

UDDALAK PUBLISHING HOUSE
15, Shyamacharan Dey St., 1st Flr.
Kolkata - 700073
Contact : 8910122473

₹ 400/-

ISSN : 2320-9275

উদ্দালক

UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩)

A Peer-Reviewed International
Multidisciplinary Academic Journal

প্রধান সম্পাদক
ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

যুগ্ম সম্পাদক
ড. অনুপ বিশ্বাস ও ড. সৌরভ দাস

উদ্দালক

UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩)

A Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Academic Journal
ISSN: 2320-9275

প্রধান সম্পাদক
ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

যুগ্ম সম্পাদক
ড. অনুপ বিশ্বাস ❙ ড. সৌরভ দাস

UDDALAK (Vol. 17 Issue II)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Academic Journal
Edited by Dr. Santosh Kumar Mandal (Chief editor),
Dr. Anup Biswas & Dr. Sourav Das (Joint editors)

© Publisher

Published by
Uddalak Publishing House
15, Shyamacharan Dey Street, 1st Floor, Kolkata-700073

Printed by
Nabaloke Press
5/2, Nerode Behari Mullick Road, Kolkata-700006
Published : September, 2023

Price: 400/-

UDDALAK
(Vol. 17 Issue II)

ADVISORY BOARD

1. **Prof. (Dr.) Pabitra Sarkar,** Former Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University

2. Prof. (Dr.) Tapadhir Bhattacharya, Former Vice-Chancellor, Assam University

3. Prof. (Dr.) Mita Banerjee, Former Vice-Chancellor, WBUTTEPA & Kanyashree University

4. Prof. (Dr.) Pranab Krishna Chanda, Former Registrar, Baba Saheb Ambedkar Education University

5. Prof. (Dr.) Rita Sinha, Former Professor & Dean (Education, Journalism & Library Science), University of Calcutta

6. Prof. (Dr.) Ravindranath Bhattacharya, Professor & Dean of the Arts Faculty, University of Calcutta

7. Prof. (Dr.) Debi Prasanna Mukhopadhyay, Former Professor of Vinaya Bhavana, Visva-Bharati

8. Prof. (Dr.) Pulin Das, Former Professor in Bengali, University of North Bengal

9. Prof. (Dr.) Krishnajyoti Goswami, Faculty of Medicine, Lincoln University, Malaysia

10. Prof. (Dr.) Taposh Kumar Biswas, Professor in Education IER, University of Dhaka, Bangladesh

11. Prof. (Dr.) Sumana Das Sur, Professor in Bengali, Rabindra Bharati University

UDDALAK
(Vol. 17 Issue II)

REVIEW COMMITTEE

1. Dr. Bishnupada Nanda, Professor in Education, Jadavpur University, Kolkata

2. Dr. Dipak Midya, Professor of Anthropology, Vidyasagar University

3. Dr. Kakali Dhara Mondal, Professor in Folklore & Director in Centre for women's Studies,University of Kalyani. President, Centre for Folklore Studies and Research, University of Kalyani, Nadia

4. Dr. Saber Ahmed Chowdhury, Chairman, Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka, Bangladesh

5. Dr. Ayantika Ghosh, Principal, Naba Ballygunge Mahavidyalaya

6. Dr. Momenur Rasul, Associate Professor in Bengali, University of Dhaka, Bangladesh

7. Dr. Chandana Rani Biswas, Associate Professor in Sanskrit, University of Dhaka, Bangladesh

8. Dr. Sabyasachi Chatterjee, Associate Professor of History, University of Kalyani, Nadia

9. Dr. Sidhartha Sankar Laha, Associate Professor of Lifelong Learning & Extension, University of North Bengal

10. Dr. Nita Mitra, Associate Professor in Geography, Siliguri B.Ed. College, Siliguri

সম্পাদকীয়

গুরুদেবের প্রতি চন্দ্রশেখরের সেই আর্তিই আজ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গুমরে গুমরে ওঠে- 'গুরুদেব ! এ কী করিলে কী করিলে'। শৈবলিনীর নরক-ভোগ নীতিবাগীশ বঙ্কিমের বাড়াবাড়ি ছিল, সন্দেহ নেই; কিন্তু আমরা এ কোন নরকে এসে পড়লাম! শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষাগুরুদের আপ্তবাক্য লিপিবদ্ধ করতে চাইলে এ পত্রিকার ক্ষুদ্র পরিসরে কুলোবে না। একদা গুরুগৃহে গুরুর পরিচর্যার বিনিময়ে অন্তেবাসী ছাত্র বিদ্যা অর্জন করতেন। বিদ্যা সমাপ্ত হলে স্বগৃহে ফিরে গিয়ে অধীত বিদ্যার দ্বারা আদর্শ সমাজ-সংসার গড়ে তুলতেন। অধ্যাত্মচিন্তায় জীবনের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করতেন। সেদিন শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মনে কোনো সংশয় ছিল না। সময় বদলেছে। গুরুগৃহে থেকে বিদ্যার্জনের পর্ব চুকে গেছে। এখন শিক্ষাসত্র গড়ে উঠেছে, সেদিনের শিক্ষাগুরু বেতনভোগী শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন। তবু শিক্ষার আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থা হারাননি। স্বল্প বেতনের শিক্ষকতার চাকরি শিক্ষাপ্রেমী মানুষেরা ভালোবেসেই গ্রহণ করেছেন। তাই শিক্ষকবৃত্তি একটি সাম্মানিক পেশা হিসাবে সমাজে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু জীবিকা যখন জীবনের চেয়ে দামী হয়ে উঠল, তখন থেকেই বদলে যেতে থাকল শিক্ষার আদর্শ, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যে। যদিও শিক্ষাগুরুরা মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শকে শিক্ষা-কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে চারিয়ে দিতে কসুর করেননি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁদের আদর্শ ও মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকলো। মানুষের মনে জীবনের সার্থকতা নিয়ে সংশয় দেখা দিল। 'এ জীবন লইয়া কী করিব, কী করিতে হয়?' এই সংশয়দীর্ণ চিত্তে শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য দিশাহারা হয়ে গেল। ভোগবাদী জীবনে মানুষ অর্থ ও ক্ষমতার মধ্যেই জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পেতে চাইল। অতৃপ্তি বাসা বাঁধলো মনে। কোন প্রাপ্তিই তার কাছে যথেষ্ট মনে হল না। একদা সমাজদৃষ্টিতে শিক্ষকবৃত্তি যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভোগবাদী সমাজে সে-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হল। একদা স্কুল মাস্টারের বেতন আড়াই-তিন হাজারের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করত। সেদিনও শিক্ষককুলে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেনি। কিন্তু সম্মানজনক বেতন-কাঠামো প্রবর্তিত হওয়ার পর শিক্ষকেরাও আর সাবেকি মূল্যবোধ ও আদর্শে স্থিত হতে পারেননি। সারাজীবন ভাড়াবাড়িতে কাটিয়ে অবসর গ্রহণের পর সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে শিক্ষকেরা নিজের একটা বাড়ি বানাতো। এখনকার শিক্ষকেরা চাকরি পাওয়ার পরপরই বাড়ি বানাতে শুরু করে। ঈর্ষণীয় বেতন ও ভোগবাদী মানসিকতাই এই পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু তার দোসর হল অতৃপ্তি। আরো বেশি অর্থলাভের আশায় শিক্ষকতার পাশাপাশি কোন ব্যবসা, শেয়ার-বাজার কিংবা গৃহশিক্ষকের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদান করে আদ

চাইলেন। ইদানীং ঈর্ষণীয় বেতন-কাঠামো সত্ত্বেও একালের শিক্ষক জীবিকার প্রতি নিষ্ঠা হারিয়ে সমাজের চোখে অমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। শিক্ষার ঘটলো অবনমন।

সচেতন অভিভাবকেরা এই শিক্ষককুলের প্রতি ভরসা রাখতে পারলেন না। তাঁরা অর্থ দিয়ে শিক্ষা ক্রয় করতে চাইলেন। চালু হল বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। অর্থাৎ শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা। মূল্যবোধের জায়গা দখল করল মুনাফা। ব্যবসার শর্তই হল– যত ভালো পরিষেবা, তত বেশি মুনাফা। কাজেই মুনাফার প্রয়োজনে উন্নতমানের শিক্ষাদানের প্রয়াস পেল। অপরদিকে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শ ও মূল্যবোধ ক্রম-অবক্ষয়িত হওয়ায় সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য তৈরি হয়ে গেল। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সার্বিক অনাস্থা প্রকট হতে শুরু করল।

প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি স্তরে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়তে লাগল, মিড ডে মিলের আয়োজন করেও শিশুদের স্কুলে ফেরানো সম্ভব হল না। জামা, জুতো, ব্যাগ, সাইকেল, মোবাইল, ল্যাপটপ অনেক কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা হল, সেগুলো পাওয়ার জন্য স্কুলের খাতায় ছেলেমেয়েদের নাম রইল, কিন্তু কেউ পড়াশুনা করল না। ফলস্বরূপ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। করোনাকালীন বিপর্যয়ে সেই সংখ্যা একলাফে অর্ধেক ছুঁই-ছুঁই। কলেজে কলেজে শিক্ষার্থীর হাহাকার। কোনো বিভাগ শূন্য, তো কোনোটাই দু-চার জন ভর্তি হয়েছে। দুবার-তিনবার করে ভর্তির বিজ্ঞাপন দিয়েও শূন্য আসন পূরণ করা সম্ভব হল না। যোগ্য অযোগ্য বিচার করবার তো প্রশ্নই নেই।

ইদানীং যোগ্যতার মাপকাঠি বিসর্জন দিয়ে একেবারে বে-আব্রু হয়ে পড়ল। এখন ভর্তি হতে ডোনেশন দিতে হয়, ভালো নম্বর পেতে, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে কাউকে কাউকে খুশি করতে লাগে। আর চাকরি পেতে গেলে তো কথাই নেই। এখন পর্যাপ্ত টাকা থাকলে ডাক্তারিও পড়া যায়। কাদের হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ! কোথাও স্কুল আছে শিক্ষক নেই, যোগ্য শিক্ষকেরা ধর্নামঞ্চে, অযোগ্যেরা আদালতের কাঠগোড়ায়। এর মাধখানে শিক্ষার্থীরা দিশাহীন, শিক্ষাহীন, আদর্শহীন, ভরসাহীন, ভবিষ্যতের গহন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। আমার সন্তান এ কোন নরকের অধিবাসী। তারা কি পাপ করেছে? 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে' যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তরুণ বাঙালি কবি, তিনি বিশ্বের শিশুদের নিয়ে ভাবতে পেরেছিলেন, তাঁরই উত্তরসূরি হয়ে আমরা বাঙালিরা বাংলার শিশুদের ভবিষ্যতের অক্সিজেনটুকু কেড়ে নিচ্ছি, এ পাপ আমরা রাখবো কোথায়? এসবই তো সমাজের স্মরণীয় বরণীয় ডাক্তার, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক সবার সামনে ঘটে চলেছে। এই ক্রান্তিকালে আপনাদের কিছুই কী করার নেই। 'গুরুদেব! এ কী করিলে, কী করিলে!' হৃদয়মাঝে গুমড়ে ওঠা এই আর্তনাদের কী শেষ নেই!

শিক্ষকদিবস, ২০২৩

সূচিপত্র

অনুপ দাস	অদ্বৈত মল্লবর্মণ : উপন্যাসে জীবন ও বাস্তবতার রূপকার	১১
অন্তিমা ভট্টাচার্য	পরভা : বাংলার বিলুপ্তপ্রায় একটি মুখোশনৃত্য	১৯
অভি কোলে	বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনার আলোকে শিশু ও কিশোরসাহিত্য	৩০
ড. অরুণ সরকার	দেড়গজী নাম ও একটি অদ্ভুত লোক	৪১
অসীম বিশ্বাস	গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অনুসারী ধর্মসম্প্রদায় : শ্রীবাস পণ্ডিত গোষ্ঠী ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়	৪৯
আঙ্গুরা খাতুন	মনোজ মিত্রের 'দেবী সর্পমস্তা': সংলাপের ভাষা ও ভাষাগত বিশ্লেষণ	৬৩
আব্দুল সামাদ	অনিল ঘড়াই-এর 'নুনবাড়ি' আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে প্রান্তিক নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম	৭১
ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস	'দিনান্তের আগুন': দেশত্যাগের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি	৮৩
ড. ঋতব্রত বসুমল্লিক	শ্রীচৈতন্যভাগবত-এ শ্রীচৈতন্য : পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম	৯৩
ড. ঋতুপর্ণা বসাক (দাশগুপ্ত)	রবীন্দ্রসৃষ্টিতে মানবতাবাদের প্রভাব	১০৬
ড. গুরুপ্রসাদ দাস	রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর : একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আখ্যান	১১৬
ড. চাঁদমালা খাতুন	বিমল সিংহের 'লংতরাই' উপন্যাস : সমাজজীবন ও সংস্কৃতির আখ্যান	১২৯
তনুশ্রী মণ্ডল	লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আর্ন্তজাতিক স্তরে উদ্যোগ	১৪১
দয়ানন্দ মাঝি	ভিন্নতর পাঠে সাইমন জাকারিয়ার 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা'	১৫২
দীপক হাজরা	রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক দর্শন তাঁর ব্রিটিশনীতি: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	১৫৯
দীপঙ্কর নস্কর	জয়নগর – কৃষ্টিময় মতিলাল রাজবংশ	১৬৭
পবিত্র বর্মন	প্রাণী (বন্যপ্রাণী) সংরক্ষণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবনা	১৭৬
পবিত্র বিশ্বাস	সাধারণ শ্রেণীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অবদান	১৮৫
পম্পা দাস	রণবীর পুরকায়স্থ ও ইমাদউদ্দিন বুলবুল-এর উপন্যাসে প্রতিফলিত দেশভাগের চিত্র : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন	১৯৮

পরেশ চন্দ্র মাহাত	"তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ": প্রসঙ্গ বিষ্ণু দে'র কবিতা	২০৩
পৌলমী সরকার	বাংলা সাহিত্যে অর্থনীতি প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সমবায় নীতি"	২১৫
প্রশান্ত কুম্ভকার	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অনুসন্ধান	২২২
প্রীতম চক্রবর্ত্তী	'রক্তে বোনা ধান' ও ননী ভৌমিকের কয়েকটি গল্প	২৩৪
ড. প্রীতম দাস	বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা	২৪৭
বিপ্লবকুমার চন্দ্র	বাংলা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দা	২৫৫
বিশ্বজিৎ রায়	অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে : যোগদর্শন	২৬২
ড. মথুর গুপ্ত	হারানের নাতজামাই : একটি বিদ্রোহের আখ্যান	২৭২
ড. মনুয়া পাঁজা	'আগুনপাখি': দেশভাগের কালে দেশভাগের মন	২৮০
মাধব বর্মন	প্রাচীন বঙ্গের লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি	২৯২
মোহিত কুমার নন্দী	গান্ধিজী ও আন্তর্জাতিকতাবাদ	৩০২
রাহুল মণ্ডল	সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কথাসাহিত্য: একটি অন্বেষণ	৩০৮
রিয়া পাল	শৈলেন ঘোষের নির্বাচিত গল্পগ্রন্থে বৈচিত্রময়তা	৩১৯
ড. লিলি সরকার	মহাশ্বেতার দরদী কথনে আদিবাসী জনজীবন	৩২৮
শিবনাথ দত্ত	বাংলা ভাষায় মহাভারত আলোচনার সূচনা-পর্ব:বঙ্কিম-পূর্বযুগ	৩৪০
ড. শ্যামল রায়	প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : একটি ভাষাশৈলী সন্ধানে	৩৫২
শ্রুতকীর্তি সরকার	মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ; দাম্পত্যসংকট ও সমাজবিগর্হিত প্রেমের পত্রগাথা	৩৬৬
শ্রেয়সী রায়	কল্পপৃথিবীর বয়ানে 'ননসেন্স' বাস্তব : 'সুকুমার' শৈশবের ভূমিকা	৩৭৭
সঙ্ঘমিত্রা কর্মকার	বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক সাগা: গোপাল হালদার	৩৮৮
সত্যজিৎ বসাক	নাটকের মধ্যে নাটক 'বিভাব' এবং শম্ভু মিত্র : বিশ্লেষণ	৩৯৬
সত্যা দেবনাথ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনা-পাওনা' : আর্থ-সামাজিক ও প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত	৪০২
সত্যেন বর্মন	বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিফলন– অথ কিম্	৪১৩
সন্দীপ দাস ও অলিক কুমার মণ্ডল	B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি	৪২২
সমর দাস	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজ্ঞানীদের অবদান	৪৩১
সর্বজিৎ মিত্র	দরদশীল সমাজে নৈতিক কাঠামোর 'সম্পর্ক' সম্বন্ধে : দরদী নীতিশাস্ত্রের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা	৪৪১
সর্বানী পাল	সেলিনা হোসেনের দিনকালের কাঠখড় : সংকট ও সংকটের অভিমুখ	৪৫৫
সাদিয়া আফরোজ সিফাত	অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্পে রাজনীতি ভাবনা	৪৬৬
সিদ্ধেশ্বর মুর্মু	সাঁওতালিভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে মহাকবি	৪৭৫
সুমিত মহন্ত	হিড়বাঁধ পরিমণ্ডলে লৌকিক দেবদেবী : এক অনালোচিত অধ্যায়	৪৮০
সুরজিৎ প্রামাণিক	নজরুলের 'অ-নামিকা' : বাসনার বিপুল আগ্রহ	৪৯০
সুরেন্দ্র নাথ দে	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর কথাসাহিত্য	৫০৩
সুলগ্না ব্যানার্জী	সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাষাশৈলী: একটি পর্যালোচনা	৫১২
সুস্মিতা সাহা	বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে পুরাণ কাহিনির নবরূপায়ন	৫২৮
স্নিগ্ধা চক্রবর্তী	সুমন ও নচিকেতার গানে 'জীবনমুখী' পরিসর : বিস্তৃতি ও বিতর্ক	৫৩৬
হৈমন্তী ব্যানার্জী	গান্ধীজির অহিংসা ও সমসাময়িক বিশ্ব : একটি আলোচনা	৫৪৮

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : উপন্যাসে জীবন ও বাস্তবতার রূপকার

অনুপ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

আপন সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা নিয়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার অদম্য প্রচেষ্টায় তিতাস পারের জন-জাতির জীবন ইতিহাস কীভাবে পরিবর্তনের ছোঁয়ায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার কথা অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস নিয়ে লেখা এই প্রবন্ধে রয়েছে। যেখানে রয়েছে একদিকে বহিঃশত্রু, অন্যদিকে অন্তর্ঘাত। এই উভয় সংঘাতে মুছে যাওয়া এক সম্প্রদায়ের করুণ কাহিনীর বিষাদ ঘন বর্ণনার পাশাপাশি বিদেশী শক্তির অভিঘাতে এদেশীয় মানুষের ওষ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই, যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন শহর কলকাতা আবহ-পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যার ফলে সমগ্র উপমহাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদেশী শোষণ, হস্তক্ষেপ ও যুদ্ধকালীন সংকটময় পরিস্থিতিকে প্রকট করে তুলেছে। অন্যদিকে জীবনের গভীর সংকল্পকে একনিষ্ঠ উদ্যোগে সফল রূপদানের সাথে সাথে প্রতিশ্রুতি-প্রেম-পরিণতির আনন্দময় কথাচিত্র, ব্যক্তি-জীবনের দোলাচলতা ও বাস্তব পরিবেশে জীবনযাপন যে যে বিশেষত্বগুলি কথাকারের লেখনী সত্তায় ফুটে উঠেছে তার সবটাই এই প্রবন্ধের পরতে পরতে রয়েছে।

মূল প্রবন্ধ

কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাহিত্যের প্রাঙ্গণে একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব রূপে সর্বজনবিদিত। ব্যক্তিজীবনের বৈচিত্র্যময়তার মতো তাঁর সাহিত্যজীবনও ভিন্নতায় পরিপূর্ণ। সাহিত্য জীবনের রসদ হয়তো তিনি ব্যক্তিজীবন থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যবাড়িয়া-গোকর্ণঘাট-কুমিল্লা থেকে কলকাতা-শান্তিনিকেতন পর্যন্ত তিনি ভাগ্যান্বেষণের জন্য যেমন ঘুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি ভাবে তাঁর সাহিত্যে 'সবার পিছে সবার নীচে সর্বহারা'দের ঘুরে বেড়ানোর কথা পাই। যেখানে মাঝিমাল্লা, চাষী-মজুর, খেটে খাওয়া মানুষ, খেতে না পাওয়া মানুষ সবাই রয়েছে। সাহিত্য জগতে মাসিক 'ত্রিপুরা'(১৩৪১) পত্রিকায় সম্পাদক রূপে অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রথম আবির্ভাব। এরপর 'নবশক্তি', 'কৃষক', 'মোহম্মদী', 'যুগান্তর', 'নবযুগ', 'সাপ্তাহিক দেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় সম্পাদনার কাজও করেছেন। বিশ্বভারতী'র গ্রন্থণ বিভাগেও কিছু সময়কালীন কাজ করেছিলেন। 'কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে উপন্যাস লিখছেন তা আমরা জানতুম না। নিজে চাকরি করতেন 'দেশ' পত্রিকায়। কিন্তু একদিন অন্য একটি অখ্যাত পত্রিকায় তাঁর একটি উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যে উপন্যাসটি নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম'।[১] সেই অখ্যাত পত্রিকার নাম 'মোহম্মদী'। শুধু এই উপন্যাসে নয়; তাঁর 'শাদাহাওয়া', 'রাঙামাটি' উপন্যাসের অন্দরেও আমাদের চারিপাশের চোখে দেখা মানুষের পরিচয় পাই। যারা জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত লড়ে চলেছেন। এই বেঁচে থাকার লড়াই-ই যেন তাঁর সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। যার বাস্তবসম্মত রূপ এই প্রবন্ধের পর্যালোচনায় প্রকট হয়ে উঠবে।

প্রকৃতি ও মানবে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কাহিনী 'তিতাস একটি নদীর নাম' (মোহম্মদী, শ্রাবণ ১৩৫২) উপন্যাসটি। তিতাস পারের মালো পাড়ার শান্ত সমাহিত জীবনেতিহাস নিয়ে এসেছে সুখ ও সমৃদ্ধি। তিতাসকে কেন্দ্র করে মালোদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ জড়িয়ে রয়েছে। তিতাস হীন জীবনের কথা মালোরা কখনোই ভাবতে পারে না। তিতাসে মাছ ধরে মালোদের সংসার চলে। এ প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন—

> "এই গ্রন্থে আছে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত তিতাস নামে একটি নদী এবং তার তীরবর্তী মাছধরা মালো সম্প্রদায়ের জেলেদের জীবন-যাপনের নিখুঁত ছবি। 'তিতাস'এর প্রতিবেশী নদীর নাম 'বিজয়'। তা জলহীন

শীর্ণ। তার ধীবরদের সঙ্গে তুলনা করে লেখক মালো সমাজের মাছধরা পেশা-নির্ভর জীবনের চমৎকার ছবি এঁকেছেন।"[২]

যেখানে তিতাসের ঢেউয়ের সাথে তাদের জীবনসংগ্রামের ওঠানামা, ভাঙাগড়ার কথা কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় তিলক-সুবল-কিশোর'রা শুকদেবপুরে মাছ ধরতে গিয়ে বউ নিয়ে ফেরার পথে নয়াগাঙের খাড়িতে ডাকাতির কারণে কিশোর পাগল হয়ে যায়। নদীনির্ভর পূর্ববঙ্গের মাঝি-মালোদের সংকটময় জীবনের ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি পাগল কিশোর চরিত্রে ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিলক, সুবল, কিশোর, অনন্তর মা, বনমালী সকলেই ধীরে ধীরে তিতাসের মতো শুকিয়ে গেছে। কাহিনী যত এগিয়েছে ততই দেখতে পাই একের পর এক চরিত্রগুলো জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে চলে যাচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

মালোরা পূর্বে সচ্ছল জীবনযাপন করলেও, ক্রমশ তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তারপর তাদের সঙ্ঘবদ্ধতায় যেদিন চির ধরে সেইদিন থেকে মালোরা সর্বদিক থেকে শান্ত হতে শুরু হয়। বামুন, সাহা, পাল, তেলিপাড়ার লোকেরা তাদের ভাঙনকে বিশেষভাবে মদত দিতে থাকে। তাদের কুপ্ররোচনায় অর্থিক লোন নিয়ে যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনি তাদের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডে গ্রামের অভ্যন্তরে মালোদের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মালোদের ঐক্যবদ্ধ সংহতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদের জীবনে ঘনিয়ে আসে দুর্ভোগের কড়াল ছায়া। মালোরা দিশেহারা হয়ে দ্বি-বিভক্ত হয়ে যায়। যাত্রাদলের হারমোনিয়ামের সুর মালোদের খোল-করতালকে ছাপিয়ে ওঠে। সংস্কৃতির আপ্রাণ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় বাসন্তী, মোহন, উদয়চাঁদ প্রমুখের পরাজয় ঘটে। এখন মালোদের মেয়েরা স্যাকরার গয়না, মনোহারী দোকানের তেল, সাবান, গামছার প্রতি আকৃষ্ট; মালোদের ছেলেরা বড়ভাইয়ের বউকে 'বউদি' বলে ডাকে- যার ফলে মালোদের অন্তঃপুরের শুচিতা নষ্ট হতে থাকে। অন্যদিকে লোন কোম্পানির বাবুদের পেয়াদা সহযোগে অত্যাচারের দৃশ্য গ্রামের বুড়ো রামকেশবের নির্যাতনের মধ্যদিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক অসাধারণ দক্ষতার সাথে মালোদের সংস্কৃতি ও সামাজিক

সংহতি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, জীবনবোধ ও বেঁচে থাকার প্রবণতা কীভাবে ধীরে ধীরে লোপ পেল, তার বাস্তব চিত্র আমাদের দেখিয়েছেন। সমালোচক বিমল চক্রবর্তী লিখেছেন—

> "তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিকে বাস্তবতাবাদী বা realistic উপন্যাস বলতে পারি, এ উপন্যাসে বাস্তবতা অথবা realism-এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। উপন্যাসে বাস্তবতার অর্থ শুধু দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ও ক্ষুদ্র, খন্ড ঘটনাবলী এবং দৃশ্যবলীর বিবৃতি নয়, মানবজীবনের বাস্তবদুঃখ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ইত্যাদির বিশ্বস্ত চিত্র নির্মাণ।"[৩]

আর অনন্ত ও অনন্তবালার অসম্পূর্ণ গাথা বড়ই করুণ। অনন্ত লোক সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। কিন্তু অনন্তবালা উমার মতো শিবের তপস্যায় আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এরজন্যই 'তিতাস একটি নদীর নাম' তিতাসের হারিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তিতাসের পারে বসবাসকারী মালোদের হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। যারা তিতাসের পারে সুখের স্বপ্ন দেখত আজ তারা ছন্নছাড়া। নদীর অগভীরতায় আজ কৃষকের চাষের জমি। পরিবর্তনের প্রবাহে দিকভ্রান্ত মালোদের জীবনে নেমে আসে ভিক্ষাবৃত্তি, দুর্ভিক্ষ। উপন্যাসের অন্তিমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া তিতাস পারের গ্রামের বর্ণনায় জানতে পারি—"সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁসোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২ সালের শহর কলকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর 'শাদা হাওয়া' (সোনারতরী, শারদ ১৩৫৫) উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটায় ভারতের মাটিতে রয়েছে ব্রিটিশ সৈন্য টম ও আমেরিকার সৈন্য জীল'রা। তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি, শোষণের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। রাজনৈতিক দোলাচলতায় মানুষের জীবনের চরম

মূল্যহীনতা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাতে হাজার মানুষের মৃত্যু, যুদ্ধকালীন ব্যক্তি-মানুষের চরিত্রের অবনমন, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মানুষ মানুষকে ধ্বংস করতে উদ্ধত। কিন্তু, সমগ্র চাষীমজুর যদি এক হতে পারত, সমস্ত সর্বহারারা যদি এক হতে পারত, সকল সৈন্যরা যদি এক হতে পারত তবে এই নিপীড়ন দূর হত, হত্যালীলা বন্ধ হয়ে যেত। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি যেন মানুষকে ক্ষণিকের জন্য দার্শনিক করে তোলে। তাইতো গোয়েন্দা গোবিন্দ শর্মা ভাবে—

> "যুদ্ধ করে কেবল ভাই ভাইকে মারছি আর ভাইয়ের হাতে মরছি। অন্য কেউ তো মরছে না। এবার আমাদের ভুল ভেঙেছে। যাদের স্বার্থ এক, কার্য এক এবং গতি ও পরিণাম এক তাদের মধ্যে কেন থাকবে বিভেদের সপ্তসিন্ধু, কেন থাকবে শত্রুতার বিষবাষ্পের উত্তাপ।" (শাদা হাওয়া)

রাজনৈতিক এই সত্যতা গোবিন্দের কাছে প্রকট হলেও বাস্তবে সে সংঘবদ্ধতা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, এই অবক্ষয়ের যুগে বাংলায় বাঙালীরা তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। অফিসের দাবী নিয়ে আন্দোলনেও এদেশীয় কর্মচারী, শ্রমিকদের মধ্যে মতবিরোধ, একে অপরকে বঞ্চিত করার প্রয়াস এবং কর্তৃপক্ষের পদলেহন। কান্তগোপাল দীর্ঘাঙ্গী, ধনপতি দাস, ললিত পাকড়াসী, হরিদাস প্রামাণিক প্রমুখের আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে চায় মতিলালরা। গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ আদর্শের এই দেশের এহেন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার কথাও টমি ও জীলের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। লেবার লীডারকে হত্যা, গান্ধীজির গেপ্তার, বিদেশী দ্রব্য পোড়ানো, জাপানী আক্রমণ ও প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এই সমস্ত কিছু মানুষের ব্যক্তি অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে। রাষ্ট্রের সংঘাত যেন মানুষের জীবনে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

গ্রাম ও শহুরে জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'রাঙামাটি' (চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৭১) উপন্যাসে সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। যার এক প্রান্তে রয়েছে গ্রাম্যজীবনের রাঙামাটির প্রতীক রেণুকা আর অন্যপ্রান্তে শহরতলীর প্রতীক

ডাক্তার নবকুমার। রেণুকার পিতা হরগোবিন্দবাবু 'গ্রাম দিয়ে শহর গড়া'র সংকল্পে ব্রতী হয়েছিলেন। আর নবকুমারের পিতা ললিতবাবু শহুরে জীবনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। সেই কারণেই ছেলেকে ডাক্তারী পড়ায়। আর কথা দিয়েছিলেন নবকুমার বড় হলে তার সাথে রেণুকার বিয়ে দেবে। পরে প্রেম ও সম্পর্কের দোলাচলতা উপন্যাসের কাহিনীধারাকে ভিন্ন দিকে নিয়ে গেছে। অন্য দিকে হরগোবিন্দের গ্রাম গঠনের কার্যাবলী দেখে ললিতবাবু বলেন, 'তুমি অসাধ্য সাধন করেছ গোবিন্দ। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের স্বপ্নকে সত্য করেছ। পল্লীর সমস্ত দলাদলি হিংসা-দ্বেষ দূর করে তার মধ্যে এমনি সাম্য আনা, এমন শ্রী দেওয়া যেতে পারে তা তোমার জমিদারী না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।' জমিদার হরগোবিন্দের পল্লীবাসীর জীবনযাপনের সংগ্রামকে নিজ জীবনের একমাত্র সংকল্প করে সকল প্রতিকূলতাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। শুধু চেষ্টা করেননি, তিনি গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়ণ করেছেন। আমরা দেখতে পাই গান্ধীজির অহিংসনীতির প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রদ্ধা হেতু উপন্যাসের জমিদার হরগোবিন্দ চরিত্রটির রূপদান। জমিদার চাইলেই তার দণ্ডনীতিকে প্রয়োগ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা কখনোই করেননি; আজীবন সমর্থনও করেননি। তার পরিবর্তে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও হরগোবিন্দ স্থির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। গ্রামের মধ্যে যে শহরের প্রাণ লুকিয়ে রয়েছে একথা রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে বলে গেছেন। হরগোবিন্দ সেই সত্যকে গভীর ভাবে অনুধাবন করেছেন এবং তার জমিদারীর মধ্যে প্রতিরূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারী কাজ দেখাশোনা করতে গিয়ে যে সংকল্পকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই সংকল্প যেন হরগোবিন্দের জীবন আদর্শ হয়ে উঠতে দেখা যায়। আমরা জানি লেখক দীর্ঘ সময়কালীন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে কর্মসূত্রে ছিলেন। রবীন্দ্রচিন্তা ও চেতনা তাঁর মননে বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সহিত ব্যপিত ছিল। যার প্রতিফলন এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায়।

রেণুকা-বিজনেশ-নবকুমার— এই তিনজনের সম্পর্কের পরিণতি 'রাঙামাটি' উপন্যাসটির কাহিনিকে অন্যমাত্রা দান করেছে। রেণুকা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে

শহরের আদবকায়দাকে আপন করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে মানিয়ে নিতে পারেনি। কারণ, জ্ঞানদা দেবীর মতো নিন্দুকদের জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রেণুকার সাথে বিজনেশ নামক কবির প্রেম হয়ে ওঠে 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য ও অমিতের মতো। যদিও নবকুমারের মতে বিজনেশ মদ্যপ, লম্পট। তবে 'ল্যাবরেটরি'র মতো পিসিমা ব্রজরাণীর আগমণে তাকে স্খলিতের হাত থেকে রক্ষা করেছে। নবকুমার ও রেণুকার পারস্পরিক আকর্ষণ, ঈর্ষা, অভিমান ও উপেক্ষা পরিশেষে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ– সবকিছু মিলিয়ে উপন্যাসটি অন্যমাত্রা লাভ করেছে। যদিও রেণুকা নবকুমারকে গ্রহণ করে তার বুকে নিজের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে, তবুও শেষে শহুরে জটিল মানবিকতার মাঝে পড়ে তাকে নিঃস্ব হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল রাঙামাটির প্রান্তরে। বিদেশীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ যে কতটা বিভ্রান্তিকর, নাগরিক সভ্যতার বিকৃত অভিজাত সমাজের কদর্য রূপ কতটা ভয়ঙ্কর তা রেণুকা শহরে না এলে বুঝতেই পারত না। শহুরে জীবন সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস তার আজীবন থেকে যেত। এ প্রসঙ্গে বিমল চক্রবর্তী লিখেছেন–

> "অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাসাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বের লেখা হলেও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিষয় নির্বাচন অসাধারণ। নাগরিক জীবনের ছদ্ম জগতকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ চিহ্নিত করলেন। কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত করলেন।"[৪]

মডেল ফার্ম কোম্পানি, চাষাবাদের কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয়, গ্রামোন্নয়ণ ব্যবস্থা এবং জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তের আদলে রেণুকা'র চরিত্রায়ন-এই সবকিছু বাস্তব বিষয়বস্তুর আদলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ মাত্র।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু তাঁর এই উপন্যাসে যে সকল কাহিনির বর্ণনা করেছেন, তা সবই তিনি নিজ জীবনে চাক্ষুষ দর্শন করেছেন। তিনি যে পরিচিত পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন, কর্মসূত্রে যে সকল স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যে সমস্ত অভিনব ঘটনা সমূহের সম্মুখীন হয়েছেন, তা সবই তাঁর কলমকে প্রভাবিত করেছে। তিনি মানুষকে খুব কাছের থেকে দেখেছেন, মানুষের

লড়াইকে নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন। আর একারণেই তাঁর উপন্যাসের পাতায় সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন-যাপনের কথা রয়েছে।

তিতাস পারের নিম্নবর্গের মানুষগুলো সাধারণভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু জীবনের লড়াইয়ে তাদের পরাজয় হয়েছে। যেমন পরাজয় ঘটেছে 'শাদা হাওয়া'র গোবিন্দশর্মার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট গোবিন্দ হয়ে যায় স্পাই, খুনি। তিনি ইউরোপীয় চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী মানুষদের জীবন সমস্যার স্বরূপকে উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সাম্রাজ্য রক্ষা ও দেশ রক্ষার নামে শক্তিধরের হাতে আবদ্ধ জন-জীবনের সংকটজনক পরিস্থিতি। যেখানে বেঁচে থাকাই প্রথম ও প্রধান প্রাধান্যতা পেয়েছে। রাশিয়া ও জাপানী কৃষি পদ্ধতিতে দীক্ষিত হরগোবিন্দ রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনকে, জাপানের আদর্শ গ্রাম উগানমুরাকে তার রাঙামটির আঙ্গনে বাস্তবায়ণ করেছেন তার অদম্য প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। তিতাস পারের সংকটপূর্ণ মালোসমাজের কথাচিত্র থেকে বিয়াল্লিশের সংঘাতময় মহাযুদ্ধকালীন কলকাতার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতা লাভে জনজাতির প্রয়াস এবং স্বদেশ গঠনের সংকল্পে রাঙামাটির রূপদান সবটাই ঔপন্যাসিক বাস্তবসম্মত ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সূত্র নির্দেশ :

১. মিত্র, বিমল, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।
২. দত্ত, বীরেন্দ্র(১৯৯৮), বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১১১।
৩. চক্রবর্তী, বিমল(২০১২), অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্যজীবনের ব্রাত্যকথাকার, অক্ষর পাবলিকেশনস, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃষ্ঠা-৯২।
৪. চক্রবর্তী, বিমল(২০১২), অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্যজীবনের ব্রাত্যকথাকার, অক্ষর পাবলিকেশনস, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা, পৃষ্ঠা-৭০।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. খান, ড. ইসরাইল(২০১৫),সংগ্রহ ও সম্পাদনা, অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাবলী, সূচীপত্র, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

পরভা : বাংলার বিলুপ্তপ্রায় একটি মুখোশনৃত্য

অন্তিমা ভট্টাচার্য
গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বাংলার জঙ্গলমহলের অন্তর্গত লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে আজও বিখ্যাত হয়ে আছে ঝাড়গ্রাম জেলা। তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসতি সম্পন্ন এই এলাকার ঝুমুর নাচ,পাইক নাচ,ছৌ নাচ,রনপা নাচ,কাঠি নাচ ইত্যাদি আঞ্চলিক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে আজও ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে আছে। এই অঞ্চলের বিশেষ আঙ্গিক সম্পন্ন ছৌ নাচ 'পরভা' নামে পরিচিত। মূলত চিল্কিগড় নামক স্থানের রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই বিশেষ লোকনৃত্যটি একসময় প্রসারতা লাভ করেছিল। পরভা উৎসবের সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় হল,এখানকার শিল্পীরা এই বিশেষ শৈলীর নৃত্য পরিবেশন করবার সময় মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢাকা এক বিশেষ ধরনের কাঠের বা সোলার মুখোশ ব্যবহার করেন। পরভা নাচের শিল্পীরা প্রায় ষোল ধরনের মুখোশ ব্যবহার করে থাকেন। 'পাথর' পদবীধারী শবর সম্প্রদায়ের মানুষ এই মুখোশ শিল্পের কারিগর হিসাবে প্রথমদিকে পরিচিত ছিলেন। মূলত চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজন উপলক্ষে ধর্মীয় উৎসব হিসেবে এটি অতীতকালে অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু বর্তমানে এটি ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা ত্যাগ করে সাধারণ সংস্কৃতিসম্পন্ন এক অনুষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিস্মৃতির প্রায় অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া এই বিশেষ প্রকার লোকনৃত্যটি বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরুজ্জীবন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

সূচক শব্দ

লোকসংস্কৃতি, চিল্কিগড় রাজবাড়ী, সরাইকেল্লা, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গুরুসদয় দত্ত।

মূল আলোচনা

বাংলাদেশের প্রায় ৩২টি উপজাতির মধ্যে রক্ষণশীলতাযুক্ত কম-বেশি লোকসংস্কৃতির প্রচলন প্রায় সকলের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যেই আছে। এইসকল লোকসংস্কৃতিগুলির বেশিরভাগই পরিবর্তনবিমুখ,রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যময়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো তাদের শিক্ষা-দীক্ষার অভাব এবং বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতা। তার ফলে তারা তাদের আগের অবস্থান থেকে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে খুব বেশি অগ্রসরতা লাভ করতে পারেনি। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে হারিয়ে যাওয়া এমনই একটি উৎসব হল ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত চিল্কিগড়ের ছৌ নাচ স্থানীয় ভাষায় যা 'পরভা' নামে পরিচিত। এই জেলাটি বেশ কয়েক বছর আগে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার জন্য তপশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসতিসম্পন্ন এই এলাকা মৌলিক এক ঘরানা সম্পন্ন স্বতন্ত্র একটি জেলা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রশাসনিক বিভাগীকরণের মধ্যে,বৃহত্তর ভৌগোলিক অবয়বের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আর জনজীবনের নিজস্বতা থেকে যায়। কারু-চারু-লোকশিল্পের নানা উপাদান ও আঙ্গিক এইসব সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যেই বিকাশলাভ করেছে। সংহত গ্রামসমাজের মধ্যেই লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদানগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলার দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পালাবদল, উত্থান-পতন,ভাঙা-গড়ার ঘাত-প্রতিঘাতেই বাংলার লোকশিল্পের সমৃদ্ধি ঘটেছে বলে মনে করা যায়। তবে এই লোকনৃত্যটি বলতে পারা যায় একটি হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকনৃত্য। কিন্তু সরাইকেল্লা বা পুরুলিয়ার ছৌয়ের থেকে পরভা নৃত্যশৈলী গঠন ও আঙ্গিকগত দিক থেকে অনেকটা ব্যতিক্রমী। কারণ এই নৃত্যটিতে নৃত্যশিল্পী প্রধানত কাঠের বা সোলার মুখোশ পরে নৃত্য করে। এখানকার স্থানীয় কোল, ভিল, মুন্ডা, সাঁওতাল, কুর্মি সম্প্রদায়ের

মানুষেরা প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে পরভা উৎসবের সঙ্গে যুক্ত। কাঠের বা শোলার তৈরী এই বর্ণময় মুখোশ দ্বারা মূলত শিল্পীর মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত অংশ ঢাকা থাকে। লোকসংস্কৃতির এই হেন বিচিত্রতা সম্পর্কে Curt Sachs তাঁর 'World History Of The Dance' গ্রন্থে বলেছেন-

> "After covering the body and it's colour by means of paint and cosmetics and actors should assume the nature of the person whose character he is to represent to put on another face to admit and other street we call this otherwise with all its costume and decoration a mask it is interesting to note that whatever the mask was of use it always carried along with it a religious significance." [১]

প্রাচীন ইতিহাসের তথ্য থেকে জানতে পারা যায় প্রথমে চিল্কিগড় রাজপরিবারের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীনকালে পরভার মুখোশগুলি ছিল কাঠের তৈরি। মূলত মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত এই কাঠের মুখোশগুলি অত্যন্ত ভারী এবং পরিধান করে নাচ করার অসুবিধার জন্যই পরবর্তীকালে শোলার তৈরি মুখোশগুলি শিল্পীরা ব্যবহার করতে থাকে। চৈত্রসংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের শেষ পর্যন্ত চিল্কিগড় রাজবাড়ীর উৎসব প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার সময় এই অঞ্চলের শিল্পীরা পরভা নৃত্যটির মহড়া চালাত এবং পরবর্তী সময়ে সেটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আকারে পরিবেশন করত। জনশ্রুতি আছে, জামবনি থানার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের নান্দনিক বিনোদনের পালা ছিল এই পরভা উৎসব। এর মধ্যে সোহাগী বাবু, ভূত-ছো ইত্যাদি অন্যতম প্রধান পালা বলে পরিগণিত হয়। বৈশাখের শেষ দিনে এই পরভা নৃত্য উৎসবে সতীর পালা উপস্থাপিত হয়। বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত কোনও কোনও লোক-অনুষ্ঠান বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে একটি লোক সমন্বয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এক কথায় বলা যেতে পারে বাংলার লোক সংস্কৃতিতে মুখোশ সম্বলিত বিভিন্ন প্রকার নৃত্য এবং নাটকের প্রচলন আছে । তাদের মধ্যে একটি মৌলিক এবং বৈচিত্র্যময় উৎসবমুখরতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

এই লোকনৃত্য এবং লোকনাট্যগুলির পশ্চাতে বাংলার কৃষিকার্যের একটি ক্ষীণ

ভূমিকা আছে। আবার লোকসমাজের সমষ্টিগত আবেগ তথা কর্মপ্রবণতাকে জাগ্রত করার জন্যও অনেক সময় নাচ, গান, নাটকের মত বিভিন্ন শিল্পকলার উপস্থাপনা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে মাধুর্যমণ্ডিত করে থাকে। আদিম উপজাতি সম্প্রদায়ের উৎস সম্পর্কে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারত সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন-

> "আচার এবং লৌকিক বিধি-নিষেধ,দেশ-কাল-পাত্রভেদে অবস্থার গতিকে সমাজরক্ষার সামাজিকতা খুব সুবিধার জন্য গঠিত হইয়াছে। আসলে ব্যবহারিকভাবে এগুলিকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। আদিম মানবের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মপ্রবণতা প্রবল ছিল বলিয়াই বিভিন্ন ধর্মে,ধর্মভাবের প্রাধান্য ছিল। তবে আদিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের যে অস্তিত্ব একেবারে ছিল না- এ কথা বলা যায় না।"[২]

পুরুলিয়ার ছৌয়ের মতোই পরভা পালাতে গণেশ, নারায়ণ, ষড়ানন, সরস্বতী, লক্ষী, অরুণ, বরুণ, কুমির, কাক, দশভুজা, রাবণ, কার্তিক প্রমুখ মুখোশ ব্যবহার করা হয়। প্রথমদিকে কাঠ কুঁদে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দ্বারা মুখোশগুলি তৈরি করা হতো। চিল্কিগড় রাজবাড়ী থেকে পাওয়া প্রায় বারো রকমের পরভা লোকনৃত্যের মুখোশ 'ঝাড়গ্রাম লোকসংস্কৃতিসংগ্রহশালা'তে আজও সংরক্ষিত আছে। শোনা যায় আকস্মিক একটি অগ্নিকাণ্ডে বাকি চার রকমের মুখোশ নষ্ট হয়ে গেছে।

বাংলায় আঞ্চলিক লোকনাট্যগুলি প্রায় সর্বত্রই লোকসংগীত সম্বলিত লোকনৃত্য থেকে উৎপন্ন হয়। প্রধানত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এ ধরনের নাটকগুলি রচিত এবং উপস্থাপিত হয়। বিসহরা নাটকের দেবী মনসার কথাতেই হোক, গম্ভীরাতে শিবের প্রসঙ্গেই হোক, কুশান গান বা রামায়ণের কথাই হোক- 'ধর্ম' শব্দটি লোকনাট্যর মধ্যে মূলত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, মূলত লোকশিক্ষার জন্যই লোকনাট্যগুলির মঞ্চায়ন ঘটে থাকে। তাদের প্রাচীন এই সংস্কারের ঐতিহ্য, প্রথাগত ভাবনা, চিন্তাগুলি অবলম্বন দ্বারা নিজেদের সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যতা আজও এভাবে বজায় রেখে চলেছে। এদের গোষ্ঠীগত বিশ্বাস-সংস্কার-জীবনযাত্রা-সমাজব্যবস্থা সবকিছুর মধ্যেই একটি বিচার করার প্রবণতা লক্ষ করা

যায়। সাধারণ মানুষদের এই লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করে ছটি খণ্ডযুক্ত ইন্ডেক্স রচনাও করা হয়েছে। আসলে লোকসংস্কৃতি যে কোনও জাতি বা উপজাতির চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটি বিশ্বজনীন ও সর্বাঙ্গিন রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাঙালি প্রথম থেকেই আবেগপ্রবণ জাতি। বাঙালির এই হেন উৎসবমুখরতায় 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' প্রবাদটি আজও উল্লেখিত হয়। আজও তাই বাংলার লোকসাহিত্যগুলির মধ্যে লোকগাথা, লোককাহিনি, লোকনৃত্য, লোকসংগীত, লোকনাট্য, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি উপাদানগুলি মনি-মুক্তার মতো ছড়িয়ে আছে। বাংলার লোককথায় ড্রাগন না থাকলেও সেখানে ভূত-প্রেত-রাক্ষস-খোক্ষস ইত্যাদির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। আসলে প্রাচীনকাল থেকেই সাধারণ মানুষের মনে দৈবিক এবং অলৌকিক শক্তির প্রতি ভীতি ও ভক্তি দুটি একসাথে ছিল। গুহাবাসী-বনবাসী মানুষের শরীরের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি,পশুর প্রতি ভয় ইত্যাদি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই মানুষ বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক ভাবনাকে বিশ্বাস করে তার থেকে সাময়িক মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছিল বিভিন্ন প্রকার লোকসংস্কার দ্বারা। এসকল লোকসংস্কারের উপর ভিত্তি করে এককথায় বিরুদ্ধ ও বিদগ্ধ শক্তিকে ভয় দেখাতে এবং বশীভূত করতেই তাদের নিজেদের মুখের অবয়বের বিকল্প হিসেবে মুখোশ ব্যবহারের করতে শুরু করে।

আজও কান পাতলে বৃদ্ধ পরভা গায়ক ভুবন খামরুইদের মত মানুষদের মুখ থেকে শোনা যায় এই সকল কাহিনি। মৃত স্বামীকে স্মরণ করে সতী চরিত্রগুলি গান গাইত এই বলে—

"আমি কি করিব কোথায় যাব
বল না গো দ্যুতি।
পরানে মারিয়া শেল
বড়ালী পিরিতি।।
শিশুকালে ছিলাম ভালো
কুসুম শয়ানে।

এবে তনু ঝর ঝর
মদনের বাণে।।"

অধ্যাপক সুশীল বর্মন তাঁর 'জঙ্গলমহলের সতীক্ষেত্র' প্রবন্ধতে লিখেছেন—

"যতদূর মনে হয় বাংলায় ছৌ নাচের কাঠের মুখোশের ব্যবহার একমাত্র চিল্কিগড়ের পরভা নৃত্যেই ভারতের মধ্যে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশে অশুভ শক্তি থেকে পরিত্রান ও দৈব কৃপালাভের জন্য প্রাচীনকালে মুখোশনৃত্য প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মুখোশের উৎপত্তি সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক যুগে। পাহাড়ের গায়ে ও গুহাচিত্রতে মুখোশের আকৃতি মিলেছে। সিন্ধু সভ্যতায় পোড়ামাটির মুখোশের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যাকে বলা হয় 'পশুপতির মুখোশ'। মধ্যপ্রদেশের বৈগা উপজাতির মধ্যে কাঠের মুখোশের ব্যবহার প্রচলন আছে। এছাড়া কেরলে তিরায়াট্টাস এবং ভূত নৃত্যের মধ্যে কাঠের মুখোশ ব্যবহার করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ঠিক কীভাবে চিল্কিগড়ে ধবলদের রাজা মানগোবিন্দ কাঠের মুখোশের পরিকল্পনা ও প্রচলন করে পরভা নৃত্য পদ্ধতির সূচনা করেন,তা অবশ্য গবেষণা সাপেক্ষ। তবে যতদূর মনে হয়,তখনও শোলার ব্যবহার না থাকায় সহজলভ্য কাঠকে কুঁদে মুখোশ তৈরি করা হতো। কালক্রমে রাজ্যপাট গেলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পরভা নামক লোকনৃত্যের ঘরানাটি ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে বিশ শতকের নয়ের দশকে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। সময়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল চিল্কিগড় ঘরানার ব্যতিক্রমী পরভা ছৌ। চিল্কিগড়ের রাজপরিবার এবং পরভার ছৌয়ের সাথে যুক্ত শিল্পী এবং বাদ্যকাররা অধিকাংশই আজ প্রয়াত। তাই এই লোকনাট্যটি এককথায় ক্ষয়িষ্ণু এবং সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে যে সীমাবদ্ধ সংখ্যক সংস্কৃতিমনস্ক শিল্পীদের মধ্যে এই ছৌ নাচটি বেঁচে আছে, তারা এখন কাঠের মুখোশের পরিবর্তে মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত সোলার সুদৃশ্য রংবেরঙের মুখোশ পরিধান করে এই লোকনৃত্যটি উপস্থাপিত করে।"[৩]

ঝাড়গ্রাম জেলার পরভা উৎসবের মুখোশগুলি শিল্পীরা যথেষ্ট সচেতনতার সাথে তৈরি করে থাকে। কাঠের তৈরি মুখোশগুলিকে বাঁশের পাতা দিয়ে তৈরি বৃত্তের উপর প্রথমে রাখা হয় এবং তারপর সেইগুলি ব্যবহার করা হয়। তবে পুরুলিয়ার ছৌয়ের মত ধামসা, মাদল এই ধরনের বাদ্যযন্ত্র এই নৃত্যে বাজে না। কেবলমাত্র ঢোল এবং সানাই - এই দুটি বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয় দ্বারা গঠিত সুরের মাধ্যমে পরভা নৃত্য খোলা প্রাঙ্গণে পরিবেশিত হয়।

পরভার ক্ষেত্রে একটি কাঠের ছাঁচে একটিমাত্র মুখোশ তৈরি হয়। কিন্তু পরিবেশনগত বৈচিত্র্যময়তার দিক থেকে এই লোকনৃত্যটি সত্যিই বাংলার একটি অন্যতম প্রধান ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। চিল্কিগড় রাজবাড়ীর সঙ্গে পরভা নৃত্যটির উৎপত্তিগত ইতিহাস সম্পৃক্ত হলেও মূলত জামবনি থানার দুবরা গ্রামে এই মুখোশটি তৈরি হতো। 'পাথর' পদবীধারী শবর সম্প্রদায়ের মানুষজন এই মুখোশগুলি তৈরির কাজটির সাথে প্রথমদিকে যুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলিয়াবেরা থানার নোটা, চনাবেড়িয়া, জয়পুর, বামুনডিহা ইত্যাদি অঞ্চলেও পরভা নৃত্যের উপযুক্ত কাঠের মুখোশ নির্মিত হয়। আসলে 'পরভা' কথাটির অর্থ হল 'অখন্ড কাঠের তৈরি বাহনসহ দেব-দেবীদের মুখোশসহ সম্পূর্ণ দেহ কাঠামো'। পরভা নৃত্যের মুখোশটির কৌশলগত অনন্যতা সত্যিই বর্ণনা করার মত। কথিত আছে, 'রাজা মানগোবিন্দ সিং' ওড়িশা থেকে একদল 'করঙ্গ' সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে নিয়ে এসে, তাদের বসবাস করার জন্য ঘর-জমি সবকিছু দিয়ে কাঠের মুখোশ তৈরি করানোর কাজ শুরু করেন। পরে মানগোবিন্দ সিংহের সময়ে তা ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। এই ধরনের মুখোশ নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পীরা একটি অখন্ড কাঠকে ছেনি, হাতুড়ি, বাটালি ইত্যাদি দ্বারা আস্তে আস্তে কুঁদে এই মুখোশ তৈরি করে। এর এক-একটি মুখোশের ওজন প্রায় ৭ থেকে ৯ কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়। পরভা নৃত্যের শুরুতে নৃত্যরত বুড়ো-বুড়ি এবং গনক ঠাকুর-ধুনুচি হাতে নৃত্যবৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে। গ্রামের প্রবীণদের কাছ থেকে জানা যায়, এককালে রাজবাড়ির আঙিনায় মানুষের ঢল নামতো এবং জনগণের সুবিধার জন্য সদরঘাট রাজবাড়ির দরজা ছিল সকলের জন্য অবারিত দ্বার। এমনই

এক মন্ত্রমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যে পরিবেশিত হত পরভা নামক এই লোকনৃত্যটি।

১৮৩১ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চিল্কিগড় অঞ্চলে 'ধবল' রাজবংশের সুবর্ণ যুগ হিসেবে ইতিহাসে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। গোবিন্দ সিংহ ছিলেন যথেষ্ট সংস্কৃতি অনুরাগী। তাই উড়িষ্যার দক্ষ সূত্রধর সম্প্রদায়ের একজন ভালো মিস্ত্রী নিয়ে এসে তিনি কাঠের মুখোশ তৈরি করাবার কাজ শুরু করেন। তবে পুরুলিয়ার ছৌয়ের মত পৌরাণিক কাহিনি এই পালাতে উপস্থাপিত হয় না। বিভিন্ন রকম সমসাময়িক ঘটনাবলী, দেবদেবীর মহিমা, আদিরসাত্মক গল্প,কীর্তন সর্বোপরি স্থানীয় প্রেমমূলক গল্পগুলি এই নৃত্যের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। সেই দিক থেকে বলতে গেলে, পরভা নৃত্য দর্শকদের নিপাট হাসির একটি খোরাক যোগানোর চেষ্টা করে। তবে এরই পাশাপাশি দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, সিংহ ইত্যাদি দেব-দেবীর কাঠের মুখোশ ধারণ করে দুর্গতিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী, সতীদাহপালা ইত্যাদি বীরদর্পের নাচের মত পালাও এতে উপস্থাপিত হয়। এমনকি উনিশশতকের সতীদাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি প্রথাগুলির সংস্পর্শে এই ধরনের কাহিনিগুলিকে পরিবেশিত করা হয়। পড়িহাটি, সতিঘাটা ইত্যাদি অঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় রাজবাড়ীর এই পরভা নৃত্যকে কেন্দ্র করেই গাজনের শেষ দিনে রাজপ্রাসাদের অঙ্গন উৎসবমুখর হয়ে থাকতো। এছাড়াও ডুলুং নদীর তীরে সতীঘাটা মন্দির, সতী মন্দির ইত্যাদি এই সকল ঘটনার সাক্ষী আজও বহন করে। সতীর পালাতে হারমোনিয়ামের করুণ সুরে পুরুষ চরিত্ররা মহিলাদের মত লাল পেড়ে শাড়ি ও কপালে সিঁদুরের টিপ পড়ে অভিনয় করতো। বাংলায় প্রচলিত ছৌ নাচের মধ্যে একমাত্র পরভা নৃত্যেই কাঠের মুখোশের প্রচলন আছে। আবার এরই সাথে ছা-সোহাগী, বাবু-ছো, ভূত-ছো ইত্যাদি হাস্য-রসাত্মক সং প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু চিল্কি গড়ের রাজবাড়ির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার সময় থেকে এটি বর্তমানে প্রায় অবলুপ্তির পথে। তবে পরভা নাচের মুখোশগুলি খুব ভারী হয় বলে বর্তমানে শোলার তৈরি পরভা মুখোশ ব্যবহার করে নিত্যশিল্পীরা এই লুপ্তপ্রায় লোকনৃত্যটি পুরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে।

আসলে মানবগোষ্ঠীর যে কোনও জাতির শিরা-উপশিরার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বয়ে চলেছে

অভিনয়ের সুপ্ত এক প্রবৃত্তি। বাংলার লোকসংস্কৃতিতে বিভিন্ন প্রকার মুখোশগুলির সাথে একদিকে যেমন রহস্যময় ইতিহাস জড়িয়ে আছে, ঠিক তেমনিভাবে নানারকম ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কারও বিদ্যমান হয়ে আছে। এককথায় বলা যায় বাংলার লোকসংস্কৃতিতে মুখোশের ব্যবহার বহুমুখী। বাংলার সাধারণ মানুষের লোকায়ত জীবনে নাচ-গান-অভিনয় ইত্যাদির সাথে জাদু-বিশ্বাসযুক্ত মুখোশগুলির ব্যবহার আজও বর্তমান। তবে লোকশিল্পীরা যে কেবলমাত্র তাদের কেরামতি দেখানোর জন্য মুখোশ ব্যবহার করে তা নয়,অনেকের মতে শিল্পী তার নিজের কুৎসিত রূপটিকে আবৃত করার জন্য অনেক সময় নানা রঙে রঙিন মুখোশের ব্যবহার করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে দেব-দেবীর মুখোশ পরিধান করে তরুণ লোকনৃত্য শিল্পীরা একদিকে যেমন অভিনয় করে, অন্যদিকে আবার পূজার্চনাও করে থাকে। গুরুসদয় দত্ত এই বিষয়ে বলেছেন—

> "A Mask dancer undoubtedly dances Institute a survival of one of the original prototype out of Richard elaborated the radius tenses of the classic Indian stage in ancient times recorded in ancient Indian treatise. This mask dances are essentially popular in character and form and integral part of the religious and social life of the rural Hindu population of Bengal. This is picked up of caste or rank they are not practiced as a thing apart from life as a decorative and formal performance of Art on critical stages but are performed initially in the opened air on the occasion of the annual religious festival of Chaitra Sankranti."[৪]

আসলে 'মুখোশ' নামক ধারণাটি লোকায়ত ভাবনা-চিন্তা থেকে উদ্ভূত হলেও, পরে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সাথে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। সুদূর অতীতে বাংলার সাধারণ মানুষের লোকায়ত সংস্কারের মাঝখানে যখন মুখোশনৃত্যগুলির উদ্ভব ঘটেছিল, তখন বিভিন্ন রকমের ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া, সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিজ্ঞান চেতনা তার মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল। প্রথমদিকে মানুষ কেবলমাত্র ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে তাদের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসবে মুখোশনৃত্য শুরু করে। কিন্তু ক্রমেই তা প্রসারতা ও খ্যাতি দ্বারা বিনোদনের মাধ্যম রূপে পরিগণিত হয়। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ বলা যায়, একসময় ভিয়েতনাম, লাওস, কম্পুচিয়া, ইতালি প্রভৃতি দেশের সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান থাকার ফলে সেই সকল অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার মুখোশের মধ্যে ভারতের বেশ কয়েকটি মুখোশের আঙ্গিকগত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এককথায় মানুষের মনের ভীতিময়তা থেকেই মুখোশনৃত্যের মত আনন্দময় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বাংলার প্রচলিত মুখোশগুলিতে যেমন যুগে যুগে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের মুখোশের প্রভাব পড়েছে, ঠিক তেমনভাবেই লুপ্তপ্রায় মুখোশনৃত্যতে ব্যবহৃত মুখোশগুলি এই ধারাবাহিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য মুখোশ নির্মাণের কৌশল এবং পদ্ধতির মধ্যে নানারকমের পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। আর বাংলার প্রায় সমস্ত মুখোশনৃত্য আনন্দদানের অন্যতম প্রধান একটি সাংস্কৃতিক ধারা একথা স্বীকার করতেই হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "বাংলার অনুকরণমূলক জাদুক্রিয়ার দ্বারা গড়ে ওঠা আঙ্গিক হল মুখাভিনয় এবং মুখোশ। এটি বিশেষ একপ্রকার নৃত্যশৈলীর অন্যতম প্রধান একটি অঙ্গ। বস্তুত আদিম লোকনৃত্যের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্বাসের ওপর এর টিকে থাকার প্রচেষ্টা এখনও লক্ষণীয়। আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা ব্যক্তি এবং সমাজকে দৈব-বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করার জন্য নৃত্যের উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। শিকারকেন্দ্রিক জীবনাচরণে পশুশিকার করাই ছিল মানুষের অন্যতম প্রধান বৃত্তি এবং তখন পশুর চলাফেরা ও অঙ্গভঙ্গি মানুষ অনুসরণ করতো। তাই তাদের নৃত্যশৈলী এবং অভিনয়শৈলীতে নানারকম পশুদের অনুকৃতি এবং অনুসরণ রক্ষিত আকারে আজও থেকে গেছে।"[৫]

যে কোনও মুখোশনৃত্যে মুখোশশিল্পীদের কার্যগত-কৌশল কোথাও বা সরল আবার কোথাও বা জটিল। বর্তমানে মুখোশশিল্পীরা কোনও কোনও অঞ্চলে আবার বিকল্প পেশার সাথে নিজেদেরকে নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বংশ-পরম্পরাগতভাবে তাদের হৃদয়ে আছে শিল্পীমনের আবেগময়তা। বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন মুখোশ শিল্পের মধ্যে একমাত্র পুরুলিয়া ছৌ নাচের মুখোশ শিল্পটি প্রাচীনকাল

থেকে আজও পর্যন্ত সমান সজীবতার সাথে প্রচলিত। তার তুলনায় উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত মুখোশশিল্পগুলি বেশ কিছুটা অখ্যাত বলে তা চিরন্তন ঘরানা দ্বারা তেমন প্রসারতা লাভ করতে পারেনি। তবে বাংলায় প্রচলিত বেশিরভাগ মুখোশগুলির নির্মাণশিল্প সেই অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতির মূল উপকরণের প্রভাবজাত- এই কথা সর্বজনসম্মত। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমানে প্রচার মাধ্যমগুলির দৌলতে এবং শিক্ষার প্রসারের ফলে পরভা নৃত্যের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এই নৃত্যের সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত তরুণ সম্প্রদায়ের সচেতনতায় আঞ্চলিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে পরভা আজ জাতীয় স্তরের স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সুদূর ভবিষ্যতে দূরদর্শন এবং সমাজ মাধ্যমগুলির হাত ধরে এভাবেই বাংলার আরো কিছু বিলুপ্তপ্রায় লোক-উৎসব এবং অনুষ্ঠান নতুন করে প্রাণ ফিরে পাবে এটি আশা করা যেতেই পারে।

তথ্যসূত্র :

১. Curt Sachs, World History of the Dance, Norton Library, New York, 1963, p132

২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারত সংস্কৃতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন, কলকাতা-৭০০০৭৩, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ.-৫।

৩. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.-১৫।

৪. Gurusaday Dutt, The Folk Dances Of Bengal, Shree Saraswati Press Limited, Calcutta-700009, 1954, pp-37.

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস,(তৃতীয় খন্ড), ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতা-৭০০০১২, পৃ.-৭৮।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনার আলোকে শিশু ও কিশোরসাহিত্য

অভি কোলে
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ

সারসংক্ষেপ

শিশুরা কল্পনাপ্রবণ। মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তার শৈশব। সেইসময় শিশুদের মন থাকে কোমল, অপরিণত। কৌতূহল থাকে সীমাহীন, আনন্দ থাকে অপরিমিত। শিশুর ভালোলাগা সাহিত্যই শিশুসাহিত্য। শিশুসাহিত্যেই প্রতিফলিত হয় নিত্যকালের জীবনসত্য। শিশুসাহিত্যের সমৃদ্ধির আড়ালে রয়েছে বহুজনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, ছোটোদের ভালোবেসে সাহিত্যচর্চায় নিজেদের নিবেদন করেছিলেন বহুকালের সাহিত্যিকরা। শিশুদের নরম মনে শক্ত ভিত গড়ার প্রেরণা জুগিয়েছে বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ'; সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি। পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রমদাচরণ সেন, ভুবনমোহন রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দখল করেন। শিশুসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যমেধা নিজস্ব ধারায় ও সাধারণ মানুষের বুকের মধ্যে বহমান। প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের শিশুমন প্রকৃতির মধ্যেই তো ধরা পড়ে। সেইকারণে 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দিপুরের অপূর্বর কাহিনিমাত্র হয়ে থাকেনি, সেখান থেকে ধাবিত হয়েছে পাঠকের নিভৃতপুরে। 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের ব্যক্তি ও মানসজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'চাঁদের পাহাড়' কিশোর উপন্যাসের শংকর নির্মল নিরালায় প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের কাছে পেতে

চেয়েছে ভালোবাসা। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' গল্পের জিতু, 'মেডেল' গল্পের স্কুলপড়ুয়া সুধীর, 'তালনবমী' গল্পের নেপাল-গোপাল, 'খুকীর কাণ্ড' গল্পের উমা— বিভূতিভূষণের সৃষ্ট এইসব শিশুরা প্রকৃতির সঙ্গে যেমন একাত্ম তেমনি ভগবত সাধনার অবলম্বন বটে।

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের জন্য লেখা কোনো বই-ই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ লাভ করেনি। 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসের নায়ক নাগার মধ্যে 'পদ্মা নদীর মাঝি'র কুবেরকে খুঁজে পায়। অবহেলা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে বেড়ে ওঠা নাগা জীবনকে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছে এখানে। সবশেষে, এই দুই বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর উপলব্ধির আলোকে সৃষ্ট শিশু-কিশোর চরিত্রগুলোকে অসামান্য দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলেছেন।

সূচক শব্দ

শিশুসাহিত্য, প্রকৃতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ, জীবনচেতনা।

মূল আলোচনা

মানুষের সুন্দরতম সৃষ্টি হল শিশুসাহিত্য। শিশুসাহিত্যেই প্রতিফলিত হয় নিত্য কালের জীবনসত্য। শিশুরা কল্পনাপ্রবণ। সোনাঝরা ছেলেবেলা শিশুকে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তার শৈশব। এর অন্যতম প্রধান কারণ, সেই সময় শিশুদের মন থাকে কোমল, অপরিণত। কৌতুহল থাকে সীমাহীন, আনন্দ থাকে অপরিমিত। শিশুদের সরল মনে থাকে বিশ্বাসের প্রতি অসীম আগ্রহ, বিচারবুদ্ধিহীন মনে থাকে প্রচুর রসতৃষ্ণা। তাই শিশুর ভালোলাগা সাহিত্যই শিশুসাহিত্য। আমাদের শিশুসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির আড়ালে রয়েছে বহুজনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, ছোটোদের ভালোবেসে সাহিত্যচর্চায় নিজেদের নিবেদন করেছিলেন তাঁরা। শিশুসাহিত্যের স্বর্ণযুগে বেশিরভাগ লেখকই শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

শিশুর বয়স সীমার কিছুটা আভাস পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'মুকুল' পত্রিকায় দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, শিশুর বয়সের সীমা আট-নয় বছর থেকে পনেরো-ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। কারণ তিনি মনে করেন শিশুসাহিত্য কেবলমাত্র শিশুদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তা কিশোর বয়স পর্যন্ত প্রসারিত। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু' কিংবা জোনাথন সুইফট -এর গালিভার'স ট্রাভেল্‌স— এদের অন্তর্নিহিত ভাব তো বড়োদের জন্যই। কিন্তু ছোটোরা মজা পায়, আনন্দ উপভোগ করে। তাই ছড়া-কবিতা কিংবা এই জাতীয় বই তারা ভালোবাসে। রচনার লঘুতা আর কৌতুকের পেছনে রয়েছে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরস। এখানে শিশুরা চটজলদি কৌতুকের ভাব-ভাবনাকে সহজভাবে গ্রহণ করে আনন্দ পায়, খুশি হয়। বলাবাহুল্য, জীবন, জগৎ ও পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জোনাথন সুইফট তাঁর মনের তিক্ততা রঙ্গব্যঙ্গের সাহায্যে গালিভারের ভ্রমণ কাহিনির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শিশুমন পরম কৌতূহলে এই কাল্পনিক মানসিক যন্ত্রণার প্রতীক কাহিনি সহজেই নিতে পেরেছে, আনন্দের পরম আস্বাদ লাভ করেছে। তিনশো বছরেরও বেশি আগে ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সাহিত্যিক শাল পেরোল্‌ত ইউরোপ মহাদেশে প্রথম রূপকথা সাহিত্যের সংকলন করেন। জার্মান দেশের ইয়াকব গ্রিম ও ভিল্‌ হেলম্‌ গ্রিম জার্মানিতে ছোটোদের রূপকথার সংকলন করে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। আর ডেনমার্কের হ্যানস্‌ ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন তো একাই একশো। তিনি ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য-স্রষ্টা। রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র Folk Tales of Bengal (১৮৯৩) গ্রন্থে শিশুদের জন্য সেখানে আছে পাহাড় প্রমাণ রহস্য। তাই বলা যায়, লালবিহারী দে'র এই গ্রন্থটি শিশুসাহিত্য সৃজন ও নির্মাণের পটভূমি। মার্কিনী সাহিত্যের অন্যতম দুই প্রতিভাবান লেখক মার্ক টোয়েন টম ও হাক্‌লবেরী নামে দুটি দুরন্ত কিশোরের অভিযান কাহিনির রোমাঞ্চ আর কৌতুকের মধ্যে রচিত হয়েছিল ছোটোদের দুখানি ক্লাসিক বই The Adventure of Torm Sawyer এবং Huckleberry Finn। আসলে লেখক জীবনের সত্যস্মৃতিকে অনেকাংশে প্রতিফলিত করেছেন।

এ তো গেল পাশ্চাত্য দেশে শিশুসাহিত্যের মর্মকথা, বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশে বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য বলা না গেলেও ছোটোদের মানসিকতা গড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শিশুদের নরম মনে শক্ত ভীত গড়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই এই বইগুলিকে শিশুসাহিত্য নির্মাণের অনুঘটক বলা যায়। কেবলমাত্র যে নীতিকথা আর রম্যরচনাই শিশুসাহিত্যের মূলকথা নয়, বিজ্ঞানের আলোকে শিশুমনের উন্মেষ ঘটানোই শিশুসাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিনখণ্ডে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' (১৮৫৩ – ১৮৫৪ – ১৮৫৯) তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এর কিছু পরে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে উচ্চমানের অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮), প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' (১৮৮৩), ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী' (১৮৯৩) ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' (১৩০২) বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক' পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে ছিলেন অঙ্গাঙ্গীভাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজের আগ্রহেই শিশুদের জন্য এই পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন এবং শিশুসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন। নক্ষত্রখচিত সেই মহাকাশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাংলা শিশুসাহিত্য। ছড়িয়ে পড়ল শহর থেকে গ্রামে, দেশ থেকে বিদেশে। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে নয়, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল সাহিত্য। ছোটোদের ভাবনা মাথায় নিয়ে শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ – ১৯৫০) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ – ১৯৫৬)। তাঁরা রচনা করলেন নতুন আঙ্গিকের ছোটোদের সাহিত্য। সৃষ্টি করলেন শিশুদের স্বপ্নের জগৎ।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যমেধা নিজস্ব ধারায় ও সাধারণ মানুষের বুকের মধ্যে বহমান। লেখকের ছোটোদের সাহিত্য জগৎ সম্পর্কে বেশিরভাগ জনেরই ধারণা আছে। প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের মধ্যে সদাসর্বদা এক চিরন্তন শিশুমন অটুট

ছিল যার ফলে স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করা, অজানাকে জানার আগ্রহে তিনি এক বিস্ময়কর অপার আনন্দে ডুবে যেতেন। প্রকৃতির মধ্যেই তো তাঁর শিশুমন ধরা পড়ে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহের ক্রমবিকাশেও আমরা লক্ষ্য করি সেই সহজ-সরল মনোভঙ্গির প্রকাশ। লিখেছেন 'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৮) এর মতো বই। বাংলায় লেখা ছোটোদের সেরা বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করলে 'চাঁদের পাহাড়' কে প্রথম দিকেই রাখতে হবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)-র বুকের ভিতর বিভূতিভূষণ বিছিয়ে দিয়েছেন আটপৌরে জীবনের কথা, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কথা। বিভূতিভূষণ অনুভব করেছিলেন, মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায় এবং শুনতে পায়ও। তিনি নিজেও সেই বুকের কথা শুনতে পেয়েছিলেন বলেই 'পথের পাঁচালী' শুধু নিশ্চিন্দিপুরের অপূর্বর কাহিনীমাত্র হয়ে থাকে নি। সেখান থেকে ধাবিত হয়েছে পাঠকের নিভৃতপুরে। এই কিশোর উপন্যাসের অপুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছে পাঠকের শৈশব-কৈশোর, এমনকি অজানা আগামী। ছোটোদের কথা ভেবে তার কলমের ডগায় উঠে এসেছে আম কুড়োনোর কথা, গাছ থেকে নোনা পাড়ার কথা, পানিফল তোলার কথা কিংবা নৌকা বাওয়ার কথা। এগুলোই তো সাহিত্যে এনে দিল মুক্তি আর আনন্দের অনুভূতি। মাত্র একুশ বছরের সাহিত্য জীবনে কোনো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে তাঁর মন আবদ্ধ থাকতে চায় নি। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, নদীতীরে, বাঁওড়ের ধারে ঘন সবুজ ঝোপঝাড়ে অংশীদার হয়েছেন সাহিত্যিক। 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থে বিভূতিভূষণের ব্যক্তি ও মানস জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—

> "'পথের পাঁচালী' র মধ্যে লেখক উপন্যাসের বাঁধাপথ অবলম্বন করেন নি। একটি বালক চিত্ত কীভাবে রূপকথার রূপলোকে বিচরণ করতে করতে অগ্রসর হল, জীবনের নানা ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তার সে রূপজগত হারিয়ে গেল না, তারপর পুত্রের মধ্যেও সেই জীবন-প্রতীতি বয়ে চলল— সেই কথাটাই বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্পরূপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন।"[১]

তাঁর প্রায় সমস্ত লেখায় ফুটে উঠেছে মাটির কাছে থাকা মানুষের ছবি। তাঁর সৃষ্ট প্রায়

প্রতিটি চরিত্রই এক আশ্চর্য আলো ছড়িয়ে চলে। তাইতো তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য রকম ভাবে সমকালীন ও জননন্দিত।

'চাঁদের পাহাড়' কিশোর উপন্যাসের শংকর চরিত্রের মধ্যেও লেখক অপুর মতোই প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ, ভালোবাসা ও পিপাসাকে তুলে ধরেছেন। মানসিক দিক থেকে 'পথের পাঁচালী' র অপুর সঙ্গে 'চাঁদের পাহাড়' এর শংকরের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অপুর মতোই শংকর নির্মল-নিরালায় প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের কাছে পেতে চেয়েছে ভালোবাসা। হরিহরের বন্ধ বাক্স খুলে অপু যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে, কিশোর শংকরও তেমনি ওয়েস্টমার্কের বড় ভূগোলের বইখানি পড়তে পড়তে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। প্রকৃতির অনুপম রূপ-সৌন্দর্যের সুধাপানে অপুর মতোই শংকর নিজের মনকে মাঝেমধ্যে রাঙিয়ে নিয়েছেন। অপুর নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে যাওয়ার সময় যেমন হয়েছিল, তেমনি শংকরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকায় বসে নিজের ফেলে আসা গ্রামে সপ্তর্ষিমণ্ডলের উজ্জ্বল আলোর স্মৃতি রোমন্থন করেছে। একজন সত্যিকার মানব সন্তান হিসাবে লেখক উপন্যাসে শঙ্করকে যেভাবে ঘটনাধারা অনুসারে দেখিয়েছেন তা শিশু-কিশোরদের মনে শিহরণ, রোমাঞ্চ ও মুক্তির আনন্দ জাগিয়ে তোলে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে শিশুদের মানসিক আর অনুভূতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন শিশুমনের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে এমন ঝরঝরে উৎকৃষ্টমানের শিশুসাহিত্য রচনা করা যায় না। তাঁর গল্পের চরিত্রদের মনে যেমন আছে কল্পনা, ভালোবাসা, কৌতূহল, সাহস, সরলতা, সহানুভূতি কিংবা আত্মসচেতনতা তেমনই আছে চঞ্চলতা, লাজুকতা, অভিমান, ক্রোধ, স্পর্শকারতা, দুঃখানুভুতি, অপমানবোধ ইত্যাদি। 'এয়ার গান' গল্পে হাবুল অত্যন্ত কল্পনাবিলাসী। মুহূর্তে চলে যায় বাস্তব থেকে কল্পনার জগতে। পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য পুরস্কার স্বরূপ সে কাকার কাছ থেকে একটা বন্দুক উপহার পায়। দু-একবার লক্ষ্যভেদ করার পর সে কল্পনা করে—

"বড় হলে সে চলে যাবে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মঙ্গো পার্কের মত। অসংখ্য

জন্তু-জানোয়ার শিকার হবে, ও দেখবে ওর শৌর্য-বিক্রম। .... খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ওর ফটো ছাপানো হবে। ও দাঁড়িয়ে থাকবে হাফপ্যান্ট পরে বন্দুক হাতে, আর পায়ের কাছে পড়ে থাকবে বিরাটকায় হিংস্র জন্তুর নিহত দেহটা।"[২]

'মেঘমল্লার' গল্পসংগ্রহের ঠেলাগাড়ি গল্পে নরুর প্রতি টুনির বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসার সন্ধান পায়। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫) উপন্যাসের নায়ক জিতুর শিশু মনে কৌতুহল লেগেছে অপরিচিত গ্রাম্য প্রকৃতি আর গ্রাম্য পরিবেশে নানারকম সামাজিক নিয়মকানুন দেখার জন্য। জিতুর মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও জীবনচেতনা অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে আধ্যাত্মবিশ্বাস ও অলৌকিকতার প্রভাবে। সমালোচকের ভাষায়— "দৃষ্টিপ্রদীপ জিতুর দিব্যদৃষ্টির প্রদীপ।"[৩]

ছোটোদের সাহিত্যে বিভূতিভূষণের শিশুরা প্রকৃতির সঙ্গে যেমন একাত্ম, তেমনি ভগবত সাধনার অবলম্বন বটে। তাই এই আধ্যাত্মচেতনা যে কোনো অলৌকিক রহস্যানুভূতি নয়। সুখ-দুঃখ, স্নেহ-মমতা, বিরহ-মিলনের নিবিড়তম উপলব্ধির মধ্য দিয়েই চলমান জীবনের যথার্থ অধিষ্ঠান।

ছোটোরা যে পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠে, পরিচয়-পরিবেশ অবলম্বনে যে অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করে, তার সন্ধান দেয় শিশুসাহিত্য। সেই বিশেষ বিচিত্র পরিস্থিতি আর কৌতুহল জাগানো অভিজ্ঞতা নিয়ে গড়ে ওঠে ছোটোদের সাহিত্যের জগত। 'খুকির কান্ড' গল্পে চার বছরের ডানপিটে ডাকাবুকো উমা চরিত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে। তাকে ঘিরে গল্প তরতর করে এগিয়েছে। 'মেডেল' গল্পে স্কুলপড়ুয়া সুধীর চরিত্রটি প্রধান না হলেও উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের সামরিক সৈন্যদলের সার্জেন্ট তার সাহসিকতার জন্য পাওয়া দামি ও ঐতিহ্যমন্ডিত মেডেল বন্ধক দিয়ে ছাড়াতে পারে নি। তারপর নিরুদ্দেশ। সুধীর রাই এখন এর মালিক। গল্পে মাস্টারমশায়ের চরিত্র থাকলেও ছাত্র সুধীরের মেডেল নিয়ে কাড়াকাড়ি ইত্যাদি বেশ সুখকর। 'তালনবমী' (১৯৪৪) গল্পে নেপাল-গোপাল তালনবমীর নেমন্তন্ন না পেয়ে একেবারে বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের শিশুমনে কল্পনা বা আশার পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সংসারে

অবিচার দেখে তারা একেবারেই 'থ'। কোনোরকমে তারা সেইসব সামলে নিয়েছে। জটিপিসিদের বাড়ি হয়ে উঠে তাদের বড়ো আশ্রয়স্থল। 'শিকারি' গল্পেও জংলি দেহাতি কিশোর বালক মাগনিরাম অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। সে জাতে সাঁওতাল, কিন্তু কবির বংশধর। নিজেও কবি। মাতা-পিতা হারা বেশকিছু নাবালক-নাবালিকা চরিত্রও বিভূতিভূষণের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। অল্প বয়সে অনাথ হয়ে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাদেরকে নিতে হয়। 'জলসত্র', 'তুচ্ছ', 'মৌরিফুল' এই গল্পগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন দাবী ভিন্ন ভিন্ন রকমের। স্বল্প পরিসরে ছোট্ট চরিত্রগুলির সামান্য উপস্থিতিতে বিভূতিভূষণ সংসার পরিচালনার বিষয়টিকেও খুব সুন্দর ও যথার্থ ভাবে তুলে ধরেছেন। বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পের অধিকাংশ শিশু চরিত্র প্রকৃতি সংলগ্ন এবং গল্পের পটভূমিতে প্রকৃতি একটি বিশেষ স্থান নেওয়ার ফলে গল্পগুলি শিশু-কিশোরদের কাছে আনন্দের নীড় হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বড়োদের সমান্তরালে সযত্নে ছোটোদের জন্য, বিশেষ করে কিশোরদের জন্য ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তাভাবনায় স্বভাবতই স্বতন্ত্র ও অভিনব। সেই অভিনবত্ব তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যভাবনার মতো সোজাসাপ্টা কিন্তু প্রখর। তিনি অনুভব করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের আয়োজন অত্যন্ত সমৃদ্ধ, ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রতাপশালী। তাই, বাংলা শিশুসাহিত্যই টেনে এনেছিল মূলতঃ বড়োদের এই লেখককে। তিনি চাইতেন ফুল পাখি মেঘ নদী কিংবা রূপকথা উপকথার পাশাপাশি ছোটোরাও বাস্তবমুখী হোক। কঠিন বাস্তবকে তারা জানুক, সমস্যা-সমাধানের পথ খুঁজে বের করুক। ছোটোদের পাঠসাহিত্য কীরকম হবে, সেই বিষয়ে তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন—

"বড়োদের জন্য লেখা এমন গল্প যদি বেছে নেওয়া যায় যাতে কিশোর মনকে বিগড়ে দেবার মতো কিছুই নেই, বরং গল্প পড়ে বড়োদের জীবন-সংঘাতের কম-বেশি পরিচয় পেয়ে কিশোর মন নাড়া খাবে, বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা জাগবে, সেইরকম গল্প কিশোরদের পড়তে দিলে দোষ কী?"[৪]

তিনি মনে করতেন, শিশু-কিশোর মনে স্বপ্ন থাকবে, তবে তা অলীক নয়। তাই তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নায়কেরা হিম্মতের মূল্যে স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন নিয়ে বাস্তবে দাঁড়িয়ে লড়াই করা যায় এবং লড়াই জেতাও যায়। যে স্বপ্ন এগিয়ে যাবার পথ দেখায়, শুধু সেইটুকু স্বপ্নই তারা দেখতে অভ্যস্ত।

পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোর সাহিত্য রচনায় মন দেন, তবে তা বড্ড দেরিতে। ছোটোদের লেখক হতে গেলে বড়ো দায়িত্ব নিতে হয়। জীবন গড়ার দায়িত্ব, মানুষ গড়ার দায়িত্ব। এ বিষয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোদের ছোটো না ভেবে তিনি জীবনের কথা, মানুষের কথা শুনিয়েছেন। স্পষ্ট করে তুলেছেন সমাজের আলো-অন্ধকার। 'মৌচাক' পত্রিকায় মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মাঝির ছেলে' (১৯৫৯, নভেম্বর) সমাজমনস্ক উপন্যাসটি 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) এর পরিপূরক রচনা বলেই মনে হয়। 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসের নায়ক নাগা। সতেরো-আঠারো বছরের এক বলিষ্ঠ তরুণ। সে যথেষ্ট ন্যায়নিষ্ঠ, বিবেকবোধসম্পন্ন। অবহেলা আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে বেড়ে ওঠা নাগা জীবনকে মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছে। বরং বলা ভালো সুযোগ করে নিয়েছে। নাগার মধ্যে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের কুবেরকে খুঁজে পাই। 'মাঝির ছেলে' তে চোরা চালানের সাত-সতেরো, ধরনধারণ আর উত্তেজক বর্ণনা থাকায়, ছোটোরা অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজ পেয়েছে। বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় এবং যুক্তির দ্বারা তিনি শক্ত হাতে জীবনকে যেভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন, তা আজও আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন করে বাঁচতে শেখায় এবং অন্যকে বাঁচানোর প্রেরণা জোগায়।

ছোটোদের জন্য লেখার পরিমাণ খুব একটা ভারী না হলেও, ছোটোদের লেখার ক্ষেত্রে তাঁর একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ব্যক্তিগত মুনশিয়ানা ছিল। যে-কোনো মূল্যেই সেই মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি কোনো সময় বিচ্যুত হতে রাজি ছিলেন না। তাঁর সাহিত্যের আঙিনায় ঢোকার জন্য উঠোনস্বরূপ শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন জীবন তো সংগ্রাম মুখর, তাই কিশোর মনে প্রয়োজনীয় অভিঘাত আসা দরকার । এতে ছোটোদের মনে

জাগবে অনুসন্ধানের আকুলতা। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর 'মাটির কাছের কিশোর কবি' উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি পাঠ করতে গিয়ে শিশুমনে অজান্তেই প্রস্তুত হয়ে যায় 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কিংবা 'জননী' র মতো চিরায়ত সাহিত্য কীর্তি পাঠ করবার জন্য, বিষয় জানার জন্য। এইসব রচনা শিশু-কিশোর মনকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে, প্রতিমুহূর্তে আবিষ্কারের আমন্ত্রণ জানায়।

জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ নিরাসক্ত এই শিল্পী অবাস্তব অলীক উদ্ভট গল্প একটিও লেখেন নি। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে শিশু-কিশোর মনে গা ছমছম করার রসদ আছে, তবে তা বিজ্ঞান ভাবনায় জারিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোদের জন্য লেখা কোনো বই-ই তার জীবদ্দশায় প্রকাশ লাভ করেনি। বাংলা ভাষার ছোটোদের জন্য যিনি এতখানি সম্মান জানাতে পারেন, যাদের জন্য লেখায় পরিমাণমতো এবং রুচিসম্মত মশলা ঢালতে পারেন, আক্ষেপ হয় কেন তিনি আরও বেশি কিছুদিন বাঁচলেন না, বেশি লিখলেন না, অন্তত ছোটোদের কথা মাথায় রেখে। তাঁর সার্বিক সাহিত্য ভাবনার প্রেক্ষিতে অধ্যাপক অশোক মিত্রের কথায়—

> "আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, ছাব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক নির্লিপ্ত গদ্যে, আপাত নিরুত্তাপ আবেগে, অবৈকল্যসিদ্ধ বুদ্ধিতে যে রচনায়, কিসের তাগিদ কে জানে, হাত দিয়েছিলেন! ... বাংলা ভাষার সাতশো বছরের শিলাঙ্কিত ইতিহাসে তার তুলনা নেই।"[৫]

সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর উপলব্ধি ও নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর সৃষ্ট রচনায় শিশু-কিশোর চরিত্রগুলোকে অত্যন্ত সযত্ন প্রয়াসে অসামান্য দক্ষতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। এই দুই প্রথিতযশা স্মরণীয় শিশুসাহিত্যিক একদিকে প্রকৃতি আর অন্যদিকে মানুষ এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আর সেই বন্ধনের মাধ্যমে হয়েছে অবশ্যই শিশু। তারা মনে করেন, শিশুই তো সাধনার উত্তর সাধক। শিশুকে ভালোবাসতে পারলে বা তার মতো হতে পারলেই মন সমস্ত সংকীর্ণতা ও মলিনতা মুক্ত হয়।

শিশু-কিশোরের জীবনের সারল্য, সহজাত ও বিস্ময় এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ করেছে যার সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেমের বিষয়টি নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে চরিত্রগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। আসলে এর সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রকৃতিপ্রেমিক দুই লেখকের সহজ-সরল প্রীতিস্নিগ্ধ শিশু-কিশোর সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। তারা শিশু আর প্রকৃতিকে এক অখণ্ড কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন। তাদের সৃষ্ট অপাপবিদ্ধ শিশুর সারল্য সমস্ত পাঠকের মনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। এই চরিত্রগুলি সৃষ্টির মাধ্যমে লেখকেরাও খুঁজে পায় নিজের শৈশবকে। লেখকও ফিরে গেছেন ফেলে আসা জীবনের সহজ-সরল আনন্দের বিস্ময়মাখানো দিনগুলোতে। আর সেইজন্যই তো মূল্যবোধ আর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুসাহিত্য হয়ে উঠেছে অনন্য, অসাধারণ।

তথ্যসূত্র :

১) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্বিন্যাস সংস্করণ : ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা - ৪৯৭।

২) শীতল চৌধুরী, 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প সমগ্র শিল্প ও নির্মাণে', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৩২।

৩) সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য', প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০১৫, পৃষ্ঠা - ২৫৬।

৪) 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র', ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা প্রথম প্রকাশ : ২০০২, পৃষ্ঠা - ১২।

৫) অশোক মিত্র, 'বাংলা শিশুসাহিত্যের যথার্থ শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, পৃষ্ঠা - ১১৭।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

দেড়গজী নাম ও একটি অদ্ভুত লোক

ড. অরুণ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, আচার্য গিরিশচন্দ্র বোস কলেজ

সারসংক্ষেপ

কিশোর গোয়েন্দা সাহিত্যে বিমল করের সৃষ্টি কিকিরা (কিঙ্কর কিশোর রায়) একটি অদ্ভুত চরিত্র। সে নিজেকে 'দি গ্রেট' কখনো 'ওয়ান্ডার' আবার কখনো 'ম্যাজিশিয়ান' ব'লে ঘোষণা করে। কিশোর পাঠক থেকে শুরু করে পরিণত বয়স্ক পাঠকের কাছে সে 'হিরো'। কিকিরা একাধারে 'গোয়েন্দা' ও 'ম্যাজিসিয়ান'। তার দুই বন্ধু তারাপদ ও চন্দন তার নানান রহস্য উন্মোচনে ও সত্য অনুসন্ধানে যোগ্য সহকারী। রোগাসোগা চেহারার কিকিরা অস্থির গোছের মানুষ। তার জীবিকার কোন ঠিক নেই। প্রথম জীবনে সে ছিল 'ম্যাজিক মাস্টার'। কিন্তু তার বাঁ হাতটা দুরোরোগ্য অসুখে অকেজো হয়ে যাওয়ায় সে ম্যাজিক দেখানো ছেড়ে দেয়। কিকিরা নিজের থেকে চেয়ে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কেস আদায় করে। তার কথা-বার্তা এতই সাধারণ যে তার প্রতিভা বা বুদ্ধিমত্তা কিছুই বোঝা যায় না। সে অত্যন্ত বিনয়ী। সে তার ঘরে বসে ম্যাজিকের সাহায্যে জটিল রহস্য সমাধান করে ফেলে। এই অদ্ভুত চরিত্রের কিকিরা'কে নিয়ে বিমল কর ১৮ টি কাহিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট এই কিকিরা চরিত্রটি বাংলা সাহিত্য বিরলতম।

সূচকশব্দ

কিকিরা, ম্যাজিশিয়ান, গোয়েন্দা, অপরাধ, অদ্ভুত।

মূল আলোচনা

বাংলা কিশোর সাহিত্যে বিমল করের এক ব্যতিক্রমী চরিত্র কিঙ্কর কিশোর রায়। চরিত্রটি

শুধু অদ্ভুত বললে ভুল হবে, বলা ভালো একমেবাদ্বিতীয়ম্— তার সাথে কোনো চরিত্রেরই তুলনা চলে না। এই চরিত্রটি বিরলতম। কিশোর সাহিত্যে বিশেষত কিশোর গোয়েন্দা সাহিত্যে, বাংলায় এই চরিত্রটি আট থেকে আশি সকলেরই প্রিয়, আদরের ও কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। রহস্য উদ্ঘাটনে, সত্য অন্বেষণে, অপরাধীকে চিহ্নিত করে, উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে কিঙ্কর কিশোর রায় বুঝিয়ে দিয়েছেন নিতান্ত সহজ-সরল-সাদামাটা-ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাঙালিও অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ন্যায় এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

তাই সে কখনও নিজের আত্মবিশ্বাসে নিজেকে 'দি গ্রেট' কখনও 'ওয়ান্ডার' কখনও বা 'ম্যাজিশিয়ান' রূপে ঘোষণা করে। শুধু কিশোর পাঠকই নয়, পরিণত বয়স্ক পাঠকও তার গুণে মুগ্ধ হয়, তাকে 'হিরো' বলে সহজেই মেনে নেয়।

এর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হাওড়া থেকে শংকরপুর যাওয়ার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। হাওড়া থেকে ট্রেনে সে ওঠে। আর এখানেই প্রথম আলাপ হয় দুই বন্ধুর— চাকরি সন্ধানরত যুবক তারাপদ ও সদ্য ডাক্তারি পাশ করা যুবক চন্দনের সঙ্গে— যে দু'জন তার বিভিন্ন রহস্য উদঘাটনে, সত্য অনুসন্ধানে অনিবার্য সহকারী হয়ে ওঠে। 'কাপালিকরা এখনও আছে' কিঙ্কর কিশোর রায়ের প্রথম কাহিনি আর এখানেই বাংলা কিশোর গোয়েন্দা উপন্যাসে তার প্রথম আবির্ভাব।

সে কে? সে কি গোয়েন্দা? ম্যাজিশিয়ান? সে আসলে কী?

সে নিজেই তার পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয় নাম-ধাম, সাকিন ঠিকানা, পিতৃ-পিতামহ, দোষ-গুণ, জীবন-জীবিকা— অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে সবকিছু নিজেই আমাদের (পাঠকের) কাছে বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরেছে।

টিয়াপাখির মতন নাক, তোবড়ানো গাল, গর্তে বসা চোখ। চেহারাটি রোগা-সোগা, গায়ে সেই আদ্যিকালের অলেস্টার, মাথায় কাশ্মীরি টুপি, ডানহাতে একটা সুটকেস ঝুলছে, বাঁহাতে খয়েরি বালাপোশ। ভদ্রলোক এতই রোগা যে গায়ে অলেস্টার চাপিয়েও তাকে মোটা দেখাচ্ছে না। গলায় মোটা মাফলার জড়ানো।

চন্দন ভদ্রলোককে দেখে নিচু গলায় বলল, "ডিসপেপসিয়ার কেস রে তারা, টিপিক্যাল পেপটিক পেশেন্ট।"

ভদ্রলোক তারাপদদের দিকেই এগিয়ে এলেন। কাছে এসে এমন মুখ করে হাসলেন যেন কতই না চেনা তারাপদর, গঙ্গারচণ মিত্তির লেনে রোজই দেখা হয়।

"কতদূর?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন হাসি মুখে। হাসবার সময় তাঁর দাঁত দেখা গেল। এবড়োখেবড়ো কালচে দাঁত, পান খাওয়া দাঁত যেন।... তাঁর চেনাচেনা হাসি আর কথা...."দেখি স্যার, আপনার পা-টা একটু সরান— সুটকেসটাকে প্লেস করে দি আরও একটু সেফ্ সাইডে।"

"না স্যার, আমি অরিজিন্যালি ভাগলপুরের, তারপর থেকেছি জামসেদপুরে, শেষে ইছাপুরেও কিছুদিন ছিলাম, এখন আর কোনো পুরে থাকি না, টুরে টুরে দিন কেটে যায়।"....

"আমার স্যার কতকগুলো বদদোষ আছে। আমি হাসিঠাট্টা করতে ভালোবাসি। আমার আপন-পর নেই। ভেরি ফ্র্যাংক...। একটা কথা স্যার আগেই বলে নি, আমার মুখ থেকে হরদম ইংলিশ বেরোয়, নো গ্রামার, কিছু মনে করবেন না আমার বাবাকে একজন অ্যাংলো ঘুষি মেরে নাক ভেঙে দিয়েছিল, তখন থেকেই আমার ওই ভাষাটার ওপর রাগ। অ্যাংলোরা হাফ ইংলিশ বলে, তাতেই আমার বাবার নাক চলে গেল, ফুল ইংলিশ যারা বলে তাদের ঘুষি খেলেতো আমার বাবার ফেসই পালটে যেত বলুন ঠিক কি না! আমি তখন থেকে রিভেঞ্জ নিতে শুরু করেছি ভাষাটার ওপর, যা মুখে আসে বলব— তুই আমার কাঁচকলা করবি। তোর ভাষা কি আমার মা-র না বাবার ভাষা!"

চন্দন বলল, "আপনার নামটা কী স্যার?"

"কিঙ্কর কিশোর রায়, দেড়গজী নাম স্যার, ছোট করে লোকে বলে কিকিরা দি গ্রেট।"

তারাপদ জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কী করেন?"

"আমার করার কিছু ঠিক নেই স্যার। কখনো ছুরি-কাঁচির এজেন্ট কখনো খোস পাঁচড়ার মলমের, কখনো অম্লশূলের ওষুধ বেচে আসি, কখনো আবার অন্য কিছু যা হাতের কাছে জুটে যায়। ...আমার নেচারটা অস্থির গোছের। মেজাজে না বনলে আমি কাউকে ছেড়ে

কথা বলি না। লাস্ট মান্থে আমি একটা নতুন কোম্পানির স্নো ক্রিম পাউডারের রিপ্রেজেনটেটিভ ছিলাম। মালিক বেটা ছ্যাঁচড়া, আমার সঙ্গে বনলো না, ছেড়ে দিলাম। দিয়ে এখন একটা কোম্পানির কাঁচি, খুর, ক্লিপের এজেন্ট হয়ে গিয়েছি। হাওড়ায় কারখানা খুলেছেন ভদ্রলোক — বেশ ভালো খুর তৈরি করছে স্যার। আমার সুটকেসে স্যাম্পেল আছে। কাল সকালে দেখাবো।"

তারপর নিজেই বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি স্যার, আমি আসলে ম্যাজিশিয়ান ছিলাম। গণপতিবাবু আমার গুরুর গুরু। আমার সাক্ষাৎ গুরু বড় একটা কলকাতায় আসতেন না। তাঁর ফিল্ড ছিল পাটনা, মজঃফরপুর, জামালপুর; ওদিকে বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা— এইসব। আমার গুরু অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা জানতেন। ইন্ডিয়ান ট্রিক বলে তাঁর একটা খেলা ছিল— তাতে তিনি স্টেজের ওপর একটা মেয়ের হাত-পা, মুখ সব আস্তে আস্তে অদৃশ্য করে দিতেন। তারপর আবার একে একে সব জোড়া লাগিয়ে দিতেন।"

চন্দন কৌতূহলবোধ করছিল, 'বলেন কী!'

"মিথ্যে বলব না স্যার, গুরুর নামে কেউ মিথ্যে বলে না।" বলে' কিকিরা হাত জোড় করে গুরুর উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। উঁচু দরের লোক ছিলেন তিনি। একবার নাইট্রিক অ্যাসিড খাবার খেলা দেখাতে গিয়ে কী একটা গন্ডগোল হয়ে গেল। তিনি মারা গেলেন। আমি পনেরো বছর বয়েস থেকে তাঁর চেলাগিরি করেছি। সাত আট বছর লেগে ছিলাম। আরও পাঁচ সাতটা বছর সঙ্গে থাকতে পারলে দেখতেন— কিকিরা কী না করত! জাপান, আমেরিকা, লন্ডন করে বেড়াতাম। কপাল স্যার, কপাল, ব্যাডলাক... ।"

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "আপনি নিজেও কি ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন ?"

"আমরা ম্যাজিকের বংশ স্যার। আমার ফাদারের অলটারনেট ফাদার বিরাট ম্যাজিশিয়ান ছিলেন।"

চন্দন অবাক হয়ে বলল, "ফাদারের অলটারনেট ফাদার কী জিনিস মশাই?"

কিকিরা মজার মুখ করে হেসে বললেন, "বাবার বাবাকে ছেড়ে তাঁর বাবা — মানে প্রপিতামহ।"

"ওটাই তো আমার অরিজিন্যাল ব্যবসা ছিল স্যার, বছর আট দশ কিকিরা ম্যাজিক

মাস্টার হয়েছিল; তারপর আমার বাঁ হাতটায় কী যে হল প্রথমে ব্যথা ব্যথা করত, দেখতে দেখতে হাত শুকোতে লাগল, জোর একেবারে কমে গেল, সব সময় কাঁপত। হাত না থাকলে ম্যাজিশিয়ান হওয়া যায় না। ম্যাজিশিয়ানের হাত, চোখ আর মুখ এই তিনটেই হল আসল।"

কিকিরা তার বাঁ হাতটা দেখালেন। সত্যিই শুকনো মতন দেখতে, আঙুলগুলো বেঁকা বেঁকা, চামড়া কেমন পোড়া পোড়া রঙের। হাতটা কাঁপছিল। কোট থাকার জন্য কব্জির ওপর দেখা গেল না।

চন্দন বলল, "আপনি ডাক্তার-টাক্তার দেখাননি?"

"দেখিয়েছি, কত ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ খেয়েছি, ইনজেকশান নিয়েছি, কিছু হয়নি। ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। কেউ বলছে, নার্ভের রোগ; কেউ বলছে কোনো বিষাক্ত জিনিস থেকে হয়েছে, কেউ আবার অন্য কিছু বলছে-"

কিশোর পাঠকদের কাছে ফেলুদা, কাকাবাবু, কর্নেল নীলাদ্রী সরকার, গোগোল এবং অর্জুন যে অর্থে গোয়েন্দা (ডিটেকটিভ) কিকিরা ঠিক সেই অর্থে গোয়েন্দা নয়। গোয়েন্দাগিরি তার পেশাও নয় আবার ঠিক নেশাও বলা চলে না। বিচিত্র জীবিকার সূত্রে বিভিন্ন রহস্যে তাঁর জড়িয়ে পরা।

নিরূপ মিত্রের কথায়, "... কিকিরার আর একটি বিশেষত্বর কথা মনে পড়ে গেল। কোনো প্রতাপান্বিত গোয়েন্দা কখনো নিজে যেচে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কেস আদায় করছে, এমন নিদর্শন কি আগে কোথাও পেয়েছি। কিকিরা কিন্তু মিহিরবাবুর কাছ থেকে গোড়ায় অনাস্থা এবং অবহেলা পেয়ে স্রেফ ম্যাজিক দেখিয়ে লোকটিকে অনুকূল করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেনি। তার পরের ঘটনাগুলি তো ম্যাজিকে ম্যাজিকে ছয়লাপ। মিহিরবাবুর লাইটার হড়পিয়ে যে ম্যাজিকটা দেখালো তাতে তার ক্লেপটোম্যানিয়াক বদনামও হতে পারত। সম্ভবত রণে এবং সমস্যা সমাধানে যে কোনো চাতুরীকে কিকিরা অন্যায় বলে মনে করে না ('সেই অদৃশ্য লোকটি' গল্পে)। কিকিরার চেহারায় যেমন কোনো আভিজাত্য নেই, তেমনি কথাবার্তায় এতই সাধারণ যে তার প্রতিভা-বুদ্ধিমত্তা— প্রায় কিছুই বোঝা যায় না।

কিকিরা অন্যের বিপদে সমব্যথী হয়ে অতি সহজেই কেঁদে ফেলে—"এত পাপ করেও মানুষ যদি বেঁচে থাকে তবে ভগবান বলে কিছু নেই। ('কাপালিকরা এখনও আছে' কাহিনিতে কাপালিক ভূজঙ্গভূষণের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা বর্ণনা প্রসঙ্গে চন্দনরা অবাক হয়ে দেখলো কিকিরার গলা ফুলে উঠেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।)।"

কিকিরা অত্যন্ত বিনয়ী। অন্য গোয়েন্দাদের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নয়। সকলকেই সে সম্বোধন করে স্যার ব'লে- এমনকি কারোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলেও, বন্ধুত্ব হলেও সে সরাসরি কাউকে নাম ধরে ডাকতে পারে না।

"কিকিরার সাধারণী অসাধারণত্ব আরও একটি ব্যাপারে লক্ষণীয়। সাহিত্যের গোয়েন্দারা সাধারণত তার সাকরেদদের ব্যবহার করে নিজের কৃতিত্বের বহরটা মালুম দেওয়াবার জন্য। কিকিরা কিন্তু অনায়াসেই তারাপদ ও চন্দনকে পরামর্শ দিতে আহ্বান জানায় এবং বহু সময়ে তাদের স্বাধীনভাবে তথ্য সন্ধানে নিযুক্ত করে। কিকিরার বিনয় তাকে আমি-সর্বস্ব হতে দেয় না কখনোই। বরং কিকিরার দাবি, সে তিনের একমাত্র এবং তাদের তিনজনের মিলিত পার্টনারশিপের নাম কুটুস। কিকিরার কে, তারাপদর টি এবং চন্দনের সি মিলে কে.টি.সি. তারই ব্যবহারযোগ্য বাঙালি রূপান্তর হ'ল কুটুস।" [দ্রষ্টব্য :'সেই অদৃশ্য লোকটি'][২]

কিকিরার নিজের মতে, সে আসলে ম্যাজিশিয়ান ('সেই অদৃশ্য লোকটি' কাহিনিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার ম্যাজিকের পরিচয় আমারা পাই। প্রসঙ্গত মনে পরবে 'শুদ্ধানন্দ প্রেতসিদ্ধ ও কিকিরা' কাহিনির কথাও)। সে গোয়েন্দা নয়। ম্যাজিশিয়ানদের মধ্যে হুডিনি তো তার আদর্শ। সে হুডিনির লেখা ম্যাজিক সংক্রান্ত বইও পড়েছে। হুডিনি যে শুধু বিখ্যাত যাদুকরই ছিলেন তাতো নয়— তিনি যেসব মানুষ আত্মা-ভূত-প্রেত এসব বুজরুকি দেখিয়ে (প্ল্যানচেট) সাধারণ মানুষ, এসবে বিশ্বাসী মানুষদের ঠকিয়ে ব্যবসা করে— তাদের ভণ্ডামি ফাঁস করেও দিতেন। ম্যাজিকের আড়ালে থাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার জনসমক্ষে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত ক'রে বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে চাইতেন। আর কিকিরা হুডিনির এই পথই অনুসরণ করে থাকে এমনকি হুডিনির সংলাপ কখনো কখনো কিকিরার সংলাপও হয়ে ওঠে।

কিকিরা সিরিজের প্রথম কাহিনিতে কাপালিক ভূজঙ্গ ভূষণের আত্মা নামানোর কৌশল (তারাপদর মা বেনু, বাবা বিষ্ণু, বোন পরীর) চন্দন ও তারাপদকে হাতে-নাতে দেখিয়ে দেয়। হুডিনির একটি জীবনী গড়েই যে কিকিরা চরিত্রের কথা লেখক বিমল কর ভেবেছেন তা আমরা জানতে পারি তাঁর কথাতেই (বিমল কর অনেকবারই সে কথা অনেককে বলেছেন)।

কিকিরা অলৌকিক-জটিল রহস্যের সহজ সমাধান করে ফেলে তার ঘরে বসে ম্যাজিকের সাহায্যেই। আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে বিশ শতকের ছয়ের দশকে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'Indian Radical Humanist Association' প্রতিষ্ঠার কথা। তিনি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ও জনমানসে বিজ্ঞানকে প্রসারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল Popular Science চর্চা বাংলায়। আটের দশক থেকেই বাংলার বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠে 'সায়েন্স ক্লাব'। জনমানসে বিজ্ঞান সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্যে তান্ত্রিক, সাধু,বাবাজীদের লোক ঠকানোর নানান ভেলকিবাজির ভণ্ডামি ফাঁস হতে থাকে 'লৌকিক নয় অলৌকিক' প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে। ১৯৮৫তে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'Science communicator's forum'– লক্ষ্য জনমানসে বিজ্ঞান সচেতনতার প্রসার। আমরা কিকিরাকে এই বিজ্ঞান সচেতনতার এক বিশিষ্ট 'communicator' বা 'সম্প্রসারক' বলতে পারি।

কিকিরার Sense of humour, ভুল ইংরেজি বলা (অথবা ইংরেজি ভাষাকে তাচ্ছিল্য করা), সদা হাস্য মুখ, প্রবল যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান মনস্কতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অপরাধীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা, অনুজ বন্ধু প্রতিম চন্দন ও তারাপদর সাহায্য নেওয়া– বিনয়ী এবং নিরহঙ্কারী স্বভাব বাংলা কিশোর সাহিত্যে তাকে এক অনন্য ও অননুকরণীয় চরিত্র করে তুলেছে।

কিকিরার লক্ষ্য ছিল সারা জীবনে অন্তত ১০০টি ম্যাজিক শো করবে কিন্তু ৩৬টি শোয়ের পরই অসুস্থতার কারণে তার একটি হাত পঙ্গু হয়ে যায়। ফলে স্টেজে তার আর ম্যাজিক শো করা হয় না। কিন্তু বাঁ হাতের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও (কাকাবাবু চরিত্রটির কথা এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়তে পারে)। সে রহস্যভেদ করতে সেই ম্যাজিকেরই সাহায্যে নেয় মাঝে মাঝে।

কিকিরার সমস্ত কাহিনি 'কিকিরা সমগ্র' তিন খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। প্রথম খন্ডে রয়েছে ৫টি কাহিনি, দ্বিতীয় খন্ডে ৬টি কাহিনি এবং তৃতীয় খন্ডে ৭টি কাহিনি রয়েছে— অর্থাৎ মোট ১৮টি কাহিনি নিয়ে কিকিরা সমগ্র। প্রথম কাহিনি 'কাপালিকরা এখনও আছে'। এবং কিকিরা সিরিজের শেষ কাহিনি 'ভুলের ফাঁদে নবকুমার' (২০০১-এ প্রকাশিত)।

বিমল কর জানিয়েছেন, " 'কিকিরা সমগ্র'-এর দুটি খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এটি তৃতীয় খণ্ড। কিকিরা চরিত্র নিয়ে লেখা আর কোনও কাহিনি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ধরে নিতে হবে এইটি শেষ খণ্ড। আগে যা বলেছি, আবার বলি, গোয়েন্দা গল্প বলতে ঠিক যা বোঝায় কিকিরার গল্প তা নয়, অপরাধমূলক কাহিনি বলা যায়। খুনোখুনি বন্দুক পিস্তল রক্তপাত এইসব ভয়ংকর ব্যাপার কিকিরার গল্পে নেই; যেটুকু আছে তা আড়ালে, এবং অতি সামান্য। এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিকিরাসারকে যাদের ভালো লাগে, এই লেখাগুলি তাদের তৃপ্ত করলে খুশি হব।"[৩]

বিমল করের জন্মশতবর্ষে তাঁর সৃষ্ট এই অদ্ভুত-ক্ষ্যাপাটে, খামখেয়ালি, মাঝবয়সী 'কিকিরা দি গ্রেট', 'কিকিরা দি ওয়ান্ডার' এবং 'কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান'কে আমরা ভুলবো কি করে? জন্মশতবর্ষে স্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে কিঙ্কর কিশোর রায় — 'কিকিরা স্যারকেও' জানাই Hats Off।

সূত্র নির্দেশ :

১। কিকিরা দি গ্রেট, নিরূপ মিত্র, তীব্র কুঠার, কোলকাতা, বিমল কর বিশেষ সংখ্যা, ২০০৩, সম্পাদক বীরেন শাসমল, পৃ. ৪৮৪

২। তদেব, পৃ. ৪৮৩

৩। দ্র: ভূমিকা, কিকিরা সমগ্র ৩, বিমল কর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা ২০০২

আকর গ্রন্থ :

৪। কিকিরা সমগ্র ১, বিমল কর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৯৯

৫। কিকিরা সমগ্র ২, বিমল কর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা ২০০১

৬। কিকিরা সমগ্র ৩, বিমল কর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা ২০০২

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অনুসারী ধর্মসম্প্রদায়: শ্রীবাস পণ্ডিত গোষ্ঠী ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়,
গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে যখন বাংলা তথা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রসহ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয় নেমে আসে তখন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ত্রাতারূপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। তার বহুকাল আগে থেকেই নদিয়া অঞ্চল ধর্মসহিষ্ণু স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী কালে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নানা মতবিরোধ দেখা দেয়। এমনকি তাঁর জীবদ্দশাতে এই ধর্মে সংকীর্ণতা ও বিভেদের বাতাবরণ প্রবেশ করেছিল এবং অসংখ্য বৈষ্ণবীয় শাখা-উপশাখা ও সংগঠন গড়ে ওঠে। মূলধারার সমান্তরালে বিভিন্ন অনুসারী ধর্মীয় গোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে। যেগুলি পরবর্তী শতকগুলিতে অর্থাৎ ষোড়শ থেকে উনিশ শতক এমনকি বিশ শতকেও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভূত এই সকল ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রত্যেকেই একটি হতে পৃথক সত্তায় বিশ্বাসী এবং প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে স্বতন্ত্রভাবে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণব মতবাদ বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদেরকে চৈতন্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতে থাকে। তবে এই সকল গোষ্ঠীগুলি কতটা চৈতন্যের

আধ্যাত্মবাদ বা ধর্মীয় দর্শনকে গ্রহণ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। চৈতন্য পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা এমনই একটি বৈষ্ণব ধর্মীয় অনুসারী ধর্মসম্প্রদায় হল শ্রীবাস পণ্ডিতের গোষ্ঠী ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়। আমি আমার এই গবেষণাপত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম অনুসারী ধর্মসম্প্রদায় শ্রীবাস পণ্ডিত গোষ্ঠী এবং তাঁর অনুগত অনুসারী ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

মূল শব্দ

মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, শ্রী চৈতন্যদেব, অনুসারী গোষ্ঠী, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহট্ট, পঞ্চখণ্ড, কুমারভট্ট বা হালিসহর, শ্রীবাসঅঙ্গন, হরিসভা, নাম-সংকীর্তন

মূল আলোচনা

শ্রীবাস পণ্ডিত গোষ্ঠী ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম একটি অনুসারী চৈতন্যশাখার বৈষ্ণবধর্মীয় সম্প্রদায়। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্বশ্রীবাস পণ্ডিত। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে শ্রীবাস পণ্ডিত নামেই সমধিক খ্যতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল নারদ। শ্রীবাস পণ্ডিতের জন্ম শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডের পণ্ডিত পাড়ায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। এঁরা পাঁচ ভাই ছিলেন। কেউ কেউ বলেন চার ভাই ছিলেন। এঁরা সকলেই বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাকি চার ভ্রাতা হলেন— নলিন, শ্রীরাম, শ্রীপতি এবং শ্রীনিধি। শ্রীনিধির অপর নাম শ্রীকান্ত। এঁদের মধ্যে নলিন পণ্ডিত ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণীর পিতা ছিলেন। কিন্তু প্রেমবিলাসের সন্দিগ্ধ ত্রয়োদশ বিলাসে শ্রীবাস পণ্ডিতের পিতা জলধর পণ্ডিত এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিত সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য আছে, বাকি কোনো গ্রন্থে তার আর উল্লেখ নেই। স্বয়ং বৃন্দাবনদাসও কোথাও তাঁর মাতামহের নাম উল্লেখ করেননি। নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির কাছেই তাঁদের বাসস্থান ছিল। শ্রীহরিদাস দাস বিবৃত করেছেন—

> ‘জলধর পণ্ডিতের পাঁচ পুত্র সন্তান সকলেই ধর্মপ্রাণ ও ধর্মসহিষ্ণু বিদ্বান পণ্ডিত ছিলেন’। (দাস, ১৪২২, পৃ.১৩৯৪)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপে না থেকে কুমারহট্টে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ইতিপূর্বে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ শ্রীবাস অঙ্গনেই মহাপ্রভু সর্বদা নাম-সংকীর্তন করতেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবী চৈতন্যদেবের পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবীর সখী স্থানীয়া ছিলেন। (দাস, ১৪২২, পৃ.৩৮২-৩৮৩) শ্রীবাসপণ্ডিত সারাজীবন বৈষ্ণবীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ পেলে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই হরিসভা ও নাম-সংকীর্তন করতেন। শ্রীবাস ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়ক শক্তি। সেজন্য শ্রীবাসকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁরা দু'ভাই কুমারহট্টে চলে যান, বাকি তিন ভাই নবদ্বীপে থেকে যান। কিন্তু তাতে শ্রীবাসের চৈতন্যপ্রীতি ও নিষ্ঠা কিছুতেই নষ্ট হয়ে যায়নি। তাঁর গৌরাঙ্গপ্রীতি এত প্রবল ছিল যে, শ্রীবাস পণ্ডিতই শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরসত্ত্বা প্রথম স্বীকার করে তাঁর পুজো করতে শুরু করেন। অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির বর্ণনা থেকে তাই জানা যায় যে, 'শ্রীবাস পণ্ডিতের বৈষ্ণব গোষ্ঠীর প্রতি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অধিক পরিমাণে প্রশ্রয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। চৈতন্য আদর্শ ছিল যার প্রধান হাতিয়ার'। (চৌধুরী তত্ত্বনিধি, ১৯১৭, পৃ.১৪৯-১৫১) অর্থাৎ সারাজীবন শ্রীচৈতন্যের প্রতি অবিচল সম্মান প্রদর্শন করেও শ্রীবাস পণ্ডিত মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে অনুসারী একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বদান করে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল আদর্শ থেকে কোনোদিন তিনি বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। তাঁর অসংখ্য শিষ্য-শিষ্যার মধ্যে তিনি শত দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও চৈতন্য মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

বাল্যকালে শ্রীবাস খুব দুরন্ত ও অসদাচারী প্রায় ঔদ্ধতের শিরোমণি ছিলেন। তবে যখন তাঁর ষোলো-সতেরো বছর বয়স তখন তিনি স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন হন এবং তাঁর মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর এই ভক্তিভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশিষ্ট বৈষ্ণব গবেষক রবীন্দ্রনাথ মাইতি লিখেছেন- ''ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্থির-বুদ্ধি হন এবং তাঁহার মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। সেই সময় একদিন তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে 'শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপক' দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট আসিয়া সেই

'আজন্ম উদাসীনজ্ঞানবন্ত তপস্বী'র নিকট প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ শ্রবণ করিতে থাকেন। কিন্তু পাঠনের মধ্যে ভক্তি-ব্যাখ্যা না থাকিলেও শ্রীবাসের উদ্ভিন্ন প্রেমাকুল চিত্ত তাহার মধ্যে ভক্তি কল্পনা করিয়া বিগলিত হইল এবং তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন অন্যান্য পড়ুয়ায়াবৃন্দ ইহাকে এক উৎপাত ও 'জঞ্জাল' মনে করিয়া 'বাহিরে এড়িল নিঞা শ্রীবাসে টানিয়া'। দেবানন্দ পণ্ডিত কিছুই বলিলেন না। শ্রীবাস অঙ্গনে পতিত হইয়া প্রায় জ্ঞানহারা হইলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি যেন এক নূতন জগতের সন্ধান প্রাপ্ত হন''। (মাইতি, ১৯৬২, পৃ.১০৯-১১০)

এ প্রসঙ্গে একটু শুনেই শ্রীবাস পণ্ডিত বুঝে নিলেন দেবানন্দ ঠাকুর ভাগবত পাঠ করছেন। বলছেন প্রহ্লাদের কাহিনি। নিতান্ত গল্পই বলছেন দেবানন্দ পণ্ডিত। প্রহ্লাদের ভক্তির কথা বলছেন না, বলছেন না শরণাগতির কথা। তাঁর মনে প্রশ্ন উঠছে, যে বলিষ্ঠ বিশ্বাসে কৃষ্ণের কাছে সর্বসমর্পণ করে দিয়েছে সে কথার ব্যাখ্যা কই? একই রকম পাঠ? শুধু অন্বয় আর অনুবাদ। লেশমাত্র ভক্তির সৌরভ নেই। এরকম নানা প্রশ্ন শ্রীবাস পণ্ডিতের মধ্যে দেখা দিল এবং তিনি উচ্চৈস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন। অন্যান্য পড়ুয়ারা তাঁকে সেখান থেকে টেনে সরিয়ে দিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত তার প্রতিবাদ করলেন না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য— বরং শ্রীবাসের মধ্যে ভক্তিভাবের লক্ষণ তিনি প্রকটভাবে দেখতে পেলেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তিথিতে চন্দ্রগ্রহণের মুহূর্তে শ্রীবাস হঠাৎ উল্লাস করে উঠলেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় চৈতন্য অবতার পৃথিবীতে আবির্ভাব হওয়ার আগাম বার্তা পৌঁছে গেল। যথারীতি চৈতন্যের আবির্ভাব হল। সে সময় জগন্নাথ মিশ্র এবং শ্রীবাস পণ্ডিত পাশাপাশি প্রতিবেশী ছিলেন এবং দুই পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে মঙ্গলকর্মে শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনী দেবীর ডাক পড়ল। শ্রীবাসও এ বিষয়ে সাহায্য করলেন জগন্নাথকে। মালিনীর মধ্যে জাগল বাৎসল্যভাব আর শ্রীবাসের মধ্যে শুধুমাত্র দাস্যভাবে সেবা বাসনা। এভাবেই সেদিন চৈতন্যের অনুগত এক সেবাদাসে পরিণত হয়েছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁর মনে বাসনা জাগল- যদি নিমাই বৈষ্ণব হতেন খুব ভালো হতো। এ প্রসঙ্গে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বর্ণনা

করেছেন— "আহা নিমাই পণ্ডিত যদি বৈষ্ণব হত কত সুখের হত! শুকনো ডালে ফুল ফুটত।মরা নদীতে উজান বইত।মুখে-মুখে জেগে উঠতো হরিনাম"। (সেনগুপ্ত, ১৩৭৫, পৃ.৬০)

এই কালপর্বে প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করার প্রাক্-মুহূর্তে অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপে এসে বসবাস করতে থাকেন। নরহরি চক্রবর্ত্তির ভক্তিরত্নাকর থেকে জানা যায়- 'এই সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত'। (চক্রবর্ত্তি, ৪০২ চৈতন্যাব্দ, পৃ.৫২৩) ফলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই নবদ্বীপ সংস্কৃতি-মণ্ডলে পৃথক একটি বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শগত পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। এই সময় বিভিন্ন বৈষ্ণব সাধক, পণ্ডিত ও বৈষ্ণবীয় মতে বিশ্বাসীগণ পৃথক একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবহে নিজেদেরকে ধর্মসহিষ্ণু পরিবেশে তৈরি করতে থাকেন। সেরকমই ধর্মীয় সহিষ্ণু পরিবেশে অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপে আসলেনও টোল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর এই টোলের প্রধান ভক্ত ও সহায়ক শক্তি হলেন পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শ্রীবাস পণ্ডিত। ক্রমে ক্রমে তিনি যেন অদ্বৈত প্রভুর এক মনোযোগী প্রিয় ছাত্রের স্থান অধিকার করে বসলেন। এমতাবস্থায় শ্রীবাস আচার্য ও জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরও গভীর হল। তাই দেখা যায় শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবী যে কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে প্রতিবার্সিনী বা সূতিকাগারের অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসাবে নবজাতকের মঙ্গল কামনায় মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করেছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর স্তন্যদাত্রী মাতার স্থানলাভ ও অধিকার অর্জন করেছিলেন। মাতৃস্নেহে শ্রীগৌরাঙ্গকে তিনি লালন-পালনের অধিকার অর্জন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা থেকে জানা যায়—

> "ইতিমধ্যে নবদ্বীপ সহ বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'অহিংসক' ও 'পরহিতকারী' শ্রীরাম পণ্ডিত— এই দুজনকে চৈতন্যের দু'টি প্রধান শাখা হিসাবে ধরা হতো।" (কবিরাজ, চৈ.চ.১/১০, ১২৯৭সং,পৃ.৫১)

কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্য চার ভাইয়েরাও সকলেই বাল্যকাল থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্যসহচর হয়েছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁরা প্রথমে সম্পন্ন পরিবার ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের চার ভাইয়ের গৃহ দাস-দাসী এবং বৈষ্ণব সহচর-পরিকর,

শিষ্য-শিষ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। এঁরা অভিবাসী হয়ে শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপমণ্ডল এবং কুমারহট্টে বা হালিশহরে বসবাস শুরু করলে দারিদ্র্য এঁদের নিত্য সঙ্গী হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁরা সবংশে চৈতন্যের সেবক হওয়ার ফলে বৈষ্ণবীয় আদর্শ চ্যুত হননি। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল হতে শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবীর মধ্যে যে মাতৃবৎসল্যভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তার প্রভাব শ্রীবাস পন্ডিতের ওপর পড়লেও তিনি ছিলেন মূলত দাস্যভাবের অন্যতম ভাবুক এবং মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী অন্যতম একটি পৃথক গোষ্ঠীর ধর্মীয় নেতা। ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা যায় যে, তাঁর ভাইয়েরাও সেই একই পথ অবলম্বন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা চৈতন্যশাখার অংশ হলেও প্রাক-চৈতন্য পর্ব থেকে চৈতন্য পরবর্তীকালে কিছুকাল তাঁরা তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের পৃথক শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে তৎকালীন সমাজের এক নিদারুণ অধঃপতন ঘটায় অদ্বৈত আচার্য এবং তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁর অন্যতম সহচর শ্রীবাস পণ্ডিত একজন পরম বৈষ্ণব ভক্ত এবং মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রার্থনা করতে থাকেন। তৎকালীন নবদ্বীপ পরিমণ্ডলের অন্যতম সজ্জন জগন্নাথ মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর সমস্ত লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে তাঁরা ত্রাণকর্তা রূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে মান্যতা দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে অদ্বৈত আচার্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিত সেই শুভ মুহূর্তে সেখানে থেকে 'বিধিধর্ম' মতো জাতকর্মাদি সম্পন্ন করেছিলেন। (কবিরাজ, ১২৯৭ সং, পৃ.৬২) কিন্তু বয়সের বিরাট পার্থক্য থাকায় চৈতন্যদেবের বাল্যকালের সঙ্গে শ্রীবাসের বিশেষ যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। সেই সম্বন্ধ ঘটে বিশ্বম্ভরের অধ্যাপনাকালে, যখন তিনি 'চৈতন্য' সম্পর্কে বহুগুণ আকৃষ্ট হলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজ ভাতৃবৃন্দকে নিয়ে এমনভাবে দিনরাত কৃষ্ণগুণগানে মাতলেন যে, বৈষ্ণব ভক্তগোষ্ঠী-বহির্ভূত নবদ্বীপবাসী-বৃন্দ সকলেই তাঁদের প্রতি বক্রোক্তি করতে লাগলেন। (দাস, চৈ.ভা., ১-৭, ১৩৫৬, পৃ.৫২) কিন্তু এতে তিনি কর্ণপাত করলেন না। বরং চৈতন্যের অপার শক্তি প্রকাশের জন্য অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবতে'- এর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানকার বর্ণনা

অনুযায়ী— ‘একদিন পথে বিশ্বম্ভরের সহিত দেখা হইলে শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ‘উদ্বতের চূড়ামণি’ যদি লোককে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে তাঁহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বৃথা’। (দাস,১/৮, ১৩৫৬, পৃ.৬১)

শ্রীবাস পণ্ডিতের ইঙ্গিতপুর্ণ কথায় বিশ্বম্ভর বুঝলেন, তিনিই অপেক্ষমান নিপীড়িত জনসমাজের একমাত্র আশাভরসা-স্থল। তিনি পণ্ডিত শ্রীবাসকে জানালেন যে তাঁদের কৃপা হলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এর পরবর্তীকালে যা ঘটলো তা পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কোনদিন ঘটেনি। নিপীড়িত সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে ষোড়শ শতকের শুরুতেই শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্য এবং শ্রীবাস পণ্ডিতকে সঙ্গী করে বৈষ্ণব সমাজে নবজোয়ার আনেন এবং অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত নারী এবং অগণিত নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী ‘সমাজ-বিপ্লবী’ হিসাবে অন্যতম ধর্মীয় নেতা শ্রীচৈতন্যের নতুন উদ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়-যা ছিল তৎকালীন আবহে সমাজে বিপ্লবের সমতুল।

ইতিপূর্বে শ্রীচৈতন্যের বিবাহ জনিত ব্যাপারে শ্রীবাস পণ্ডিত অভিভাবকের পদ গ্রহণ করলেও তাঁদের মধ্যে প্রকৃত ভাব-সম্মিলন ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যের গয়াধাম হতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পরেই। চৈতন্য তখন কৃষ্ণপ্রেমে অস্থিরও উন্মাদ হয়ে পড়েছেন। সকলেই বলছেন তিনি বায়ুরোগ দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্যত্র অস্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করলেও শ্রীবাসকে দেখলে বিষম্ভর প্রণাম জানিয়ে গুরু-মর্যাদা দান করতেন। জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর মিশ্র পরিবারের অভিভাবকত্বের কিছুটা ভার শ্রীবাসের ওপর আপনা হতেই বর্তেছিল এবং শ্রীবাস পণ্ডিতও সেই গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। কিন্তু শচীদেবীর ধারণা ছিল যে, শ্রীবাস পণ্ডিতের সংস্পর্শে এসে বিশ্বম্ভরের এই পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রীবাস পণ্ডিত শচীদেবীর এই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করে প্রমাণ করে দেখালেন যে, এটা কোনও বায়ুরোগ নয়- এটি আসলে প্রগাঢ় ভক্তিভাবের লক্ষণমাত্র। এ প্রসঙ্গে বিশ্বম্ভর বুঝলেন যে, মহাভক্ত ও শক্তি বলেই শ্রীবাস পণ্ডিত ভক্তির লক্ষণ বুঝতে পেরেছেন। এর ফলে শ্রীবাসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আর ঠিক এই সময়েই শ্রীচৈতন্য তখন হতেই শ্রীবাস-গৃহে নাম-সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। যদিও ইতিপূর্বেই শ্রীবাস পণ্ডিতের একটি

কীর্তন গানের দল ছিল। সেই দলটিকেই চৈতন্য আরও সংগঠিত করে তুললেন। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন চলতে থাকায় পাষণ্ডীগণ ক্ষুদ্ধ হয়ে সমস্ত কথা রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল। তাঁকে আটক করার জন্য রাজার আদেশে দুটি নৌকা আসছে বলে ভয় প্রদর্শন করলে শ্রীবাস পণ্ডিত যবন রাজার ভয়ে ভীত হয়ে কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে লাগলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পাষন্ডীবৃন্দের সমস্ত কৌশল প্রকাশ পেয়ে যায়। এর ফলে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করা হয়। এই সময় শ্রীবাস নৃসিংহদেবকে পূজা করতেন। উক্ত গৃহ দেবতার পরিবর্তে শ্রীচৈতন্যকে মহাশক্তির প্রকাশান্তর ও আধার মনে করে তাঁর স্তব আরম্ভ করে বীরাসনে তাঁর পুজো আরম্ভ করলেন। আর তখন থেকেই শ্রীবাসের ভাতৃবৃন্দ ও শিষ্যগণ নিজেদেরকে গৌরাঙ্গ সেবায় নিয়োজিত করেন।

এর কিছুকাল পরে নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসলে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ-মন্দিরে তাঁর ব্যাসপূজা উপলক্ষে শ্রীবাস পণ্ডিত আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সেইসূত্রে শ্রীবাস-পরিবারের সঙ্গে নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই বাস করতে থাকেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁর পত্নী মালিনী দেবী পরম বাৎসল্য সহকারে তাঁকে অভিন্ন গৌরাঙ্গরূপে বরণ করে নেন। এই সময় অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে ছিলেন। গৌরাঙ্গ শ্রীরাম পণ্ডিতকে পাঠিয়ে তাঁকে নবদ্বীপে আনয়ন করলে শ্রীবাস-গৃহে গৌরাঙ্গের লীলা আরম্ভ হয়। শুরু হলো নতুন এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের। নাম-সংকীর্তন বৈষ্ণবতা (Vaishnavism) প্রচারের অন্যতম হাতিয়ারে (armes) পরিণত হয় এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের মূল মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এইরূপ আদর্শে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন চলতে থাকে। এতে শ্রীবাস পণ্ডিতের একটি পৃথক কীর্তন সম্প্রদায় বৈষ্ণবতা প্রচারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাঁর এই কীর্তনের দলকে কেন্দ্র করে পৃথক একটি গোষ্ঠী তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করে। এর ফলে বাংলার বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে চৈতন্য পরবর্তীকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের নেতৃত্বে বিশেষ একটি সমান্তরাল এবং অনুসারী গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠে। চৈতন্য সমকালীন সময়ে কাজী দমনকালে এই দলটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন

চৈতন্যধর্মের প্রসার ঘটেছিল, তেমনি সেদিন অহিংস সত্যাগ্রহের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন জোরদার ও ফলপ্রসু হয়েছিল। যা পরবর্তীকালের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন সহ রাজনৈতিক আন্দোলনকে উৎসাহিত ও পরিপুষ্ট করেছিল। বৃন্দাবন দাসও শ্রীবাস পণ্ডিতের 'কীর্তনদল' পৃথক গোষ্ঠীটি সম্পর্কে চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করেছেন— 'শ্রীবাস পণ্ডিত লৈয়া এক সম্প্রদায়' নাম-সংকীর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করতেন। (দাস,২/৮, ১৩৫৬, পৃ.১৪০)

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন একজন অতি উচ্চমানের লেখক, পাঠক,কথক ও বক্তা। তাই তাঁরই ধর্মগ্রন্থ পাঠ শ্রবণে গৌরাঙ্গ যেমন নৃসিংহভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি তাঁরই বৃন্দাবনলীলা কথনে বিহ্বল হয়ে তিনি 'বংশী' প্রার্থনা করে আকুলিত চিত্তে না ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করেছিলেন। আবার অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের জন্য তাঁকে যেভাবে পাষন্ডীদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এমন ঘটনা সহ্য আর কোনো বৈষ্ণব নেতাকে হতে হয়নি। গোপাল-চাপাল নামে পাষণ্ডী সরদার এক বিপ্র একবার রাত্রিকালে শ্রীবাসের গৃহের দুয়ারে মা ভবানী পূজার সামগ্রী রেখে যান। শ্রীবাস অঙ্গনের একটি স্থান পরিষ্কার করে ও গোবর-জল দিয়ে নিকিয়ে তার ওপর একটি কলাপাতায় ওড় ফুল, হরিদ্রা, সিঁদুর, রক্ত চন্দন ও তন্ডুল সহ বিভিন্ন জিনিস রেখেছিলেন। তবে এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল- তার পাশে মদ্যভাণ্ডও রেখে যান। পরদিন সকালে শ্রীবাস এই সমস্ত দেখে হাড়ি সম্প্রদায়ের এক লোককে ডেকে পাঠিয়ে এই সমস্ত কিছু দূরে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। এরকম কত দুর্ভোগই তাঁকে সহ্য করতে হতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও তিনি চৈতন্যধর্মকে বাংলার অন্যতম সহনশীল ও নিজস্ব ধর্মে পরিণত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐক্যবদ্ধ রূপটিকে সংগঠিত করার শতত চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাই নয়, চৈতন্যপ্রীতির জন্য তিনি যেমন হৃদয়বিদারক বেদনাকেও হাসিমুখে উড়িয়ে দিয়েছেন, তার দৃষ্টান্তও রয়েছে। একবার শ্রীবাসঅঙ্গনে নাম-সংকীর্তনকালে রোগগ্রস্ত হয়ে শ্রীবাসের এক পুত্রের মৃত্যু ঘটে। এমত অবস্থায় গৃহমধ্যে নারীগণ কাঁদছেন। চারিদিকে কান্নার রোল কীর্তনকে বিঘ্নিত করতে পারে বলে এ ঘটনা শ্রীবাস কাউকে বলেননি। বরং তিনি ক্রন্দনরত নারীদেরকে সান্তনা দিয়ে

অতি সহজভাবেই সংকীর্তনে যোগদান করেন। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর গৃহে কোনো বিষাদময় ঘটনা ঘটেছে কিনা, তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন—

'পণ্ডিত বোলয় প্রভু! মোর কোন দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ'।। (মাইতি, ১৯৬২, পৃ.১১৪)

অন্যান্য ভক্তের নিকট সমস্ত শুনে চৈতন্যদেব বিস্ময়প্রকাশ করলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীবাসের পুত্রের স্থান অধিকার করে তাঁকে সান্তনা দান করলেন। তারপর তিনি শ্রীবাস-পুত্রের সৎকার করে আসলে তাঁর চার ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাপ্রভুর পদযুগল ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—

'জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাশরি কভু'।। (মাইতি, ১৯৬২, পৃ.১১৪)

এই সমস্ত কারণে শ্রীবাসের প্রতিও চৈতন্যদেবের সীমাহীন করুণা ও সম্মান ছিল অপরিসীম। তাঁর হস্তক্ষেপের ফলেই শ্রীচৈতন্য শচীদেবীর অদ্বৈত অপরাধ খণ্ডন করেছিলেন এবং চন্দ্রশেখরের গৃহে নাট্যাভিনয় কালেও শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সমস্ত নাটক অভিনয়ের এবং ব্যবস্থাপনার সামাজিকভার ও দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন শ্রীবাসের উপর। এমনকি এই সময়ে যে মুসলমান দর্জি শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করে দিতেন, তিনিও চৈতন্য প্রভুর করুণা লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। আর এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই পর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার প্রধান কেন্দ্রই ছিল শ্রীবাসের গৃহ। শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব, দানগোষ্ঠাদিলীলা, পাশাখেলা, বনভোজন, অভিষেক, গোপীভাবে নৃত্য ইত্যাদি প্রথম হতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত সমস্ত লীলা অনুষ্ঠানের সঙ্গী ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন এই শ্রীবাস ও তাঁর ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত এবং তাঁদের অন্য ভ্রাতারা। শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের শেষে মহাপ্রভু শান্তিপুরে পৌঁছালে শ্রীবাস পণ্ডিতবিধ্বস্ত হৃদয় নিয়ে শচীমাতাকে 'নবযানে' আরোহণ করিয়ে নবদ্বীপবাসীগণের সঙ্গে শান্তিপুরে এসে তাঁকে বিদায় দিয়ে যান। এরপর শ্রীচৈতন্যের পূর্বে নির্দেশিতপথ অনুসরণ করে শ্রীবাস পণ্ডিত কুমারহট্ট এসে বসবাস করতে থাকেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য

হতে নীলাচলে এলে শ্রীবাস ও শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁকে দর্শন করবার জন্য নবদ্বীপ হতে যাত্রা করেন। (কবিরাজ, ১২৯৭ সং, ২/১০, পৃ.১৪৭) এই সময়ে শ্রীবাস ও তাঁর ভাতৃবৃন্দ সকলেই নীলাচলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন তাঁরা। এখানে সম্প্রদায় ভিত্তিক ক্ষেত্রেও শ্রীরাম নৃত্য ও কীর্তনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ছিল একটি সম্প্রদায়ের উপর নেতৃত্ব। এমনকি মহাপ্রভুর উদণ্ডনৃত্যেও শ্রীবাস এবং তাঁর অনুজ রামাইও অংশগ্রহণ করেন। এভাবেই শ্রীবাস পণ্ডিত প্রতিবছর নীলাচলে গিয়ে চৈতন্য দর্শন লাভ করতেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য ভ্রাতারাও যেতেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবীও দু-একবার তাঁদের সঙ্গে গিয়েছেন। নীলাচলে শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ের দ্বারা কীর্তন এবং নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

মহাপ্রভুর তিরোধানকালেও শ্রীবাস পণ্ডিত নীলাচল উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অন্য কোনো প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। গৌড়ে প্রেরিত হওয়ার পর নিত্যানন্দ সম্ভবত মধ্যে মধ্যে শ্রীবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। শ্রীরাম পণ্ডিতকেও মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে দেখা যেত। (চক্রবর্ত্তি, ৪০২ চৈতন্যাব্দ, ১২/৩৯২০-৩০, ৩৯৮৯, পৃ.১৫৪) কিন্তু চৈতন্য বিরহের ফলে আর তাঁদের ভাবসম্বন্ধের মধ্যে সম্ভবত সেইরূপ মাদকতা ছিল না।তাই নিত্যানন্দের সংসারধর্ম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় শ্রীবাস ও মালিনী দেবী উভয়ই তাঁকে বিবাহ বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন। কারণ তারপরে মহাপ্রভুর জীবদ্দশাতেই নিত্যানন্দের দীর্ঘকাল যাবত গৌড়বাসকালে শ্রীবাসের সঙ্গে তাঁর লীলার কোনো কথাই আর শুনতে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর প্রিয়ভাবের পরেও তাঁদের তদানীন্তন সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারা যায় না। চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীবাস পণ্ডিত কত দিন বেঁচে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে শ্রীজীব গোস্বামীর বৃন্দাবন যাত্রাকালে কিংবা তারও অনেক পরে শ্রীনিবাস আচার্যের নবদ্বীপ আগমনকালে তিনি যে তাঁদেরকে আশীর্বাদ করেছিলেন তা নরহরি চক্রবর্ত্তির গ্রন্থ থেকে জানা যায়। (চক্রবর্ত্তি, ৪০২ চৈতন্যাব্দ, ৪/৫৬ পৃ.৭৬) সম্ভবত তখন শ্রীবাস ও শ্রীরাম বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার তত্ত্বাবধানের জন্য নবদ্বীপে থেকেই প্রভুর প্রতি তাঁদের শেষ কর্তব্যটুকু পালন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু

শ্রীনিবাস আচার্য যখন বৃন্দাবন হতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন শ্রীবাস পণ্ডিত ইহলোক ত্যাগ করেছেন। (চক্রবর্ত্তি, ৪০২ চৈতন্যাব্দ, ৭/৬১৯; ৮/৪৭) রামাই পণ্ডিত সম্পর্কেও আর বেশি কিছু জানা যায় না। তবে শ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, গঙ্গাধরদাস প্রভু এবং নরহরি সরকার ঠাকুর বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর আয়োজিত খেতুরির উৎসবেও তাঁদের বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। (দাস, প্রে.বি., ১৯বি., ১৩২০, পৃ.৩০৯) প্রকৃতপক্ষে এঁরা ছিলেন শ্রীবাস পন্ডিতের গোষ্ঠীভুক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অনুসারী বৈষ্ণব গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তবে এ প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য যে, চৈতন্যের শেষ-জীবন এবং চৈতন্য পরবর্তীকালে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐক্য বিনষ্ট হতে থাকে।

কিন্তু ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বৈষ্ণব ধর্মে বিভেদ ও বাদ-বিসম্বাদ ও দরবারি দলাদলি শুরু হয়ে তা প্রকট আকার ধারণ করে এবং মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐক্য বিনষ্ট হয় ও বিভিন্ন গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী, দল-উপদল, শাখা-প্রশাখা, উপধর্ম ও অনুসারী বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল শ্রীবাস পণ্ডিতের ধর্মীয় গোষ্ঠী ও শিষ্য সম্প্রদায়। পাশাপাশি আরও কতকগুলি উপগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— অদ্বৈত আচার্যের গোষ্ঠী বা শান্তিপুর গোষ্ঠী, নিত্যানন্দ সম্প্রদায় বা খড়দহ গোষ্ঠী, নরহরি সরকারের নেতৃত্বে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রসরাজ সম্প্রদায় ও মঞ্জরী সাধনা, শ্রীনিবাস আচার্যের নেতৃত্বে একটি পৃথক গোষ্ঠী, নরোত্তম দাস ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত অনুসারী গোষ্ঠী, চৈতন্য-পুজক সম্প্রদায়, গদাই-গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়, শ্যামানন্দ গোষ্ঠী প্রভৃতি। এগুলি সবই চৈতন্য পরবর্তীকালে গঠিত মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যন্তরে সমান্তরালভাবে গঠিত বিভিন্ন অনুসারী বৈষ্ণব ধর্মীয় গোষ্ঠী। চৈতন্যের জীবদ্দশাকালীন সময়ে এবং তৎপরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীগুলি বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল চৈতন্যের পরবর্তীকালে তাঁরমতো আদর্শবান ধর্মীয় নেতার অভাব এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা। পাশাপাশি বৈষ্ণব নেতাদের আখড়া, মঠ, মন্দির, শ্রীপাট বা তীর্থকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র

স্বার্থপরতা এবং অর্থনৈতিক দুর্নীতি সহ নানা ব্যভিচারপূর্ণ জীবন যাপন মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ঐক্যকে বিনষ্ট করে দেয়। ফলে বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে, সমাজের সার্বিক মঙ্গলসাধনের পরিবর্তে ক্ষুদ্র স্বার্থ জনিত কারণে বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে নানা বিভেদ ও অনৈক্য লক্ষ করা যায়, যা ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ কয়েকটি শতক অতিক্রম করে উনিশ-বিশ এমনকি একুশ শতকেও তা ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান আছে। বর্তমানকালে মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমঠ, মন্দির ও মিশন কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল কাঠামোর পরিপন্থী। চৈতন্যদেব এ ধরনের বিভেদকে তাঁর জীবদ্দশায় প্রশ্রয় দেননি। তাই তার ঐক্য অটুট ছিল। বর্তমানকালের প্রযুক্তিনির্ভর ভোগবাদী যাপিত জীবন-যাপন, বিশ্বায়ন ও উত্তর আধুনিকতার প্রকট প্রভাবের ফলে আজ ধর্মের ক্ষেত্রেও বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা এবং হানাহানি লক্ষ করা যাচ্ছে, যা সাধারণভাবে কাঙ্ক্ষিত নয়। ধর্ম আজ বিপন্ন। ধর্ম মানুষের রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি তথা রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে চৈতন্যধর্ম তাঁর ভাবাদর্শ শুধুমাত্র পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধই থাকবে, বাস্তবক্ষেত্রে তার সুদূরপ্রসারী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। তাই আজকের দিনে আমাদের প্রয়োজন শ্রীবাস পণ্ডিতের মতো চৈতন্যভাবুক ধর্মনেতার, যাঁদের নেতৃত্বে ধর্ম হয়ে উঠবে সৃজনশীল, সহনশীল, মানবিক ও আধ্যাত্মিক আত্মদর্শন।

তথ্যসূত্র:

১. দাস., হ.(১৪২২ বঙ্গাব্দ,২০১৫), শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম খণ্ড, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.

২. দাস., হ.(১৪২২ বঙ্গাব্দ, ২০১৫), শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, অখণ্ড সং, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.

৩. চৌধুরী তত্ত্বনিধি., অ.(১৯১৭), শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৪র্থ ভাগ, কলকাতা: কথা প্রকাশন.

৪. মাইতি., র.(১৯৬২), চৈতন্য-পরিকর, কলকাতা:বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড.

৫. সেনগুপ্ত., অ.(১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, ১৯৬৮), গৌরাঙ্গ-পরিজন, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

৬. চক্রবর্ত্তি., ন.(৪০২ চৈতন্যাব্দ, ১৮৮৭), ভক্তিরত্নাকর, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংশোধিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ:রাধারমণ যন্ত্র.

৭. কবিরাজ., কৃ.(১২৯৭ সং, ১৮৯০), চৈতন্যচরিতামৃত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ:রাধারমণ প্রেস.

৮. কবিরাজ. কৃ.(১২৯৭ সং, ১৮৯০), চৈতন্যচরিতামৃত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ:রাধারমণপ্রেস.

৯. দাস.,বৃ.(১৩৫৬ সন, ১৯৪৯), চৈতন্যভাগবত, কলকাতা: সুচারুকান্তি ঘোষ সং.

১০. দাস.,বৃ.(১৩৫৬ সন, ১৯৪৯), চৈতন্যভাগবত, কলকাতা:সুচারুকান্তি ঘোষ সং.

১১. দাস., বৃ.(১৩৫৬ সন, ১৯৪৯), চৈতন্যভাগবত, কলকাতা:সুচারুকান্তি ঘোষ সং.

১২. মাইতি., র.(১৯৬২), চৈতন্য-পরিকর, কলকাতা:বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড.

১৩. মাইতি., র.(১৯৬২), চৈতন্য-পরিকর, কলকাতা:বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড.

১৪. কবিরাজ., কৃ.(১২৯৭সং, ১৮৯০), চৈতন্যচরিতামৃত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ: রাধারমণ প্রেস.

১৫. চক্রবর্ত্তি.,ন.(৪০২ চৈতন্যাব্দ, ১৮৮৭), ভক্তিরত্নাকর, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক, সংশোধিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ:রাধারমণ যন্ত্র.

১৬. চক্রবর্ত্তি.,ন.(৪০২ চৈতন্যাব্দ, ১৮৮৭), ভক্তিরত্নাকর, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংশোধিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ: রাধারমণ যন্ত্র.

১৭. চক্রবর্ত্তি.,ন.(৪০২ চৈতন্যাব্দ, ১৮৮৭), ভক্তিরত্নাকর, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংশোধিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ: রাধারমণ যন্ত্র.

১৮. দাস.,নি.(১৩২০ সন, ১৯১৩), প্রেমবিলাস, কলকাতা: যশোদালাল তালুকদার সং.

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

মনোজ মিত্রের ‘দেবী সর্পমস্তা’: সংলাপের ভাষা ও ভাষাগত বিশ্লেষণ

আঙ্গুরা খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সংলাপ। নাট্যক্রিয়া ও চরিত্রকে অচ্ছেদ্য রূপে তুলে ধরতে সহায়কের ভুমিকা গ্রহণ করে সংলাপ। তবে চরিত্রের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক নির্দেশ করে সংলাপের ভাষা। এই ভাষা পরিবেশিত হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বিশেষে। ফলে সংলাপের ভাষায় উপভাষা, সমাজভাষা ও লোকভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। এইরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষার সমাবেশ লক্ষ করা যায় নাট্যকার মনোজ মিত্রের ‘দেবী সর্পমস্তা’ নাটকে। বনপাহাড়ি অঞ্চল ও সিংহগড় রাজ্যের পটভুমিতে তাঁর নাটকে শিষ্টভাষা, উপভাষা এবং ব্রজবুলি ভাষার আভাস পাওয়া যায়। এককথায় চরিত্র ও পরিবেশ উপযোগী ভাষা-উপভাষা তথা জনগোষ্ঠীর ভাষা তাঁর এই নাটকে দেখা যায়। স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিবর্তনে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, লিঙ্গ ও পুরুষ ভেদে শব্দের পরিবর্তন, কারক বিভক্তি, ক্রিয়ার কাল, শব্দদ্বৈতের ব্যবহার, ক্রিয়া রূপের পরিবর্তনে শিষ্টশব্দের পরিবর্তন সমস্ত কিছু নাট্য সংলাপের ভাষায় বিদ্যমান। শুধু তাই নয় উপমা, প্রবাদের ব্যবহার সংলাপের ভাষাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপের ভাষার স্বাতন্ত্রতা চমৎকার ভাবে লক্ষিত। আসলে সমস্তটাই নাট্যকারের প্রতিভা ও দক্ষতা গুণের পরিচয়।

সূচকশব্দ

মনোজ মিত্র, দেবী সর্পমস্তা, সংলাপ, ভাষা।

মূল আলোচনা

সংলাপকে নাটকের প্রাণ বলা হয়ে থাকে। কারণ নাটককে শক্তিশালী ও সজীবতায় পরিপূর্ণ করে তোলে সংলাপ। সংলাপই নাটকের ক্রিয়া ও চরিত্রকে অচ্ছেদ্য রূপে তুলে ধরে। তবে চরিত্রের সামাজিক, ভৌগোলিক, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা অর্থনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত করে চরিত্রের মুখে উচ্চারিত সংলাপের ভাষা। এই ভাষা বিশেষ অবস্থান কিংবা জীবিকা-শিক্ষা-অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। ফলে সংলাপের ভাষায় দেখা যায় শিষ্টভাষা, লোকভাষা, উপভাষা তথা সমাজভাষার বিচিত্র রূপ। মূলত নাট্যকারগণ চরিত্র ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী নাটকে সংলাপের ভাষা প্রয়োগ করে থাকেন। গণনাট্য পরবর্তীকালের নাট্যকার মনোজ মিত্রও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর নির্মাণশিল্পের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষার ব্যবহার। যে ভাষা শুধু কানকে তৃপ্ত করে না, এক অন্য স্বাদও এনে দেয়। যা নিয়ে তাঁকে কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। আমাদের আলোচনার বিষয় মনোজ মিত্রের ‘দেবী সর্পমস্তা’ নাটকে সংলাপের ভাষা ও ভাষাগত বিশ্লেষণ।

লোকায়ত ভাবনা ও কাল্পনিক ইতিহাসের আদলে রচিত ‘দেবী সর্পমস্তা’ (১৯৯৫) নাটকটির পটভূমিতে রয়েছে সিংহগড় রাজ্য ও বনপাহাড়ি অঞ্চল। ফলে ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন চরিত্রের সমাগম হওয়ায় নাটকের ভাষায় বৈচিত্র্য দেখা গেছে। নাটকের ভাষা কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবে সিংহগড় রাজ্যের রাজা, দেওয়ান, সেনাপতি সকলের ভাষায় শিষ্টজনের ভাষা পরিলক্ষিত। পাশাপাশি বনপাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী আদিম বনবাসী মানুষদের ভাষা স্বতন্ত্ররূপে ধরা পড়েছে। তাদের মুখের ভাষা কোনো উপভাষার অন্তর্গত না হলেও মাঝে মাঝে সংলাপে উপভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। স্বর ও ব্যঞ্জনের নানান পরিবর্তনে প্রচলিত ও অপ্রচলিত এমনকি দেশজ শব্দের ছাপ লক্ষ করা গেছে। তাছাড়া বন্যচারী ব্যাধেদের ভাষায় ব্রজবুলি ভাষার আভাস পাওয়া যায়। তাদের এই লোকপ্রচলিত ভাষা কৌম-জনগোষ্ঠীর ভাষার পরিচয় বহন করে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Phonetic Features):

স্বর ও ব্যঞ্জনের অবিকৃত উচ্চারণের পাশাপাশি সংলাপের ভাষায় বহু বিকৃত তথা পরিবর্তিত রূপ চোখে পড়ে, যা নাটক ভিন্নতর শিল্পগুণের পরিচয় পায়। যদিও সমস্তটাই নাট্যকারের দক্ষতা ও প্রতিভাকে প্রকাশ করে। আমরা সংলাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখব 'দেবী সর্পমস্তা' নাটকের সংলাপে ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকগুলি কতটা বৈচিত্র্যময় হয়েছে।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ।। তোমার বিবাহ ঘরসংসারের ব্যবস্থা করে দেব।[১]

এখানে ব্যবহৃত 'করে' শব্দটি অভিশ্রুতির দৃষ্টান্ত। অপিনিহিতিজাত 'কইর‍্যা' শব্দ থেকে 'করে' শব্দটি এসেছে। এই অভিশ্রুতির প্রভাব দেখা যায় মান্যভাষা তথা রাঢ়ী ভাষায়।

প্রভাকর।। দ্যাখ কোথায় এসেছি আমরা...[২]

প্রভাকরের কথায় বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কারণ 'দেখ' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে 'দ্যাখ' রূপে। অর্থাৎ মানুষের উচ্চারিত রূপটি লিখিত হয়েছে সংলাপে। যদিও স্বরের দিক থেকে 'এ'-কার পরিবর্তিত হয়েছে 'অ্যা'-কারে। তাছাড়া ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে শিষ্টশব্দগুলি নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

রঙ্গলাল।। এর চেয়ে যে আমিও সুপাত্তর![৩]

রঙ্গলাল।। ঘরদোর কি কম্মে লাগবে রে![৪]

প্রথম ব্যাধ।। ...পাথরের আগড় তুলি আটকাহবি।[৫]

সংলাপে ব্যবহৃত 'সুপাত্তর' শব্দটি এসেছে 'সুপাত্র' থেকে। অর্থাৎ এখানে স্বরভক্তির প্রয়োগ ঘটেছে। আবার 'কর্ম' শব্দটি হয়েছে 'কম্ম'। এটি সমীভবনের দৃষ্টান্ত এবং 'আটকাবি' শব্দটি প্রথম ব্যাধের মুখে উচ্চারিত হয়েছে 'আটকাহবি'। অর্থাৎ শব্দমধ্যে 'হ' ব্যঞ্জনের আগাম হওয়ায় শব্দটির নবরূপ দেখা গেছে। তাছাড়া শিষ্টভাষী রঙ্গলাল বন্যচারী ব্যাধেদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের মতো করে কথা বলে। যেমন—

রঙ্গলাল।। কোঁড়া মারি ভাঙি দিব তোহর ঠ্যাঙ্গ। ব্যাটা কালি মোরে বান্দরের পিলা খাওয়ালি![৬]

এখানে 'কোঁড়া' শব্দটির অর্থ 'বাঁশ'। 'কোঁড়া' শব্দ ব্যবহার করে শব্দের নতুনত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া 'মেরে', 'ভেঙে' শব্দগুলির প্রথমে ও শেষে ব্যবহৃত উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ' পরিণত হয়েছে নিম্ন-কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি 'আ' এবং উচ্চ-সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'ই'-তে। ফলে শব্দগুলি হয়েছে 'মারি', 'ভাঙি' এবং 'তোর' শব্দটি হয়েছে 'তোহর' অর্থাৎ মধ্যব্যঞ্জনের আগম হয়েছে। 'ঠ্যাং' শব্দটি হয়েছে 'ঠ্যাঙ্গ' অর্থাৎ শব্দান্তে 'গ' ব্যঞ্জনের আগম ঘটেছে। 'কাল' হয়েছে 'কালি' অর্থাৎ শব্দন্তে 'ই' স্বরের আগম ঘটেছে। 'আমাকে' হয়েছে 'মোরে'। 'বাঁদর' শব্দটি হয়েছে 'বান্দর'। এই 'বান্দর' শব্দের নাসিক্যব্যঞ্জন 'ন' এখানে লোপ পায়নি। এই বৈশিষ্ট্য অটুট রয়েছে বঙ্গালী উপভাষায় অর্থাৎ রাঢ়ী উপভাষার মতো বঙ্গালী উপভাষায় নাসিক্যীভবন চন্দবিন্দুর প্রভাব দেখা যায় না। ফলে চন্দ্রবিন্দু পরিণত হয় 'ন'-কারে। তাছাড়া বন্যচারী উদাসের সংলাপে স্বর ও ব্যঞ্জনের বিচিত্র রূপ দেখা গেছে।

উদাস।। শোন, কহিরে শ্বেত ভালুকি, ইচ্ছার পায়ের ধুলার তরও না তুহিঁ... তুহিঁ কোন কম্মে লাগিবি মোর।... যা ভাগ, নহে দিব শেষ করি! ... ঘিরনা করি। তাহে লখি হাসি পায় রে... হো-হো-হো...[৭]

সংলাপটিতে আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ না ফুটে উঠলেও ভাষার মধ্যে নবরূপ সৃষ্টি হয়েছে। ভাষা হয়ে উঠেছে লোকভাষার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। ফলে 'শুন' শব্দটি হয়েছে 'শোন' অর্থাৎ উচ্চ-সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'উ'-কার পরিণত হয়েছে উচ্চ-মধ্য অর্ধ-সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'ও'-কারে। 'বলি' শব্দের গ্রাম্যরূপ হয়েছে 'কহি', 'সাদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'শ্বেত' রূপে। 'ভালুক' পরিণত হয়েছে 'ভালুকিতে' অর্থাৎ শব্দান্তে 'ই' স্বরের আগম ঘটেছে। 'যোগ্য' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'তর' রূপে। যা শব্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। 'তোকে' সর্বনাম পদটি হয়েছে 'তুহিঁ', 'লাগবি' রূপান্তরিত হয়েছে 'লাগিবি'-তে অর্থাৎ মধ্যস্বর 'ই'-এর আগম ঘটেছে। 'আমার' শব্দটি এখানে রূপ পেয়েছে 'মোর', 'নাহলে' হয়েছে 'নহে', 'করে' শব্দটি 'করি' হয়েছে অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়ার শেষে অবস্থিত 'এ'-কার রূপ লাভ করেছে 'ই'-কারে। তাছাড়া 'ঘৃনা' শব্দটি স্বরভক্তির প্রভাবে 'ঘিরনা'-তে পরিবর্তিত হয়েছে এবং 'দেখি' শব্দটির নতুন রূপ সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে 'লখি'। লক্ষণীয় এখানে স্বর ও

ব্যঞ্জনের যে পরিবর্তনগুলি দেখা গেছে তা বেশিরভাগই ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মানুযায়ী হয়েছে। যা একটি জনগোষ্ঠীর লোকভাষার স্বরূপ হিসেবে বিবেচিত। আবার সংলাপে ব্যবহৃত 'তুহুঁ', 'তোহ' 'তাহে' ইত্যাদি শব্দগুলি ব্রজবুলি ভাষার দৃষ্টান্ত। তাছাড়া আরো কিছু সংলাপ তুলে ধরলে ব্রজবুলি ভাষার স্বরূপটি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যেমন—

বৃদ্ধ ব্যাধ।। (গলা ঝেড়ে) মাহ ভাদর, তিথি চান্দর, ঝিরিঝিরি বরষণ...[৮]

ডাহুক।। হঁ হঁ মত্ত দাদুরী...[৯]

উদাস।। চল, কান্তা দুহেঁ ঘর বান্ধি...[১০]

চরিত্রগুলির সংলাপের ভাষা প্রচলিত ভাষা থেকে অনেকটা আলাদা। তাদের ভাষা যেন মনে করিয়ে দেয় বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষাকে। এছাড়া কভুঁ, দুহুকার, তেঁই ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার নাটকে দেখা গেছে, যা ব্রজবুলি ভাষাকে ইঙ্গিত করে। তবে ব্রজবুলি ভাষায় কথিত তাদের সংলাপ পদ্যভাষার আমেজ সৃষ্টি করেছে।

ডাহুক।। (প্রভাকরকে) দো! যো কছু আছে... সব দো!... হে রে কুণ্ডলা, ত্বরা আয়, ত্বরা আয়...[১১]

ডাহুকের মুখের ভাষায় 'দে', 'যে' শব্দগুলি পরিণত হয়েছে 'দো', 'যো'। অর্থাৎ 'এ'-কার 'ও'-কারে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার 'কিছু' শব্দটি রূপ লাভ করেছে 'কছু'-তে। অর্থাৎ এখানে আদি স্বরলোপ হয়েছে। তাছাড়া 'ত্বরা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'তাড়াতাড়ি' অর্থে। প্রত্যেকটি শব্দের নতুন রূপ সংলাপকে শুধু বৈচিত্র্যময় করেনি, সেইসঙ্গে ধ্বনিপ্রবণ করে তুলেছে।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Morphologic Features) :

রূপতত্ত্বের দিক থেকে সংলাপের ভাষায় উঠে আসে ক্রিয়াপদের পরিবর্তনে শিষ্টশব্দের বিকৃতি, ক্রিয়ার কাল, কারক ও বিভক্তি, সমাস, সর্বনাম, বচন, পুরুষভেদে শব্দের পরিবর্তন, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈতের ব্যবহার এমনকি শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ।। আজ তোমার মুখে বালিকার সে মুখ আমি খুঁজে পাইনে।[১২]

রঙ্গলাল।। এমন দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি![১৩]

লক্ষণীয় ক্রিয়ার শেষে থাকা 'না' এখানে 'নে' ও 'নি'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে শব্দগুলি রূপ পেয়েছে 'পাইনা' থেকে 'পাইনে' এবং 'দেখিনা' থেকে 'দেখিনি'। এই বৈশিষ্ট্য রাঢ়ীতে দেখা যায়। কিন্তু বঙ্গালী উপভাষায় নাই-এর ব্যবহার বেশি প্রচলিত। যার প্রয়োগ ঘটেছে নাটকে। যেমন—

ইচ্ছে।। কভুঁ সে বেঁহুশ হয় নাই।[১৪]

সংলাপে ব্যবহৃত 'নাই' শব্দের দ্বারা আবার সাধুভাষার রূপও প্রকাশ পায়।

লোকেন্দ্রপ্রতাপ।।...এই অপদার্থ রাজাই তাঁকে নিরাভরণ করে কণ্ঠমালাটি তুলে দেবে ব্রিটিশ প্রভুর হাতে।[১৫]

এখানে 'নিরাভরণ' শব্দটির সমাস হল 'নেই আভরণ যার'। অর্থাৎ সমাসগত দিক থেকে এটি নঞ বহুব্রীহি সমাসের দৃষ্টান্ত।

রঙ্গলাল।। বাঃ, হাসির কথা কই বললাম![১৬]

সদ্য অতীতকালে ক্রিয়াপদে 'লাম' বিভক্তি রাঢ়ী, বঙ্গালী উভয় উপভাষাতে লক্ষিত হয়।

রঙ্গলাল।। বুঝলে সন্ধেবেলা হারটা দেখার পর থেকেই ব্রহ্মতালু দপদপ করছে![১৭]

রঙ্গলাল।। এই বামুনটার পেছনে শুয়োরের মতো ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে দৌড়ে এলি কেন অ্যাদ্দুর?[১৮]

রঙ্গলালের প্রথম সংলাপে 'দপদপ' শব্দটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার চরিত্রের উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কাকে তীব্রতর করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় সংলাপে ভাষার বিভিন্ন রূপ দেখা গেছে। প্রথমত চরিত্রটি নিজেকে শুয়োরের সঙ্গে তুলনা করেছে। ফলে উপমা অলংকারের একটা নিদর্শন স্পষ্ট। আবার 'ঘোঁৎঘোঁৎ' ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার ঘটেছে। সেই সঙ্গে 'করতে করতে' শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ ঘটিয়ে নাট্যকার অসমপিকা ক্রিয়ার রূপকে স্পষ্ট করেছেন। তাছাড়া অন্যদিক থেকে দেখেলে বোঝা যায় তিনি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং যৌগিক ক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন করে একপ্রকার মিশ্র অর্থবোধক ক্রিয়াপদের রূপ তৈরি করেছেন। ফলে তার রূপ হয়েছে 'করতে করতে দৌড়ে এলি'।

রঙ্গলাল।। আমিই বুদ্ধি করে তোমাদের বনে ঢোকালাম,...[১৯]

লক্ষণীয় সমাপিকা ক্রিয়া 'ঢোকালাম' শব্দটি এসেছে 'ঢুকালাম' থেকে। অর্থাৎ শব্দের আদিতে 'উ'-কার পরিণত হয়েছে 'ও'-কারে। স্বরের এরকম পরিবর্তন লোকভাষার পরিচয় বহন করে।

ইচ্ছে।। তুহুঁর পূজার ফুল কুড়াতে গেলমরে গৌরী... হুই সুদূর পাহাড়ে...[২০]

ইচ্ছে।। হুঁ, হুঁ, মধুবাসে অজগর হাঁকুপাঁকু।[২১]

ইচ্ছে।। হুঁ হুঁ, গোঁসাই আর গোঁসাই নাই গো।[২২]

এখানে প্রথম সংলাপে ব্যবহৃত 'তোর' সর্বনাম পদটি হয়েছে 'তুহুঁ' এবং দূরত্ববাচক নির্দেশক সর্বনাম 'ওই' ব্যবহৃত হয়েছে 'হুই' হিসেবে। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংলাপে চরিত্রের মুখে একাধিকবার 'হুঁ', 'হুঁ' শব্দের প্রাধান্য দেখা গেছে। সেইসঙ্গে স্বতোনাসিক্য ধ্বনির বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। তবে নাটকে একটি চরিত্রের মুখে শুধু এই ধরনের শব্দ ব্যবহার হয়নি, বন্যচারী বিভিন্ন চরিত্রের মুখে এই ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যা তাদের মূদ্রাদোষও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ বনপাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী চরিত্রগুলির সংলাপে একটি কৌম-জনগোষ্ঠীর ভাষা স্পষ্ট হয়েছে।

রঙ্গলাল।। কখন হাতাবো! ও হরি, চোরের ওপর বাটপাড়ি![২৩]

'চোরের ওপর বাটপাড়ি' প্রবাদের অর্থ এক চোরের চোরাই মাল আরেকজন চুরি করলে তাকে বাটপাড় বলে। এই ধরনের প্রবাদের ব্যবহার ঘটিয়ে নাট্যকার চোর সম্পর্কিত ধারনাকে দৃঢ় করেছেন। এছাড়া 'ঐছন', 'কৈছন', 'ধুত্তেরি', 'কন্‌টক', 'হাঁকুপাঁকু' 'নিকুচি' এরকম অজস্র প্রচলিত, অপ্রচলিত, দেশজ শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে নাট্যকার নাটককে অমৃত রসাস্বাদনে ভরপুর করে তুলেছেন।

'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে সংলাপের প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লক্ষ করা যায় নাট্যকার পরিবেশ ও চরিত্রের বিশিষ্টতা বজায় রাখতে ভাষা-উপভাষা তথা জনগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করেছেন। সহজ, সরল কথ্যভাষার প্রয়োগে নাটক যেমন হয়েছে অনন্য তেমনি চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে বাস্তব ও প্রাণবন্ত। এই নাটকের ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে দীপঙ্কর মল্লিক বলেছেন—

> "'দেবী সর্পমস্তা' নাটকে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন মনোজ মিত্র, সেই ভাষার মধ্যে অমৃত বর্ষণ করেছেন। ভাষার মধ্যে কোনো কাঠিন্য নেই। কিন্তু ভাষার মধ্যে এমন গভীরতা রয়েছে যে, সেই ভাষা হয়ে উঠেছে বহুত্ববোধক।"[২৪]

তথ্যসূত্র:

১। মিত্র মনোজ (২০১২): দেবীসর্পমস্তা, তিনপূর্ণাঙ্গ নাটকসংকলন, কলাভৃত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১২৬
২। তদেব: পৃ. ১০৪
৩। তদেব: পৃ. ১১৬
৪। তদেব: পৃ. ১১০
৫। তদেব: পৃ. ১৩১
৬। তদেব: পৃ. ১১৫
৭। তদেব: পৃ. ১৪৫
৮। তদেব: পৃ. ১৩২
৯। তদেব: পৃ. ১৩৩
১০। তদেব: পৃ. ১৩৫
১১। তদেব: পৃ. ১০৭
১২। তদেব: পৃ. ১২০
১৩। তদেব: পৃ. ৯৯
১৪। তদেব: পৃ. ১৫১
১৫। তদেব: পৃ. ৯৮
১৬। তদেব: পৃ. ৯৯
১৭। তদেব: পৃ. ১০৩
১৮। তদেব: পৃ. ১০৬
১৯। তদেব: পৃ. ১১১
২০। তদেব: পৃ. ১২১
২১।তদেব: পৃ. ১০৩
২২। তদেব: পৃ. ১২১
২৩। তদেব: পৃ. ১২২
২৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ (২০২২): মনোজ মিত্র নানাবর্ণে, নানারঙে, (সম্পা.) দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ১৫৮

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

অনিল ঘড়াই-এর ‘নুনবাড়ি’ আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে প্রান্তিক নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম

আব্দুল সামাদ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংরূপ উপন্যাস। এই সংরূপের এক ব্যতিক্রমী শিল্পী অনিল ঘড়াই। তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে উচ্চাভিলাষের আভাস মলিন। কেননা তাঁর শিল্প ঘোর বাস্তবের। যে সমস্ত মানুষকে তথাকথিত সভ্য ও ভদ্র সমাজ অস্পৃশ্য-অতুচ্চ রূপে সমাজ-সভ্যতার বাইরে পর্যবসিত করে রেখেছে, যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত, যারা সমাজ ও মানুষের কাছে নিম্নবর্গীয়শ্রেণি রূপে পরিচিত, ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই সেই সমস্ত মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। ‘নুনবাড়ি’ তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এই উপন্যাসে স্বামী-শ্বশুর গৃহে নির্যাতিত এক প্রান্তিক নারীর জীবন, যৌবন ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে। সেই চিত্রণে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজব্যবস্থার বৈষম্যমূলকনীতি ও ধনতান্ত্রিক-অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার অভিঘাত। যার প্রভাবে প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন, যৌবন ও সংসার অস্তিত্বহীন।

সূচকশব্দ

মার্কেন্টাইল আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, শ্রেণিবৈষম্য, স্বেচ্ছাচার, যৌতুক, নির্যাতন, আত্মমর্যাদা, অস্তিত্বরক্ষা।

মূল প্রবন্ধ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংরূপ উপন্যাস। মহাকাব্যের মতোই এর ব্যপ্তি। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন বাস্তবতা এই সংরূপে এমন ভাবে দ্যোতিত হয় যা ঐতিহাসিক জীবনবাস্তবতার প্রামাণ্য দলিল রূপে যুগ-যুগান্তরের মানুষের কাছে সমাদৃত-আলোচিত। সমাজ ও জীবনে ঘটে চলা প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি ঔপন্যাসিকগণ নিজ অভিজ্ঞতায় স্নাত করে উপন্যাসে চিত্রিত করেন। মানুষের জীবন ও সমাজে প্রতিনিয়ত অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু কোনো কোনো ঘটনার অভিঘাতে সমাজ ও জীবনে বৃহত্তর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তবে ঘটনা সামান্য বা বিশেষ উভয়ই হতে পারে। কখনো কখনো সামান্য ঘটনার দ্বারা বিধৃত উপন্যাস মানুষ ও সমাজের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সচরাচর মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরের কোনো ঘটনা কিংবা যে সব বিষয় নিয়ে মানুষ কোনদিন ভাবনার প্রকোষ্ঠ উন্মোচন করেনি— তা অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হয়ে সমাজ ও জীবনে যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করে তেমনি মানুষের সমাজ ও জীবনকে বদলে দেয়। আর ঔপন্যাসিকগণ তাদের জীবনাভিজ্ঞতার গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উপন্যাস সৃষ্টি করেন। আর সেই সৃষ্টি মহাকাব্য ও ইতিহাসের মতো জীবন্তসত্তায় মানুষ ও সমাজের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বিরাজিত থাকে। মানুষ ও সমাজকে ন্যায়, নৈতিকতা ও সৎ পথের সন্ধান দেয়। এক কথায় জীবনদর্শনের সামগ্রিক রূপ উপন্যাসে দ্যোতিত হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই। বাস্তববাদী, মানবদরদী তরুণ শিল্পী। সুতীক্ষ্ণ তাঁর শিল্পদৃষ্টি। তাঁর শিল্পদৃষ্টিতে উচ্চাভিলাষের আভাস মলিন। কেননা তাঁর শিল্প ঘোর বাস্তবের। বাস্তবের কঠোর-কঠিন উপাদান দিয়ে তিনি প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর শিল্প গভীর জীবনজিজ্ঞাসার শামিল। যে সমস্ত মানুষকে তথাকথিত সভ্য ও ভদ্র সমাজ অস্পৃশ্য-অতুচ্চ রূপে সমাজ ও সভ্যতা থেকে একেবারে প্রান্তে পর্যবসিত করে রেখেছে; আবার যে সমস্ত মানুষের জীবন জীবিকা ও সংসার নিয়ে দেশ-সমাজের সভ্য ভদ্র চিন্তাশীল মানুষের ভাবনার প্রকোষ্ঠ উন্মোচিত হয় না— ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই সেই সমস্ত মানুষের জীবনালেখ্য রচনা

করেছেন। বিশেষ করে নিম্নবর্গীয় এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী মানুষের জীবন ও সংসার ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর সেই প্রত্যক্ষের ফলস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন একাধিক উপন্যাস এবং সেই উপন্যাসগুলি প্রচলিত আর্থসমাজিক ব্যবস্থার প্রতি একই সঙ্গে ধিক্কার ও প্রতিবাদের দলিল।

'নুনবাড়ি'(১৩৯৬) ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই-এর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমাজ ও অর্থনৈতিক জটিলাবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন। সেই চিত্রিণে প্রতিফলিত হয়েছে আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীপ্রত্যাখ্যাত এক অসহায়-নিরুপায় প্রান্তিক নারীর জীবন, যৌবন ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। মানুষ সুষ্ঠভাবে জীবন-যাপন করার জন্য সমাজবদ্ধ হয়। তাই প্রত্যেক সমাজে কিছু নিয়ম-অনুশাসন গড়ে ওঠে। নিয়ম-অনুশাসন মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের সমাজে নিয়ম-অনুশাসনের একচক্ষু দৃষ্টি লক্ষ করা যায়। যারা ক্ষমতাশালী-বলশালী কিংবা ধন-মান-বিত্তের দিক থেকে সমাজের প্রথম শ্রেণির অধিবাসী তাদের হাতেই থাকে সামাজিক অনুশাসনের নিয়ন্ত্রণ রশি। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয়। ফলে সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে দ্বিচারিতা লক্ষ করা যায়। আবার যেদিন থেকে অর্থ-সম্পদ সমাজ নিয়ন্ত্রা কর্তার আসন গ্রহণ করেছে সেদিন থেকে মানুষ ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ধনতন্ত্র মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে। মানুষের ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবণতা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে—অর্থহীন সম্পদহীন মানুষ সমাজে একপ্রকার অস্তিত্বহীন। বলা যায় ধনতন্ত্রের মহাসমুদ্রে প্রান্তিক নিম্নবর্গীয়মানুষ একপ্রকার তৃণমাত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈষম্যমূলক নীতির ফলে প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন, যৌবন ও সংসার বালির বাঁধের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ও অস্তিত্বহীন।

উপন্যাস কাহিনির অভ্যন্তরে দেখা যায়— লবঙ্গর বিবাহের সময় একটি বাইক যৌতুক হিসাবে ধার্য করা হয়। কিন্তু বিয়ের পর সাত বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও লবঙ্গর পিতা জামাই কালাচাঁদকে প্রতিশ্রুতির বাইক কিনে দিতে পারেনি। ফলে স্বামী-শাশুড়ি-ননদ সকলে সম্মিলিত হয়ে লবঙ্গর উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। উঠতে-বসতে লবঙ্গকে অপমানিত হতে হয়। তাছাড়া স্বামীর কাছে লবঙ্গ এক প্রকার ভোগের

সামগ্রী। আবার কালাচাঁদের দেহ ভোগের পক্রিয়াও অমানবিক। স্ত্রী হিসেবে লবঙ্গর প্রতি তার কোন মায়া-মমতা নেই; তাই সে লবঙ্গকে বিদায় করে গঞ্জের রূপসীকে ঘরে তুলতে চায়। তাই সে বলেছে—

> "ও মাগি যাবে না মা, ও আমার হাড়-মাস চুষে খাবে; বউ নয়—ডাইনি। ওর গা দিয়ে খালি নোনাজলের গন্ধ। গা-টা কি নুন-তিতা, আঁশটে! ওর ছিমুতে দাঁড়ালেও পাপ। ওরে তুই বিদেয় কর মা— তোর দুটো পায়ে পড়ি।"[১]

স্বামীর কাছে যে নারী অবহেলিত-লাঞ্ছিত সে পৃথিবীর সর্বত্র অপমানিত-লাঞ্ছিত। তাই লবঙ্গর শাশুড়ি এবং ননদও তার প্রতি দয়াহীন। তাঁরাও চায় লবঙ্গ তাদের সংসার থেকে বিদায় গ্রহণ করুক। এমনকি কালাচাঁদের মায়ের কাছেও লবঙ্গ অপয়া-অলক্ষ্মী। তাই ছেলের অত্যাচারকে প্রতিহত না করে তিনি নিজেও নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করেছেন। ছেলেকে নির্যাতনে প্রোৎসাহিত করে তিনি বলেছেন—

> "অমন অপয়া বউ আমি জন্মেও দেখিনি। যেদিন থেকে এ ঘরে পা দিল সেদিন থেকেই অশান্তি। তোর ব্যবসা গেল, জমি-জমা গেল, মাঝখান থেকে খেটে খুটে বুকে কালরোগ বাঁধিয়ে বসলি। ওরে তুই খেদা কেলো।...ওরে শেষ করে দে—না হলে নোনাখালের ওধারে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে রেখে আয়। ওর কালোমুখ যেন আমায় আর দেখতে না হয়। সর্বনাশী, নোনাখালের ঝিউড়ি আমার সব খেল। এবার তোরে খেয়ে শাঁখা ভেঙে পালাবে।"[২]

একজন গৃহবধূ যখন স্বামী-শ্বশুর গৃহে সকলের চক্ষুশূলে পরিণত হয় তখন তার পক্ষে স্বামীগৃহে টিঁকে থাকা দায় হয়ে ওঠে। তাই একদিকে স্বামী-শ্বশুর গৃহের অত্যাচার-নির্যাতন অন্যদিকে নিজের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা— এই দুয়ের দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ হয়ে লবঙ্গ শেষপর্যন্ত স্বামীগৃহ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পুত্র নোনাইকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী-সংসার পিছনে ফেলে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

আসলে লবঙ্গ সামাজিক কুপ্রথার শিকার। যৌতুক ব্যবস্থার যাঁতাকলে লবঙ্গর জীবন ও সংসার পিষ্ঠ। আমাদের সমাজ যৌতুক ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। কিন্তু যৌতুক ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে সমাজ ওয়াকিবহাল নয়। ফলে এই কুপ্রথার যূপকাষ্ঠে হাজার হাজার জীবন ও সংসার অকালে ঝরে পড়েছে। স্বামীগৃহে লবঙ্গর উপর

নির্যাতনের মূল কারণই হল যৌতুক। তবে সাত বছর ধরে লবঙ্গ নির্যাতন সহ্য করেছে শুধুমাত্র পিতার অসহায়তা ও দারিদ্র্যের কথা ভেবে। কিন্তু সমাজ লবঙ্গর পিতার অসহায়তা ও দারিদ্রের ভার গ্রহণ করেনি। সমাজ শুধু প্রথা সংস্কার ও নিয়ম-অনুশাসন প্রচলনে সিদ্ধহস্ত। ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে প্রথা, সংস্কার ও নিয়ম-অনুশাসন বৃদ্ধি পায়। আর সেই প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে যারা অভিযোজিত হতে পারে তাঁরা সমাজ মধ্যে টিঁকে থাকে, আর যারা পারে না তাঁরা সমাজ, জীবন ও সংসার থেকে অচিরে বিলীন হয়ে যায় কিংবা আত্মবিসর্জনের পথ বেছে নেয়। সেই অর্থে লবঙ্গর স্বামী-সংসার ত্যাগও একপ্রকার আত্মবিসর্জনের শামিল।

লবঙ্গ স্বামী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। পিতা জটায়ু পঙ্গু, বৃদ্ধ—বয়সের ভারে মুহ্যমান। আবার দরিদ্র্য ও অসহায়। ফলে তার পক্ষে পুনরায় কন্যার দায়ভার গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব। তাই কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে বলে। কিন্তু লবঙ্গ স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। কেননা সেখানে লবঙ্গর আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান অস্তমিত। সেখানে মানুষের থেকে যৌতুকের মূল্য বেশি। তাই যেখানে আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান ধূলুণ্ঠিত সে স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে লবঙ্গ আর স্বামীগৃহে ফিরতে চায় না। ফলে শুরু হয় লবঙ্গর জীবন সংগ্রাম। অসহায় প্রান্তিক নারী লবঙ্গর এই সংগ্রাম দ্বি-মুখী—একদিকে জীবন, যৌবন ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ অন্যদিকে সামাজিক ও মানবিক অধিকার অর্জনের অভীপ্সা।

মানুষের জীবন, যৌবন ও অস্তিত্ব রক্ষার মূলচাবিকাঠি অর্থ। ধনতন্ত্রের যুগে অর্থ ব্যতিত জীবন-সংসারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। শুধু অর্থের জন্যই সারা পৃথিবীব্যাপী মানুষের নানা আয়োজন, পরিকল্পনা ও কার্যকলাপ লক্ষ করা যায়। বর্তমান সভ্যতার মানুষ ও সমাজ অর্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একদা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মার্কেন্টাইলবাদ নামক একপ্রকার সংরক্ষণবাদী অর্থনৈতিক ভাবধারার প্রচলন হয়েছিল—যার ফলে দেশের জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। অর্থনীতির মার্কেন্টাইল ভাবধারা

আজও মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল আছে। ফলে মানুষের মধ্যে তীব্রাকারে সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণের স্পৃহা লক্ষ করা যায়। এর ফলেই মানুষ ও সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। ধনতন্ত্রের যুগে যে কেউ প্রভূত সম্পদের অধিকারী হতে পারে, আবার কেউ কায়ক্লেশে দুবেলার অন্নের সংস্থান করতে গিয়ে মুমূর্ষু হয়ে উঠে। বর্তমান সভ্যতার চালিকাশক্তি অর্থ-সম্পদ। তাই অর্থ-সম্পদ হল একপ্রকার নুন। নুন বা লবণ ব্যতিত খাদ্য-খাবার যেমন স্বাদহীন-পান্‌সে তেমনি অর্থ ব্যতিত মানুষের জীবন ও সংসার অচল ও পঙ্গু। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "...নুন সবারই দরকার, নুন না থকলে জগৎ সংসার পান্‌সে।"[৩]

অর্থাৎ অর্থ ব্যতিত জীবন, যৌবন ও সংসারের অস্তিত্ব অলীক কল্পনা।

তাই পিতৃগৃহে লবঙ্গকে সর্বপ্রথম অর্থ সংস্থানের জন্য ভাবতে হয়। কেননা পিতা জটায়ুর পক্ষে মেয়েকে নিয়ে নতুন করে সংসার চালানো দুস্কর। আমরা জানি দরিদ্র পরিবারে কন্যাসন্তান একপ্রকার পাথর বোঝার ন্যায়। তাই দরিদ্র পিতা-মাতা যে কোনো প্রকারে কন্যার বিবাহ দান করে সেই ভার লাঘব করতে চায়। কিন্তু কন্যা যদি স্বামীগৃহ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুনরায় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে পিতৃ পরিবারের ভার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবার সমাজও স্বামীপ্রত্যাখ্যাত নারীকে ভালো চোখে দেখে না। তাই অসহায় পিতা কাতর সুরে বলেছে—

> "স্বামী খেদান মেয়েমানসের এ সমাজে কোনো দাম নেই বিটি, সবাই তারে কুনজরে দেখে। কেউ তার মনের দুঃখটা বুঝতে চায় না।"[৪]

কিন্তু লবঙ্গ পিতৃগৃহে পিতার গলগ্রহ হতে চায়নি। সে নিজের ভার নিজে বহন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। সে পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করতে চায়। তাই লবঙ্গ প্রথমদিকে মাঠে মাঠে গোবর কুড়িয়ে ঘষি দিল, মুড়ি ভাজল, চিঁড়ে কুটল। কিন্তু এই সমস্ত কাজ-কারবারে অভিজ্ঞাতা না থাকার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু লবঙ্গ তাতে হাল ছাড়েনি। আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথাউঁচু করে বাঁচার জন্য লবঙ্গ অবশেষে নুনবাড়ি তৈরি করে নুনের কারবার-ব্যবসা শুরু করে। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "সে কোনোমতেই বাপের গলার ফাঁস হয়ে ঝুলবে না। নিজের মুখের দানা নিজেই জুটিয়ে নেবে সততায় আর কঠোর পরিশ্রমে, ঘাম ঝরিয়ে।"[৫]

কর্মই হলো জগৎ ও জীবনে বেঁচে-বর্তে থাকার একমাত্র পথ ও পাথেয়। পৃথিবীর সমস্ত কর্মই পবিত্র। কেননা কর্মের মাধ্যমে মানুষের সমস্ত রকম ক্ষুধা প্রশমিত হয়। তাই কর্মকে অবলম্বন করে লবঙ্গ জীবন পথে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু লবঙ্গর এই প্রয়াসকে রুদ্ধ করতে চায় আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা। কেননা লবঙ্গ নারী, আবার স্বামীপ্রত্যাখ্যাত। তাই সমাজের চক্ষুতে সে একপ্রকার জঞ্জাল-আবর্জনার স্তূপমাত্র। সমাজ নারীকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে কেবল পাকশালার অভ্যন্তরে। পাকশালার বাইরের কর্মজগতে তাদের অধিকার খুবই সামান্য । আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা নারীর অধিকার প্রদানে সহায় নয়—বরং অধিকার হরণে পারদর্শী। তাই অবলম্বনহীন নারী অর্থাৎ বিধবা, বৃদ্ধা, অবিবাহিতা, স্বামীপ্রত্যাখ্যাত নারী—এরা সমাজের চক্ষুতে অবাঞ্ছিত বস্তুমাত্র। তাই তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবহারে সমাজ ও মানুষ কুণ্ঠিত নয়। আবার যে সমস্ত নারী নিজে উপার্জন করে জীবন নির্বাহ করে তাদের প্রতিও সমাজ সদয় নয়। সমাজের চোখে তাঁরাও ঘৃণিত-লাঞ্ছিত। শুধু তাই নয় কর্মক্ষেত্রেও নারী নানা রকম অসাম্য বৈষম্য ও অসহযোগিতার শিকার। পারিশ্রমিকের অসাম্য ব্যতিত নানাভাবে তাদের উত্ত্যক্ত করা হয়। এমনকি কর্মক্ষেত্রে নারী যৌননিগ্রহের শিকারও হয়।

আসলে স্বামীপ্রত্যাখ্যাত নারী সমাজের চোখে যেমন অবহেলা-অবজ্ঞার পাত্র তেমনি অবলম্বনহীন কর্মমুখী নারীও অশুচি-অশৌচ মানুষ। তাদের নামে নানারকম কুৎসা-রটনা প্রচার করা হয়। মানুষ তাদের কাছে নানা রকম কুপ্রস্তাব ও কুইঙ্গিত নিয়ে হাজির হয়। লবঙ্গ স্বামীপ্রত্যাখ্যাত নারী, আবার বাজার-হাটে কারবার করে তাই সে সমাজ ও মানুষের কাছে অপরাধিনী। সে অশৌচের হাঁড়ি। তাই উপন্যাসে বলা হয়েছে—

> "সে হল অশৌচ হাঁড়ি! অশৌচ হাঁড়ি কখনো নতুন হাঁড়ির মর্যাদা পায় না। অশৌচ হাঁড়ি-ধরা জলে মশা মাছি ব্যাঙাচির জন্ম হয়। সে হাঁড়িতে আগের মতো ভাত ফোটে না, আর ফুটলেও তা আর দেবতার পায়ে উৎসর্গীত হয় না।"[৬]

তাই ছোকরা গ্রামপ্রধান এবং নিতাই সাঁতরার মতো পাশবিক মানুষরা নানারকম

অছিলায় অশৌচ হাঁড়ির কাছে ঘোরাফেরা করে। টাকা ও কাজের প্রলোভন দেখিয়ে সেই অশৌচ হাঁড়িতে অবগাহন করতে চায়। আর এটাই হল একজন অসহায় নারীর প্রতি অর্থ ও ক্ষমতা কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার আসল ব্যবহার। এটাই কি সমাজের সামাজিকতা? এটাই কি মানুষের মানবিকতা?—এর উত্তর প্রদানে সমাজ ও মানুষ অসমর্থ। ফলে একদিকে মেয়ের নামে কুৎসা-কলঙ্ক-রটনা, অন্যদিকে অভাব-অনটন-দারিদ্র্য—এ দুয়ের সমন্বয়ে লবঙ্গর পিতা ক্ষতবিক্ষত। ফলে মেয়ে তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠে। তাই উপন্যাসে বলা হয়েছে—

> "দুরারোগ্য ঘায়ের মতো মেয়েটাকে সে আর সহ্য করতে পারছে না।"[৭]

তাই মেয়েকে নোনাখালের জলে বিসর্জন দিতে গিয়ে নিজেই পড়ে যায় জোয়ারের জলে। অর্থাৎ নিষ্ঠুর সমাজ ও অর্থনীতি ব্যবস্থার জন্য পিতা ও কন্যা উভয়ে নিরুপায় ও অসহায়।

সমাজের অলিখিত আইনসংহিতা বড়োই নিষ্ঠুর ও নির্মম প্রকৃতির। তার একচক্ষু দৃষ্টির জন্য কেউ জীবন-যৌবন নিয়ে ভোগ-বিলাস করে; আবার কারোর জীবন-যৌবন তেলহীন প্রদীপের মতো ধিক ধিক করে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু যৌবন জীবনের বসন্ত, তা আবার নুনমাটির ন্যায়। জীবনের বসন্ত বিদায় গ্রহণ করলে দেহ-মনের সতেজতা যেমন শুস্ক হয়ে যায় তেমনি নুনমাটির নুন বিদায় নিলে পড়ে থাকে মাটি—যা দিয়ে প্রতিমা তৈরী হয় কিন্তু কোনো জৌলুস থাকে না। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "যৌবন হল নুনমাটির মতো। প্রেমের বারিবর্ষণে মাটি থেকে নুন চলে যায়। পড়ে থাকে মাটি। কাদা ভুসভুসে খোলামকুচি মেশান মাটি। যা দিয়ে প্রতিমা হয়, মূর্তি হয়—শিল্প হয়। কিন্তু তাতে প্রাণ থাকে না।"[৮]

একথা অনস্বীকার্য যে নারী-পুরুষ উভয়ের যৌবনদশা উপস্থিত হয়। পুরুষের মতো নারীরও শারীরিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনার স্পৃহা থাকে। কিন্তু পুরুষ শারীরিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানোর জন্য যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করে নারী তা কখনই পারে না। কেননা এই সমাজ নারীকে শাঁখা-সিঁদুর, নোয়া-পলা দিয়ে সারাজীবন বেঁধে রেখেছে ঢেউহীন পুকুরের জলের মতো। পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারে কিংবা একাধিক

নারীর সহচর সান্নিধ্য লাভ করলেও সমাজের চোখে তা অপরাধ বলে গণ্য হয় না। কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ স্বেচ্ছাচারের অধিকারী। তাই তাঁরা স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচার করে। সেজন্য স্ত্রী বর্তমান সত্ত্বেও কালাচাঁদ অন্য নারীর দ্বারগ্রহণ করে তাকে গৃহে নিয়ে আসে; নিতাই সাঁতরা বিধবা অবলাকে রক্ষিতা হিসেবে গৃহে রাখে; ছোকরা গ্রামপ্রধান নারী দেখলে নানা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু নারী এ সমস্ত হীন বিষয়ে অপারক। তাঁরা আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা ও আত্মমূল্যবোধের তাড়নায় পুরুষের মতো অতি সহজে স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচারে লিপ্ত হতে পারে না। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই স্বৈরাচারের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "পুরুষের দ্বিতীয় নারী তৃতীয় নারী এমনকি একাধিক নারী যখন কোনো নিন্দার নয়, তখন মেয়ে হয়ে দ্বিতীয় স্পর্শ, অন্য জীবন চাওয়াটা কি ভুল?...সমাজে পুরুষের পদস্খলন, স্বৈরাচার, অসংযম, স্বেচ্ছাচার, বিধ্বংসী জীবনযাপন যদি নির্বিবাদে সকলে মেনে নেয় তাহলে একটা অসহায় আত্মসমস্যা জর্জরিত মেয়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?...অধিকারের মাপকাঠি এক হওয়া আজ খুবই প্রয়োজন; নাহলে বৈষম্যের বিষে নীল হয়ে যাবে গাছের সবুজ পাতা, বাতাস হারিয়ে ফেলবে তার প্রাণদায়ী ক্ষমতা। পৃথিবীর জল-হাওয়া সব নষ্ট হয়ে যাবে।"[৯]

লবঙ্গ অসামাজিক কোনো নারী নয়। সে ন্যায়-নৈতিকতা ও সৎ পথে জীবন পরিচালনায় অভ্যস্ত। অন্নের অভাব তাকে স্বৈরিণীতে রূপান্তর করতে পারেনি। বরং আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানের সঙ্গে নির্যাতন, অভাব, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। লবঙ্গর সামাজিক মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রখর। তাই কণ্ঠিরামের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পূর্বে বারবার বাবার কথা, পুত্র ও স্বামীর কথা, নুনবাড়ির কথা, সমাজ ও মানুষের কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু যখন সমাজ ও মানুষের কথা চিন্তা করেছে তখন তার দেহ-মনে একপ্রকার ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার জন্ম হয়েছে। কেননা তার জীবনের সমস্ত পরিণতির জন্য একমাত্র সমাজ ও মানুষই দায়ী। সমাজ সৃষ্ট যৌতুক ব্যবস্থার জন্য সে স্বামীগৃহে নির্যাতিত এবং স্বামী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত; সমাজব্যবস্থার জন্যই সে পুত্রহারা; আবার সমাজব্যবস্থার জন্যই সে জীবন ও যৌবনের জৌলুসহারা। নির্মম

একচক্ষু সমাজব্যবস্থার জন্যই লবঙ্গর জীবনে এত উত্থান-পতন, দুঃখ-যন্ত্রণা, অভাব-দারিদ্র্য, কষ্টভোগ।

তাই সমস্ত রকম যন্ত্রণা ভোগের পর লবঙ্গ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার জন্য তার এই পরিণতি তার বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়িয়েছে। আর সেই সংগ্রামে কণ্ঠিরামকে পাশে নিয়ে ঘুণ ধরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ করেছে। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "সে নোনাইয়ের মা, কালাচাঁদের স্ত্রী। তারা তাকে যে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে এখন সেই ঠুনকো মর্যাদার কোনো মূল্য নেই তার কাছে। জোয়ারের সময় কাগজের নৌকার মতো অর্থহীন এইসব সামাজিক মূল্যবোধ। যে সমাজ একটা খোঁটা উপড়ান মেয়েকে বিপদে রক্ষা করতে পারে না, সেই অবক্ষয়ী গলিত কুটিল ভ্রষ্ট সমাজকে সে মানে না। নারী যে এই হীন সমাজে অন্যের উপভোগের দ্রব্য নয়, নারীর যে স্বাধীনভাবে চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকতে পারে এটা সে সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়।"[১০]

লবঙ্গ জীবন ও যৌবনের কাছে হার না মান ব্যক্তিত্বময়ী নারী। তার ব্যক্তিত্ববোধের কাছে হার মেনেছে অর্থ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। সে কণ্ঠিরামকে ভালোবাসলেও তার কাছে পুরোপুরি আত্মনিবেদন করেনি। কেননা লবঙ্গ কণ্ঠিরামকে পেতে চায় সামাজিকসত্তা দিয়ে, স্বাধীনতা দিয়ে, মানবিকতা ও মূল্যবোধের সমাহারে। তাই কণ্ঠিরামের সংসর্গে প্রবেশের পূর্বে লবঙ্গ তাকে সতর্ক করে বলেছে—

> "...আমি অবলা না কণ্ঠিদা, তুমি যদি ভেবে থাক আমি অবলা তাহলে খুব ভুল হবে।"[১১]

তবে লবঙ্গ শেষপর্যন্ত কণ্ঠিরামের সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে পারেনি। জীবন ও যৌবনের তাড়নায় কণ্ঠিরামকে আঁকড়ে ধরেছে। আর এটাই স্বাভাবিক। অবলম্বনহীন জীবন কোনো জীবন নয়—বাঁচার জন্য অবলম্বন চায়। লোকনিন্দা, অপবাদ, সামাজিকতা, মূল্যবোধ—এ সব ভাবনায় নিজেকে নিঃশেষ না করে অপবাদ-কলঙ্ক-কালিমা মাথায় নিয়ে জীবন, যৌবন ও অস্তিত্ব রক্ষা শ্রেয়। আর সেই কাজটাই লবঙ্গ-কণ্ঠিরামকে সঙ্গে নিয়ে করেছে।

তাই দেখা যায় লবঙ্গ একজন অসহায়, স্বামীপ্রাত্যাখ্যাত, প্রান্তিক নারী হয়েও কেবল নুনবাড়িকে অবলম্বন করে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই-সগ্রাম করেছে। কেবল নুনবাড়িকে অবলম্বন করে সমাজের যাবতীয় কুৎসা-কলঙ্ক গায়ে মেখেছে; ছোকরা গ্রামপ্রধান ও নিতাই সাঁতরার নেকড়ে চাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে; আবার পঙ্গু-বৃদ্ধ পিতার দায়ভার গ্রহণ করেছে। পুত্র নোনাইকে একপ্রকার চুরি করে স্বামী কালাচাঁদ যে আঘাত দিয়েছিল তার নিস্তারও সম্ভব হয়েছে নুনবাড়িকে আশ্রয় করে। আবার সেই নুনবাড়িই লবঙ্গর জীবনে নতুন করে কণ্ঠিরামকে বহন করে এনেছে। অর্থাৎ নুনবাড়িই হল লবঙ্গর জীবন, যৌবন ও বাঁচার একমাত্র অভিলাষ। আমাদের মনে হয় নিরাশা-হতাশা-অসহায়তার দীর্ঘশ্বাস অপেক্ষা কলঙ্কের অবলম্বন বীরত্বের। আর সেই কলঙ্কের অবলম্বন গ্রহণ করে লবঙ্গ একই সঙ্গে একচক্ষু সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি এবং মানুষের মানবিকতার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাতে পেরেছে; আবার নিজের জীবন যৌবন ও অস্তিত্ব রক্ষাও করতে পেরেছে। ফলে কণ্ঠিরাম লবঙ্গর জীবনে কলঙ্কিত অধ্যায় হলেও সে অধ্যায়ে বীরত্ব আছে, সাহস ও সংগ্রাম আছে।

তথ্যসূত্র :

০১. অনিল ঘড়াই, 'নুনবাড়ি', প্রথম দে'জ সং.,এপ্রিল ২০১৬, কলকাতা, দে'জ, পৃষ্ঠা-১৩
০২. ঐ, পৃষ্ঠা-১৩
০৩. ঐ, পৃষ্ঠা-৩০
০৪. ঐ, পৃষ্ঠা-২৩
০৫. ঐ, পৃষ্ঠা-২২
০৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৭
০৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬
০৮. ঐ, পৃষ্ঠা-৪৮
০৯. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৭-২৮
১০. ঐ, পৃষ্ঠা-১২০
১১. ঐ, পৃষ্ঠা-১২৫

গ্রন্থপঞ্জি :

০১. ঘড়াই, অনিল; নুনবাড়ি, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১৬
০২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীকুমার; বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা: মর্ডানবুকএজেন্সি, ১৩৪৫
০৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার; বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬১
০৪. ভট্টাচার্য্য, দেবীপদ; উপন্যাসের কথা, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মে ১৯৬১
০৫. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮০

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

‘দিনান্তের আগুন’: দেশত্যাগের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি

ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

পরাধীনতার শৃঙখল, বন্ধন থেকে স্বাধীনতা, মুক্তির স্বাদ পরাধীন দেশবাসী বা জাতির কাছে পরম আকাঙ্ক্ষার। তবে স্বাধীনতা যখন দেশত্যাগের কারণ হয়ে পড়ে তখন তা অধিক যন্ত্রণার। উদ্বাস্তু, অনিশ্চিত জীবন কতটা ভয়ঙ্কর তা দেশহারা, দেশত্যাগী মানুষ ভালো করে জানে। কারণ দেশ হারালেও সে বীভৎস স্মৃতি কখনো হারায়নি। দেশত্যাগ, দেশ হারানোর সেই যন্ত্রণা, ভয়াবহতা, উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা ফুটে উঠেছে শশীভূষণ দাশগুপ্তের ‘দিনান্তের আগুন’ নাটকে। দেশভাগের পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার আগুন যেভাবে বাংলাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারই প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে নাটকটিতে।

সূচক শব্দ

পরাধীনতা, শোষণ, সংগ্রাম, স্বাধীনতা, দেশভাগ, দেশত্যাগ, সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষরণ, উদ্বাস্তু, অনিশ্চিতজীবন, সৌভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি।

মূলপ্রবন্ধ

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?”[১]

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একথা স্মরণে রেখে বলতে পারি পরাধীনতার শৃঙ্খল যেখানে মৃত্যু যন্ত্রণার সমতুল্য সেখানে স্বাধীনতা যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে পরম কাঙ্ক্ষিত। কোনো ব্যক্তি সমাজ বা রাষ্ট্র পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে শোষিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত হতে চায় না। সকলেই চাই স্বাধীনতা। আর পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে এই স্বাধীনতার জন্য কত দেশে কত রক্তপাত হয়েছে সেকথা আমাদের অজানা নয়। কারণ সকলের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা কোনো স্থানেই সহজলভ্য হয়নি। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যেদিন অস্তমিত হয়েছিল তারপর হৃত সেই স্বাধীনতা অর্জন করতে তথা ইংরেজ শাসকের শাসন, শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করতে প্রায় দীর্ঘ দু’শো বছর ভারতবাসীকে যে ত্যাগ, বলিদান ও সংগ্রাম করতে হয়েছে সেই ইতিহাস আমাদের অজানা নেই। অনেক রক্তক্ষরণ সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্যে দিয়েই ভারতবাসীরা প্রায় দীর্ঘ দু’শো বছরের পরাধীনতার দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা পেয়েছে। ১৫ই আগস্ট দিনটি প্রত্যেক স্বাধীন ভারতবাসীর জীবনের উল্লাসপূর্ণ বহুকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের স্মরণীয় দিন। তবে এখানে একথাও মনে পড়ে যায়, স্বপ্ন পূরণের এই দিন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা হয়ে উঠেছিল। যে স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে প্রত্যেক ভারতবাসী হৃদয়ের অফুরান প্রাণশক্তিতে উদযাপন করতে চেয়েছিল সেই স্বাধীনতায় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে বাস্তহারা উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছিল। বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা যে তাদের জীবনকে গৃহহীন মাতৃভূমি হারা এক অনিশ্চিত অন্ধকার আগামীর দিকে নিক্ষেপ করবে তা তারা কখনোই অনুধাবন করেনি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে শুধু আনন্দের উচ্ছ্বাস এনেছিল তা নয় এনেছিল বাস্তহারা লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশত্যাগের প্লাবন। তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি দেশভাগ ও দেশত্যাগের প্রয়োজনীয়তা বা অনিবার্যতা– এ নিয়ে মতভেদে অনেক আলোচনা-সমালোচনার বিস্তীর্ণ অবকাশ রয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ ৭৫ বছর পরেও তা আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে করা সম্ভব নয়। তবে একথা সত্য রাজনৈতিক দাবার চালে দ্বিখন্ডিত হওয়ার পর ভারতবর্ষের ধর্ম-

ভাষা-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ভারতবাসীর সৌভ্রাতৃত্ববোধ মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। শুধু তাই নয় দেশভাগের মুহূর্তে সাময়িকভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে এক সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার রক্তক্ষরণ ও ইতিহাস আমাদের আজও শিহরিত করে। প্রত্যেক ভারতবাসী তাদের সৌভ্রাতৃত্ব ভুলে গিয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবে উন্মাদ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়েছিল।কারণ রাজনৈতিক টেবিলে বসে হওয়া আকস্মিক দেশভাগ দেশবাসী মেনে নিতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে আবুল কালাম আজাদ তার বিখ্যাত 'ভারত স্বাধীন হল' গ্রন্থে লিখেছেন –

> "ভারত স্বাধীন হল,কিন্তু মুক্তি ও জয়ের স্বাদ পাওয়ার আগেই লোক চোখ খুলে দেখল স্বাধীনতার সঙ্গী হয়ে এসেছে এক মহাদূর্দৈব।... যেমন কংগ্রেস তেমনি মুসলীম লীগ দেশভাগ মেনে নিয়েছে। কংগ্রেস গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং মুসলমানদের মধ্যে লীগের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে; এ থেকে সাধারণ দৃষ্টিতে মনে করা যেতে পারত যে, গোটা দেশ মেনে নিয়েছে এই দেশভাগ। আসল অবস্থা কিন্তু একেবারেই অন্য। দেশভাগের ঠিক আগে পরে আমরা দেখলাম যে, মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা শুধু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির একটি প্রস্তাবে আর মুসলীম লীগের রেজিস্ট্রী খাতায়। ভারতের জনগণ দেশভাগ মেনে নেয়নি।...১৯৪৭- এর ১৪ আগস্ট স্বাধীন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হল; তখনই দেশভাগ সম্পর্কে লোকের মনভাবের সত্যিকারের যাচাই হয়ে গেল। ভারতের জনগণ যদি স্বেচ্ছায় দেশভাগে রাজি হত, তাহলে নিশ্চয়ই পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ আর বাংলার হিন্দু আর শিখেরাও এইসব অঞ্চলের মুসলমানদের মতোই আনন্দে মেতে উঠত। এই সমস্ত প্রদেশ থেকে আমরা যা রিপোর্ট পেলাম তাতে প্রমাণ হয় যে কংগ্রেস দেশভাগ মেনে নেওয়া মানে ভারতীয় জনগণের দেশভাগ মেনে নেওয়া এই দাবী কতটা ফাঁপা।"[২]

ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণ মেনে নিতে পারেনি বলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নময় ইতিহাস স্মরণ করলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলিম ভাইয়ের রক্তমাখা শরীরের

প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উঠে আসে সহস্র নারীর সম্মান-সম্ভ্রমহানির কলঙ্কিত অধ্যায়। যে স্বাধীনতা প্রত্যেক ভারতবাসীর পরম কাঙ্ক্ষিত ছিল সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতায় ভারতবর্ষের একাংশের মানুষদের উদ্বাস্তুতে পরিণত করবে সে প্রত্যাশা হয়তো কেউ কোনদিনই করেনি। দেশহারা, উদ্বাস্তু, নিরাপত্তাহীনতায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার লড়াইয়ে বিধ্বস্ত, সর্বদা সচেষ্ট সহস্র মানুষের দুর্দশাগ্রস্থ জীবন সংগ্রাম ও সামাজিক অবক্ষয়ের ইতিহাস উঠে এসেছে বাংলার একাধিক নাট্যকারের নাটকে। দেশভাগ ও দেশত্যাগের কলঙ্কের দাগ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশের মানুষদের মনে যেমন লেগে আছে তেমনি এক গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়ে। প্রত্যেক বাঙালি জানে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সেই রাত্রি বাঙালিকে যত আনন্দ দিয়েছে তার অধিক দিয়েছে যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার ছবিই উঠে এসেছে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'এই স্বাধীনতা', তুলসী লাহিড়ীর 'বাংলার মাটি', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', 'মশাল', বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর', সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল', শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন' ইত্যাদি নাটকে। এই নাটকগুলি দেশভাগ ও দেশ ত্যাগের অন্ধকার ইতিহাসের বাস্তব দলিল। আমার এই প্রবন্ধে শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন' নাটকের আলোচনা সাপেক্ষে দেশভাগ ও দেশ ত্যাগের আগুন সারা বাংলা জুড়ে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসায় কতটা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তা বিশ্লেষণ করব।

শশীভূষণ দাশগুপ্ত তার 'দিনান্তের আগুন' নাটকটিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দেশত্যাগের ভয়াবহ পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। দেশভাগ ও দেশত্যাগের করুন ইতিহাস পর্যালোচনা করার পূর্বে নাটককার সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯১১ সালের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ বাংলার বরিশালের অন্তর্গত চন্দ্রহার গ্রামে শশীভূষণ দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৪ সালের স্বাধীন ভারতবর্ষে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তার জীবনকালের দিকে তাকালেই দেখতে পাই– তিনি শৈশবে দেখেছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, যৌবনে দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষের দুরাবস্থা এবং খুব কাছ থেকে

দেখেছেন ভারতবাসীর স্বাধীনতা প্রাপ্তির উন্মাদনা এবং বিভক্ত বাংলার মানুষের দেশত্যাগ করে উদ্বাস্ত হওয়ার ভয়াবহ দিনগুলি। নাটককারের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন তাঁর 'দিনান্তের আগুন' নাটকটির মধ্যে দেখতে পাই।

শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'দিনান্তের আগুন' নাটকটি রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেশভাগ ও দেশত্যাগের সংকটময় পটভূমিতে। নাটকের প্রথমেই সেই সংকটময় পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে। আমরা দেখি ছাতিমপুরের জমিদার বিষ্ণুরায়ের ছেলে নন্দলাল রায় গ্রাম ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, আর তার মা হরসুন্দরী স্বামী-শ্বশুরের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছেন না। একদিকে নন্দলালের জন্মভূমি ছেড়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা বা অনিবার্যতা অন্যদিকে হরসুন্দরীর নিজের বাড়ি ছেড়ে না যাবার অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকের মধ্যে উঠে এসেছে। হরসুন্দরীর কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে পূর্ববাংলার সহস্র গৃহবধূর গ্রাম ত্যাগ না করার ইচ্ছা এবং জন্মভূমি ত্যাগ করার আশঙ্কার অন্তর বেদনা। সংসারের প্রতি টান, জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা, সংসারের গণ্ডির বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হরসুন্দরী নন্দলালের গ্রামত্যাগের বিষয়টিকে সমর্থন করতে চায়নি। কিন্তু শিক্ষিত নন্দলাল দেশভাগের ফলে দেশের ও জমিদারির অন্তর্গত প্রজাদের চিন্তাভাবনার আমূল পরিবর্তন অনুধাবন করে দেশত্যাগের সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে গ্রহণ করে প্রস্তুতি নিয়েছে। নন্দলালের দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্তই যে ঠিক এবং সেই পরিস্থিতিতে অনিবার্য তা হরসুন্দরীর সঙ্গে দুর্গার সংলাপেই স্পষ্ট—

> "হর— এই বাকি অনাচ্ছিষ্টি হল! গাছের ফল গাছে রাখতে পারা যাবে না— মানুষ তাহ'লে থাকবে কি ক'রে!
>
> দুর্গা— গাছের ফল বৌঠান? বাঁশ ঝাড়ের বাঁশগুলো সব কেটে নিয়েছে দিনের বেলাই। ভয়েতে কাছে এগোই না, দেখেও দেখি না। সেদিন গোঁসাই ঘরের টিন ক'খানা সন্ধ্যা রাত্তিরেই ছুটিয়ে নিয়েছে; উত্তর ঘরের বারান্দার কাঠের কবাট জোড়া তুলে নিয়ে গেছে। নিত্য নিত্য তোমাদের এসে কত আর বলবো?"[৩]

প্রকৃতপক্ষে যে সৌভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থেকে হিন্দু-মুসলমান এক

সঙ্গে বাংলার মাঠে-ঘাটে, বাজারে, বাড়িতে যাপন করেছে দেশভাগের মুহূর্তেই সেই সৌভ্রাতৃত্ববোধ লুপ্ত হয়ে রক্ত পিপাসু মনোভাব তৈরি হয়েছিল সম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাসে। নন্দলাল সেই সাম্প্রদায়িকতার হিংস্রতা অনুধাবন করেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল এই পরিস্থিতিতে 'শান্তি সমিতির' সক্রিয়তা অর্থহীন। এছাড়া নন্দলাল বুঝতে পেরেছিল হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের অভাব রয়েছে তাই এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ হিন্দু জমিদার যেভাবে নিজের জমিদারি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নন্দলালও তাই করেছে। তবে নন্দলালের পিতা বিষ্ণু রায় জন্মভূমির প্রতি টানের কারণে দেশত্যাগ করতে না চাইলেও গ্রামের পরিস্থিতি মানুষের পরিবর্তন দেখে বিস্মিত, মর্মাহত হয়ে সর্বোপরি সন্তানের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়ে শেষ পর্যন্তদেশ ত্যাগ করতে রাজি হয়েছে-

> "বিষ্ণু— (আস্তে আস্তে) শোননন্দ, ছাতিমপুরের যে এক বিষ্টু রায় ছিল না? সে নেই— মরে ভূত হয়ে গেছে!
>
> নন্দ— না— সে মরেনি-
>
> বিষ্ণু— (ধমক দিয়া) আমি বলছি মরেছে! (আবার আস্তে) আমি তার নাড়ী টিপে দেখেছি, নাড়ী চলে না বুকে হাত দিয়ে দেখেছি, এখন আর ঢিপ্ ঢিপ্ করে না ! নেই! তুই তাকে এখন যেখানে পারিস্ নিয়ে চল— অনেক দূরে— অনেক দূরে—!"[৪]

বিষ্ণু রায় ও নন্দলালের জমিদারি ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে যাওয়া দেশভাগ ও দেশত্যাগের সময়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদারদের গ্রাম ত্যাগের ছবি তুলে ধরে। বিষ্ণু রায় প্রথম দিকে গ্রাম ত্যাগ করতে চাননি জন্মভূমির টান যে তাকে বাঁধবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু যে জমিদারিতে এতদিন সে মাথা উঁচু করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সেই সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিয়েছে। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেই অধিকার বিষ্ণুরায় হারিয়েছে, ধর্মের উস্কানিতে তারই সামান্য প্রজা আইজদ্দি তার মাথার উপর উঠে বসতে চাইছে, তার সন্তানকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠাতে উদ্যত হয়েছে। এ দৃশ্য বড়োই মর্মান্তিক। দেশভাগের পরবর্তী মুহূর্তে হিন্দু প্রভাবশালী জমিদারদের সন্তানকে

সংখ্যাগুরু মুসলিমদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের আইনি বিশৃংখলা এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাকে ফুটিয়ে তোলে। তবে এই মিথ্যের আবর্ত থেকে নন্দলাল মুক্তি পেলেও লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে এই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলবন্দী করা হয়েছে সে কথা দেশত্যাগ করে আসা সহস্র হিন্দুর স্মৃতিতে আজও স্পষ্ট। তাই আমরা দেখি নন্দলালের সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে হরসুন্দরীও শেষপর্যন্ত স্বামীর মতোই সন্তানের সাথে অতসীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছে–

"নন্দ– (অন্যদিকে তাকাইয়া) অতসী যে আজই যেতে চাচ্ছে মা!

হর– তা কি করে হয়?

নন্দ– তাকে তা'হলে বোঝাও।

হর– (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া) হ্যাঁ, তাকে যখন আজই যাব ক'রে নিয়ে এসেছি,– এত ভাবনা আর ভাবতে পারি না নন্দ; কাজ নেই আর দো-মনায়, কাজে যাব তাহ'লে সবাই– চল– আজই চল।"[৫]

অতসী গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রজহরির কন্যা। দেশভাগ, দেশত্যাগের মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক হিংসার আবর্তে গ্রামের হিন্দু মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষার চিন্তা পিতা-মাতাকে কতটা উদ্বিগ্ন করেছিল তার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই ব্রজহরি ও ক্ষেমঙ্করীর মধ্যে। খাদ্যসংকট, বস্ত্র সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুন্দরী প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে নিয়ে তারা ভীত সন্ত্রস্ত। অন্যদিকে অতসীকে ব্যবহার করে পটল ডাক্তারের নিজ স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা সমাজের কুৎসিত দিককে যেমন ফুটিয়ে তোলে তেমনি স্বার্থপর হিন্দু সমাজের ঠুনকো বন্ধনকেও প্রকাশ করে। দেশভাগ ও দেশত্যাগের চরম মুহূর্তে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা যেখানে একত্রিতভাবে আইজদ্দিদের নেতৃত্বে হিন্দু উৎখাতে ব্যস্ত ছিল তখন পটল ডাক্তার, কানাই, ফটিক প্রমুখের মতো হিন্দুরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় সন্ধান করেছে। শুধু তাই নয় হিন্দুরা তাদের চরম সংকটের মুহূর্তে পূর্ব স্মৃতি স্মরণ করে নিজেদের বিভাজিত করে রেখেছে জাতের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে। জমিদারদের পাশে দাঁড়িয়ে কোনোরকম ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিবর্তে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদের দুর্বল করেছে। বিভাজিত সেই হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের মনের ক্ষোভ, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে ঈশান, বেঙ্গু, কিনারামের সংলাপে-

"ঈশান– দুঃখের আরো আছে দাদা, সেই যে উঠানে পড়লাম বারান্দায় আবার উইঠা দেখি, আমার পিঁড়ির পাশে শোয়াই আছে কত্তাদের কুত্তাটা, কই তারে ত কেউ তাড়াইল নাই – সে তো শোয়াই রইল!

বেঙ্গু– তবেই এখন বোঝো জগত্তারণ। আমরা কি কুকুরেরও অধম হইয়া ভদ্দরলোকের পাও চাটতে বাস করুম?

কিনা– মনের চাপা দুঃখ যদি বলতে সুরুইকরলা দাদা,তবে আমিও কিছু বলি। এই কিছুদিন আগে বসা আছি রাইদের আটচালা ঘরে,কথা বলছি,নায়েব মশাইর সঙ্গে। খানিকক্ষণ বাদে দেখি সেই ভুলু কায়েতের বিধবা বুইন, দাঁড়া'য়া আছে আটচালার বাইরে ভরা কলসী কাঁখে। দেখতেই নায়েব-মুহুরী আমাকে বলল, এইরে কিনারাম, একটু নাইমা খাড়া, বাড়ির খাবার জল লইয়া যাইবে। কেনরে দাদা, আমরা বন্ধনের তলে থাকলেই কি জল মার যায়?"[৬]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশভাগের উত্তাল মুহূর্তে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। হিংসা-প্রতিহিংসার উন্মাদনায় হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছে যখন,তখন পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের পারস্পারিক মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব, অভিমান, ক্ষোভ, লোভ, ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা তাদের ঐক্যবদ্ধ তো করেনি করেছে দুর্বল। আর সেই দুর্বলতার সুযোগেই আইজদ্দিদের মতো সামান্য প্রজাও ছাতিমপুরের দাপুটে জমিদার বিষ্ণুরায় এবং তার পুত্র নন্দলাল রায়-কে অপমান ও অপদস্ত করতে সাহস পেয়েছে। আর সেই অপমান মাথায় নিয়েই বিষ্ণুরায় বাধ্য হয়েছেন দেশ ত্যাগ করতে। দেশ ত্যাগের এই জোয়ারে সাধারণ হিন্দুদের যেমন গৃহহারা হতে হয়েছে তেমন গৃহহারা হয়েছে পূর্ববঙ্গের দাপুটে জমিদাররাও। যার প্রমাণ বহন করেছে ছাতিমপুরের জমিদার বিষ্ণুরায়। আইজদ্দিরা হিন্দু জমিদারদের গৃহহারা করে যে ক্ষান্ত থাকেননি তাও নাটককার নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটকের শেষে গ্রাম ত্যাগ করার পরেও যখন বিষ্ণুরায় শুধুমাত্র জন্মভূমির টানে আবার ফিরে এসেছে তখন জানতে পারে এক রাত্রের মধ্যেই জমিদার বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে–

"বিষ্ণু– হ্যাঁ চাচা, এলুম,– আবার ফিরে এলুম। ওদের সব পাঠিয়ে দিয়েছি– আমি– আবার পালিয়ে এলুম।

করিম– (মাথানিচু করিয়া) কেন আবার–

বিষ্ণু– কেন? কেন?– এই গ্রামটাকে আবার একটু দেখতে এলুম– এই বাড়ি-ঘর একবার দেখতে এলুম। ওই দোল মঞ্চটাই আরেকবার একটু দেখতে এলুম,– এই তোমাদের একবার দেখতে এলুম!(করিম সর্দার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মাথা নীচু করিয়া নীরব রহিল।) কথা কইছ না যে চাচা– মুখ ফিরিয়ে রইলে যে–! তাইত, চাচাও যে কথা কয় না। করিম চাচাও কথা কয় না! (চঞ্চলভাবে করিম সর্দারের হাত ধরিয়া) চল– চল চাচা, বাড়িঘর একটু দেখি–

করিম– (মাথা নীচু করিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া) সব গেছে ভূঁইয়া, কিছু রাখতে পারি নাই!

বিষ্ণু– কি গেছে? কি গেছে?

করিম– ঘরবাড়ি লুটপাট কৈরা সব পোড়া'য়া দিছে।"[৭]

ছাতিমপুরের প্রভাবশালী জমিদার বিষ্ণুরায়ের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবার মধ্যে দিয়ে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা জুড়ে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন বিধ্বংসী আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি। তবে আইজদ্দির পিতা করিম তার সন্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও হিন্দু জমিদারদের পাশে থেকেছে আবার মেছের ও তার স্ত্রী জমিদার বিষ্ণুরায়ের স্নেহ ও ভালোবাসার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রেখেছে। করিম মেছের-রা সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা বাংলার সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে ভারতবর্ষের দেশভাগের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। আমরা সকলেই জানি আকস্মিক দেশভাগের সেই মুহূর্তে দেশবাসী সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। আর সেই বিভ্রান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছু মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানি সমগ্র দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। হিন্দু মুসলিম শিখ আরো কত ধর্মের কত বর্ণের নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল তার সঠিক হিসেব হয়তো ইতিহাসও রাখতে পারে নি, কত নারী যে ধর্ষিত হয়েছিল তাও লেখা

নেই ইতিহাসের পাতায়। তবে দেশ হারানো সহস্র মানুষের মনে আজও ক্ষত হয়ে আছে দেশ ত্যাগের বীভৎস সে স্মৃতি। প্রাণ-মান বাঁচানোর জন্য কত মানুষ ঘরবাড়ি, মাঠ ভরা ফসল, পুকুর ভরা মাছ, ফলে ভরা বাগান, সাজানো সংসার ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে তার হিসেব নেই। তাদের অন্য কোনো দোষ ছিলো না, তাদের শুধু একটাই দোষ ছিলো দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশেই তারা হয়েছিল ভিনদেশী, হয়েছিল সংখ্যালঘু। যে দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছিল সেই দেশ থেকে অত্যাচারিত, নিঃস্ব হয়ে অনিশ্চিত জীবনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে তারা বাধ্য হয়েছিল। দেশহারা সেই সব মানুষের কাছে দেশ ত্যাগের সেই স্মৃতি আজও জীবন্ত। দুঃস্বপ্নের সেই দিনগুলো আজও তাদের শিহরিত করে। সেই শিহরণ আজও অনুভব করি আমরা ঘটি-বাঙালের দ্বন্দ্বে, ইলিশ-চিংড়ির স্বাদে। দেশভাগ এবং দেশত্যাগের ক্ষত যে এখনও পূরণ হয়নি তা বাঙালির এই বিভাজনেই স্পষ্ট। হয়তো আগামী আসবে যেদিন বাঙালি সব দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে আবার সৌভ্রাতৃত্বের কাঁধে ভর করে এগিয়ে যাবে। তবে ততদিন পর্যন্ত দেশহারা মানুষদের মনে দেশত্যাগের যন্ত্রণা তুষের আগুনের মত জ্বলবে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরেও এ নিয়ে বিতর্ক আছে এবং থাকবে, আলোচনা চলবে তবুও আপন মানুষের নিথর দেহ, নিজ গৃহ, পুড়তে দেখা চোখ সেই স্মৃতি কোনদিনই ভুলবে না।

তথ্যসূত্র:

১. 'পদ্মিনী উপাখ্যান', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৫/২নং গ্রে-স্ট্রীট, নতুন কলকাতা "ইলেক্ট্রিক্ মেসিন যন্ত্রে" শ্রীপূর্ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১২সাল, পৃষ্ঠা:৭৪

২. 'ভারত স্বাধীন হল', মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পূর্ণাঙ্গ সং, অনু-সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, মুদ্রণ ২০১০

৩. 'দিনান্তের আগুন', শ্রী শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ৯৮/৪, রোড কলিকাতা (২৬) হইতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ:১লা বৈশাখ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা:৩-৪

৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ৭০

৫. তদেব,পৃষ্ঠা:১১৪

৬. তদেব, পৃষ্ঠা:১০৪

৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫২-১৫৩

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

শ্রীচৈতন্যভাগবত-এ শ্রীচৈতন্য : পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম

ড. ঋতব্রত বসুমল্লিক

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি

সারসংক্ষেপ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় শ্রুতিপ্রস্থানেও নানাভাবে এই পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই 'পুরুষোত্তম' কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে দুই ধরণের অর্থ হতে পারে – একটি হল পুরুষগণের মধ্যে উত্তম আর অন্যটি উত্তম যে পুরুষ। ভগবানের এই নরবপু ধারণ এবং নরলীলা করার মধ্যেই পুরুষোত্তম ভাবনাটি লুকিয়ে আছে।

ভগবানের এই অবতারময় লীলারসবিগ্রহের স্বরূপ দর্শন বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। বৃন্দাবন দাস বাংলা চৈতন্যচরিতকারগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য রূপে অদ্যাপি পূজিত। তাঁর আগে বাংলায় রচিত কোন সম্পূর্ণ চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের পুথি অবিসংবাদিতভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। তিনি পরবর্তীকালে তাঁর গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে চৈতন্যচরিত লেখায় ব্রতী হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস যা কিছু বলেছেন সেগুলি আর যাই হোক মনগড়া নয়। তিনি মূলতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, নারায়ণী দেবীর কাছেই গৌরসুন্দরের জীবনের মূল ঘটনাবলীর সন্ধান পেয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস ভক্তি পরিমণ্ডলে বাস করতেন। ফলে ভক্তির প্রগাঢ়তা তাঁর কাব্যে থাকবেই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর ভক্তিময়তা কোথাও বাস্তবকে অতিক্রম করেনি।

বৃন্দাবনের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ভগবান তথা পুরুষোত্তম; তবে তাঁর পুরুষসত্তার কথাও তিনি ভোলেননি। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর ছিলেন ঠিকই, তবে ভক্তির অন্ধদৃষ্টিতে কবি অলৌকিকতা আর কল্পনা দিয়ে চৈতন্যলীলাকে ভরিয়ে তোলেননি; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুক্তিনিষ্ঠ থেকেছেন। যেমন বাল্যকালে আলাদা করে রাখা বিষ্ণুর ভোগ রান্নার হাঁড়ির মধ্যে বসে মাতা শচীকে গৌরাঙ্গ শুচি-অশুচির পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার স্তরান্তর বিন্যাসটি খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চৈতন্য কোমলে-কঠিনে অভিষিক্ত – 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।' তিনি প্রথম জীবনে নবদ্বীপের শ্রীগৌরচন্দ্র আর উত্তরজীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নারায়ণ নররূপ ধারণ করলে মানুষী আচরণই করবেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। নিমাই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূলে নিয়ে আসতে শিখিয়েছেন। তবে সেটা সহিংস পথে নয়; অহিংস পথে, ভালোবাসার পথে, প্রেমের পথে। কাজীদলন তাঁর অহিংস প্রতিবাদী আন্দোলনের সর্বোত্তম নিদর্শন। এর আগে নবদ্বীপের কেউ এই অভূতপূর্ব অহিংস প্রতিবাদী মিছিল দেখেননি। চৈতন্য সমগ্র নবদ্বীপ তথা বাংলাকে সেটা দেখালেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লোকচরিত্রজ্ঞান ছিল অসামান্য। মূল প্রবন্ধে এই সবকিছুরই যথাযথ বিশ্লেষণ করা হবে।

সূচক শব্দ

পুরুষ, পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন দাস, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, বৈষ্ণব, ঈশ্বর, অবতার, নবদ্বীপ।

মূল প্রবন্ধ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় শ্রুতিপ্রস্থানেও নানাভাবে এই পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই 'পুরুষোত্তম' কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে দুই ধরণের অর্থ হতে পারে– একটি হল পুরুষগণের মধ্যে উত্তম আর অন্যটি উত্তম যে পুরুষ। দু'টিই

সমাস নিষ্পন্ন। তবে সাধারণ্যে শব্দটি যোগরূঢ় অর্থে প্রচলিত হয়ে আছে যে, যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ তিনিই পুরুষোত্তম। শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলতে আমরা সাধারণত ভগবান বা ঈশ্বরকে মান্যতা দিই। গীতায় অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করে শ্রীভগবানকে 'পুরাণপুরুষ' বা 'আদিপুরুষ' বলে স্তুতি করেছিলেন–

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।"[১]

কাজেই ভগবান যে পুরুষোত্তম– সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু শ্রীভগবান কথিত পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার তত্ত্ব তাতে সন্দেহাতীত ভাবে নিষ্পন্ন হচ্ছে না, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে– "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"[২] বৈষ্ণবতত্ত্ববেত্তাগণও একযোগে এই ধারণাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটা হল বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু যিনি এই পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার বাণীকে প্রচার করেছিলেন সেই ভগবান স্বয়ং কোন বিশ্বাসকে অন্ধ ভাবে চাপিয়ে দিতে চাননি। ভারতীয় পুরাণসমূহে যে অবতারবাদের কথা আছে, সাধারণভাবে আমরা বিষ্ণুর যে দশ অবতারের কথা জানি তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের-ই রূপ। ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুদয় হলে ভগবান স্বয়ং সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন।[৩] সাধারণভাবে দশাবতারের কথা প্রচলিত থাকলেও পুরাণাদি শাস্ত্রে অসংখ্য অবতারের কথা বলা আছে। তাঁরা নররূপ ধারণ করে লীলাবিলাস করেন। তুলনীয়–

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।।"[৪]

কাজেই ভগবানের এই নরবপু ধারণ এবং নরলীলা করার মধ্যেই পুরুষোত্তম ভাবনাটি লুকিয়ে আছে। ভগবানের এই অবতারময় লীলারসবিগ্রহের স্বরূপ দর্শন বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছিল খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। ভক্তদৃষ্টিতে তিনি অবতার; যদিও এইবিষয়ে দুই ধরনের ভক্তিদৃষ্টি এখানে লক্ষিত হয় – ১) নবদ্বীপের ভক্তদৃষ্টিতে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ২) বৃন্দাবনের ভক্তিভাবনায় তিনি রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত বিগ্রহ। নবদ্বীপে তিনি উপেয়

আর বৃন্দাবনে তিনি উপায়। বঙ্গবাসীমাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই সদূরপ্রসারী। মধ্যযুগের বাংলাদেশে একেবারে স্থবির হয়ে যাওয়া জনজীবনকে তিনিই মূল স্রোতে চালনা করেছিলেন। যে অস্থির সময়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই সময় অস্পৃশ্যতা, জাতপাতের গোঁড়ামি, মানুষে-মানুষে বিভাজন, রাজনীতির গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে গণজীবনকে মুক্ত করা সহজ ছিল না। একদিকে সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতি আর অন্যদিকে সেই রীতিনীতির কবলিত হয়ে পড়া মানুষের নীচ মানসিকতা। সর্বোপরি যে বৈষ্ণব ধর্মকে তিনি সুদৃঢ় স্থায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন সেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি সেকালের মানুষের ঘৃণ্য মনোভাব। এইসমস্ত বিরুদ্ধতাকে তিনি জয় করেছিলেন। তিনি অবতার কি স্বয়ং ভগবান – সেই প্রশ্নকে সরিয়ে রেখে যদি কেবল তাঁর বচন এবং আচরণসমূহকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার পর্যায়সারণীটি স্পষ্টত প্রতিভাত হবে।

বৃন্দাবন দাস বাংলা চৈতন্যচরিতকারগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য রূপে অদ্যাপি পূজিত। তাঁর আগে বাংলায় রচিত কোন সম্পূর্ণ চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের পুথি অবিসংবাদিতভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়নি। বৃন্দাবনের পূর্বে সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনী পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের প্রথম সংস্কৃত জীবনীটি রচনা করেছিলেন তাঁর সহপাঠী মুরারি গুপ্ত। গ্রন্থটির মূল নাম 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্', তবে এই গ্রন্থটি 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। মুরারি গুপ্তের বইটিতে প্রত্যক্ষদর্শিতার ছাপ আছে। কারণ তিনি নিমাই পণ্ডিতের সহাধ্যায়ী থাকায় নিমাই'র বাল্য, কৈশোর ও প্রারম্ভিক যৌবনের বহু ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। ফলে তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। এইকারণে বৃন্দাবন দাস মুরারির গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের অন্যতম বিশিষ্ট লীলাপার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর পুত্র ছিলেন। নিমাই (তখনও চৈতন্য হননি) নবদ্বীপে এই শ্রীবাস অঙ্গনেই বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতি রাতে

কীর্তনবিলাস করতেন। নারায়ণী দেবী এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বৃন্দাবন দাস বাল্যকালে চৈতন্যের দেখা পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কোন ধারণাই সেই বয়সে হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি পরবর্তীকালে তাঁর গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে চৈতন্যচরিত লেখায় ব্রতী হয়েছিলেন–

"অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।।
চৈতন্যকীর্তন স্ফুরে শেষের কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়।।
.....
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাহি লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে।।"[৫]

বৃন্দাবন দাসের এই উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে,

১) তিনি নিত্যানন্দের আদেশে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

২) নিত্যানন্দের থেকে তিনি চৈতন্যজীবনের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। (৬১ সংখ্যক পয়ারে যে 'শেষ'-র কথা আছে তিনি নিত্যানন্দ, কারণ যিনি শেষনাগ, তিনি কৃষ্ণলীলায় হলধর/বলরাম, চৈতন্যলীলায় তিনিই নিত্যানন্দ।)

৩) বেদে যে চৈতন্যের কথা গুহ্যভাবে আছে তা তিনি প্রকাশ করেছেন।

৪) ভক্তদের কাছে চৈতন্য সম্পর্কে যা কিছু শুনেছেন তাই লিখেছেন।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস যা কিছু বলেছেন সেগুলি আর যাই হোক মনগড়া নয়। তিনি মূলত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, নারায়ণী দেবীর কাছেই গৌরসুন্দরের জীবনের মূল ঘটনাবলীর সন্ধান পেয়েছিলেন। এছাড়াও নবদ্বীপবাসী অন্যান্য চৈতন্যপরিকরও তাঁকে নিশ্চিতভাবেই সহায়তা করেছিলেন। আনুমানিক ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হয়েছিল। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান হয়। তার অনেকপরেই কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে পূর্ণচৈতন্যের প্রকাশে কবিকে সতর্ক

থাকতে হয়েছে। আদি, মধ্য এবং অন্ত্য– এই তিনভাগে তিনি শ্রীচৈতন্যলীলাকে বিন্যস্ত করেছেন। আদি ও মধ্যলীলায় তিনি যত বিস্তৃত, অন্ত্যলীলায় ততখানি নন। এইবিষয়ে পণ্ডিতদের অনুমান যে, মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার সাক্ষী নিত্যানন্দ বা শ্রীবাস কেউই ছিলেন না। ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ কোন তথ্য বৃন্দাবনের কাছে আসেনি। বিভিন্ন ঘটনা এবং প্রেক্ষিতে যেটুকু তিনি জানতে পেরেছেন সেটুকুই অন্ত্যলীলায় লিপিবদ্ধ করেছেন। একটা বিষয় মনে রাখা বিশেষভাবে জরুরি যে, বৃন্দাবন দাস ভক্তি পরিমণ্ডলে বাস করতেন। ফলে ভক্তির প্রগাঢ়তা তাঁর কাব্যে থাকবেই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁর ভক্তিময়তা কোথাও বাস্তবকে অতিক্রম করেনি।

চৈতন্য জীবনকথা বলতে গিয়ে কবি সেকালের ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলকেও তুলে ধরেছেন। তৎকালীন ইসলামী শাসনব্যবস্থায় প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্য যেভাবে নবদ্বীপবাসীকে একত্রিত করে তুলেছিলেন তা অবিশ্বাস্য। বৃন্দাবনের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ভগবান তথা পুরুষোত্তম; তবে তাঁর পুরুষসত্তার কথাও তিনি ভোলেননি। গৌরাঙ্গ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে।।"[৬]

তখন নবদ্বীপ জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান, নব্যন্যায়-কেন্দ্র। পণ্ডিতসমাজ শুষ্ক জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন, শাক্তাচারপ্রিয়গণ গোপনে তন্ত্রাদির অনুশীলনে ব্যস্ত, অদ্বৈতবাদীরা অদ্বৈততত্ত্ব নিয়ে বৃথা পাণ্ডিত্যময়তায় আচ্ছন্ন। প্রেম ও ভক্তিধর্মের কোন জায়গা সেখানে ছিল না। মুষ্টিমেয় কিছু বৈষ্ণব রাত্রিকালে শ্রীবাস অঙ্গনে সমবেত হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতেন যা অবৈষ্ণবরা সহ্য করতে পারতেন না। তবে তাঁরা যে এগুলো নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের বশে করতেন তা মনে হয় না; রাজরোষের ভয়েও এই কাজ করতে তাঁরা অনেক সময়েই বাধ্য হতেন। কারণ হরিদাসকে শাস্তি দেওয়ার মানসিকতা থেকে অনুমান করা চলে যে, বিধর্মী শাসক সুযোগ পেলে হিন্দুর জাতি নাশ করার সুযোগ খুঁজতেন। ফলত এইকালে কোন মানুষের পুরুষ থেকে পুরুষোত্তম হয়ে ওঠা প্রায় দুর্নিবার ছিল। কিন্তু এই অসাধ্যসাধন করেছেন বৃন্দাবন দাস। তাঁর দৃষ্টিতে

শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর ছিলেন ঠিকই, তবে ভক্তির অন্ধদৃষ্টিতে কবি অলৌকিকতা আর কল্পনা দিয়ে চৈতন্যলীলাকে ভরিয়ে তোলেননি; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুক্তিনিষ্ঠ থেকেছেন। যেমন বাল্যকালে আলাদা করে রাখা বিষ্ণুর ভোগ রান্নার হাঁড়ির মধ্যে বসে মাতা শচীকে গৌরাঙ্গ শুচি-অশুচির পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শুচি, অশুচি যে কেবলমাত্র মনের ভ্রম, বিষ্ণুর ভোগরান্নার হাঁড়ি স্পর্শ করলে কেউ অশুচি তো হয়ই না, বরং সেই সেই হাঁড়ির পবিত্রতাগুণে সে নিজেই শুদ্ধ হয়ে যায়। শিশু গৌরাঙ্গ মাকে বলেছিলেন –

"এসব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন।।
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সেই হাঁড়ি পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়।।"[৭]

এই থেকে বোঝা যায় যে, কবির চিন্তার মধ্যে একটি পারম্পর্য ছিল।

বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার স্তরান্তর বিন্যাসটি খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চৈতন্য কোমলে-কঠিনে অভিষিক্ত – 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।' তিনি প্রথম জীবনে নবদ্বীপের শ্রীগৌরচন্দ্র আর উত্তরজীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নারায়ণ নররূপ ধারণ করলে মানুষী আচরণই করবেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। যতিপূর্ব জীবনে গৌরাঙ্গ ছিলেন অসম্ভব ধী-শক্তি সম্পন্ন, শ্রুতিধর, বিদ্বান ও আত্মশক্তিনির্ভর। নতুবা প্রাক্ যুবা বয়সে তিনি অধ্যাপক হয়ে উঠতে পারতেন না। আর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ যে যুক্তিনিষ্ঠ হবেন এটাই নিশ্চিত। কারণ কার্যকারণ সূত্র সন্ধান এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যধারা স্থিরীকরণ কোন বিবেচক মানুষের পক্ষেই সম্ভব। নবদ্বীপের অবৈষ্ণব সম্প্রদায় যখন রটনা করলেন যে, কীর্তনকারীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুইখানি রাজনৌকা আসছে তখন ধর্মপ্রাণ শ্রীবাস সহ বৈষ্ণবসমাজ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের গৃহে উপনীত হয়ে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন–

"অয়ে শ্রীনিবাস ! কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও।।
.....
মুঞি গিয়া সর্ব্ব-আগে নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু।।
মোরে দেখি রাজা কি রহিব নৃপাসনে?
বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে?"[৮]

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে নেতৃত্ব-শক্তি প্রকাশিত। বিপন্ন মানুষকে সাহসদান, নির্ভরতাদান পুরুষত্বের লক্ষণ। তবে এই পুরুষত্ব লিঙ্গবাচক পুরুষত্ব নয়; বৃহদর্থে মনুষ্যত্ববাচক। বিপন্ন মানুষ যখন তার পাশে কাউকে সহায়তাকারী হিসাবে দেখতে পায় তখন তার মনোবল বেড়ে যায়। এটা শিক্ষাও বটে আবার আচরণও বটে। নিমাই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূলে নিয়ে আসতে শিখিয়েছেন। তবে সেটা সহিংস পথে নয়; অহিংস পথে, ভালোবাসার পথে, প্রেমের পথে। কাজীদলন তাঁর অহিংস প্রতিবাদী আন্দোলনের সর্বোত্তম নিদর্শন। এর আগে নবদ্বীপের কেউ এই অভূতপূর্ব অহিংস প্রতিবাদী মিছিল দেখেননি। চৈতন্য সমগ্র নবদ্বীপ তথা বাংলাকে সেটা দেখালেন। তিনি নিজে নেতা হয়ে থাকতে চাননি, মানুষকে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য যতটুকু নেতৃত্ব দেওয়া প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই দিয়েছেন। আর এর জন্য মানুষকে তিনি ভালোবেসেছেন, নবদ্বীপের ঘরে ঘরে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, বর্ণাশ্রম প্রথার যে অন্ধ কুসংস্কার সনাতন হিন্দুধর্মকে রসাতলে পাঠাতে বসেছিল, গৌরচন্দ্র সেগুলো সমূলে বিনষ্ট করেছেন। মানুষের সঙ্গে মেশার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি মানুষকে যেমন ভালোবেসেছেন তেমনি মানুষও তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে। তিনি তন্তুবায়ের ঘরে গিয়ে 'ভাল বস্ত্র' নেওয়ার কথা বলেছেন, সে দিয়েছে। গৌরাঙ্গ বলেছেন –

"মূল্য করি বোলে প্রভু "এবে কড়ি নাঞি।"
তাঁতি বোলে "দশে-পক্ষে দিবা বা গোসাঞি।।
বস্ত্র লৈয়া পর' তুমি পরম-সন্তোষে।
পাছে মোর কড়ি তুমি দিও সমাবেশে।।"[৯]

এইভাবে গোপগৃহে, গন্ধবণিকের আবাসে, মালাকারভবনে, তাম্বুলীসদনে, শঙ্খ বণিকের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে দ্রব্যাদি নিয়েছেন। গৌরাঙ্গ কিন্তু কারও কাছে বিনামূল্যে কিছু নেননি; সেইমুহূর্তে তাঁর কড়িহীনতার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁকে মূল্যের জন্য কিছু বলেননি। ভালোবেসেই নিমাইকে তাঁদের তৈরি উত্তম দ্রব্যাদি দিয়েছেন। আসলে ভালোবাসার মানুষকে কিছু দিলে তা বিনিময়ের মূল্যে দিতে মন চায় না। প্রেমের অতুলনীয় স্পর্শে তা আন্তরিক হয়ে ওঠে। আর এই আন্তরিকতাই পুরুষোত্তমের অন্যতম গুণ। পুরুষোত্তম সকলকে ভালোবাসেন। এই ভালোবাসা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যকে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে লালন করতে হয়। এর সঙ্গে এসে মেশে উদারতা। তাম্বুলী নিমাই পণ্ডিতকে পান, সুপারী দিলে–

"প্রভু বোলে 'কড়ি-বিনা কেনে গুয়া দিলা?'
তাম্বূলী বোলয়ে 'চিত্তে হেনই লইলা'।।"[১০]

কত সহজ, মর্মস্পর্শী উত্তর! এই সহজাত ভালোবাসার উদার স্পর্শেই নিমাই পণ্ডিত গোরাগুণমণি।

শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে ধৈর্য, স্থৈর্য শান্তভাবে মানুষের কথা শোনার মানসিকতা তাঁকে পুরুষোত্তম করে তুলেছে। তিনি নিজে বিদ্যাদর্পে প্রথমজীবনে এতই আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন যা প্রায় অহংকারেরই নামান্তর ছিল। তিনি ছিলেন অধ্যয়নপটু। আসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধীশ্বর বিশ্বম্ভর মিশ্র শ্রবণমাত্রই কোন বিষয়ের ব্যুৎপত্তিতে পৌঁছে যেতে পারতেন। এটা নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা, ভক্তকুল বলবেন যে, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর কিসেই বা প্রতিভার অভাব থাকবে ! কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তিনি মনুষ্যদেহধারী। ফলে মনুষ্যপ্রকৃতির বশবর্তী তাঁকে হতেই হবে। ফলে ঈশ্বরদত্ত প্রতিভাকে তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় বিকশিত করে তুলেছিলেন। দিগ্বিজয়ী পরাভব অংশ তারই পরিচয়বাহী। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরির স্বরচিত গঙ্গাস্তোত্র তিনি পণ্ডিতকেই ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করে সেই ব্যাখ্যা অনুসরণ পূর্বক তার দোষ নির্ণয় করে দিয়েছিলেন –

"সুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্বোমনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর।।
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে।।
প্রভু বোলে "এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার।।
তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি।
বোল দেখি ?" কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
এত-বড় সরস্বতীপুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু, বুদ্ধি গেল কহিঁ।।"[১১]

শ্রীগৌরাঙ্গের লোকচরিত্রজ্ঞান ছিল অসামান্য। কাকে কখন কিভাবে সংযত করতে হবে সেটা তিনি জানতেন। ফলে জগাই-মাধাই উদ্ধারকালে তিনি মাধাইকে নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছিলেন কারণ নিতাইকে আঘাত করেছিল মাধব বা মাধাই। তাই নিত্যানন্দ ক্ষমা না করলে মাধাই-এর মুক্তি নেই। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের কোমল-কঠিন স্বরূপটি প্রকাশিত। একই রূপ দেখা যায় কাজীদলনকালে। জগাই-মাধাই বা কাজী ছিলেন ক্ষমতালিপ্সু শাসক। শাসকের ধ্বজাধারী। ফলে তাঁদের কাছে কোমলতার প্রকাশ দুর্বলতারই নামান্তর হয়ে যেতো। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ এই পরিস্থিতিতে আপন কঠিন স্বরূপ দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যতিজীবনে প্রবেশের পর শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে তিনি মাতা শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে দেখা করেননি, কারণ সন্ন্যাসীর কাছে স্ত্রী-দর্শন নিষিদ্ধ। অদ্বৈতনিবাস থেকে চৈতন্য নীলাচলের পথে যাত্রা করেছিলেন। এই যাত্রাপথে যে যে তীর্থ পড়েছিল সেখানে অবতরণ করে সেখানকার তীর্থপতিকে দর্শন ও প্রণাম করে তিনি এগিয়েছিলেন। যথা – জলেশ্বরে জলেশ্বর শিব, রেমুণায় গোপীনাথ, যাজপুরে আদিবরাহ, কটকে সাক্ষিগোপাল, ভুবনেশ্বরে শঙ্কর ইত্যাদি। কিন্তু এহো বাহ্য – তিনি বৈষ্ণব হয়ে শিবপূজার মাহাত্ম্যখ্যাপন করেছিলেন –

"শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে।।
.....
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাথে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়।।
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ।।
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে'।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে।।"[১২]

অর্থাৎ স্বধর্মানুসারী থেকেও সকল দেবতার প্রতি ভক্তিভাব রাখা একান্ত আবশ্যক। যিনি পুরুষোত্তম তাঁর সর্বত্র সমদৃষ্টি থাকবে।

পুরীতে থাকাকালীন তিনি রথযাত্রার সময় বাংলার ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং নীলাচল-প্রত্যাগত সেই ভক্তদের কাছ থেকে তাঁর কুশল সংবাদ শচীমাতা পেতেন। সন্ন্যাসী হলেও মা'কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন চৈতন্য। শ্রীচৈতন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। নীলাচলে থাকলেও বাংলায় নবগঠিত বৈষ্ণবধর্মের কোন হানি যাতে না ঘটে সেইজন্য তিনি নিত্যানন্দকে বাংলায় ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, তিনি তো সকলকে প্রেমসাগরে ভাসিয়ে উদ্ধার করবেন বলে এসেছেন তাই -

"এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও।।
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সভার মোচন।।"[১৩]

তিনি নিজে কোন সংগঠন তৈরি করেননি ঠিকই, তবে সংগঠন তৈরীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং এইকার্যে নিত্যানন্দই যে সমধিক যোগ্য – তাও তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

সুতরাং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে যে শ্রীচৈতন্য প্রকাশিত হয়েছেন তিনি যে কেবল দিব্যভাবমণ্ডিত, কনককষিতকান্তি, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ তা নন; বরং মানুষকে যন্ত্রণার বিষম ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধারকারী, সঠিক পথনির্দেশদানকারী দিব্য ব্যক্তিত্ব। এই দিব্যত্বকে স্পর্শ করা যায়, দেখা যায়, অনুভব করা যায়। 'পুরুষোত্তম' কথাটি আর কথার কথা হয়ে থাকেনি, প্রকাশিত হয়েছে স্বগরিমায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের চৈতন্য এর স্বয়ং প্রমাণ।

তথ্যসূত্র :

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১/৩৮ – স্বামী ভাবঘনানন্দ অনূদিত, ২য় উদ্বোধন সং, ১৭তম পুনর্মুদ্রণ, ১৪২৮, পৃঃ ২৭৯
২। শ্রীমদ্ভাগবত- ১/৩/২৮ – গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, পৃঃ ৫৫
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা – ৪/৭-৮ - স্বামী ভাবঘনানন্দ অনূদিত, পূর্বোক্ত সং, পৃঃ ১০০
৪। চৈতন্যচরিতামৃত – মধ্য/২১ - উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী সং, ১৯৯৭, পৃঃ ২৩৫
৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত (১ম খণ্ড) আদিলীলা ১/৬০-৬১, ৬৪ - শ্রীচৈতন্যভাগবত, রাধাগোবিন্দ নাথ (সম্পা), সংস্কৃত বুক ডিপো, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৮ , পৃঃ ৩৮-৩৯
৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত (১ম খণ্ড) আদিলীলা ২/৮২ - তদেব, পৃঃ ৭৬
৭। শ্রীচৈতন্যভাগবত (১ম খণ্ড) আদিলীলা ৫/১৭৬-১৭৭ - তদেব, পৃঃ ১৮৭
৮। শ্রীচৈতন্যভাগবত (২য় খণ্ড) মধ্যলীলা প্রথমার্ধ ২/৩০২, ৩০৬-৩০৭ - তদেব, পৃঃ ১০৭-১০৮
৯। শ্রীচৈতন্যভাগবত (১ম খণ্ড) আদিলীলা ৮/১১১-১১২ - তদেব, পৃঃ ২৯৭
১০। শ্রীচৈতন্যভাগবত (১ম খণ্ড) আদিলীলা ৮/১৩৯ - তদেব, পৃঃ ৩০০
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (১ম খণ্ড) আদিলীলা ৯/৯৩-৯৭ - তদেব, পৃঃ ৩২৬
১২। শ্রীচৈতন্যভাগবত (৩য় খণ্ড) অন্ত্যলীলা ২/৩৯৩, ৩৯৫-৩৯৭ - তদেব, পৃঃ ৬৮-৬৯
১৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (৩য় খণ্ড) অন্ত্যলীলা ৫/২২৭-২২৮ - তদেব, পৃঃ ২০৯

সহায়ক গ্রন্থ:

১। কবিরাজ কৃষ্ণদাস – শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯৭

২। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস – শ্রীমদ্ভাগবত, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ১ম-৯ম স্কন্ধ, প্রথম সংস্করণ ২০০৭

৩। দাস বৃন্দাবন– শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রী রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৮ এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, ড. অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, তৃতীয় পরিমার্জিত মুদ্রণ ১৪২৬

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার – বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড,তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮-২০১৯

৫। ব্যানার্জী চন্দ্রা – বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য, পূর্ব বর্ধমান,এভেনেল প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০২২

৬। ভট্টাচার্য জগদীশ – চৈতন্য-প্রসঙ্গ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৬

৭। ভাবঘনানন্দ স্বামী অনূদিত – শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৯, ১৭তম পুনর্মুদ্রণ ১৪২৮

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

রবীন্দ্রসৃষ্টিতে মানবতাবাদের প্রভাব

ড. ঋতুপর্ণা বসাক (দাশগুপ্ত)
সহযোগী অধ্যাপিকা, ইংরাজি বিভাগ, শিলিগুড়ি বি এড কলেজ

সংক্ষিপ্তসার

প্রাচীন গ্রীসের প্রাক-সক্রেটীয় দার্শনিকদের ভাবনা চিন্তায় মানবতাবাদের প্রথম আভাস পাওয়া গেলেও রেনেসাঁ কালে এর চর্চা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। পরবর্তী কালে সভ্যতা যত এগিয়েছে শিক্ষা ও গবেষণায় মানবতাবাদ তত তার স্থায়ী আসন লাভ করেছে। এর গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস, পদ্ধতি ও দর্শনে এসেছে বৈচিত্র্য তবে কেন্দ্রীয় আলোচনায় থেকেছে মানব জীবন। আধুনিক কালের অন্যতম সৃষ্টিশীল প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনা চিন্তা জুড়ে বইছে মানবতাবাদের জোয়ার। আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েকটি নির্বাচিত রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা ও তাঁর শিক্ষা চিন্তার সাহায্যে এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ

মানবতাবাদ, রবীন্দ্র কবিতা, রবীন্দ্র সঙ্গীত, শিক্ষাচিন্তা।

মূল প্রবন্ধ

আজ দেশে বিদেশে যেদিকেই তাকাই সেদিকেই ধ্বনিত হচ্ছে বিপন্ন মানবতার অসহায় বার্তা। সমগ্র পৃথিবী আজ নিরুপায় হয়ে দেখছে ক্রন্দনরত মানবতাকে। অথচ এমনটা তো মনে হয় হওয়ার কথা ছিল না। মানব সভ্যতার উত্তরোত্তর অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ জীবনে এসেছে সুখ, বিলাসিতা ও পার্থিব সমৃদ্ধি। শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই গবেষণা ও আধুনিক চিন্তাধারার প্রসারে ঘটেছে অভূতপূর্ব পার্থিব উন্নতির জয়যাত্রা । আর এ

সব কিছুরই প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে মানব জীবনে। সে যুক্তিতে তো মানবতার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটারই কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি । কেন ঘটেনি তার নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত কারণ আছে। সে সব কারণের বিস্তারিত অনুসন্ধান করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ লেখার মাধ্যমে মানবতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বর্তমান কালের বিপন্ন মানবতাকে রবীন্দ্র সাহিত্য, বিশেষত তাঁর লেখা নির্বাচিত কয়েকটি গান, কবিতা এবং তাঁর শিক্ষাচিন্তার মাধ্যমে কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে তা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

খুব সহজ করে বলতে গেলে মানবতাবাদ হল দর্শন ও গবেষণা অনুশীলন ক্ষেত্রে মানবিক নীতিসমুহ ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা ও কাজ করার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচীন গ্রীসে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রাক্- সক্রেটীয় দার্শনিক থেলিস এবং ক্সেনোফানিজকে প্রথমদিকে মানবতাবাদী বলা যেতে পারে কারণ তাঁরাই প্রথম পুরাণ ইত্যাদির সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যে জগতকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তারপর মধ্য যুগের শেষ ভাগে ও প্রাক্-আধুনিক যুগের বৌদ্ধিক আন্দোলন রূপে রেণেসাঁ বা নবজাগরণ এসে মানবতাবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে মানব মন ও জীবনে এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব পরিলক্ষিত হতে লাগল। সেই অর্থে পেত্রার্ককে প্রথম রেনেসাঁ মানবতাবাদী রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই সময় এটাও মনে করা হত যে প্রাচীন জ্ঞানের অধ্যয়ন একটি সাধারণ ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের কাজ করবে। রেনেসাঁ-পরবর্তীকালে মানবতাবাদের বিকাশ ও বিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গ্যালিলিও ও ইরাসমাসের স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তাভাবনা যা যুক্তি ও কর্তৃত্বের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি করেছিল। সেই থেকে শুরু হয়ে 'মানবতাবাদ' শব্দটি বহুধা বিশ্বাস, পদ্ধতি ও দর্শনের জন্ম দিয়েছে- কিন্তু সে সব কিছুরই কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ বা মানব জীবন ও জগত। মানবতাবাদ বা 'Humanism' শব্দটি দ্বারা উনবিংশ শতকের দার্শনিকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে ধ্রুপদী সাহিত্য চর্চার ওপর রেণেসাঁকালের প্রভাবকে বুঝিয়েছেন- তখন তাকে বলা হত 'Humanismus'। যাঁরা এর চর্চা করতেন সেই অধ্যাপক ও ছাত্রদের

বলা হত 'Umanisti' যাদের চর্চার বিষয়বস্তু ছিল ব্যকরণ, কবিতা, কাব্য, ইতিহাস, নৈতিকতা ইত্যাদি। এ সবের পূর্বাভাস পাওয়া যায় রোমান রাজনীতবিদ মার্কাস তুলিয়াস সিসেরোর 'Humanitas' সংক্রান্ত ধারণায়। পরবর্তীতে এই 'Humanitas' বলতে মানবতাবাদের আধুনিক ধারণার বৈশিষ্ট্য যেমন বোঝাপড়া, দয়া, করুণা ইত্যাদির সাথে সাথে যুক্ত হয় আরো কিছু জোরালো বৈশিষ্ট্য- যেমন সহিষ্ণুতা, ন্যায়, বিচার, বিচক্ষণতা, বাগ্মিতা, আত্মসম্মান ইত্যাদি। এভাবেই Humanitas চর্চাকারীগণ ধীরে ধীরে দর্শনের এক স্বতন্ত্র শাখার বিদ্বজ্জন মাত্র হয়ে না থেকে হয়ে উঠলেন মানব ও সমাজ জীবনে অংশগ্রহণকারী এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধীরে ধীরে সমাজ ও সভ্যতা বিবর্তনের পথ ধরে এই মানবতাবাদ দর্শন শাস্ত্রের গণ্ডী পেরিয়ে ব্যপ্ত হয়ে পড়ে সমগ্র শিক্ষা-সমাজ চিন্তায়। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, তর্কবিদ্যা, গণিত সমস্ত বিষয়েই মুখ্য হয়ে ওঠে মানবকেন্দ্রিকতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সর্বকালের ও সর্বদেশের একজন অগ্রণী আধুনিক প্রতিভা যাঁর অবাধ বিচরণে সমৃদ্ধ হয়েছে শিক্ষা, সাহিত্য, চারুকলা ও সঙ্গীতের অঙ্গন। তাঁর প্রগতিশীল ও আধুনিক মনন উপলব্ধি করেছিল সভ্যতার তথাকথিত অগ্রগতি সত্ত্বেও ক্রমনিমজ্জমান মানবতার বিপন্নতা। মূলত ভাববাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সৃষ্টি ও শিক্ষা চিন্তা জুড়ে রয়েছে মানব মুক্তির দর্শন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে তিনি স্থান দিয়েছেন বিশ্ব মানবতা সমৃদ্ধ দৃঢ় বিশ্বাসকে। উপনিষদের বাণীকে অনুসরণ করে লিখেছেন- " ঈশ্বরের প্রকাশকে উপনিষদ তিন ভাবে দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতের মাঝে; আর একটি প্রকাশ মানব সমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং"(ধর্ম, ৯৮)। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ কিন্তু শুধুমাত্র উপনিষদকে আশ্রয় করে নয়। সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, "রবীন্দ্রনাথের মানবতত্ত্বের একদিকে আছে ঔপনিষদিক আদর্শ- "...জ্ঞানে অদ্বৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা" (তপোবন, শিক্ষা, ১১, ৬০৫)। অন্যদিকে আছে পাশ্চাত্য রেনেসাঁর মানবতন্ত্রী আদর্শ-ব্যক্তি মুক্তি যুক্তি। ব্যক্তিত্বের সীমাহীন বিকাশ, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি, মুক্ত মনের বাধাহীন প্রকাশ এবং মানুষের যুক্তি বুদ্ধি বিচার শীলতায়

সীমাহীন আস্থা, আপোষহীন যুক্তিবাদ। (১৯৮২, ৩৫)।

তাঁর মানবতাবাদের ধারণাটির ভিত্তি রচিত হয়েছে মানবতা, মানব কল্যাণ ও মানব মুক্তির ত্রিবেণীসঙ্গমে, তাঁর যাবতীয় দার্শনিক চিন্তা ভাবনা আবর্তিত হয়েছে মানুষ কে কেন্দ্র করেই। তিনি 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক গ্রন্থে বলছেন, "ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব- যেমন আগুনের ধর্ম অগ্নিত্ব , পশুর ধর্ম পশুত্ব । তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা"। তাঁর অন্যান্য রচনা যেমন, 'রাশিয়ার চিঠি', 'কালের যাত্রা', 'পুনশ্চ' তথা মানুষের ধর্ম নিয়ে অক্সফোর্ড-হিবার্ট বক্তৃতা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা ইত্যাদিতে ধ্বনিত হয়েছে মানব ধর্মের জয়গান। এই পথ ধরে মানব-ঐক্য নিয়ে তাঁর ভাবনা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমানবতায় উন্নীত হয়েছে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন, "মানুষের সব চাইতে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকের দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্ব দেশের সর্ব কালের। তার মধ্যে কোন জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই"। এই ভাবনাটি সুচারুভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর এই গানে:

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।।
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে-
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও ।
(১৪০২, ১৫১) ।।

'সভ্যতার সঙ্কট' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবপ্রেমের পথেই আছে ঈশ্বরের প্রেম লাভের ঠিকানা। মানুষকে ভালবাসলে তাঁকে ভালবাসা হয়, মানুষকে দিলে সে দান সমর্পিত হয় তাঁর চরণে। এই ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে নানা রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র কবিতায়। তার মধ্যে থেকে এখানে একটি গান ও কবিতার কথা উল্লেখ করব। গানটি হল-

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।

পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু ব'লে দু'হাত ধরি নে।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে।।
ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে, প্রভু,
তাদের পানে তাকাই নে যে তবু,-
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন তোমার মুঠা কেন ভরি নে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুঃখে
দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীণ কাজে প্রাণ সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে।।
(১৪০২, ৭২)

এখানে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রসঙ্গটি বলিষ্ঠতার সাথে উচ্চারিত হয়েছে। সম্পদের অসম বণ্টন সামাজিক বিভেদকে পুষ্ট করে, অনৈক্য ও হানাহানির কারণ হয় এবং সুষম বণ্টন ঐক্যকে সমৃদ্ধ করে- সেই কথাটিকে এখানে ঈশ্বর প্রেমার্জনের পন্থা রূপে দেখানো হয়েছে। সকলকে ভ্রাতৃ জ্ঞানে ভালবেসে, তাদের সাথে নিজের যা কিছু আছে তা ভাগ করে নিলে পরমপিতার সম্পদ বাড়ে, আশীর্বাদ ঝরে পড়ে আর সবার কাজে-বিপদে-প্রয়োজনে নিজেকে নিঃস্বার্থ ভাবে বিলিয়ে দিলে বিপুল প্রাণসাগর তরঙ্গায়িত হয়, প্রাণ চাঞ্চল্যের ধারা থাকে নিত্য প্রবহমান।

এবারে যে কবিতাটির কথা বলব সেটি হল 'দেবতার বিদায়'(১৩০২)। এ কবিতায় দেখা যাচ্ছে যে মন্দিরে এক প্রবীণ ভক্ত বসে নামজপ করার সময় ধূলিমলিন দেহে প্রায় নির্বস্ত্র এক দীন, গৃহহীণ ভিখারি এসে এক কোণে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাকে 'অপবিত্র' বলে তিরস্কার করে ভক্ত সেখান থেকে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলে ভিখারি রূপী ঈশ্বর স্বরূপ ধারণ করে মন্দির ত্যাগ করে বলে যান, " জগতে দরিদ্র রূপে ফিরি দয়া তরে / গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি

ঘরে"। অর্থাৎ দেবালয়ের পবিত্রতা শুধু বহিরঙ্গের পরিচ্ছন্নতায় নয়, অন্তর শুচি না করলে দেবালয়ে দেবতা থাকেন না। অপরিষ্কার বস্ত্র ও ধূলিপূর্ণ শরীর মানেই অশুচি নয়। দেবালয়ে গিয়ে দেবিতার উদ্দেশ্যে টাকা কড়ি, বস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী দানের চাইতেও ঈশ্বরের কাছে প্রিয় হল গৃহহীনকে আশ্রয়, খাদ্যহীনকে খাদ্য ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা।

উপরোক্ত দুটি রচনাতেই ফুটে উঠেছে মানবাত্মার সাথে বিশ্বাত্মার প্রগাঢ় সংযোগের বাণী। মানবাত্মাকে অবহেলা বা অস্বীকার করে পরমাত্মার কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর পরমাত্মার নিবাস ইঁট-কাঠ-প্রস্তর নির্মিত সুরম্য দেবালয়ে নয়, তিনি বিরাজ করেন দয়া-করুণা-সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ মানব হৃদয়ে। 'ধূলামন্দির' কবিতার শুরুটি 'দেবতার বিদায়'-এর মতো একই সুরে বাঁধা হলেও কবিতার পরবর্তী ধাপে দেওয়া আছে ঈশ্বর প্রাপ্তির ঠিকানা। দেবতা তো দেবালয়ে নেই। তবে তিনি গেলেন কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলছেন-

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ-
পাথর ভেঙে কাটছে সেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার প'রে।। (১৪০৪, ৫১০)

অর্থাৎ সামাজিক বিভেদ যা স্পৃর্শ্য- অস্পৃর্শ্য, ধনী- গরীবের মধ্যে প্রাচীর তুলে দেয় তাকে ভাঙার ডাক দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে কর্মযোগের পথেই ভক্তিযোগের যাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে, "কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে"। সবাই এই ধরণীর ভূমিপুত্র ও ভুমিকন্যা- এ কথাই ধ্বনিত হয়েছে এই রবীন্দ্র সঙ্গীতে, "আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা"(১৪০২, ৫৮৭)। সব বিভেদ মানুষেরই

সৃষ্টি, তাই মানুষই পারে তাকে ভাঙতে কারণ "মানুষের কাছে কেবল জগত প্রকৃতি নয়, সমাজ প্রকৃতি বলে আর একটা আশ্রয় আছে" (শান্তিনিকেতন, ১৪০)।

এভাবে ভাবতে পেরেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চিন্তা জুড়ে রয়েছে ঈশ্বরের সাথে মানব মিলনের কথা। তাঁর কল্পনার ঈশ্বর খুব কাছের এক আত্মার আত্মীয় যাঁর সাথে অবলীলায় মনের সব রকম ভাবের আদান প্রদান করা যায়, যাঁকে অবলীলায় বলা যায়, "তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছ নীচে/ আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে" (১৪০২, ১২৩) অথবা, "প্রভু আমার প্রিয় আমার পরম ধন হে/ চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে" (১৪০২, ৩৪)। এ'রকম আরো অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

তাই মানবাত্মার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর সেবা। একই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে 'অভিসার' (১৪০৪, ৩৪১) শীর্ষক কবিতাতেও। পরমাসুন্দরী , পূর্ণযৌবনা নটীশ্রেষ্ঠা বাসবদত্তা নবীন সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মিলনার্থে আপন আবাসে আবাহন করলে উপগুপ্ত জানান যে উপযুক্ত সময় হলে তিনি নিজেই নটীর কাছে আসবেন, এখনো সে সময় আসে নি। দিন যায়। বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রে সমস্ত নগরবাসী যখন আনন্দ উৎসবে ব্যস্ত, তখন উপগুপ্ত নগরের বাইরে বসন্ত রোগাক্রান্ত এক মুমূর্ষু রমণীকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখেন। মূর্ছিতপ্রায় সেই রমণীকে সন্ন্যাসী সেবা ও শুশ্রুষা প্রদান করলে সে জানতে চায় এই দয়াময় পুরুষের পরিচয়।এই নারী আর কেউ নয়, একদা 'যৌবনমদে মত্তা' নটী বাসবদত্তা যার যৌবন ও সৌন্দর্যকে এতদিন সমাজ পণ্য মনে করে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে কিন্তু মারণরোগে আক্রান্ত হলে তাকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে নি। কিন্তু সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বাসবদত্তার প্রথম ও শেষ পরিচয় যে সে একজন মানুষ। তাই তিনি তাকে পরম যত্নে ও মমতায় সেবা করেছেন, মানুষ রূপে তাকে মূল্য দিয়েছেন। নটী বা মারণ রোগাক্রান্ত বলে ঘৃণা করেন নি। জয়ী হয়েছে মানবতা।

এ রকম আরো অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। 'সামান্য ক্ষতি' (১৩০৬) কবিতায়

'কাশীর মহিষী করুণা' একশো সখী পরিবৃতা হয়ে এক শীতের সকালে নিভৃতে বরুণা নদীতে স্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাণী স্নানযাত্রায় আসবেন বলে কাছাকাছি গ্রামের কুটীরগুলি খালি করে প্রজাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। স্নানান্তে শীতার্ত রাণী একটু তাপের জন্য সখীদের আগুন জ্বালাবার নির্দেশ দিলে তারা কাঠ কুটো সংগ্রহের চেষ্টা করে। হঠাৎ রাণী বলেন-

" ওলো তোরা আয়! ওই দেখা যায়
কুটীর কাহার অদূরে,
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল
তপ্ত করিব করপদতল"...

একজন সখী বাধা দিতে চাইলে তাকে নস্যাৎ করে রাণীর নির্দেশে আগুন লাগানো হলে পুরো গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর সে আগুন পোহালেন রাণী সহ সখীরা। রাণীর কাছে এই ধ্বংস লীলা আমোদ প্রমোদের বিষয়, নিতান্তই সামান্য ক্ষতি। পরে রাজসভায় এসে প্রজারা জানালে রাজা সমমর্মিতা দিয়ে বিচার করে বলেন-

"যতদিন তুমি আছ রাজ রাণী
দীনের কুটীরে দীনের কি হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি-
বুঝাব তোমারে নিদয়ে …
মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে -
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে কটি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পারো সে- ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে" ।

এখানেও জয় হয়েছে মানবতার, ক্ষমতার বা পদাধিকারের নয়।

আলোচনা শেষ করব রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় মানবতাবাদের প্রগাঢ় প্রভাব

দিয়ে। বিশ্বভারতী পর্বের কেন্দ্রগত প্রেরণা হল বিদ্যার সার্বভৌমত্ব, শিক্ষার সার্বজনীনতা তথা আন্তর্জাতিকতা কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদটা সাময়িক ও আরোপিত, মিলটাই হল আসল যা মানবঐক্যের মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তি। তিনি এও মনে করতেন যে শিক্ষার একটি সর্বমানবিক দিকও আছে যাকে তুলে ধরতে হবে ভারতবাসীর শিক্ষাতেও। তাই বলা যেতেই পারে যে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মৌলিক প্রত্যয় নিহিত রয়েছে তাঁর মানবতাবাদী ধারণার মধ্যে। তাই তাঁর মৌলিক শিক্ষাচিন্তা গুরুবাদী শিক্ষানীতির পরিপন্থী। তাঁর ভাবনায় সৃষ্টি ও মুক্তি আলাদা নয়, বরং ব্যক্তির স্বধর্ম প্রকাশিত তার সৃজনশীলতায় এবং তার মুক্তিতে ও স্বাধীনতায়। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল কথা হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করা কারণ- "মানুষ করে তোলাই শিক্ষা" (১৩৩৯, ১২৯)। তাই তো তিনি বলতে পেরেছেন-

"মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্য কালের আলো আমি,
সৃষ্টি- উৎসের আনন্দ ধারা আমি"

(২২ সংখ্যক কবিতা, শেষ সপ্তক, ১৮০)

এখানেই মানব জন্মের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতা ফুটে উঠেছে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পরিদর্শক অধ্যাপক Sten Konow এর লেখায়- "মানুষে মানুষে তফাত আছে এবং আছে স্বার্থের সংঘাত। ইহা অস্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অনৈক্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা এবং মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উপযুক্ত সমাধান বের করা" (ভট্টাচার্য, ১৯৬৪, ১০)। শিক্ষা কিভাবে মানব শক্তিকে জাগ্রত করতে করে অসাধ্য সাধন করতে পারে তার কথা তিনি বলেছেন তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে, "আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল- তাদের চিত্তের আবরণ উদঘাটিত। যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক। যারা অবমাননার তলায়

তলিয়ে ছিল- তারা আজ সমাজের অন্ধকুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী" (১৩৩৮, ৩৯)।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির কেন্দ্রে রয়েছে মানবতাবাদ। তাঁর শিক্ষাচিন্তা, সাহিত্য, সৃষ্টিশীলতা, চারুকলার বিকাশ ইত্যাদি সব কিছুই আবর্তিত হয়েছে মানব কেন্দ্রিকতাকে ঘিরে।

তথ্যনির্দেশ :

ঠাকুর, র। (১৩০২)। *চৈতালি*। বিশ্বভারতী।
ঠাকুর, র। (১৩৩৮)। *রাশিয়ার চিঠি*। বিশ্বভারতী।
ঠাকুর, র। (১৩৩৯)। *মানুষের ধর্ম*। বিশ্বভারতী।
ঠাকুর, র। (১৪০২)। *গীতবিতান*। বিশ্বভারতী।
ঠাকুর, র। (১৪০৪)। *সঞ্চয়িতা*। বিশ্বভারতী।
দত্ত, ভ। (১৪২৬)। *রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা*। দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা।
ভট্টাচার্য, ভূ। (১৯৬৪)। *রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন*। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড , কলিকাতা।
রায়, স। (১৯৮৮) । *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত শিক্ষাচিন্তাঃ রবীন্দ্র রচনা সংকলন* । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর : একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আখ্যান

ড. গুরুপ্রসাদ দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এস.এফ.এস মহাবিদ্যালয়, বীরভূম।

সংক্ষিপ্তসার

লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য তারাশঙ্কর যখন লড়াই করে চলেছেন তখন মোহিতলাল-সজনীকান্ত গোষ্ঠীর বাইরে যিনি তারাশঙ্করের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন– তিনি রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষে পৌঁছে তারাশঙ্কর চরম ক্ষোভ ও পরম বেদনার সঙ্গে বলেছেন সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে নানাজনের কাছ থেকে পাওয়া সেই চরম আঘাত ও যন্ত্রণার কথা কিন্তু নিজের সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভ থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিপুল উৎসাহ ও প্রশংসা যে তিনি পেয়েছিলেন সে কথা তিনি বারে বারে সোচ্চারে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র তারাশঙ্করকে সামনে পেয়ে বা চিঠিপত্রে তারাশঙ্করের লেখালেখির প্রশংসা করতেন তা নয়, তিনি অন্যদেরও উৎসাহ দিতেন তারাশঙ্করের রচনা পড়বার জন্য এমনকি শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে তিনি বলেছিলেন তারাশঙ্করের 'রাইকমল'-এর কাহিনি নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই তারাশঙ্কর খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পরম আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনা যেমন তাঁকে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি রবীন্দ্রনাথের গানে, গল্পগুচ্ছে তিনি পেয়েছেন গভীরতম দ্যোতনার সন্ধান আর নিবিড়তম নির্ভরতা। আসলে তারাশঙ্করের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যেমন একটা স্নেহ ও ভালোবাসা ছিল তেমনি তারাশঙ্করও আজীবন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় ছিলেন নতমস্তক। এ ভাবেই দু'জনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল

এক মধুর ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক। এই দুই যুগন্ধর সাহিত্যিকের সেই প্রাণবন্ত ও মরমী সম্পর্কের ইতিবৃত্তটিই অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে বর্তমান সন্দর্ভে।

সূচক শব্দ

রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, প্রতিভা, সম্পর্ক, নির্ভরতা, উৎসাহ।

মূল প্রবন্ধ

সালটা ১৯৩৩। লেখক হিসেবে তখনও প্রতিষ্ঠা পাননি তারাশঙ্কর। তখন গ্রামসেবা ও রাজনীতিতে অনেকটা সময় কাটত তাঁর। এই বছরই গ্রামীণ সমাজসেবক কর্মীদের একটি সম্মেলন হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় কালীমোহন ঘোষ ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা, তারাশঙ্করকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। বীরভূম জেলায় ১৯২৪-২৫ সালে কলেরার যে ব্যাপক সংক্রমণ হয়েছিল তাতে তারাশঙ্কর সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ অঞ্চলের প্রায় ৩০-৪০ টি গ্রামে ঘুরে মুমূর্ষু রোগীদের সেবাকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। তাঁর এই কাজ সেইসময় কালীমোহন ঘোষের নজরে পড়েছিল। তখন থেকেই তারাশঙ্করকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাই যখন শান্তিনিকেতনে এমন একটি কর্মী সম্মেলন হচ্ছে তখন কালীমোহন ঘোষ তারাশঙ্করকে বারে বারে অনুরোধ করেছিলেন এই সম্মেলনে আসার জন্য। কালীমোহনবাবুর এ ডাক তারাশঙ্কর উপেক্ষা করতে পারেননি। তারাশঙ্কর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, কর্মী সম্মেলনের শেষে তিনি শুনলেন কবি তাদের সঙ্গে দেখা করবেন, এ প্রসঙ্গে 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ তারাশঙ্কর লিখেছেন– ''সন্ধ্যার সময়; উদয়নের একটি ঘরে মেঝের উপর বিছানো শতরঞ্জির উপর আমরা বসলাম, বসেছিলাম পূর্বমুখী হয়ে; সামনেই ছোটো চৌকির উপর কবির আসন। বড়ো বড়ো দুটি দীপদানে আলো জ্বলছিল। আমাদের দলের সকলে আমাকেই দিলেন সামনে; কথা বলবার ভার আমার উপরেই পড়ল। স্পন্দিত বক্ষে বসে রইলাম। কবি তখন একটি কোনো বক্তৃতা রচনা করছিলেন। বোধ হয় কমলা লেকচার। যাই হোক, কবি এলেন, এসে আসন গ্রহণ করলেন।

কালীমোহনবাবু পরিচয় দিলেন আমার। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, সাহিত্যিকও বটে। কবি স্মিতহাস্যে বললেন, হ্যাঁ, লাভপুরে সাহিত্যের চর্চা আছে। ভালো অভিনয়ও হয় সেখানে।

এরপর আমি অপর সকলের পরিচয় দিলাম।

কবি আমাদের আশীর্বাদ করলেন, পল্লির পুনর্গঠনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে বললেন, গ্রামকে গড়ে তোলো। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না।"[১] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাতেই তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন, তাঁর কথাবর্তা শুনে হয়েছিলেন মুগ্ধ। এরপরেও নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারাশঙ্করের সাক্ষাৎ হয়েছে, কখনো কখনো চিঠিপত্রের মাধ্যমে হয়েছে যোগাযোগ ও সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা। এরপর ১৯৩৭-৩৮ সালে যখন সাহিত্যিক হিসেবে তারাশঙ্করের একটু পরিচিতি হয়েছে সেই সময় বেরোলো তাঁর দুটি বই 'রাইকমল' উপন্যাস ও কয়েকটি ছোটগল্পের সংকলন 'ছলনাময়ী'। বই দুটি প্রকাশিত হবার পর তারাশঙ্কর মনের যাবতীয় দ্বিধা ও সংকোচ ত্যাগ করে, মনে প্রভূত সাহস সঞ্চয় করে বই দুটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কয়েকদিন পর তিনি একটি চিঠি পেলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠি। চিঠিখানা পেয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা হয়েছিল তারাশঙ্করের। 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ এ প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন "বোধ করি এক সপ্তাহ পরেই একদিন একখানি বিচিত্র খামের চিঠি পেলাম। সাদা খামের এক কোণে 'র' অক্ষর লাল কালিতে ছাপা। ঠিকানার লেখাও রবীন্দ্রনাথের হাতের; বুকটা ধড়াস করে উঠল, হাত কাঁপতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। তখন আমি লাভপুরে রয়েছি। লাভপুর পোস্টাপিসের পূর্বদিকে কল্কে ফুলের সারিবন্দি গাছ বেশ কুঞ্জবনের মতো ঘন এবং নিরালা। সেই নিরালায় গিয়ে চিঠিখানি খুললাম। পড়লাম, সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত হাতে লেখা—

"কল্যাণীয়েষু,

আমার পরিচরবর্গ আমার আশেপাশে উপস্থিত না থাকায় তোমার বই দুখানি আমার হাতেই এসে পৌঁছেছে কিন্তু তাতে পরিতাপের কোনো কারণ ঘটেনি। তোমার 'রাইকমল' আমার মনোহরণ করেছে।'

রাইকমল মনোহরণ করেছে। আনন্দে উল্লাসে আমার চিত্ত যেন আকাশলোকে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছিল সেদিন। একটি কথাও ছিল না, যা নাকি নিন্দার ইঙ্গিত বহন করে। পরিশেষে লিখেছিলেন, 'তোমার অপর বইখানি সময়মতো পড়ব।"[২]

'রাইকমল' রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছে জানতে পেরে তারাশঙ্কর খুব উৎফুল্ল হয়েছিলেন, সেদিন তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল এক অনির্বচনীয় পুলক। এর কিছুদিন পর তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে আবার একটি চিঠি লিখলেন, তাঁর রচনা সম্পর্কে তৎকালীন অন্যান্য সমালোচকরদের যে বিরূপ মন্তব্য তা উল্লেখ করে এই চিঠিতে তিনি লিখলেন, "রাইকমল সম্পর্কে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কিনা জানি না। কারণ আমার সমসাময়িকেরা আমার লেখাকে বলেন—স্থূল।"[৩] দিন চারেক পর তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এ চিঠির উত্তর পেলেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "তোমার কলমের স্থূলতার অপবাদ কে বা কারা দিয়েছেন জানি না, তবে গল্প লিখতে বসে যারা গল্প না লেখার ভান করে, তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাওনি, এতেই আমি খুশি হয়েছি।"[৪] চিঠির বাকি অংশে 'ছলনাময়ী'র গল্পগুলির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আবারো নিজের লেখার স্বীকৃতি পেয়ে সেদিন তারাশঙ্করের আনন্দের আর অবধি ছিল না। এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তখন প্রখর গ্রীষ্ম। চৈত্রের চরম দাবদাহে সমগ্র বীরভূম তখন যেন জ্বলছে। সেই প্রখর গ্রীষ্মের এক তপ্ত দুপুরে তারাশঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো রবীন্দ্রনাথের। 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ এই সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন— ".....ঘরের দরজায় এসেই বুক গুরগুর করে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুধীনবাবু ভিতরে ঢুকেই আবার পর্দা সরিয়ে ইশারা করলেন—আসুন।

ঢুকলাম। একটা মোড় ফিরেই একখানা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখলাম— প্রশান্ত সৌম্য স্বর্ণকান্তি দীর্ঘকায় কবির উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে আমি। কবির সামনে টেবিলের উপর লেখা কাগজ, হাতে কলম, কাগজের ও-পাশে একটি পাথরের পাত্রে পূর্ণপাত্র গোলাপ ফুল, ও-পাশে খোলা জানালার ও-ধারে বিস্তীর্ণ মুক্ত লালমাটির

প্রান্তর দুপুরের রোদে ঝলসে যাচ্ছে, পাতা উড়ছে চৈতালি হাওয়ায়, কয়েকটা গাছে নতুন পাতার সমারোহ। উত্তপ্ত বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি তাঁকে ভালো করে দেখবার অবকাশ পেলাম না। চকিত হয়ে উঠলাম তাঁর প্রশ্নে ।

দৃষ্টিতে তাঁর প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। বললেন—এ কী ? তোমার মুখ তো আমার চেনামুখ। কোথায় দেখেছি তোমাকে ?

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখেছি তোমাকে ?

এবার আমি নিজেকে সংযত করে বললাম— আমার বাড়ি তো এ-দেশেই। হয়তো বোলপুরে দেখে থাকবেন। বোলপুরে কয়েক বার আপনাকে দেখেছি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

তিনি তখনও স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। …

আমার কথায় তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন— না-না। তোমাকে যে আমি আমার সামনে বসে কথা বলতে দেখেছি মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। বৎসর পাঁচেক আগে ১৯৩৩ সালে সমাজ সেবক কর্মীদের এক সম্মেলন হয়েছিল, তখন কবি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি ছিলাম কর্মীদের মুখপাত্র। আমিই কথা বলেছিলাম। কবি কী সেই কথা বলছেন ? সেই অল্পক্ষণের স্মৃতি তাঁর মনে আছে ?

আমি সসংকোচে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তিনি বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ। মনে পড়েছে, তুমিই ছিলে কর্মীদের মুখপাত্র। ঠিক আমার সামনে বসেছিলে তুমি। বসো তুমি বসো।

একটা মোড়ায় বসলাম।

আরম্ভ হল কথা। আমার সকল প্রশ্ন মূক হয়ে গিয়েছিল। তিনিই প্রশ্ন শুরু করলেন।

— কী করো ?

বললাম—করার মতো কিছুতেই মন লাগেনি। চাকরিতেও না, বিষয়কাজেও না, কিছুদিন দেশের কাজ করেছি—

—অর্থাৎ জেল খেটেছ ?

— হ্যাঁ

—ও-পাক থেকে ছাড়ান পেয়েছ ?

—জানি না। তবে এখন ভাবি পেয়েছি।

—সেইটে সত্যি হোক। তাহলে তোমার হবে। তুমি দেখেছ অনেক। এত দেখলে কী করে ?

—কিছুদিন সমাজসেবার কাজ করেছি। আর কিছুদিন বিষয়কর্ম করেছি। সামান্য কিছু জমিদারি আছে। ওই দুই উপলক্ষ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক ঘুরেছি, লোকের সঙ্গে অনেক মিশেছি, কারবারও করেছি।

— সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তুমি গাঁয়ের কথা লিখেছ। খুব ঠিক ঠিক লিখেছ। আর বড়ো কথা, গল্প হয়েছে। তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।...আবার বললেন—তুমি দেখেছ। আমি তো দেখবার সুযোগ পাইনি। তোমরা আমাকে দেখতে দাওনি। আমাদের তো পতিত করে রেখেছিলে তোমরা।

আমি মাথা হেঁট করে রইলাম। …

কোথায় যেন ডাকছিল একটা চিল।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চেয়ে বললেন, তোমার ‘ডাইনীর বাঁশী’র চিলটার কথা মনে পড়ছে। গল্পটি খুব ভালো লেগেছে আমার।

আমি যেন আর সইতে পারছিলাম না এমন সস্নেহ সমাদরের ভার।

কথার জের টেনে তিনি বললেন – কলকাতার একজন বড়ো পণ্ডিত সাহিত্যিক এই গল্পটির কথা শুনে কী বললেন জানো ? আমি দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলে নীরব চেয়ে রইলাম। কবি বললেন– তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন শুনে। বললেন উইচক্র্যাফট নিয়ে বাংলা গল্প। এ নিশ্চয় ইয়োরোপের গল্প। ওদের দেশের গল্প পড়ে লিখেছে।

অর্থাৎ চুরি করেছি আমি।

আমি একেবারে গ্রাম্যলোকের মতোই বলে উঠলাম, না-না। স্বর্ণডাইনি যে আমাদের পাড়ায় থাকে। এখনও আছে। আমাদেরই কাছারি বাড়ির সামনের পুকুরের ঈশান কোণে তার বাড়ি। আর— এতক্ষণে একটু সংযত হয়ে সবিনয়ে বললাম— আমি তো ইংরিজিও ভালো জানিনা। যেটুকুও জানি তার উপযুক্ত পড়বার বইও পাই না আমাদের

দেশে। কোথায় পাব ? ওদের দেশের গল্প তো আমি বেশি পড়িনি।

কবি হেসে বললেন—আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। তোমাকে আমি বুঝেছি। দেখবার আগেই বুঝেছি। ও-কথাটা তোমাকে বললাম কেন জানো ? বললাম আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সঙ্গে পরিচয় কত সংকীর্ণ তাই বোঝবার জন্য। ডাইনি মানে ওঁদের কাছে উইচক্র্যাফট হলেই সে ইয়োরোপ ছাড়া এ-দেশে কী করে হবে। আমাদের দেশের ডাইনি এঁরা দেখেননি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। আমি তাই তাঁদের বললুম, বললুম—উঁহুঃ উহুঁ ! এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকছে, গলাটা তার ধুক ধুক করছে। আর নিজের ঘরের দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণডাইনি বসে আছে আচ্ছন্নের মতো। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি। তাই তো চিলের ডাক শুনে ছবিটা চোখে ভেসে উঠল ; গল্পটা মনে পড়ে গেল।

ওদিকে অপরাহ্নের আভাস ফুটে উঠল প্রান্তরের রৌদ্রাকীর্ণতার মধ্যে।

সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

বললেন, এখানে এসো। যখন ক্লান্তি হবে এখানে চলে এসো। দরজা খোলা রইল।

আমি ইঙ্গিত বুঝলাম। প্রণাম করলাম। সুধীনবাবু এসে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সুধীনবাবু আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পান্থনিবাসে।

আমি আর একমুহূর্ত দেরি করলাম না। আমার আর ঠাঁই নাই। সব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চলে এলাম লাভপুর।"[৫]

সেদিন তারাশঙ্করের অন্তরকে কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের সাহিত্যসৃষ্টির এমন স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়ে সেদিন তারাশঙ্কর যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ তারাশঙ্করকে সেদিন এতটাই প্রাণিত করেছিল যে, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সকল বাধা, সকল সংকটকে তিনি নির্দ্বিধায় উতরে যাবার শক্তি পেয়েছিলেন সেদিন। এ প্রসঙ্গ 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ তিনি লিখছেন— "রবীন্দ্রনাথ যে-উৎসাহ দিলেন, সেই উৎসাহ আমাকে সেই শক্তি দিয়েছিল, যে-শক্তিতে ডাক শুনে কেউ সাড়া না-দিলেও অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে মানুষ একলা পথ চলতে পারে...তন্ত্রসাধনায় শুনেছি, সাধককে 'ভয় নাই'—

'মাভৈঃ' এই কথা শোনাবার জন্য আর একজন সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন হয়। শবাসনে বসে সাধক যে মুহূর্তে ভয় পায়, চিত্ত যে-মুহূর্তে দুর্বল হয়, সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পায় ওই সিদ্ধ সাধকের ওই অভয়বাণী। সাধনায় রত সাধকের সঙ্গে সঙ্গে ভয় দূর হয়, নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহবাণী আমার কাছে সেই অভয়বাণী।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে এক বিনম্র শ্রদ্ধা তারাশঙ্করের এই বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অনুজ সাহিত্যিক তারাশঙ্করকে শুধু স্নেহ করাই নয় বা তাঁর রচনায় উৎসাহ দেওয়াই নয়, শান্তিনিকেতনের একটি কোণ দখল করে তারাশঙ্কর থাকলে রবীন্দ্রনাথ যে খুশি হতেন তাও 'আমার সাহিত্য জীবন' থেকে আমরা জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ একবার তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "... তুমি শান্তিনিকেতনে আস না কেন ? তোমার বাড়ি তো এই কাছেই, নিত্য আসা-যাওয়া করা চলে।" রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছিলেন, "আমি আশা করেছিলাম, এখানকার একটা কোণ আগলে তুমি বসবে। কিন্তু সে তুমি এলে না। এখানে আসাও তোমার দীর্ঘ পরে পরে। কেন বলো তো ?

আমি মৃদুস্বরে বললাম, এমনই বিব্রত থাকি কাজে যে, সময় করতে পারি না।

মিথ্যা কথাই বলেছিলাম।

তিনি সামনের দিকে চেয়ে একটু বিষণ্ণভাবেই বলেছিলেন, কী এত কাজ? কাজ করতে হলে তো বোলপুরে আসতে হয় গো তোমাকে। তোমাদের মুনসেফি কোর্ট। বিষয়কাজ করবে আর কোর্টে আসতে হবে না—এ তো হয় না। তোমাকে যে টেনে আনবে। তুমি তো নিশ্চয় বোলপুরে আস।

না। ও -পথ আমি মাড়াই না। ...আমি কিছু গ্রামের কাজ করি। কালীমোহনবাবু জানেন।

তবে শ্রীনিকেতনে আসছ না কেন ?

আমি একটু চুপ করে রইলাম, তার পর বললাম, আছে একটু যোগাযোগ। তবে গ্রামে না-থাকলে তো গ্রামের কাজ হয় না।

কবি নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষর পর বললেন, তা হলে তোমায় টানা অন্যায় হবে।

তোমার ইচ্ছে নেই। একটু মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, এ-জেলার লোকের কাছে এ-জায়গাটা বিদেশ হয়েই রইল। কোথায় যে রয়েছে মাঝখানের খাতটা !
কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠেছিল তাঁর। সে আমার আজও কানে বাজছে !"[৭]
তারাশঙ্করের প্রতি গভীর স্নেহবশতই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, তারাশঙ্কর শান্তিনিকেতনে নিয়মিত আসুক, এখানকার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে নিক নিজেকে।

এরপর তারাশঙ্করের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল কলকাতার বিচিত্রা ভবনে, কবি সেবার তাঁর নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা এসেছেন জানতে পেরে একদিন দুপুরবেলা তারাশঙ্কর তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'জলসাঘর' বইটি কবিকে উপহার দিয়ে এলেন। কবি বইখানা সরিয়ে তুলে রাখলেন আর বললেন : "পড়ব। সময় পেলেই পড়ব। তোমার লেখা আমার ভালোলাগে।" সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করকে তাঁর শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত নৃত্যনাট্যটিও দেখতে বলেছিলেন। "...তুমি আমাদের এই নৃত্যনাট্য দেখো। কলকাতাতেই দেখো। শান্তিদেবকে আমি বলে দেব। তুমি এসে একখানা প্রবেশপত্র নিয়ে যেয়ো।"[৮] রবীন্দ্রনাথের কথামতো তারাশঙ্কর কলকাতাতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য দেখেছিলেন। এ নৃত্যনাট্য দেখাও তারাশঙ্করের এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর লিখেছেন — "আমি ছায়া 'মঞ্চে' নৃত্যনাট্য দেখে এলাম।
সে কী দৃশ্য !
মঞ্চের বেদির উপর কবি বসেছেন, সে যেন দেবতার আবির্ভাব হয়েছে।...কবির সেই আবৃত্তি—দে দোল—দোল, প্রিয়ারে আমার পেয়েছি আজিকে ভরেছে কোল। তারই সঙ্গে শান্তিদেবের নাচ। আর সেই আমার প্রথম দেখা। আমার মনে অক্ষয় হয়ে রয়েছে।"[৯] সেবার এত ব্যস্ততার মধ্যেও কলকাতাতে বসেই রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' বইখানা পড়ে ফেলেছিলেন। সেবারেই কবি অভিনয়ের কাজকর্ম সেরে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন ফেরার পথে ট্রেনেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। দুদিন অচৈতন্য অবস্থায় আছেন। সমগ্র দেশবাসী উৎকণ্ঠিত। ডাক্তার নীলরতন সরকার রোগ নির্ণয় করলেন। তাঁর চিকিৎসায় কবি সুস্থ হলেন। জ্ঞান ফেরার পরই কবি তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' বইটি চাইলেন। বইটি

খুঁজে না পেয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব সুধীর কর তারাশঙ্করকে চিঠি লিখলেন, "তারাশঙ্করবাবু, পত্রপাঠ যদি একখানি 'জলসাঘর' কবিকে যেভাবে লিখে দিয়েছিলেন তেমনি লিখে পাঠিয়ে দেন তবে অত্যন্ত উপকৃত হব। গুরুদেবকে যে বইখানি দিয়েছিলেন সেখানি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত তাঁর অসুখের সময় যে-সব ভক্ত এখানে এসেছিলেন তাঁদেরই কোনও সাহিত্যরসিক বা রসিকা নিজের পিপাসা মেটাবার জন্য নিয়ে গেছেন। এদিকে গুরুদেব বইখানির বারবার খোঁজ করছেন। না পেলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। বইখানি পাঠালে অত্যন্ত উপকৃত হব। আমার নামে বা রথীবাবুর নামে পাঠাবেন।"[১০] সঙ্গে রথীন্দ্রনাথেরও একটি চিঠি পেলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "শ্রী সুধীর কর আপনাকে পত্র লিখেছেন। একখানি বই পাঠালে অত্যন্ত খুশি হব।"[১১] তারাশঙ্কর সেদিনই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন 'জলসাঘর' বইখানি।

জলসাঘর বইখানি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটা পরিচয় আমরা জানতে পারি সুধীর করের বক্তব্যে। সুধীর কর একবার কথাপ্রসঙ্গে তারাশঙ্করকে বলেছিলেন— "চেতনা ফিরে পেয়ে কবি চেয়েছিলেন তাঁর বিজ্ঞানের বইয়ের প্রুফ আর চেয়েছিলেন জলসাঘর বইখানি। ওই 'রায়বাড়ি' গল্পে, গেরুয়া পড়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে, গঙ্গার ঘাটে নৌকায় উঠতে গিয়ে বিশ্বম্ভর রায় বারেক ফিরে তাকিয়ে যে দেখলেন, অন্ধকার রায়বাড়ির জলসাঘরে আবার জ্বলে উঠেছে আধ-নেবানো বাতিগুলি এবং সেই আকর্ষণে যে আবার তিনি ফিরে এলেন, এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল পেয়েছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে।"[১২]

তারাশঙ্করের লেখা যে সত্যিই রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগত তা আমরা আরো একবার জানতে পারি রাণী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি থেকে। ওই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করে রাণী চন্দ লিখেছেন— ".....আমার খুব ভালো লাগে তারাশঙ্করের ছোটোগল্প। তার ভিতরে আছে একটা স্মৃতি-যার সঙ্গে পূর্বেকার ওই যেমন জমিদারদের ঘরে যা ঘটে থাকে শাসন, পালন, শোষণ দেখিয়েছে ; খুব সত্য

করে তুলেছে তার লেখা।"[১৩] এভাবেই বারে বারে রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় তারাশঙ্করের লেখার প্রশংসা করেছেন। তবে শুধু প্রশংসাই নয়, কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের মতো তারাশঙ্করের লেখার দোষ-ত্রুটিগুলিও ধরিয়ে দিয়েছেন। তাই তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তারাশঙ্করকে লিখেছিলেন : "গল্পলেখায় তুমি আধুনিক বাংলাসাহিত্যে অগ্রণীদের মধ্যে। তোমার লেখা আমার বিশেষ ভালো লাগে সে কথা তুমি জানো। আমার সময়ের অভাব, দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল, তবু তোমার ধাত্রীদেবতা আনন্দিত কৌতূহলের সঙ্গে পড়তে সুরু করেছিলুম। বইয়ের প্রথম অর্দ্ধেক অংশে তোমার হাতের নৈপুণ্য উজ্জ্বলভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেখানেই তোমার গল্পের জন্যে উচ্চ মঞ্চ গড়ে তুললে সেখানেই সে সেখানেই সে স্বস্থানচ্যুত স্বভাবভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। মনে হোলো এ অংশটা যেন অনুরূপা দেবীর লেখা। একশ্রেণীর পাঠকের কাছে তুমি পুরস্কার পাবে। কিন্তু সেই পুরস্কার তোমার যোগ্য হবে না। তোমার এই লেখাটিকে পরিমাণে বড়ো করতে গিয়ে সম্মানে ছোট করেছ আমার এই অভিমত ক্ষোভের সঙ্গে তোমাকে জানাতে হোলো। তোমার রচনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই তোমাকে দুঃখ দিতে দুঃখবোধ করচি।"[১৪] এভাবেই প্রিয় অনুজ সাহিত্যিককে তাঁর রচনার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে পরবর্তীকালে তাঁকে সদর্পে ও সগর্বে বিচরণের ক্ষেত্রটি তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথের নানা সমালোচনা ও উপদেশ তারাশঙ্করের সারা জীবনের পাথেয় হয়েছিল। আর তারাশঙ্করও আজীবন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় ছিলেন নতমস্তক। রবীন্দ্র সাহিত্যে উদ্ভাসিত মানবপ্রেম, মর্ত্যমমতা, বিশ্বজাগতিকতা ও নান্দনিকচেতনা তারাশঙ্করকে বারেবারে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে, করেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তারাশঙ্করের এই শ্রদ্ধা বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নানা রচনা ও ভাষণে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে তারাশঙ্করের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' গ্রন্থের প্রথম বক্তৃতার সূচনা অংশটি—"বিশ্বভারতীর এই অতি পবিত্র মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করবার পূর্ব মুহূর্তে সর্বাগ্রে এই মৃত্তিকাকে এই প্রতিষ্ঠানকে এবং এই তীর্থতুল্য স্থানের

যিনি তীর্থ-দেবতাস্বরূপ, সেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। এখানকার মৃত্তিকা একজন বাঙালী হিসাবে ও একজন লেখক হিসাবে, আমার কাছে তীর্থভূমি। এই তীর্থভূমির ধূলা আমার ললাট ও চিত্ত রঞ্জিত করুক, আমাকে নম্র করুক।"[১৫] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তারাশঙ্করের এই মন্তব্যই বোধকরি সবদিক দিয়ে হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ স্মারক।

এইভাবেই তারাশঙ্কর আজীবন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় ছিলেন নতমস্তক আর রবীন্দ্রনাথও অকৃপণ স্নেহধারায় সিঞ্চিত করে রেখেছিলেন তারাশঙ্করকে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সোহাগে তারাশঙ্কর যেমন বারে বারে হয়েছেন অভিষিক্ত, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ও শাসনকেও তারাশঙ্কর চিরকাল মহাকবির অমূল্য অশীর্বাদ জেনে বক্ষ পেতে গ্রহণ করেছেন। এভাবেই দু'জনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল এক অকৃত্রিম ও প্রাণবন্ত সম্পর্কের মরমী আখ্যান।

উল্লেখপঞ্জি :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, (তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী ২০১১), পৃ.-৫২
২. তদেব, পৃ.-৯১
৩. তদেব, পৃ.-৯২
৪. তদেব, পৃ.-৯২
৫. তদেব, পৃ.-৯৫-৯৬
৬. তদেব, পৃ.-৯৯
৭. তদেব, পৃ.-১০২-১০৩
৮. তদেব, পৃ.-১৬৭
৯. তদেব, পৃ.-১৬৭
১০. তদেব, পৃ.-১২০
১১. তদেব, পৃ.-১২১
১২. তদেব, পৃ.-১২১

১৩. চন্দ, রাণী, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ)

১৪. দাশগুপ্ত, সুরজিৎ, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৫), পৃ.-১৬৫

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, (দ্বাবিংশ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৩৪৩

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বিমল সিংহের ‘লংতরাই’ উপন্যাস : সমাজজীবন ও সংস্কৃতির আখ্যান

চাঁদমালা খাতুন
সহকারী অধ্যাপক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়,

ত্রিপুরার সাহিত্যাকাশে একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বিমল সিংহ। কথাকার বিমল সিংহের অন্যতম উপন্যাস ‘লংতরাই’(১৯৮৪)। ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী রিয়াং আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের নিয়ে ‘লংতরাই’ উপন্যাসটি রচিত। লংতরাই পাহাড় জুড়ে রিয়াং আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। এই রিয়াং আদিবাসীদের রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোকবিশ্বাস, উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির একটি সম্পূর্ণ চিত্র আলোচ্য উপন্যাসে রূপায়িত।

রিয়াং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনীতির মূলভিত্তি হল জুমচাষ। চাষের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে উৎপন্ন ফসল গোলাজাত করা পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সময় তাদের ব্যয় করতে হয়। যৌথভাবে শ্রমদানের একটি প্রক্রিয়া রিয়াং সমাজে বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসছে। রক্ত, ঘাম ঝরিয়ে ফসল ফলানোর পাশাপাশি জীবনকেও তারা ভালোবাসে। কখনো বাঁশি বাজিয়ে, কখনো প্রেমের সাগরে গা ভাসিয়ে দিয়ে বা গান গেয়ে সুখে শান্তিতে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। সহজ সরল জীবনে অভ্যস্ত রিয়াং আদিবাসীদের লংতরাই পাহাড়ই বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনো কারণে শস্য উৎপাদন না হলে তারা বন-জঙ্গলে ঘেরা পাহাড় থেকে বিভিন্ন ধরনের ফল মূল সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে থাকে। আবার পাহাড়ের গা বেয়ে বয়ে চলা নদী থেকে মাছ, কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। লংতরাই পাহাড়ের এই বন সম্পদে তাদের একছত্র অধিকার ছিল। নারী পুরুষ

নির্বিশেষে চাষের জমিতে শ্রমদান করে থাকে। কাজের সময় তাদের মধ্যে আপন পর বিভাজন দেখা যায় না। যৌথ শ্রমদান রিয়াং আদিবাসীদের জীবনে অনন্যতা নিয়ে এসেছে। লেখকের বর্ণনায়—

> “বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকেই এভাবে চলে আসছে তা। একের কাজে অন্যরাও ঝাপিয়ে পড়ে। গভীর অরন্য জীবনে একা বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, ফলে এই প্রথা তাদের জীবনে বড়ো একটা অংশ জুড়ে আছে”।[১]

দিনের সকালটা তাদের জুমক্ষেতে কেটে যায়। আর দুপুরের তীব্র রোদে তাদের আশ্রয় হয়ে ওঠে গাইরিঙ বা টংঘর। সেই সময় ঝাঁক বেঁধে বন ঘুঘু, বুলবুলি পাখিরা তিল খাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লে তারা দড়িতে মৃত্তিঙ্গা বাঁশের ঠপঠপি ওয়াথা বাজায়। তাতে কাজ না হলে তারা হাতের সাহায্যে ঠপঠপি বা ওয়াই আফফা বাজিয়ে ফসল রক্ষা করে। বনপতঙ্গ ‘য়ংসারুই’ যখন ডাকে তখন তারা বুঝতে পারে সন্ধ্যা আগত। সতরাং এবার তাদের ঘরে ফেরার পালা।

‘দোয়াইনক’ হল রিয়াং আদিবাসী যুবকদের যৌথ শ্রম জীবনের সূচনা কেন্দ্র। গ্রামের মাঝখানে রয়েছে এই দোয়াইনক। এটি একটি টঙ্ঘর। যুবকেরা এখানে একত্রে থাকার শিক্ষালাভ করে। এদের মাচা হল সিম্বাক। এই দোয়াইনকে বসে এরা চমপ্রেঙ(পাহাড়ি গিটার), সুমুল(বাঁশের বাঁশি), খাম(পাহাড়ি মাদল) শিখে নেয়। এ ছাড়া বাঁশ, বেত দিয়ে নানান ধরনের সামগ্রী যেমন— পাখা, ছোট বড়ো ঘাড়া, চেঙপাই ইত্যাদি তৈরি করে। আবার মেয়েদের কাপড় বোনার যন্ত্র চুলের কাঁটা ও হরিণের পায়ের হাড় দিয়ে চিরুনিও বানায়। যুবকেরা কাইসনী তৈরি করে-যা জমিতে বীজ বোনার সময় কোমরে বাঁধতে হয়। লেখকের বক্তব্য—

> “দোয়াইনক একদিকে যৌথ জীবনযাত্রা সূচনা করে অন্যদিকে শিল্পসংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখে আদিম ধারায়”।[২]

তাদের এই শিল্পধারা জীবনের প্রয়োজনে বেঁচে থাকে। রিয়াং আদিবাসীরা প্রয়োজনের তাগিদেই সংঘবদ্ধ হয় এবং যুগযুগ ধরে এই শ্রমকে স্বীকৃতি জানিয়ে এসেছে।

'লংতরাই' উপন্যাসে রিয়াং আদিবাসীদের অভাব-অনটনের দিকটিও ফুটে ওঠে। আবার কখনো কখনো তা দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছায়। একদিকে রুক্ষপ্রকৃতি অন্যদিকে মহাজনী শোষণ, সরকার নিযুক্ত বনবাবুও বননির্ভর ব্যাবসায়ীর দল সরলতায় ভরা রিয়াং আদিবাসীদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দিতে চায়। প্রকৃতির সঙ্গে বন্য জীব-জন্তুও বিশেষ করে বন্য হাতির উপদ্রপ তাদের জনজীবনকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। কেননা বন্য হাতির দল শুধুমাত্র উপদ্রপই করে না, সেই সঙ্গে মানুষকেও মেরে ফেলে। তসীরামের বক্তব্যের মধ্যে সেকথা স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে—

> "বলরাম গ্রামে হালাম ছেলেটা কি নৃশংসভাবে মারা গেল, তার গলা ছড়া গ্রামেই রবি রায়ের ঘর ভেঙে লুটিয়ে দিয়ে ওর বৌকে আছাড় দিয়ে মেরে গেলে"।[৩]

কথাকার বিমল সিংহ তাঁর 'লংতরাই' উপন্যাসে আদিবাসীদের অভাব-অনটনের দিকটিও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। লেখকের ভাষায়—

> "জৈষ্ঠমাস। পাহাড় জুরে অভাব। জরকা মুনিরও ঘরে খোরাক শেষ। উঠোনে ধানকাটার গাইল পরিত্যক্ত, শ্যাওলা ধরা। ঘরে ধান ফুরিয়ে যাওয়ার নিষ্ঠুর সংকেত। মুরগীর কুঠুরীর দোয়ার দিবানিশি খোলা। মুরগী শেষ অভাবের জ্বালায়। ওয়া করৌ এর কাদা শুকিয়ে খা খা"।[৪]

অভাবের সময় তারা কাঠাঁল বিচি, কচুসেদ্ধ খেয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়। উপোস বাঘিনীর মতো তারা হিংস্র হয়ে ওঠে, চেহারায় তার আভাস মেলে। বৃদ্ধ না হয়েও চোখ কোটরগত। জরকা মুনির মা দুপুরে ঘোলাটে চোখ মেলে ভয়ংকর বার্তা শোনে আয়ুংমাই-এর। তার মতে—

> "আয়ুংমাই বনপতঙ্গ, দুর্ভিক্ষের বার্তা বহনকারী। কেউ বলে নিদানপোকা, কেউ বলে ভাত খুঁজা পোকা"।[৫]

একদিকে তাদের শেষ সম্বল কাঁঠালবিচি যখন ফুরিয়ে যায় অন্যদিকে তেমনি বাঁশের করুলও তলানিতে এসে ঠেকে। এরপর তারা বনের গভীর থেকে গভীরে খাদ্যের

অন্বেষণ করতে থাকে। বনের পাতা, কলার মোচা, চামল ফল, থাইথয় বন্যফল, খুইচাং গোটা বা বন ডুমুর ইত্যাদি যা পাই তাই খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। লাল বন্য আলু সিদ্ধ হতে চাই না। তাই যদি কেউ সাদা বন্য আলু পাই তাহলে সেদিন তারা আনন্দে মেতে ওঠে এবং সকলে ভাগ বাঁটোয়ারা করে খায়— এ হল গোষ্ঠীজীবনের স্বীকৃতি ও বেঁচে থাকা।

লংতরাই পাহাড়ে বসবাসকারী রিয়াং আদিবাসীরা একসময় স্বাধীনভাবে জুমক্ষেতে ফসল ফলিয়েছে। কিন্তু এখন তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে বনদপ্তর। সরকারের পক্ষ হয়ে বনবাবুরা সেখানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। লেখকের ভাষায়—

> "বনদপ্তর কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে লংতরাই পাহাড়ের শিখরে। বাজারে ঢোল পিটিয়ে ফরমান জারি করে জুমকাঁটা নিশেধ। বাঁশছন কাঁটা নিশেধ। বনজ সম্পদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেয় একটা চিরকুট কাগজের মতো নোটিশ দিয়ে। নিষ্ঠুর আইনের হাড়িকাঠে জবাই শুরু হল লংতরাই পাহাড়ের অসহায় জুমিয়াদের"।[৬]

দা'কুড়ুল কেড়ে নেওয়া হয় জুমিয়াদের কাছ থেকে। পাহাড়ি যুবক তসীরাম দা ফেরত আনতে গেলে গ্রেফতার করে তাকে কোর্টে চালান করে দেয়। জামিনে ছাড়া পাবার জন্য জুমের ফসল মহাজনের কাছে বন্ধক দিয়ে তাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। শুধু বাঁশ, ছন, গাছ কাটাই নিষিদ্ধ হয় না, সেই সঙ্গে পশু শিকার করাও নিষিদ্ধ করা হয়। দাঁতাল বুনো শুয়োর মারতে গিয়ে চৈত্র মগকেও গরু বেঁচে মাশুল দিতে হয়েছে। নানা কারণে রাবেহা রিয়াং, চৈত্র মগ, জরকামুনি ও তার বাবা-মাকে বন দপ্তরের কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছে। পাড়ার সকলে একত্রে বনদপ্তরের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে দরখাস্ত দিলেও তাতে কোনো লাভ হয় না। অবশেষে আদিবাসীরা নিরুপায় হয়ে বনদপ্তরের হয়ে জুমচাষ করে এবং নানা ধরনের গাছ লাগানোর কাজে রোজ পাঁচ টাকার বিনিময়ে নিযুক্ত হয়।

আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় দরিদ্র, নিঃস্ব ও সর্বশান্ত অসহায় মানুষগুলি বাঁচার তাগিদে ঋণের জন্য মহাজনের দোরে দোরে ঘুরতে থাকে। আর তাদের এই ক্ষুধার দিনগুলিতে স্বার্থান্বেষী মহাজন তথা ব্যাবসায়ীরা ঋণ প্রদানের জন্য হাত বাড়িয়ে

অপেক্ষায় থাকে। কারণ এই সাধারণ মানুষদের বিপদের সময় তারা চড়া সুদে ঋণ দিয়ে নিজের আখের ভরাট করবে। আর দারিদ্র্য ক্লিষ্ট এই সকল মানুষেরা নির্দ্বিধায় সেই ঋণ গ্রহণ করে। লেখকের বর্ণনায়—

> "সারা বাজারে রিয়াংদের ভীড়। অধিকাংশেরই চোখ কোটরগত। বুকের পাঁজরের সব কটি হাড় টেনে বেরিয়ে আসছে, যেন আস্ত কয়েকটা কঙ্কাল বাজারে সোজা চলে এসেছে"। [৭]

কেউ আবার মহাজনের কাছে রুপা, মালা বেঁচে বা বন্ধক দিয়ে টাকা নেই। কেউ মোরগ বা শুয়োর বিক্রি করে টাকা নেই। এরা সম্পদের বিনিময় বোঝে কিন্তু আর্থিক লেনদেনের মতো জটিল একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া তাদের কাছে কঠিন। ফলে তারা ঋণ নামক এক অদ্ভূত জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এ যেন এক চক্রব্যূহ্য, প্রবেশ করা যতটা সহজ, কিন্তু বেরিয়ে আসা ততটা সহজ নয়। যতই বেরিয়ে আসতে চায় ততই সেই ঋণের জালে আরো বেশি করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। মহাজনেরা নিজেদের মতো করে শোষণের এলাকা ভাগ করে। বাজার বার এলে আদিবাসীরা তাদের উৎপাদিত শস্য বহন করে নিয়ে আসে। জরকামুনি ও তার বাবা অনেক আশা নিয়ে পরিশ্রমের ফসল তিল ও কার্পাস বিক্রি করতে নিয়ে যায়। তারা ভাবে উৎপাদিত শস্য বিক্রি করে যা অর্থ পাবে তা দিয়ে মহাজনের ঋণের টাকা শোধ করে বাকি টাকা দিয়ে সংসারের জিনিস পত্র কিনবে এবং সেই সঙ্গে জরকামুনি তার ভালোবাসার মানুষ সাজেরুং-এর জন্য সাজ-গোছের কিছু জিনিস কিনবে। তাদের সমস্ত আশা বিফলে যায়। কেননা মহাজন তাদের চোখের সামনে ঠকায় এবং টাকাও তারা কম পায়। কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো সাহস তাদের নেই। কেবল ভেতরে ভেতরে বেদনা পাক খায়। অনেক ইচ্ছা তাদের অপূর্ণ থেকে যায়। বেদনা ও হতাশা নিয়ে চেয়ে থাকে। লেখক বর্ণনায়—

> "জরকামুনি ও তার বাবা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এসব কথা কানে ঢোকে না, তাদের বিশ্বাস ছিল অন্য রকম। বড়ো আশা করে -"। [৮]

মহাজনের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে যায় রাংকারায়-এর ছেলে। জলের দরে ফসল বিকানোর তিক্ত অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া মানুষ রাংকারায় ছেলেকে বুঝিয়ে বলে—

> "তর্ক করে লাভ নেই বাবা। বরং বিপদে আপদে আর কোনদিন ঋণ পাবে না। মহাজন চটে গেলে বড় বিপদ"। [৯]

সে আরো বলে—

> "মহাজনের অনেক ক্ষমতা। থানা, পুলিশ হাকিম সব ওদের কথায় ওঠে বসে"। [১০]

একদিকে মহাজন যেমন তাদেরকে ঠকায় অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন দোকানদারও ঠকিয়ে নেয়। জমিতে ফসল ফলিয়ে মহাজনের ঋণশোধ করে যে পরিমাণ অর্থ থাকে তাতে বিলাস দ্রব্য জিনিস কেনা তো দূরের কথা, সংসারের অপরিহার্য কোনো কোনো জিনিসই কেনা তাদের ক্ষেত্রে দুষ্কর হয়ে ওঠে। মহাজনের কাছে ঠকে গিয়ে নন্দীরাম রিয়াং তার বৌ-এর চাহিদা মেটাতে না পেরে তাকে পেটায়। নন্দীরামের বৌ প্রহৃত হয়েও আক্ষেপ করে সে বলে—

> "... রোদ, বৃষ্টিতে বুকের রক্ত জল করে জুম করেছি, আর আজ ফসল বিকানোর সময় আমি একভাগের মালিকও হতে পারি না"। [১১]

নিত্য লেগে থাকা অভাব-অনটনের মধ্যে তাদের আনন্দ ভালোবাসা কমে যায় না। রিয়াং সমাজে শ্রম আর সংগীত পারস্পারিকভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার এই গানই হয়ে ওঠে তাদের প্রেমের বাণীবাহক। কাজের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে গান। আবার গানের সুরে তরুণ-তরুণীরা হৃদয়ে উষ্ণতা অনুভব করে থাকে। এই গানের কথায় লুকিয়ে থাকে কোনো সংকেত বা ইঙ্গিত। রিয়াং সমাজে গানের মাধ্যমে কথা বলার রীতি প্রচলিত আছে। দীর্ঘদিন ধরে বংশ পরম্পরায় এই রীতি চলে আসছে। উপন্যাসের প্রথমদিকে আমরা দেখি নায়ক জরকামুনি জুম চাষ করতে এসে নায়িকা সাজেরুঙকে তার হৃদয়ের কথা তথা প্রণয়ের কথা গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে—

> "কোন পাহাড়ের পাখি তুমি
> লেজ নাচিয়ে কেন তুমি এলে
> কোন নদীর ঝাঁক হারা মাছ
> কেন তুমি অচিন জুমে এলে
> বাঁক চোখের চাহনি দেখে দেখে চেনা চেনা লাগে"। [১২]

সাজেরুঙ বুঝতে পারে, তাকেই উদ্দেশ্য করে জরকামুনি গান গাইছে। আবার সাজেরুঙও গানের মধ্যদিয়ে জরকামুনির কথার উত্তর দেয়—

"হাপিং থাকলেঙ খাক নিলে কাইয়া
নুংবাই মালায় নিছক ইয়া"।[১৩]

সাজেরুঙের এই গানের প্রত্যুত্তরে জরকামুনিও আবার বলে—

"তক মূঙতরজাং খওয়াই পাইহা
চনা তামা নি খওয়াইয়ালা"।[১৪]

একসময় সাজেরুঙ যখন লজ্জিত হয়ে জুমক্ষেত ছেড়ে তার গাইরিঙে চলে যায়, তখন বিরহের যন্ত্রণা উছলে ওঠে জরকামুনির অন্তরে। তার গানের মধ্য দিয়ে তা ব্যক্ত হয়েছে—

"তুইনি আবালাং নুংব থাংখে
আংব থাংখে তংলে সই লাংলাং"।[১৫]

তাদের প্রণয় বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি পায়। রিয়াং সমাজের বিবাহ রীতি মেনেই সাজেরুঙ ও জরকামুনির বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। রিয়াং সমাজের প্রথা অনুযায়ী বিবাহের পর জরকামুনিকে শ্বশুর বাড়িতে তিন বছর থাকতে হয়। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজে এই প্রথা প্রচলিত। একে জামাই খাট্টা প্রথা বলা হয়। জামাই তার শ্বশুর-শাশুড়ির মন জোগাবে, তাদের দেখভাল করবে এবং শ্বশুরের সংসারই তার নিজের সংসার হবে। তেমনি 'লংতরাই' উপন্যাসে দেখা যায় জরকামুনি দিন-রাত পরিশ্রম করে তার শ্বশুর-শাশুড়িকে খুশি করার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকজন তার অর্থাৎ জরকামুনির ত্রুটি বের করার চেষ্টা করে। ফলে সংসারে নিত্য অশান্তি লেগেই থাকে।

'লংতরাই' উপন্যাসটি ত্রিপুরার রিয়াং সমাজের একটি যথার্থ দলিল। এই উপন্যাসে রিয়াং সমাজের রীতি-নীতি, লোকবিশ্বাস, আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, পোশাক, খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ চক্রেই সংসারে মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। সাজেরুঙ ও জরকামুনির বিবাহের প্রসঙ্গে রিয়াং সমাজের রীতি-নীতি লক্ষ করা যায়। কনে দেখতে যাবার সময় পাত্রপক্ষের বাবাকে কাছিম

শিকারে ব্যবহৃত বল্লম আর একটি দা নেওয়ার প্রথা রয়েছে। পাত্রপক্ষের বাবার মাথায় পাগড়ি থাকতে হবে। এই পাগড়ি বিয়ের সূচনার ইঙ্গিত। তেমনি উপন্যাসে দেখা যায় জরকামুনির বাবা রাংকারায় এই নিয়ম পালন করে। আবার অতিথি আপ্যায়নের মধ্যেও থেকে যায় তাদের প্রথার অনুসরণ। লেখকের বর্ণনায়—

"পাড়ার সর্দার চান্দতা গাঁইয়ের প্রত্যেককে নির্দেশ দেয় অতিথিদের আপ্যায়নের ভার নিতে। কোনো অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত নয়"।[১৬]

আবার বিয়ে অনুষ্ঠানে অতিথিদের মদ্য পরিবেশন করার রীতি রিয়াং সমাজে প্রচলিত। তাদের সমাজে কিছু নিয়ম রয়েছে। পাত্রপক্ষ বিয়ে করতে আসলে সরাসরি মেয়ের বাড়িতে উঠতে পারে না। তাদের অন্য একটি বাড়িতে উঠতে হয়। সন্ধ্যাগত হলে পাত্রকে বিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়। বিয়ের সময় কনে থাকে না। তার বদলে বরের ডান দিকে একটা বক্ষ আবরণী থাকে। ওই বক্ষ আবরণী কনের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। বিয়ের সময় গান গাওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত এবং পারস্পরিক ভালোবাসার শর্ত উচ্চারিত হয়ে বিয়ে পর্ব সমাপ্ত হয় এবং শেষে শুয়োর কেটে ভোজের আয়োজন করা হয়।

নবজাতকের নামকরণ প্রসঙ্গে কিছু রীতি-নীতি রিয়াং সমাজে রয়েছে। 'লংতরাই' উপন্যাসে সাজেরুঙের সন্তান রাংথাংহার জন্মের সময় ঠাকুমা রুপোর মালা বন্ধক দিয়েছিল বলে তার ছেলের এই রূপ নামকরণ করা হয়। এর অর্থ হল রূপহারা। নামকরণের পরে বেইবুনামা অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে নবজাতকের জন্য মঙ্গল কামনায় পৃথিবীর সমস্ত দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার রিয়াং আদিবাসীদের সংকুচিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। লংতরাই পাহাড়ে যখন মহামারি আসে তখন এখানকার জাতি-উপজাতিরা প্রাচীন লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মহামারির প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'লাউতাউ' দেবতার পুজো করে। রিয়াং সমাজের মানুষের বিশ্বাস লাউতাউ দেবতা মৃত্যুকে ঠেকানোর জন্য সংগ্রাম করেছিল। মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গিয়েই নাকি লাউতাউ নিজের দেহ উৎসর্গ করেছিল। সেই লাউতাউকে খুশি করার প্রথা এখনও রিয়াং

সমাজে প্রচলিত। কিন্তু মৃত্যু আসে ভয়ংকর বেশে। মৃত্যু দূতের বিরুদ্ধে লড়াই করে কখনো তারা বাঁচতে পারে না। তাই দুঃখে তারা গান করে—

"তামা কাংসালে চে-রে খে বুসানাই কাংসারী তঙ
বরাতী চে-রে ম বুসানাই কাংসারী কুরুই
হাচিং দে সোয়াক বাই থাকুং দে ফা ওয়াক বাই
বর অ ককইয়ে ফব র স্নাবনাং সি নি"।[১৭]

মৃত্যুকে যে মেরামত করা যায় না গানের মধ্যে দিয়ে তা বোঝানো হয়েছে।

রিয়াং সমাজে নিয়ম আছে কেউ যদি মারা যায় তাহলে ঢোলক বাজিয়ে মৃত্যু সংবাদ আদিবাসী গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া। রিয়াং রীতি অনুযায়ী রাতভর ঢোলক, বাঁশি বাজান হয়। বাঁশির সুর বিষণ্ণতায় ভরা। বিষণ্ণ বাঁশির সুর খমুপাড়ার মানুষের ঘুম কেড়ে নেই। নদীর চরে কাঠের চিতা ছয় স্তরে সাজানো হয়। মৃতদেহকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে কাঠের চিতার উপর রেখে এক স্তরে কাঠ দিয়ে ঢেকে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করানো হয়। মৃতদেহ পুড়ে গেলে উপস্থিত সকলে জল ছিটায়। তারপর যুবকরা শ্মশান ঘর বানায়। উঁচু মাচার উপর ছোটো টংঘর। সিমালুংনকে সপ্তাহে একবার করে মৃতের উদ্দেশ্যে চোঙে জল ও পাতায় ভাত দিতে হয়—এটাই রিয়াং সমাজের রীতি। হারানো মানুষের স্মরণে এমন করেই স্বজনরা জল ও ভাতের সাথে দুফোটা চোখের জলও উৎসর্গ করে।

আলোচ্য উপন্যাসে সাজেরুঙের সন্তান প্রসবকে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের চিত্র লক্ষ করা যায়। সাজেরুঙ প্রসবের যন্ত্রণায় যখন ছটফট করে তখন কুমায়ূক তাকে জিজ্ঞাসা করে বলে— "দশমাসের ভিতর কারো কোন আদা, হলুদ চুরি করেছ?"[১৮] তাদের সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে যে গর্ভাবস্থায় কোনো মেয়ে যদি আদা ও হলুদ চুরি করে খায় তাহলে সন্তানের হাত, পায়ের আঙুল বেড়ে যায়। তার ফলে প্রসবের সময় কষ্ট হয়। গর্ভবতী মহিলা টক খেতে ভালোবাসে। প্রসবের কদিন আগে টক খেলে শিশুর শরীর ফুলে যায় এবং সেই সঙ্গে রক্ত জল হয়ে যায় বলে তারা বিশ্বাস করে। ফলে প্রসবের সময় চাপ কম হয়। তাই সাজেরুঙের বাচ্চা হতে দেরি হচ্ছে বলে তারা মনে করে। আবার মন্ত্রপড়া কোনো

বস্তু কাউকে খাইয়ে দিলে বশে আনা যায়— এই ধরনের সংস্কার তথা লোকবিশ্বাস রিয়াং উপজাতিদের মধ্যে ছিল। 'লংতরাই' উপন্যাসে দেখা যায় যে মৈতহাম রিয়াং ছড়া গ্রামের সুন্দরী মেয়ে রূংবাংতীকে ভালোবাসে। কিন্তু তার পথের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় রূংবাংতীর মা ও বাবা। এমনকি রূংবাংতীও তার নাম শুনলে রেগে যেত। তখন সে বিদ্যাজয়ের কাছ থেকে মন্ত্র পড়া নুন মরিচ নিয়ে আনে এবং তাকে খাইয়ে দিয়ে বশে আনে। রূংবাংতী মৈতহামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। বিদ্যাজয়ের এই মন্ত্র পড়া জিনিস দিয়ে যে কাউকে বশে আনা যায় তা উপন্যাসের নায়ক জরকামুনিও বিশ্বাস করে। তাই জরকামুনিও আতঙ্ক মিশ্রিত বিশ্বাস নিয়ে তার ভালোবাসার মানুষ সাজেরুঙকে কাছে পাবার জন্য বিদ্যাজয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে।

লোকবিশ্বাস, সংস্কার, রীতি-নীতিতে পরিপূর্ণ আদিবাসী রিয়াং সমাজ। তারা নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী। অশিক্ষা তাদের চিরসঙ্গী। ভ্রাম্যমানতা তাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খমু পাড়ায় মহামারি দেখা দিলে তারা জরকামুনিকে প্রথমে সবার প্রতিনিধি করে নতুন আবাস সন্ধানের জন্য পাঠায়। জরকামুনি স্ত্রী ও সন্তানকে সাথে নিয়ে আসামের গহন অরণ্যে আবাসের সন্ধানে যায়। তারা নিশ্চিত আবাসের সন্ধান পেলে খমু পাড়ার সকলে তাকে অনুসরণ করবে। বছর দুই পরে ফিরে এসে জরকামুনি সকলকে নিয়ে নতুন আবাস স্থলে রওনা হয়।

রিয়াং উপজাতির লেখাপড়া জানা শিক্ষিত যুবক হাসমাই জরকামুনির সঙ্গে কথোপকথনে বুঝতে পেরেছে যে, তারা আর জুম করতে এখানে আর পারবে না, তাই তারা বাঁচার জন্যে নতুন পথের দিসা খুঁজবে। কারণ তাদের পূর্বপুরুষ জুম করে জীবন নির্বাহ করেছে। তাই জরকামুনি প্রশ্ন করে—"সে পথ ছেড়ে আমরা কী করে বাঁচবো?"[১৯]

হাসমাই জরকামুনিকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, দিনকাল বদলে যাচ্ছে, সারাজীবন জুম করে বাঁচা সম্ভব নয়। তাছাড়া পাহাড় জঙ্গল দিন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে জুমচাষ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলো। আলোচ্য উপন্যাসে হঠাৎ হাসমাই রিয়াং গতানুগতিকতার মোড় ফেরানোর শক্তি নিয়ে

হাজির হয়েছে। হাসমাই রিয়াং আদিবাসীদের বন্যজীবনের সীমানা ছাড়িয়ে সভ্য জগতের সন্ধান দিয়েছে। জরকামুনিকে জীবনের কর্মব্যস্ততা দেখিয়ে দেয়। সাজেরুঙ ও জরকামুনি গ্রামে ফিরে এসে উন্নয়ন দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সাজেরুঙ তখন স্বপ্নের রামধনু দেখে। কেননা সে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা করেছে। উপন্যাসের শেষে লেখক বলেছেন—

> "রঙিন স্বপ্নের ঘোরে বিভোর তখন সাজেরুঙ। চোখে যেন দীপ্ত হয়ে ভাসছে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি।.....ইস্কুলের ময়দানে কচি হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে থাকবে, পাথর ফুঁড়ে কচি ঘাস যেমন অপার বিস্ময়ে সূর্যের দিকে তাকায়"।[২০]

কথাকার বিমল সিংহ তাঁর 'লংতরাই' উপন্যাসে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১) 'লংতরাই', বিমলসিংহ, নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৭
২) তদেব, পৃষ্ঠা-১২
৩) তদেব, পৃষ্ঠা-১৫
৪) তদেব, পৃষ্ঠা-২১
৫) তদেব, পৃষ্ঠা-২১
৬) তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩
৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫
৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫
১০) তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫
১১) তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮
১২) তদেব, পৃষ্ঠা-৯
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৯
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৯

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১০
১৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৪০
১৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৬২
১৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৫২
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৮
২০) তদেব, পৃষ্ঠা-৭১

গ্রন্থপঞ্জি :

১। বিমল সিংহ : 'লংতরাই' নবচন্দনা প্রকাশনী, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮৪
২। শিশির কুমার সিংহ : 'ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস', অক্ষর পাবলিকেশান, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮
৩। অন্তর্মুখ, ত্রিপুরার সাহিত্য, পর্ব-৫, সংখ্যা-১, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৫
৪। শ্যামল ভট্টাচার্য : 'ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্য', স্রোত পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রকাশ ২০১৭

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আর্ন্তজাতিক স্তরে উদ্যোগ

তনুশ্রী মন্ডল
গবেষক, আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

নারীকেন্দ্রিক সমস্যা বা আলোচনা একটি আর্ন্তজাতিক বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজে সংঘঠিত বিভিন্ন রকম অপরাধের মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা হল একটি ভয়ানক অপরাধ। যেটি নির্মূলের জন্য জাতীয় রাজনীতিতে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই অপরাধটি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক স্তরেও এই বিষয়ক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রতিবেদনে নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা দূরীকরণ, অধিকার সহ নানান সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক স্তরে প্রয়োজনীয় গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

নারী নির্যাতন, নির্যাতনের ধরণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, বেজিং সম্মেলন, বিভিন্ন রকম সম্মেলন।

মূল প্রবন্ধ

জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক স্তরেও নারীকেন্দ্রিক আলোচনা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারীদের শিক্ষা, উন্নতি, নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন সহ নানান বিষয়ে আর্ন্তজাতিক স্তরেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অতীতে নারীকেন্দ্রিক আলোচনা এত প্রাধান্য না পেলেও বর্তমানে এটির গুরুত্ব অধিক মাত্রায় পর্যবসিত।

নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, হিংসা এটি একটি সামাজিক অপরাধ। একজন নারী নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে। নারী নির্যাতনের ঘটনা বর্তমান সময়ে বহুল মাত্রায় আত্মপ্রকাশিত হচ্ছে। নির্যাতনের পরিমাণও দিন দিন বেড়েই চলেছে। নানা জায়গায়, নানাভাবে নারীরা এই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। নারীদের অগ্রগতি, উন্নতিকল্পে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন মনীষীবৃন্দগণ যথেষ্ট মাত্রায় অবদান রেখেছেন। এই বিষয়ে স্বামীজী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়ের অবদান উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় সংবিধানে নারীদের সুযোগ- সুবিধার জন্য নানারকম ব্যবস্থার অবকাশ রাখা হয়েছে। শিক্ষার অধিকার, ১৪ নং থেকে ১৯ নং ধারা অবধি মৌলিক অধিকার। যা নারী-পুরুষ উভয়েই মেনে চলেন। এছাড়াও নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের প্রতিকারকল্পে বিভিন্ন রকমের আইন কানুনের অবকাশ রাখা হয়েছে।

একজন নারী নানাভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিতা হয়ে থাকেন। পরিবার কর্তৃক হোক বা পরিবার বর্হিভূত নারীদের উপর নির্যাতনের ঘটনা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

নিম্নে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

পর্যায়	**নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ধরন**
প্রাক জন্ম	গর্ভে থাকাকালীন ভ্রুণের লিঙ্গ জানার চেষ্টা।
শৈশব	নারীকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে হত্যা করা এবং নারীভ্রুণ হত্যা করা।
বালিকাবস্থা	পরিণত বয়স হবার আগেই বিবাহ দেওয়া, নগ্নচিত্র করা বা পর্ণগ্রাফী করা।
কৈশোর এবং সাবালবত্ব	অজাচার, কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা, ধর্ষণ করা, অ্যাসিড ছোড়া, পণকেন্দ্রিক হত্যা, শারীরিকভাবে ক্ষতিসাধন করা, বৈবাহিক ধর্ষণ করা।
বয়স্কা	শারীরিকভাবে অপব্যবহার করা, অর্থনৈতিক কেন্দ্রিক অত্যাচার[১]।

উপরিউক্ত নারী নির্যাতনের ছক দেখে বোঝা যায় যে, নারীদের উপর নানাভাবে নির্যাতন করা হয়ে থাকে। এই নির্যাতন নানা জায়গায়, নানা প্রান্তে, নানাভাবে সংঘঠিত হয়। বর্তমান সময়ে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। যা আমরা বিভিন্ন ভাবে জেনে থাকি। বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা প্রায়শই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) এবং ফৌজদারী কার্যবিধির (CrPC) তে নানারকম অপরাধের বিষয়ে শাস্তি বিধানের পাশাপাশি তার প্রয়োগবিধি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে নারী নির্যাতন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের বিরুদ্ধে প্রতিকারের ক্ষেত্রে নানারকম আইনের অবকাশ লক্ষ করা যায়। দেশেই শুধুমাত্র নারীদের সমস্যা সমাধান, নারীজাতির নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, নারী শিক্ষা, উন্নতির ক্ষেত্রে মানুষজন সোচ্চার, গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা নয়, বরং দেশের বাইরে গণ্ডী অতিক্রম করে আর্ন্তজাতিক স্তরেও নারীকেন্দ্রিক সমস্যা, সমাধান, আলোচনায় যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গড়ে ওঠে। এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হল একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা (Intergovemmental organization) এবং এই সংস্থার সনদে (Charter) উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর্ন্তজাতিক রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন- পরিবেশ, সুরক্ষা, মানবাধিকার বিষয় সহ নানা বিষয়ে সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এটি একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা হওয়ার দরুণ এর সমস্ত উদ্যোগ, গৃহীত সিদ্ধান্ত বিশ্বের প্রতিটি দেশের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং এই সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত আর্ন্তজাতিক রাজনীতির বিবাদমান পক্ষ এবং প্রতিটি দেশের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই এরকম একটি সংস্থার নিকট নারীকেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা খুবই গুরুত্ব রাখে।

আর্ন্তজাতিক স্তরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নারীদের লিঙ্গ বৈষম্য এবং অধিকার বিষয়ে সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট ভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৪৭ সালে নারীর মর্যাদা বিষয়ক একটি কমিশন গঠন করে (United Nations Commission on the status of women- CSW)। নারী উন্নয়ন এবং রাজনীতির

ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল এর মুখ্য লক্ষ্য। পরবর্তীকালে নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানারকম নীতি গ্রহণ করা হয়।[২]

নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম নারী সংগঠন গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সংগঠনগুলির তৃণমূল স্তরে কাজ করার সময়ে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত এই অপরাধগুলি সরকারের সামনে নিয়ে আসে। ৯০ র দশকে এই সংগঠনগুলির পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক স্তরে মানবাধিকার সংগঠনগুলিও এই বিষয়ে ভূমিকা রাখে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেবার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়।[৩]

১৯৪৫ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে সানফ্রান্সিসকোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের (Charter) প্রস্তাবনা স্বাক্ষর করা হয়। এবং এই প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়– এর মুখ্য লক্ষ্য হল পুনর্বাচন, "মৌলিক মানবাধিকারের উপর বিশ্বাস স্থাপন, মানব ব্যক্তির মূল্য এবং মর্যাদা দেওয়া, নারী-পুরুষের বিষয়ে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা"। (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদঃ ১৯৪৫)। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় (১৯৪৮ সালে) বলা হয় যে, "যে কোন ধরনের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন মতামতের উপর নির্ভর হয়ে, সামাজিক ভাবে বা জাতীয় দিক থেকে জন্মগত বিষয়ে অথবা অন্য কোন অবস্থানগত ক্ষেত্রে কোনরকম পার্থক্য করা হবে না"।[৪]

নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা দূরীকরণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাধারণ সভা কর্তৃক ১৯৭৯ সালে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এটি নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা, বৈষম্য নির্মূল করার ক্ষেত্রে একটি ঘোষণা করা হয় যা (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women- CEDAW) হিসেবে পরিচিত। (মেহের্তা ১৯৯৪; ফ্রেজের ২০০২)।[৫]

নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা দূরীকরণ করার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা দূরীকরণ ঘোষণায় (UN Declaration the Elimination of Violence against Women) "নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা" এই শব্দটিকে "লিঙ্গ নির্ভর হিংসা" (Gender based Violence) হিসেবে অভিহিত করে বলা হয় - লিঙ্গ ভিত্তিক এমন কোন ধরনের আচরণ বা কার্যকলাপ, যা নারীর শারীরিক ক্ষতি করে

অথবা লিঙ্গ ভিত্তিক কোন ধরনের ভীতি প্রদর্শন করে নারীকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করা এবং নারীকে সুষ্ঠ ও স্বাধীন ভাবে বসবাস করার ক্ষেত্রে বাধা তৈরী করা।[৬]

১৯৭৫-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পর্যায়কে নারী দশক (Women Decade) হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত নারী দশক চলাকালীন সময়ে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত অপরাধের বিষয়ে বিচারের জন্য একটি আর্ন্তজাতিক বিচারালয় ১৯৭৬ সালে ব্রাসলসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৪০টি দেশ থেকে প্রায় ২০০০ প্রতিনিধি সামিল হয়। এবং এই বিচারালয় বিচারের ক্ষেত্রে নির্যাতিতা ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি নির্যাতিত হয়েছেন তার ব্যক্তিগত (Victim Personel Testimony) প্রমাণের বিষয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও পারিবারিক নির্যাতন, ধর্ষণ, পর্ণগ্রাফী বিষয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৭]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৯২ সালে নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা এবং বৈষম্য দূরীকরণের ঘোষণা (CEDAW) দ্বারা গৃহীত কমিটি সমারণ সুপারিশ উনিশ (Recomendation) গ্রহণ করে। এবং এই সুপারিশে বলা হয় যে, "নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা এই বিষয়টি হল এমন একটি বৈষম্য যেটি পুরুষের সাথে নারীদের সাম্যর বা সমতার ক্ষেত্রে নারীদের অধিকারগত বিষয়ে এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ক্ষমতার দিক দিয়ে ভীষণ ভাবে বাধা দায়ক"।[৮]

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাধারণ সভা কর্তৃক ভিয়েনা সম্মেলন, বেজিং সম্মেলন, বিশ্ব মানবাধিকার সহ নানা বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নিম্নে এই সম্মেলন গুলির বিষয়ে আলোকপাত করা হল-

ভিয়েনা সম্মেলন ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সম্মেলন। এই সম্মেলনে নারীকর্মীরা একটি বিখ্যাত শ্লোগান গ্রহণ করে- "নারী অধিকার হল মানবাধিকার।" এবং এটি আর্ন্তজাতিক চুক্তিগুলিতে যাতে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেই দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় (এ/৬১/১২২/এ ডি ডি ১ ২০০৬ প্যারা ২৯)।[৯]

বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালে। এই সম্মেলনে বলা হয়- নারী এবং শিশুদের উপর যে হিংসা সংঘঠিত হয়ে থাকে, সেটি হল মানবাধিকারের বিষয়ে হিংসা, যেটি জনগণের সামনে অথবা (বাড়িতে) যেখানেই সংঘঠিত হয়ে থাকুক। এই সম্মেলনে আরো বলা হয়-

> নারী এবং শিশুদের বিষয়ে মানবাধিকার হল একটি সার্বজনীন মানবাধিকারের অবিভাজ্য অংশ, নারীজাতির সমানভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বেসরকারি, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে, জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে। এছাড়াও লিঙ্গগত বৈষম্যকে দূর করা। (ভিয়েনা ঘোষণা এবং কার্যক্রম ১৯৯৩ পার্ট- I প্যারা ১৮)।[১০]

বেজিং এ চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। এবং এই সম্মেলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি নারীদের উপর যে ধরনের হিংসা সংঘঠিত হয় সেই বিষয়ে ভূমিকা পালন করে। এখানে শিশু এবং নারীদের উন্নতির ক্ষেত্রে ১২টি নীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয় যা প্রয়োজনীয় ভূমিকা বজায় রাখে। (৪ নং অধ্যায়ের ডি, ১১২ নং প্যারাতে) উল্লেখ করা হয় যে-

> উন্নয়ন, সাম্যর ক্ষেত্রে এবং শান্তি অর্জনের ক্ষেত্রে নারীদের উপর সংঘঠিত হিংসা হল একটি বাধাদায়ক। যেটি নারীদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। তাদের অধিকারও ক্ষুণ্ণ করে। (এ/কনফঃ ১৭৭.২০.১৯৯৫)।[১১]

বেজিং সম্মেলনে (১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) যে ১২টি নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা হল :

১) নারী ও ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ
২) নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
৩) নারী ও দারিদ্র
৪) নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত হিংসা
৫) নারী ও অর্থনীতি
৬) নারীজাতির অগ্রগতির ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি
৭) নারী ও পরিবেশ

৮) নারী ও মানবাধিকার

৯) নারী এবং স্বাস্থ্য

১০) নারী এবং প্রচারগত মাধ্যম (Media)

১১) নারী ও নিরস্ত্রীকরণ (Arms-conflict)

১২) কন্যাসন্তান (Girl child)[১২]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা দ্বারা (৫৪/১৩৪) ১৯৯৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর একটি প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবনাতে ২৫ শে নভেম্বর এই দিনটিকে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত যে সমস্ত হিংসা ঘটে থাকে তা নির্মূল করার ব্যাপারে একটি আর্ন্তজাতিক দিবস ঘোষণা করে। এছাড়াও ব্যক্ত হয় নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত যে কোন ধরনের হিংসা, নারীদের উন্নয়ন, সাম্যর ক্ষেত্রে, মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি বাধাস্বরূপ।[১৩]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৯৯ সালের ২৫ শে নভেম্বর দিনটিকে নারীদের উপর সংঘঠিত অত্যাচারকে দূরীকরণের দিবস হিসেবে ঘোষণা করে (International Day for the Elimination of Violence against women)। এইগুলি বাদেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ লিঙ্গগত যে হিংসা ঘটে থাকে তার বিরুদ্ধে ১৬ দিন ব্যাপী একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। যেখানে ১৩০টি দেশে এই বিষয়ক প্রচার চালানো হয়। এবং বিভিন্ন রকম নীতি, কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সাল অবধি এই কর্মসূচী নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা নির্মূলের জন্য নানারকম ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে।[১৪]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা কর্তৃক বেজিং + ৫ (Beijing +5) ২০০০ সালের (জুন মাসের ৫ তারিখ থেকে ৯ তারিখ অবধি) একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেজিং সম্মেলনে যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সেটি পাঁচ বছরে (প্ল্যাটর্ফম ফর অ্যাকশন) কত পরিমাণে বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা বিচার বিবেচনার জন্যই এবং পরবর্তীকালে আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ নীতি, ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১৫]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা কর্তৃক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নারী (Un-women) ২০১০ সালে একটি সংস্থা অনুষ্ঠিত হয়। নারীগত ক্ষমতায়ন, বৈষম্য

দূরীকরণ, সাম্য প্রতিষ্ঠা, নারী, শিশুদের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে।[১৬]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৪৫ সাল থেকে নারীদের শিক্ষাগত, সামাজিক দিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নানারকম কার্যকর্ম, সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেছে। নিম্নে সেই বিষয়গুলি দেওয়া হল।

১৯৪৬ ইকোসকো (ECOSCO)	নারীজাতির মর্যাদা ক্ষেত্রে একটি কমিশন স্থাপন। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮) সালের নারীদের অধিকারের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা।
১৯৫১ আই এল ও (ILO)	নারী এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক ক্ষেত্রে সমান বিষয়ক সম্মেলন।
১৯৫২ ইকোসকো (ECOSCO)	নারীজাতির সমান অধিকার বিষয়ক সম্মেলন।
১৯৫৭ ইকোসকো (ECOSCO)- সাধারণ সভা-	দাসত্ব ব্যবস্থা বিলোপ সংক্রান্ত সম্মেলন। যে সব নারীদের বিবাহ হয়েছে তাদের জাতীয়তা বিষয়ক সম্মেলন।
১৯৬২ সাধারণ সভা-	বিবাহের বয়স, সম্মতি এবং নথি বন্ধনের ক্ষেত্রে সম্মেলন স্থাপন।
১৯৭৫ মেক্সিকো মহিলা সম্মেলন	কার্যক্রম করার ব্যাপারে একটি বিশ্ব কার্যক্রম করার ব্যাপারে একটি বিশ্ব পরিকল্পনা নির্মাণ।
১৯৭৫-৮৫	নারী দশক।
১৯৭৯	শিশুদের ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক বছর ঘোষণা করা।

১৯৮০ সালের কোপেনহেগেন নারী সম্মেলন	১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত মাঝারি বিষয়ক পরিকল্পনা করে।
১৯৮১ সাধারণ সভা	নারীদের উপর সংঘঠিত বিভিন্ন ধরনের হিংসা দূরীকরণের জন্য সম্মেলন এবং কমিটি গঠন করে।
১৯৮২ সাধারণ সভা	নিরাপত্তা, শান্তি প্রচারের বিষয়ে নারীদের অংশ গ্রহণের বিষয়ে ঘোষণা করে।
১৯৮৫ নাইরোবি নারী সম্মেলন	বিভিন্ন রকমের কৌশল তৈরী করা।

১৯৯২ সালে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপ্রধানদের স্ত্রীদের সম্মেলন জ্ঞাপন।

১৯৯৪ সালে পারিবারিক আর্ন্তজাতিক বছর হিসেবে ঘোষণা।

১৯৯৫ সালে বেজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন স্থাপন।[১৭]

নারীদের পাশাপাশি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিশু অধিকারের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৫৯ সালে শিশু অধিকারের বিষয়ে একটি ঘোষণা পত্র প্রকাশ করে (UN Declaration On the Rights of the child, 1959)। এখানে শিশু অধিকারের পাশাপাশি বয়স্ক মানুষদের দায়িত্বের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে।[১৮]

উপরিউক্ত আলোচনায়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত নানারকম কর্মসূচী, নীতি, উদ্যোগ সহ প্রভৃতি নানান দিক আলোচনা করা হয়েছে। যার দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের বিরুদ্ধে যে ধরনের হিংসা, বৈষম্যকরণ করা হয়, তার বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অবদান যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্বদায়ক।

নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন, হিংসা এটি একটি ভয়ানক ও সামাজিক অপরাধ। এই নির্যাতন দমনের জন্য অতীতকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আন্দোলন, সংগ্রাম সংঘঠিত হয়েছিল। অন্যায়-অবিচারের হাত থেকে নারী জাতিকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিশিষ্টবর্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধুমাত্র, দেশেই নয় দেশের বাইরেও

নানাপ্রান্তে নানা জায়গায় আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। যার পরিণাম হিসেবে জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক স্তরেও নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা, অপরাধ দমন, সহ নানারকম বিষয়ে সুযোগ সুবিধার কথা প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্যনির্দেশ :

১) Ghupta, Manjari and Chattopadhay, Ratnabali, Law and Violence against women, (Editor) Bagchi, Jasodhara, The changing status of women in west Bengal 1970-2000, The challenge Ahead, sage Publication, New Delhi, 2005, P- 115

২) ঘোষ, চন্দ্রিমা, মহিলা ও সাম্প্রতিক আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক, (সম্পাদনা) বসু কুমার গৌতম, সমসাময়িক আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১২, নভেম্বর, পৃষ্ঠা- ৩০

৩) Kaplan, Temna, women's Rights as Human Rights, women as agents of social change, (Editor), Agosin, Marjorie, women Gender and Human Rights A Global Perspective, Rawat Publication, Jaipur, 2009, P-192

৪) Robinson, P. Nancy, Origins of the International Day for the Elimination of Violence against women : The carribbean contribution, source-carribbean studies, vol-34, No-2 (Jul-Dec, 2006), P- 143, Pub- Institute of Carribbean studies, UPR, Rio piedras campus, stable URL: https://www.jstor.org/stable/25613539

৫) Ibid, P-144

৬) Edwards, Alice, Violence against women-Under International Human Rights, cambridge university press, New York, 2011, P- 20

৭) Robinson, P. Nancy, Origins of the International Day for the Elimination of Violence against women : The carribbean contribution, source-carribbean studies, vol-34, No-2 (Jul-Dec, 2006), P- 143, Pub- Institute of Carribbean studies, UPR, Rio piedras campus, stable URL: https://www.jstor.org/stable/25613539

৮) Ibid, P-144

৯) Ibid, P-144

১০) Ibid, P-144-145

১১) Ibid, P-146

১২) Beijing conference, cited at, www.un.org/women_watch/daw/Beijing/ Platform/ indey.html

১৩) Robinson, P.Nancy, Origins of the International Day for the Elimination of Violence against women : The carribbean contribution, source-carribbean studies, vol-34, No-2 (Jul-Dec, 2006), P- 142, Pub- Institute of Carribbean studies, UPR, Rio piedras campus, stable URL: https://www.jstor.org/stable/25613539

১৪) ঘোষ, চন্দ্রিমা, মহিলা ও সাম্প্রতিক আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক, (সম্পাদনা) বসু কুমার গৌতম, সমসাময়িক আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১২, নভেম্বর, পৃষ্ঠা- ৩৪

১৫) Beijing Platform 2000, cited at www.un.org/women watch/ daw/follow up/ Beijing + 5. htm

১৬) Basic Facts about the united Nations, (Corporate body), Pub- United Nations Department of Public Information, New York, 2014, P- 203

১৭) Whittaker, J. David, United Nations in Action, Pub-University college London (UCL) Press, 1995, P-160

১৮) চট্টোপাধ্যায়, কুমকুম, বর্তমান বিশ্ব ও মানবাধিকার, (সম্পাদনা) বসু কুমার গৌতম, সমসাময়িক আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১২, নভেম্বর, পৃষ্ঠা- ১৭।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

ভিন্নতর পাঠে সাইমন জাকারিয়ার ‘সীতার অগ্নিপরীক্ষা’

দয়ানন্দ মাঝি

গবেষক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে বাংলা নাট্যসাহিত্যে একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার সাইমন জাকারিয়া। নিজস্ব শৈলী ও চিন্তাধারার উপর তিনি বাংলা নাটককে একটি অন্যমাত্রা দান করেছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক ‘সীতার অগ্নিপরীক্ষা’। বর্তমান সময়ের উপর দাঁড়িয়ে নাট্যকার পুনরায় একবার রামায়ণের কাহিনিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। সীতার জীবনে ঘটে যাওয়া অগ্নিপরীক্ষাকে তিনি এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাতে চেয়েছেন। সমগ্র রামায়ণের ঘটনাকে না নিয়ে শুধুমাত্র অগ্নিপরীক্ষার অংশটুকু নিয়ে সীতার সমগ্র জীবনের পরীক্ষাকে তুলে ধরছেন। আমাদের সমাজ যে প্রতিনিয়তই নারীর পরীক্ষা নিয়ে চলে যুগের পর যুগ তাকেই কোথাও যেন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। নাটকের মধ্যে উঠে আসা দেবী সীতার প্রশ্ন কোথাও যেন সমগ্র পুরুষতন্ত্রকে কাঠগোড়ায় তুলে দেন। একদিকে ক্ষমতা অন্যদিকে ক্ষমতার তলায় পিষ্ট নারীজাতির কথাকেই নাট্যকার রামায়ণের এই বিনির্মিত পাঠের মধ্যে স্থান দিলেন।

সূচক শব্দ

Intention, Interpretation, Methodology, বিনির্মাণ, অগ্নিপরীক্ষা

মূল প্রবন্ধ

যখন নাটকের গতিপথ গতানুগতিক ধারায় চলমান তখন একটু ভিন্ন স্বাদের পাঠ নিয়ে নাট্যকার সাইমন জাকারিয়ার আবির্ভাব। সমাজে প্রচলিত বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে নাট্যকার বারবার যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন চিন্তাকে স্থান দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, একজন লোকসংস্কৃতি গবেষক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁর অসংখ্য নাটকের মধ্যে একটি

উল্লেখযোগ্য নাটক ‘সীতার অগ্নিপরীক্ষা’। প্রসঙ্গত বলা যায় রামায়ণ, মহাভারতে মানুষ নিজেকেই বারবার খুঁজে পায় । সময়ান্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মানুষ বারবার যাচাই করে নিয়েছে রামায়ণ, মহাভারতের উপাদানকে। কাজেই একদিকে যেমন ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য আমরা পাই তেমনি পাই সাইমনের ‘সীতার অগ্নিপরীক্ষা’র মতো নাটক। রোলাঁ বার্ত তাঁর ‘The death of the author’ প্রবন্ধের শেষে জানিয়েছেন–‘the birth of the reader must be at the cost of the death of the author’। অর্থাৎ লেখকের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পাঠকের জন্ম হতে পারে। লেখকের যে intention তাঁকে প্রত্যাহার করে পাঠকের interpretation বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। ফলত এক ধরনের পাঠপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক নতুন পাঠকৃতির সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। ‘বাংলাদেশের লোকায়েত রামায়ণের রামসীতা চরিত্র’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের উপর কাজ করার সুবাদে নাট্যকার পরবর্তী সময়ে এক নতুন পাঠে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর এই ‘সীতার অগ্নিপরীক্ষা’ নাটকে। সীতার জীবনে যে অগ্নিপরীক্ষার কথা আদিকবি বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন তাকেই আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। অনেকটা বর্ণনাত্মক কাব্যনাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের এই প্রচেষ্টা যুগোপযোগী।

নাটকটি শুরু হয়েছে সীতার স্বগতোক্তি দিয়ে– ‘সুধীজন, আজ আমি আপনাদের সামনে ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় মহাকাব্য রামায়ণ- এর এক সাধ্বী নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। আমি সীতা।’[১] স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রশ্ন জাগে এত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও রামায়ণের সীতাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে নাট্যকার কেন তাঁর সতীত্বের প্রচারে নেমেছেন? আসলে পুরুষতান্ত্রিকতার আদলে তৈরি আমাদের এই সমাজ প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নারীর সতীত্ব নিয়েই প্রশ্ন করে এসেছে বারবার। যে প্রশ্ন আজও সমভাবে চলমান। ‘আমাদের সবরকম সামাজিক চলাচলের মধ্যেই আসলে একধরনের নিয়ন্ত্রনের রাজিনীতি আমাদের অজ্ঞাতেই কাজ করে চলছে। এই নিয়ন্ত্রণের যুক্তি হিসেবে রাষ্ট্র বা সমাজ আমাদের সামনে অনেক অজুহাত খাড়া করে রেখেছে দৃশ্যে বা অদৃশ্যে। এই অজুহাতের নাম ‘methodology’ বা প্রণালীবিদ্যা।’[২] আর এই

প্রণালীবিদ্যা থেকে যে আমরা আজও বাইরে বেরিয়ে আসতে পারিনি সে কথাই সীতার স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। চোদ্দ বছরের বনবাস জীবনে যে কয়েক বছর লঙ্কায় সীতা তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন রামচন্দ্রকে ছেড়ে, সেই একই ভাবে সীতাকে ছেড়ে রামচন্দ্রও তো একা ছিলেন। তবু শুধুমাত্র প্রশ্ন উঠে বারংবার নারীর ক্ষেত্রে। এটাই সমাজ, যেখানে সুধীজনের কাছে নিজের সাফাই দেওয়ার জন্য সীতাদেরই অবতীর্ণ হতে হয়। এখানে সুধীজনের রূপকে নাট্যকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজটিকে তুলে ধরেছেন । যে প্রতিষ্ঠানের উপর দাঁড়িয়ে প্রতিটি নারীকে তাঁর পরিশুদ্ধতার প্রগতিপত্র দিতে হয়।

এতকাল লঙ্কায় বন্দী থাকার পর রামচন্দ্রকে দেখার জন্য সীতা আজ উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। শ্রীরামচন্দ্রের সারল্য, সততা, নিষ্ঠা, পিতৃমাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, ভাতৃস্নেহে অবিভূত সীতা। সমগ্র রামায়ণের কেন্দ্রে রয়ে যায় রামচন্দ্রের পরাক্রমের কথা । শুধু মাত্র সীতাকে উদ্ধার করার জন্য যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তার অন্তরালে থেকে যায় রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেমের কথাই। সীতা আজ খুব আশাবাদী, বিজয়ীর বেশে রামচন্দ্র সগৌরবে আজ তাঁকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবেন। 'এই আমি সীতা– সাধ্বী এক নারী, শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী । ভাবতে খুব ভালো লাগে– আমার জন্যে, শুধু এই আমার জন্য– আমার প্রভু, আমার শ্রীহরি শ্রীরামচন্দ্র দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় এসেছেন, এবং এই আমাকে উদ্ধার করার জন্য মহাবীর রাবণের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে জয় লাভ করেছেন।'[৩] কিন্তু পরক্ষণই এই সত্য ভুল প্রমাণিত হয়। যে সীতা সমগ্র জীবন ধরে পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত তাঁর কাছে এরূপ প্রত্যাশা কাম্য নয় । আজ রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। প্রশ্ন তোলেন তাঁর সতীত্ব নিয়ে। এমনকি রামচন্দ্র জানান– 'তা তোমার জন্য নয় সীতা। তোমার জন্য নয় । আমি যা করেছি তা আমার নিজের বীর চরিত্র রক্ষার জন্য করেছি, তোমার অপহরণজনিত চারদিকে বিস্তৃত অপবাদ মোচনের জন্য করেছি এবং এও জেনে রেখো, আমি ক্ষুব্ধ হয়ে শত্রুহস্ত হতে তোমাকে উদ্ধার করেছি কেবল নিজের প্রখ্যাত বংশের নিন্দা দূর করার জন্য।[৪] আর এখানেই বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামচরিত্রের সাথে নাট্যকারের রাম চরিত্র আলাদা হয়ে আসে। এতকাল আমাদের মনোভূমে যে রামচন্দ্র অধিষ্ঠিত, তাকে ভেঙে দিয়েছেন নাট্যকার। তবে এই ভাঙা মানে

ধ্বংস নয়। কারণ এটিও মূল অর্থের সহযোগে একটি বর্ধিত অর্থের সম্প্রসারণ। ফরাসি দার্শনিক দেরিদার যে বিনির্মান তত্ত্ব, সেখানে দেখা যায় কোনো মূল বিষয়ের বিভিন্ন argument কে গ্রহণ করার পর তার উপর একরকম careful investigation চলে। আর এই বিশ্লেষণ, অনুবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মূলের সাথে পরবর্তী ভাববস্তুর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এখানেও নাট্যকার রামায়ণের কাহিনিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রামচরিত্রে উপরোক্ত সত্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। রামচরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত পত্নীপ্রেমিক সত্তাটিকে খারিজ করেছেন। গড়ে তুলেছেন বর্তমানের পুরুষতন্ত্রের আদলে একটি চরিত্র। অন্যদিকে সীতা হয়ে উঠেছে সেই পুরুষতন্ত্রের বেষ্টনে সীমাবদ্ধ এক নারী চরিত্র।

নাটকের পরবর্তী অংশে দেখি বিভীষণকে শ্রীরামচন্দ্র জানাচ্ছেন, সীতাদেবীকে দেখার জন্য যে প্রজারা ভিড় করেছেন তাঁদের যেন প্রহার না করা হয়– 'তুমি এদেরকে কষ্ট দিয়ো না...এদেরকে বেত্রাঘাত করলে তাঁর আঘাত আমার মন-শরীরে এসে লাগে বিভীষণ। কেননা এরা আমারই স্বজন।'[৫] অথচ নিজের প্রিয়তমার দুঃখ, কষ্টকে সহজেই বরণ করে নিচ্ছেন। আসলে ক্ষমতার পাঠ বড়োই অদ্ভুত। মানুষ ক্ষমতার লোভী চিরদিনেরই। যার ব্যতিক্রম এখানে রামচন্দ্রও নয়। যাঁদের উপর ভর করে ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন তাঁদের গুরুত্ব সর্বাধিক। আর এই ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ যে কতো নীচে নামতে পারে তাই ফুটে ওঠে এখানে। বলেই নিজের সহধর্মিনীকে অস্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি । এমনকি সীতাকে জানান, আজ কোনো ভাবেই তাঁকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কারণ সীতা আজ অশুচি। তাই বলেন– 'আমি অনেক বিবেচনা করে নিশ্চিতভাবেই তোমাকে বলছি, এখন তুমি লক্ষণ বা ভরতের প্রতি বুদ্ধি স্থির কর। লক্ষণ অথবা ভরত এদের মধ্যে যাকে খুশি তাঁকে তুমি গ্রহণ করতে পারো।'[৬] বৈবাহিক জীবনের প্রথম প্রত্যুষে যে নারী রামচন্দ্রের সহগামিনী হয়ে বনবনান্তরে ঘুরে বেড়ালেন তাঁর জীবনে আজ এই পরিণতি? সত্যি পুরুষতন্ত্রের বাজারে ভোগ্যপণ্য এরাই।

পরবর্তী অংশে দেখা যায় সীতা অগ্নাহুতি দেওয়ার জন্য লক্ষণকে চিতা রচনা করার অনুমতি দেন। এ ঘটনা রামায়ণেও দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাটি নাট্যকারের মনে বিশেষ দানা বাঁধে। এই ঘটনার গভীরে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে সীতার

জীবদ্দশায় এটাই তাঁর প্রথম ও শেষ পরীক্ষা নয় । জন্মবৃত্তান্ত থেকে আজ পর্যন্ত তাঁকে বারেবারে এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সীতা তাই লক্ষণকে জানান– 'বহু দেশ থেকে বহু রাজা আসতে থাকলেন মিথিলা নগরে। সবার লক্ষ্য হরধনুতে জ্যা স্থাপন করে আমাকে গ্রহণ করা। শত শত রাজপুরুষের আগমনধ্বনিতে, অহংকারের উচ্চবাক্যে ভয়ে ও শঙ্কায় আমার বুকে সীমাহীন কাঁপন উঠল– না জানি কে আমায় জয় করে নেন, সে জন উত্তম হতে পারেন আবার অধমও হতে পারেন। আমি জানতাম না আমাকে কে জয় করে নেবেন।'[৭] এটাও একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা। কেননা জীবনের একটা বড়ো অধ্যায় শুধুমাত্র হরধনুর উপর নির্ভর করেছে। শারীরিক বলের পরীক্ষায় সেদিন রাম সর্বোত্তম হলেও একজন স্বামীরূপে তিনি কতটা যোগ্য তার একটা সন্দেহ থেকেই যায়। তবুও এই ঘটনাকে হাসিমুখে গ্রহণ করেন সীতা। পরবর্তী সময়ে নিজের পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করে স্বামীর পিতা মাতাকে আপন করে নিলেন, এটাও তো একটা অগ্নিপরীক্ষা। অন্যদিকে রাবণের হাজারো প্রলোভন ও কামলিপ্সা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার সংগ্রাম কি অগ্নিপরীক্ষা নয়? হ্যাঁ, এসবই অগ্নিপরীক্ষা। আসলে এই সমাজিক প্রতিষ্ঠানে নারীকে টিকে থাকতে হলে এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। নচেৎ এখানে তাঁদের অবস্থান তালানিতে ঠেকবে।

নাটকে তিনিটি চরিত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, যথা শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও প্রজা। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সীতা। নাট্যকারের ভাবাদর্শকে পূর্ণতা প্রদানে এই মানসকন্যাই প্রণিধানযোগ্য। আমরা এতকাল যাবত রামায়ণের যে পাঠ নিতে নিতে অভ্যস্ত ছিলাম সেই পাঠের উপর সীতা কিছু প্রশ্ন রেখে গেলেন। আসলে কোন পাঠকেই আমরা চিরন্তন সত্যের মধ্য দিয়ে বিচার করতে পারি না। দেরিদা যে 'গ্রেট আর্থকুয়েক' এর কথা বলেছেন তার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে সর্বদাই ডিস্টেবিলাইজেশন। আর এভাবেই সবকিছুই বিনির্মিত হয়ে আসছে। বিনির্মাণ কেন্দ্রচ্যুতির কথা বলে। রামায়ণের কেন্দ্রে ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, কিন্তু এখানে সীতা। অন্যদিকে প্রজাদের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে ক্ষমতা নির্ণায়কের বিষয়টি। এরা সরাসরি ক্ষমতা গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে ক্ষমতার ভাগীদার এরা নয়। এখানেও শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষমতাকে দৃঢ়বদ্ধ করতে এরা সক্রিয়

ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বলেই রামচন্দ্রের পর যদি কারো গুরুত্ব থাকে তবে সেটা প্রজাদের, সীতা নয়। ক্ষমতা গঠনের সাথে সীতার সরাসরি যোগ নেই। আবার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা শ্রীরামচন্দ্র যিনি সুকৌশলে প্রজাদের মনতুষ্টি করেন আবার বৃহৎ লাভের আশায় নিজের স্ত্রীকেও অস্বীকার করেন। আসলে ক্ষমতার পাঠ বড়োই জটিল।

অন্যদিকে এই নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের সংলাপে ক্ষমতার বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে আসে। প্রসঙ্গক্রমে রামের কয়েকটি সংলাপ এখানে তুলে ধরলাম–

ক। 'সীতা, তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই । তুমি এখন এই দশ দিকের যে দিকে ইচ্ছা গমন কর; তোমাকে আমি বাধা দেবো না।'[৮]

খ। 'সীতা, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাত হতে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ-বলে একজন পুরুষের যা করতে হয় তা-ই করেছি।'[৯]

গ। 'গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর, সৎকার্য এবং অন্য সকল রাজকৃত সম্মান স্ত্রীলোকদের আবরণ নয়, কেবল সৎস্বভাবই স্ত্রীলোকের আবরণ।'[১০]

আসলে ক্ষমতার উপর দাঁড়িয়েই এইসব কথা বলা যায়। কারণ তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁর উপর প্রশ্ন তোলার মানুষ নেই। বড়ো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ছোটছোট সম্পর্ক গুলো তুচ্ছ হয়ে আসে। বলেই শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সীতা আজ ব্রাত্য।

অন্যদিকে যাঁরা ক্ষমতার তলায় দিনাতিপাত করছেন তারা কতটা নম্র, সহনশীল, বিনয়ী সেটি স্পষ্ট হয়ে আসে সীতার সংলাপে–

ক। 'তুমি আমাকে উদ্ধার করে পৃথিবীতে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছো।'[১১]

খ। 'এখন আপনারাই বলুন, এত কিছুর মাঝে কবে আমি পেয়েছি স্বামী রামচন্দ্রকে একান্ত ভাবে'[১২]

এইভাবে ক্ষমতার কাছে বিনম্র, শ্রদ্ধাশীল হওয়ার পাঠ আমরা আজীবন লালান পালন করে আসছি কোনরূপ প্রশ্ন না রেখেই।

এইভাবে নাট্যকার তাঁর এই 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' নাটকে একদিকে যেমন সমগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজটিকে তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তেমনই এই কাঠামোর বেষ্টনে পিষ্ট নারীর আর্তনাদের কথা বলেছেন। রামায়ণের বিষয়কে গ্রহণ করে তাকে বর্তমানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়েছেন আরেকবার।

তথ্যসূত্র:

১। জাকারিয়া সাইমন, নাটকসংগ্রহ ১, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০ বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ মে ২০১০, পৃষ্ঠা- ২৯০

২। চক্রবর্তী সুমিত , তত্ত্বের অধিকার বিষয়ে কিছু খাপছাড়া কথা , মোস্তাক আহমেদ , তত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য , গহন , দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০২২ , পৃ –৩৫

৩। জাকারিয়া সাইমন, নাটকসংগ্রহ ১, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০ বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ মে ২০১০, পৃষ্ঠা-২৯৫

৪। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০৪

৫। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০০

৬। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০৫

৭। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০৯

৮। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০৪

৯। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০৩

১০। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০০

১১। ঐ, পৃষ্ঠা-৩০৩

১২। ঐ, পৃষ্ঠা-২৯৬

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। ভট্টাচার্য, প্রভাত কুমার, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিমা, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর- ২০১৪

২। ভট্টাচার্য, তপোধীর, জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক দর্শন ও তাঁর ব্রিটিশনীতি : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

দীপক হাজরা

সহ-অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) এক যুগ সন্ধিক্ষণে জন্মেছিলেন। কারণ বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রাচ্য ভাবধারা ও ব্রিটিশ আগমনের পর পাশ্চাত্যের প্রভাবের ফলে সমাজ, রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাংলার সমাজ ছিল কুসংস্কারে পূর্ণ, সংকীর্ণ বেড়াজালে আবদ্ধ, জাতিভেদ প্রথা, বর্ণপ্রথা প্রভৃতি নানা সামাজিক কুপ্রথার প্রভাবে বিদ্ধ। বলা যায় মধ্যযুগীয় চিন্তা ভাবনা দ্বারা সমাজ ক্রমশ পশ্চাদপদ। এই পশ্চাদপদ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রথম কারিগর ছিলেন 'ভারত পথিক' রাজা রামমোহন রায়। আজ তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষের মহিলা সমাজের কাছে 'আইকন' কারণ তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে, অসম লড়াই এ 'সতীদাহ প্রথার' মত এক অমানবিক সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া প্রথাকে রদ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য বড়লাট আমহার্স্টকে এক লক্ষ টাকা পাশ্চাত্যের জন্য ব্যয় করার কথা বলেছিলেন। নিজে গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছিলেন কিন্তু ধর্ম নিয়ে যখন বিরোধ দেখা দিয়েছে তখন কোরাণ, বাইবেল, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ সবই পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে– ধর্মের মূল নির্যাস 'একেশ্বরবাদ'। তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করে প্রায় তেরোটি ভাষা রপ্ত করেছিলেন ফলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের আশু প্রয়োজন কি ছিল ? তাঁর জীবনীকার কোলেট (Sophia. D. Colet) রামমোহন সম্পর্কে সংস্কারের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তিনি লেখেছেন– " ইতিহাসে রামমোহন হলেন এক জীবন্ত সেতু ,যার উপর দিয়ে

ভারতবর্ষ তার বিশাল অতীত থেকে অসীম ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়েছে ……." । রামমোহন রায়ের কর্মপন্থা ছিল বহুমাত্রিক। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রচিন্তা, মানবতাবাদ, ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের কার্য প্রণালী তাঁর মনকে স্পর্শ করেছিল। তিনি সংস্কার মুক্ত এবং ধর্মীয় বিভেদের উর্দ্ধে উঠে এক নতুন জাতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই রকম এক বহু গুণ সম্পন্ন মনীষীর সম্পর্কে বলা বা আলোচনা করা সত্যি দুরূহ ব্যাপার। তবুও আমরা রামমোহনের রাজনৈতিক দর্শন ও ব্রিটিশ নীতি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণ করব ।

রামমোহন রায়ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ধর্মের সহিত রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার গভীর সংযোগ রক্ষা করেন । তিনি ধর্মকে ও রাজনীতিকে কখনই আলাদা ভাবে দেখেননি। তিনি সব সময় এটি বিশ্বাস করতেন ধর্ম ও রাজনীতি একই মুদ্রার দুটি পিঠ। ধর্মের উদার মহৎ আদর্শের দ্বারা রাজনীতির জীবনাদর্শকে শুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি সমকালীন রাজনীতি নিয়ে ক্ষোভের সহিত বলেছিলেন– "হিন্দুরা ধর্মের বর্তমান যে ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলেছে তাতে রাজনৈতিক স্বার্থ বৃদ্ধি সহায়ক হবে না। জাতি ভেদের মতো অমানবিক এক প্রথা তাদের অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত করে রাজনৈতিক অনুভূতিকে বঞ্চিত করেছে। তাই তিনি স্পষ্টই বলেছেন রাজনৈতিক জ্ঞান, সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য ধর্মের পরিবর্তন আবশ্যক।

ভারতীয়দের রাজনৈতিক সচেতনতা জাগরিত করার জন্য তিনি প্রথম স্থবির ধর্মীয় ব্যবস্থাকে সচল করার ভাবনা উপলব্ধি করেন। তাই তিনি হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান সব ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে এলেন 'ঈশ্বর এক'। তিনি ইসলাম, খ্রিষ্ট ধর্ম ও আধুনিক যুক্তিবাদ বা মানবতাবাদের ব্যাখ্যা ও সেগুলি মহৎ উপাদানের আত্মীকরণের চেষ্টা করেন এবং পরে তিনি উপনিষদীয় দর্শন তত্ত্বের অঙ্গীভূত করে একটি ধর্মার্দশ গড়ে তোলেন। হিন্দু ধর্মকে জানার জন্য তিনি বেদান্ত দর্শন পাঠ করেন। তবে শঙ্করাচার্যের দর্শনের চেয়ে রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈত্যবাদের' প্রতি ঝোঁক বেশি ছিল। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদের পূজারী।

রামমোহনের মননের মধ্যে রাষ্ট্রচিন্তা প্রবেশের একটি প্রেক্ষাপট আছে। এটি খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। রামমোহনের সঙ্গে ডিগবী সাহেবের কর্মসূত্রে

ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮০৯-১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রামমোহন রংপুরে ডিগবী সাহেবের অধীনে সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য রামমোহনের জীবনে এটি একটি 'Turning Point' ছিল। এই সময় তার হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন্য, ঐসলামিক পণ্ডিতদের সংস্পর্শে বৌদ্ধিক সম্পর্ক তৈরী হয়। তিনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সহযোগিতায় তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ডিগবী সাহেবের সঙ্গে থাকার সুবাদে ইংরেজি ভাষা জ্ঞানবিদ্যার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে তার মধ্যে বিশেষ রাষ্ট্রচিন্তার প্রবেশ ঘটে। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবের উদারনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। আমরা যদি রামমোহনের জীবনী ও তার সম্পর্কে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করি সেখানে দেখতে পাবো তিনি কোন রাষ্ট্রনীতির প্রচলন করেননি তাই সেই অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলতে পারি না। তিনি নিজে ছিলেন সমাজের এলিট সম্প্রদায় ভুক্ত, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, এবং একজন সংস্কারক। অতীত ও সমসাময়িক বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে রাজনৈতিক ভাবে পুষ্ট করেছিল। তাঁর সুচিন্তিত ধ্যান, ধারণা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের দ্বারা কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রণয়ন করেননি। তাই তাঁর রাষ্ট্র চিন্তার পদ্ধতিকে বলা যায় আরোহীমূলক (Inductive)। এই রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ঘটেছে প্রারম্ভিক পর্বে ডিগবী সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠতার কারণে এবং পরে বিভিন্ন চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন পাঠ, ও সভা সমিতির বক্তৃতার মাধ্যমে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ । এই দুই শতকে বেশ কিছু দেশে রাজনৈতিক দর্শন ও উদারনীতি বাদের প্রসার ঘটে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন কালাক্রমিক ঘটনার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় ভারতীয় ভাবধারা ও জীবন দর্শন গ্রহণ করার পরই রীতিমত ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা অনুশীলনে আড়ম্ব করেন ও জোড় দেন। তিনি জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে রংপুরে কর্মরত থাকা অবস্থায় আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ও ফরাসি বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঐ দুই ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের পিছনে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে তার সহিত পরিচিত হন। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে ওঠার পিছনে এই বিপ্লব খুব সহায়ক

ছিল। এই পর্বে তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের বিভিন্ন রচনা পাঠ করেন। যেমন বেকন, লক, ভলটেয়ার, নিউটন, হিউম, গিবন, টম পেইন প্রমুখ। এছাড়াও ব্রিটিশ দার্শনিক বেন্থাম, জেমস মিল এর বিখ্যাত হিতবাদী দর্শন ও সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। পরবর্তি কালে বেন্থামের সহিত তাঁর অন্তরঙ্গ গড়ে ওঠেছিল। বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রামমোহন বিভিন্ন সংস্কার মূলক কাজে লিপ্ত হন। জীবনের শেষ পর্বে বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী মতবাদের প্রবক্তা রবার্ট ওয়েনের সহিত যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল রামমোহনের জন্মের কিছু বছর আগে। এই শিল্প বিপ্লব ও ইংরেজ জাতির জীবন ধারা রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করে। ইংল্যান্ডে থাকা কালিন সময়ে উদারনৈতিক সরকারের সদর্থক দিকগুলি রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল। অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাসের মতে, "বেন্থাম, মিলের বিখ্যাত উপযোগবাদ অপেক্ষা রামমোহনের মতাদর্শ ছিল মানবিক,উদার, প্রশস্থ চলিষ্ণঃ।" তাঁর লেখা মিরাতুল আখবর প্রবন্ধটি ছিল আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। রামমোহনই প্রথম এক আন্তজার্তিক সংঘ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেছিলেন যেখানে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে সমস্ত বিরোধ শান্তি পূর্ণ ভাবে নিরসন সম্ভব। এই বিষয় গুলি থেকে বোঝা যায় রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর অনুশীলন করেছিলেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

রামমোহন রায়ের ব্রিটিশ নীতি: রামমোহনের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যাবলীর পিছনে ও কোন কোন গবেষক তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন ব্রিটিশ জাতির প্রতি রামমোহনের বেশি পক্ষপাত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ শাসন ভারতের জন্য মঙ্গল ময় হবে। রামমোহনের অভিমত ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সুবাদে ব্রিটিশরা বিভিন্ন গঠন মূলক ভূমিকা পালন করেছে। সুবিশাল ভারতে বিভিন্ন অঞ্চল ছিল বিক্ষিপ্ত, পৃথক ব্রিটিশরা এই খণ্ডিত ভূখণ্ড গুলিকে একই ছাতার তলায় এনে ঐক্যের সুযোগ করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার বেশ কিছু জনহিতকর প্রকল্প

ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তাঁর আশা ছিল ব্রিটিশের উদার শাসন ন্যায় বিচার ভারতবর্ষের অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোকে উন্নিত করতে পারবে। রামমোহন রায় যেহেতু এক যুগসন্ধি ক্ষণে আবির্ভাব হয়েছিলেন তাই দেশের ভবিষ্যৎ প্রগতির ও কল্যাণের জন্য ইংরেজ শাসনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের জন্যই ভারতবর্ষকে পশ্চিমী ধাঁচে হওয়া আবশ্যক। রামমোহনের সমকালীন পর্যটক ভিক্তর ঝাঁকম বলেছিলেন ভারতবর্ষের পক্ষে আরও বেশ কিছুদিন ইংরেজ শাসনে থাকা প্রয়োজন কারণ যখন তার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে তখন যেন কোন কিছু হারাতে না হয়। তিনি অনুভব করেছিলেন ইংরেজ শাসনের সূত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে অন্তত অর্ধ শতাব্দী না পেলে ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। তাই সেই সময়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী কোন আন্দোলনকে তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। পরাধীনতার গ্লানি স্বীকার করেও ভবিষ্যৎ কল্যাণের আশায় বিদেশী শাসনকে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁকে উপনিবেশিক শাসনের এজেন্ট ও বলা হয়েছে। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ হল শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস, কৃষক শ্রেণীর রক্তক্ষরণের পাশাপাশি ভূস্বামী শ্রেণীর সমৃদ্ধির ইতিহাস জানা যায়। এছাড়া এক 'তোষামদ' শ্রেণীর উত্থান ঘটে যারা বিদেশী বণিক শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপনে ভীষণ আগ্রহী ছিল। রামমোহন নিজে ভূস্বামী, বিলাস ব্যসনে জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। কোম্পানির শিক্ষিত সাহেব ও অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ফলে তার মধ্যে প্রগতি বাদী ভাবধারার প্রবেশ ঘটে। একদিকে ধর্মীয় কুসংস্কার শোষণ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আবার অন্যদিকে কৃষক শ্রেণীর পাশে না দাঁড়িয়ে সামন্ত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছেন। তিনি ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব জানা সত্ত্বেও সামন্তদের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীকে সমর্থন করেননি। তাই অনেকে বলেছেন রামমোহন ব্রিটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি কখনই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ও শোষণের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন নি। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পর্যন্ত বলেছেন– ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য যে আইন প্রণয়ন করেছেন তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

রামমোহনের ব্রিটিশ প্রীতির আর এক নমুনা হল ভারতীয় শিক্ষা নিয়ে তার চিন্তা

ভাবনা। রামমোহন সবসময় ভাবতেন যে বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু রামমোহনের প্রস্তাবকে আদর্শ প্রস্তাব বলা যায় না। কারণ বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় না। সমাজের সার্বিক শিক্ষার জন্য প্রাচ্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমান ভাবে দরকার। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনসাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামমোহন এইকাজে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন ।

ইংল্যান্ডে বসবাস কালে রামমোহনের 'হাউস অফ কমন্স' এ একটি রিপোর্ট বের হয়। এই রিপোর্টি ছিল ইউরোপীয়দের নিয়ে । রামমোহনের বিশ্বাস ছিল ইউরোপীয়দের উদ্যম চরিত্র ও মূলধনের দ্বারা ভারতীয় নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হবে। তিনি নীল চাষ সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন নীল চাষ ভারতীয়দের জন্য মঙ্গল জনক এবং নীলকরেরা নীল চাষ করে ভারতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করেছিলেন। তবে পরবর্তি রামমোহনের এই হেন চিন্তার কেউ সমর্থন জানাননি। তবু ও রামমোহন ভারতবর্ষের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা নিজ দৃষ্টিতে– প্রবীণ বয়সে ভারতবর্ষকে বিলাত স্বর্গে পরিণত করার কল্পনাতে বিভোর ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন ভারতবাসীকে ইংরেজওয়ালা বানানো। রামমোহন বলেছেন এদেশে ইংরেজরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করলে ভারতীয়দের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকারই হবে। তিনি এও মনে করেছিলেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও ঔপনিবেশিক ইউরোপীরা যে সমস্ত সভ্য বংশধর রেখে যাবে তারাই ভারতভূমিকে ইউরোপের সম পর্যায় ভুক্ত করে ফেলবে। শুধু ভারত নয় এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশগুলিও আলোকপ্রাপ্ত করে তুলবে। তাঁকে নবজাগরণের অগ্রদূত বলা হলেও অত্যধিক ইংরেজ প্রীতি তাঁর গৌরবকে অনেকটা ম্লান করেছিল বলাই চলে। তিনি কখনই ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণে বিরোধিতা করেননি। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী উত্থাপিত করেননি।

রামমোহন যে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তার একটি কারণ হিসাবে বলা যায় এই যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর মনে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখ্যোপাধ্যায় বলেছেন–

"রাজা রামমোহনের কৃপায় আমাদের মনের দরজা জানালা খুলে গেল, আমরা মুক্ত হাওয়া পেলাম, আমরা বুঝলাম বিদেশী গভর্ণমেন্টের পিছনে আছে এক বড় সভ্যতা ....." । এটি ভালো করে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়– ব্রিটিশ শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মধ্যে তিনি দুটি সম্ভাবনা দেখেছিলেন– একটি বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব আর একটি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাবে ভারতবাসীর শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ। রামমোহন এটি বিশ্বাস করতেন ভারতবাসীর জাগরণ এই নব শিক্ষার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব এবং এই শিক্ষায় ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করবে। এই জন্যই ভারতবাসীকে ব্রিটিশের অধীনে থাকায় শ্রেয় বলে মনে করতেন। রামমোহনের অন্যতম শিষ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর Reformer পত্রে স্পষ্টই লিখেছেন– এই নব শিক্ষার ফলে ভারতবাসী একদিন স্বাধীনতার দাবি তুলবে এবং ব্রিটিশ সরকার সেই আপত্তিকর দাবীও একসময় মেনে নেবে। কার্ল মার্কসের মতে এখানে রামমোহন ব্রিটিশের Regenerating (পুনরুজ্জীবন) দিকটির উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন, কেননা তিনি বুঝেছিলেন ভবিষ্যৎ-এ এই পথ দিয়েই ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে ।

রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল এক সন্ধিক্ষণে কারণ মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের মধ্যে। এই ব্রিটিশ শক্তি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাদের পতনের মধ্য দিয়ে তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার সুসম্পন্ন করেছিল । এটি তাঁদের কাছে ছিল বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হিসাবে সম্পন্ন । রামমোহন জীবনের প্রান্তবিক পর্বে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। তবে তাঁর ১৮১০ দশক থেকেই তাঁর পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। তিনি প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যযুগীয় শিক্ষার প্রতি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় চেতনা, স্বাধীনতার চেতনা জাগরণের জন্য পাশ্চাত্যশিক্ষার উপর প্রবল ভাবে জোড় দেন। তিনি বুঝেছিলেন নবশিক্ষার হাত ধরে স্বাধীনতার জন্য জাগরণ শুরু হবে। অন্যান্য মনীষীরা যখন ব্রিটিশ শাসনকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন তখন রামমোহন ব্রিটিশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

ইতিহাসের পাতায় রামমোহনের অবদান নিয়ে আজ ও বিতর্ক বর্তমান। রামমোহন

হয়ত যুগের থেকে অনেক বেশি ভাবতেন বা ভবিষ্যতকে দেখতে পেতেন। তবুও সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায় কর্তৃক সমালোচিত হয়েছেন। যেমন ডেভিড কফ (David Kopt) তাকে আধুনিক ভারতের জনক বলে মনে করেন না। তাঁর মতে নবজাগরণ সৃষ্টিতে একটি ব্যক্তির অবদান থাকতেও পারে না। এই ধরনের জাগরণের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা দরকার হয়। একক প্রচেষ্টা নয়। অনেকের মতে রামমোহনের সামাজিক সংস্কার সমাজে বেশি দূর প্রসারিত হয়নি। তাঁর আন্দোলন ছিল এলিটিষ্ট, উচ্চবিত্ত মহলকে সীমাবদ্ধ। ডঃ এন. এস. বোসের মতে– "The Raja did not or could not act as a leader of the people in general, and the movements he started lacked a sound foundation among the masses"। তিনি সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের যে দিশা দেখিয়েছিলেন তা অবশ্যই স্মরণীয় কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রতি উদার মনোভাব ও গভীর আস্থা তাকে বার বার তিরস্কৃত করেছে। তিনি শুধু ক্রীতদাস বা নীলচাষীদের সম্পর্কে নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্থ সম্পর্কে ও নিশ্চুপ ছিলেন। কোম্পানি যখন নিজ স্বার্থে নতুন নতুন ভূস্বামী শ্রেণী তৈরী করেছিলেন এবং ১৭৯৯ সালে প্রজা শোষণ চালু করল তখন ও নির্বাক ছিলেন।

তথ্যসূচী :

১। বিশ্বাস, চন্দ্র দিলীপ । *রামমোহন সমীক্ষা* (মার্চ, ১৩৭৩)

২। নাথ, চন্দ্র রাখাল । *মননের আলোকে বাঙ্গালী* । কোলকাতা (জানুয়ারী , ২০০০)

৩ । মহাপাত্র, অনাদিকুমার ও বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন । *ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন* । কোলকাতা (নভেম্বর, ১৯৯৮)

৪। Majumdar ,Chandra Ramesh –*On Rammohan Roy* . Asiatic Society Kolkata (2009)

৫। চৌধুরী, কেশব। *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ* । পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক

৬। মাইতি, প্রভাতাংশু । *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১৭০৭-১৯৫০)* । কোলকাতা(নভেম্বর, ১৯৯০)

৭। চন্দ্র, বিপান । *আধুনিক ভারত,* পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক (সেপ্টম্বর ১৯৮৫)

৮। পাহাড়ী, গোপালকৃষ্ণ– *আধুনিক ভারত চর্চা* । কল্যাণী পাবলিশার্স ,দিল্লী(২০১৬)

৯। হীরেন্দ্রনাথ, মুখোপাধ্যায়। *ভারতবর্ষের ইতিহাস* । পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক(এপ্রিল , ১৯৮৩)

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

জয়নগর – কৃষ্টিময় মতিলাল রাজবংশ

দীপঙ্কর নস্কর
সহকারী অধ্যাপক, বিধানচন্দ্র কলেজ, আসানসোল

সারসংক্ষেপ

একদা সাবেক বাংলায় সংস্কৃতির পীঠস্থানক্ষেত্র ছিল প্রধানত রাজ পরিবার, জমিদার, ভূস্বামী ও ধনাঢ্য পরিবারগুলিতেই। বাংলায় পুরানো ধনী পরিবারগুলির কৃষ্টিময় কর্মকাণ্ড 'বনেদি বাড়ির কৃষ্টি' নামে পরিচিত। মূলত জমিদার বা সামন্ত শ্রেণীর বিত্তশালী পরিবারগুলো তাদের আধিপত্য কিংবা আভিজাত্য বজায় রাখার একটা মাধ্যম হিসাবেও দুর্গা পূজার প্রচলন করেছিল বলেই মনে হয়। বিভিন্ন পরিবারে পূজার পদ্ধতি এবং আয়োজন ভিন্ন। আঞ্চলিক স্তরে লোক মুখে সেসব কোথাও কিংবদন্তি, মিথ হয়ে রয়েছে, আবার কোথাও এখনও ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সচল। গাঙ্গেয় জনপদে তেমনি এক ঐতিহ্যময় মতিলাল রাজ পরিবার তাঁদের চিরায়ত কৃষ্টিময় ধারাকে বহনের সাথে সাথে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সজাগ ও তৎপর। এই বাংলার সাবেকি পরিবারের ইতিহাস, লোকগাথা ও কৃষ্টির অভাব একদিন বাঙালি অনুভব করবে। তার জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষাজাত, মৌখিক তথ্য সম্বলিত ইতিকথা, মিথ ও কিংবদন্তীর সংমিশ্রণ লিখিত উপাদানে সাজানোর আন্তরিক প্রয়াস করেছি মাত্র।

সূচক শব্দ

স্থাননাম, প্রেক্ষাপট, বিবর্তন, লোকগাথা, কৃষ্টি।

মূল প্রবন্ধ

জয়নগর ও মজিলপুর পাশাপাশি গ্রাম দুটির মধ্যে জয়নগর প্রাচীনতর। কথিত আছে যশোর জেলার বিক্রমপুর থেকে মতিলাল পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গুনানন্দ মতিলাল ৪৫০ বৎসর পূর্বে আদিগঙ্গা পথে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। জনশ্রুতি,

তিনি এ গ্রামের অরণ্যের মধ্যে দেবী জয়চণ্ডীর নির্দেশানুসারে তার প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কার করেন ও ঐ দেবীকে উপাস্যরূপে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে উক্ত জয়চণ্ডী দেবীর নামানুসারে এ গ্রামের নাম হয় 'জয়নগর'।

অপরদিকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত 'দেশাবলী বিবৃতি' নামে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি থেকে জানা যায় যে জয়নগর নিবাসী জনৈক পণ্ডিতপ্রবর ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে পরাজিত করেছিলেন বলে তাঁর জয়গৌরব হিসাবে এই স্থান 'জয়নগর' নামে খ্যাত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উক্ত দেশাবলী বিবৃতি নামে পুঁথিটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

জয়নগরকে প্রাচীনতর বললে এর প্রাচীনত্ব প্রকাশ হয় না। মজিলপুর নিবাসী এই অঞ্চলের গৌরব স্বর্গীয় কালিদাস দত্ত মহাশয় কয়েকটি প্রস্তর বিগ্রহ অবলোকন করে মন্তব্য করেছিলেন- "জয়নগর পল্লী সহস্র বছর আগেও সমৃদ্ধ ছিল। পাল-সেন যুগে এতদঞ্চলের সভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণে জয়নগর উত্তরপাড়ার বাসুদেব মূর্তি, রাধাবল্লভজীউর মন্দিরের পাশে শিবলিঙ্গ, মিত্রপাড়ার ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি মূর্তিগুলির উল্লেখ করা যায়। পরে বন্যায় জয়নগরের অস্তিত্ব লোপ পায়।"[১]

জয়নগরকে 'পলাবাটী জয়নগর'ও বলা হয়। অনেকে মনে করেন গঙ্গানদীর পলি পড়ে পড়ে এ স্থান সৃষ্টি হয়েছে, সেকারণে এই নাম হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, গঙ্গা নদীর তীর বরাবর কয়েকটি চর বা দ্বীপের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে বঙ্গের দক্ষিণতম অংশে অর্থাৎ আমাদের এই অঞ্চলের দ্বীপটির নাম ছিল প্রবাল দ্বীপ। 'প্রবাল' শব্দ থেকে পলা এসেছে এবং জয়নগরের পরিচয় হয়েছিল 'পলাবাটী জয়নগর'। পরে মুসলমান আমলে 'প্রবালদ্বীপ' নামটি লোপ পায়।[২]

প্রাচীন বা হিন্দুযুগে ভূ-বিভাগ অনুসারে তৎকালীন গঙ্গার পশ্চিমতীরের জয়নগর বর্ধমানভুক্তি ও তার পূর্বতীরের মজিলপুর পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল। এই ভুক্তি দুটি গঙ্গানদীর উৎপত্তি ও মোহনা পর্যন্ত বরাবর পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিস্তৃত ছিল।

হিন্দু রাজত্বের অবসানে ভারতের মুসলমান রাজত্বকালে পাঠান, মুঘল আমলে প্রশাসনিক সুবিধার্থে দেশভাগ হত সুবা, সরকার, মহাল, পরগনা, চালা প্রভৃতি ভূখণ্ডে।

জয়নগর তখন সরকার 'সাতগাঁ এলাকাধীন যশোহর বিভাগের মধ্যে। পূর্বে ২৪ পরগনা নামে কোন জেলা ছিলনা। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে ও যশোহর বিভাগ বলতে পুরো যশোহর, খুলনা ও বর্তমান ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বোঝাত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে এ জেলার সমগ্র স্থান ও বর্তমান যশোহর একটি শাসন কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল। ১৭৭২-৭৪ সালে লর্ড হেস্ট্রিংস এই শাসন কেন্দ্রের বা বিভাগের নামকরণ করেন– 'চব্বিশ পরগনা জেলা'। সম্রাট আকবরের সময় কলকাতার দক্ষিণে মুড়াগাছা, মেদনমল ও হাতিয়াগড় এই তিন পরগনার মধ্যে শেষ পরগনাতেই জয়নগর অবস্থিত ছিল। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে সুলতান সুজার জমাবন্দীর সময় হাতিয়াঘর পরগনাকে বিভক্ত করা হয় ও তারই একাংশ সুন্দরবনের কিছুটা যোগ করে বারিদহাটি পরগনার সৃষ্টি হয়। বর্তমান জয়নগর অঞ্চল বারিদহাটি পরগনার অন্তর্গত।[৩]

মা জয়চণ্ডী জয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জয়নগরের প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী রাজা নীলকণ্ঠ মতিলাল করদ রাজা হিসাবে, রায়মঙ্গল বন্দর থেকে উত্তরে সূর্যপুর এবং পশ্চিমে সরস্বতী নদী পর্যন্ত (মগরা, বেণীপুর) দীর্ঘ এলাকার কিছু অংশ শাসন করতেন। তখন রায়নগরের রাজা ছিলেন দুর্গাদাস রায়। মোঘল সুবেদার টোডরমলের সঙ্গে বার্ষিক কর দেওয়ার সম্মতিতে ও যুদ্ধ বাঁধলে সৈন্য সরবরাহের চুক্তিতে তিনি তখন রায়নগরের রাজত্ব চালাচ্ছেন। রায়নগরের রাজধানী ছিল রায়দিঘি অঞ্চল। সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় ছিল রায়নগরের বন্দর। রাজা দুর্গাদাস রায় ও নীলকণ্ঠ মতিলালের মধ্যে গভীর মিত্রতা ছিল। তাঁরা একে অপরের বিপদে সর্বদা সাহায্য করতেন। করদ রাজা তথা নীলকণ্ঠ মতিলালের ৪০ টি রণপোত ও ৪০ হাজার সৈন্য ছিল বলে জানা যায়। ১৩১৪ সালে মুদ্রিত পণ্ডিত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য (বিদ্যাভূষণ) রচিত 'কুমুদানন্দ' উপন্যাস গ্রন্থে রায়নগর রাজ্যের বিবরণ থেকে এইসব তথ্য জানা যায়।[৪]

নীলকণ্ঠ মতিলাল একজন ভূস্বামী জমিদার হলেও জনগন তাঁকে রাজা বলত। আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরে ছিল নীলকণ্ঠ মতিলালের কোঠাবাড়ি। ঐ বাড়ির সামনে আদিগঙ্গাকে লোকে বলত 'রাজার গঙ্গা'। বর্তমানে সেই 'রাজার গঙ্গা', 'মতিলাল

গঙ্গা' নাম ধারণ করে বৃহৎ জলাশয় হিসাবে অবস্থান করছে। তাঁর জমিদারি ছিল রায়নগর রাজ্যের অধীনে। তৎকালীন পর্বে ঐ আদিগঙ্গা দিয়ে দেশি এবং বিদেশিরা বড়ো বড়ো নৌকা করে বাণিজ্য করতে আসত। নিজ এলাকাকে সুরক্ষা দিতে তিনি বিশেষ সৈন্য বাহিনী মোতায়েন রেখেছিলেন।[৫]

জয়নগরের আদি পুরুষ গুণানন্দ মতিলাল এবং মতিলাল বংশ। বিভিন্ন মত ও আখ্যানের উপর ভিত্তি করে জানা যায়, প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে মতিলাল বংশের প্রাচীন পুরুষ গুণানন্দ মতিলাল যশোহর জেলার বিক্রমপুর গ্রাম থেকে সাগরসঙ্গম তীর্থযাত্রা উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বজরায় পরিবার বর্গ, লোক লস্কর নিয়ে একদিন বিশ্রামের জন্য বর্তমান 'জয়নগর রাজার গঙ্গা' নামে এক জায়গায় বজরা নোঙর করেন। সন্ধ্যার সময় মাঝি-মাল্লা, পাচক'রা কেউ কাঠ সংগ্রহে, কেউ রান্নার কাজে ব্যস্ত। মতিলালবাবু গঙ্গার তীর ধরে পদচারণা করতে করতে দেখতে পান একটি সুশ্রী বালিকা জঙ্গল বা বনের মধ্যে কলসি ভরা জল নিয়ে চলছে। গুণানন্দ ভাবলেন কাছেই বসতি আছে। কিছুটা পথ তিনি বালিকাটিকে অনুসরণ করলেন কিন্তু তাকে আর দেখা গেল না, ভগ্নমনোরথ হয়ে তিনি বজরায় ফিরলেন। সেই রাত্রে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন– সন্ধ্যাবেলায় দেখা সেই বালিকাটি বলছে– 'আমি দেবী জয়চণ্ডী, এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুই আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠা কর এবং এখানে বসবাস কর'। সেই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী গুণানন্দ মতিলাল বকুল বৃক্ষমূল হতে দেবীর প্রস্তর মূর্তি উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন।[৬]

তারপর মতিলাল বংশ এখানে স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন। প্রবাদ মতিলাল বংশের তালিকা সূত্রে গুণানন্দের পৌত্র নন্দকিশোর মতিলাল দুর্গাপুজোর প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রপৌত্র এই বংশের প্রবাদ পুরুষ ছিলেন, তিনি কলকাতার বহুবাজারের (বৌবাজার) বিশ্বনাথ মতিলাল (১৭৭৯১-১৮৪৪)। সম্ভবত এই পুজোর আরম্ভকাল বা সূচনাকাল চার'শ বছরেরও পুরানো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে– গুণানন্দের আসার বহুকাল আগে তাঁর পূর্বপুরুষ নীলকণ্ঠ মতিলাল এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন। তাঁর উত্তরসূরি ভবানীনাথ মতিলাল রায়নগর রাজ্যের (অধুনা রায়দিঘি) রাজা রঙ্গিলা রায়ের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে তিনি তাদের

পর্যুদস্ত করেন এবং নিজ বীরত্বের ইতিহাস রচনা করেন।

সেই সময় একবার পাঠানরা মতান্তরে মগ জলদস্যুরা জয়নগর আক্রমণ করে। পাঠানদের সঙ্গে নীলকণ্ঠ মতিলালের সৈন্যবাহিনীর প্রবল যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে পাঠানরা পরাজিত হলেও রাজা নীলকণ্ঠ মতিলালের মৃত্যু ঘটে। অকৃতদার নীলকণ্ঠের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ভবানীনাথ মতিলাল জয়নগরের রাজা হন। তবে ভবানীনাথ বেশিদিন রাজত্ব চালাতে পারেননি। কয়েকবছর পর অর্থাৎ এক হাজার এক সালে (১০০১ খ্রি:) সুন্দরবনে প্রচণ্ড জল প্লাবন ঘটেছিল। জয়নগর তখন প্লাবিত হয়ে যায়। জনশূন্য হয় রায়নগর। নীলকণ্ঠের ভাই ভবানীনাথ মতিলাল সপরিবারে যশোর জেলার বিক্রমপুরে চলে যান। তার বহুকাল পরে সমগ্র এলাকা গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়। সেই জঙ্গলপূর্ণ আদিগঙ্গার এককূলে ঐ মতিলাল বংশেরই পরবর্তী প্রজন্মের গুণানন্দ মতিলাল আসেন। পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকপুরুষ পর ওই মতিলাল বংশেরই মহাত্মা গুণানন্দ মতিলাল ইষ্ট দেবী জয়চণ্ডী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে মায়ের রূপ পরিবর্তন ও এক পক্ষকাল ব্যাপী পূর্ণিমা পর্যন্ত মহামেলা, অগণিত ভক্তবৃন্দের আগমনে জমজমাট রূপ নেয়। জাগ্রত মায়ের এই অপরূপ মূর্তিটিকে ঘিরে চণ্ডী মতে ১৫টি বিভিন্ন রূপে সাজানো হয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাঁর আবির্ভাব তিথিতে।[৭]

গুণানন্দ থেকে মতিলাল বংশের ১১তম পুরুষ বর্তমান। তাঁরাই দুর্গাপুজো বজায় রেখেছেন। মতিলাল বংশের অন্যতম পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র মতিলাল পূর্বপুরুষদের গড়া খড়ের চালের চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙে নতুন দালান তৈরি করেন। তাঁর পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ, হরিহর, হরিপ্রসন্ন ও নিত্যহরির পৌত্র এবং প্রপৌত্ররা যথাক্রমে পরেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, বাবুদুলাল প্রমুখ বংশধররা পারিবারিক পূজা বজায় রেখেছিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে প্রায় ১০ বছর পুজো বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, পুনরায় পুজো শুরু হয়। পূর্বে ৫-৬টি পাঁঠা বলি হ'ত, প্রজারা পাঁঠা নিয়ে আসত, পুজোর ক'দিন মনিব (জমিদার) বাড়িতে আনন্দ উপভোগ করে নতুন বস্ত্র পরে ঘরে ফিরত। একসময় মতিলাল বাড়িতে দেবী পুজোয় বলিদান ও বলি বিরোধীগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সম্ভবত সেইসময় পুজো বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুজো শুরু হলেও বলিদান বন্ধ হয়ে

যায়। প্রাচীন ধারা অনুযায়ী খিচুড়ি ভোগ ও সাদা ভোগ বজায় আছে। পূর্বের ঢালাও নরনারায়ণ সেবা, বস্ত্র বিতরণ প্রভৃতি বন্ধ হলেও আজও পুজোর ক'দিন প্রসাদ গ্রহণ না করে কেউ ফেরে না। প্রাচীন দালানবাটি গোলাকার থামের উপর পাকাছাদ। দুর্গাদালানের সম্মুখের নাটমণ্ডপ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। নেই জমিদারী, নেই প্রজাকুল। এই বংশের প্রবীণ সদস্য স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ মতিলাল পর্যন্ত জমিদারির সামান্যতম যোগসূত্র ছিল। দেবত্তর সম্পত্তি বলে বর্তমানে কিছু নেই।[৮]

পরিবারের বর্তমান সদস্যগণের সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সহায়তায় পূজাপর্ব নির্বাহ হয়। প্রাচীন মতে এক চালচিত্রের দেবীপ্রতিমা, ডাকের সাজ। প্রতিমাশিল্পী প্রমথ অধিকারী বংশপরম্পরায় এই প্রতিমা তৈরি করছেন। যদিও প্রাচীন প্রতিমা শিল্পী বা পটুয়ার নাম জানা সম্ভব হয়নি। পূজার কল্প ও বোধন শুরু হয় দেবী পক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে পূজা, ন'দিন ধরে চণ্ডীপাঠ হয়। অতীতের নিয়মকানুন আজও পালিত হয়, সন্ধিপুজোয় বাড়ির ও প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা শততম প্রদীপ জ্বালান। ব্রাহ্মণ কন্যাকে দিয়ে অষ্টমীর দিন কুমারী পূজা হয়। কলকাতার ভবানীপুর থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এসে পুজো করতেন, বর্তমানে স্থানীয় ব্রাহ্মণ পুজো করেন। বর্তমান পূজক তথা কুলপুরোহিত সুভাষ ভট্টাচার্য এবং তন্ত্রধারক সুকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়। পূর্বের আড়ম্বর না থাকলেও কৌলিন্য বজায় আছে। জয়নগর মতিলাল বাড়িতে চার'শ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো অতীত ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে আজও চলে আসছে। দশমী তিথিতে দেবী কৈলাশের উদ্দেশ্যে শিবালয়ে যাত্রা করার পূর্বে পান্তাভাত, ঠাণ্ডা ভাজা তরকারি ও পিঠে পায়েস খেয়ে বিদায় নেন।

এখানে ন'ফুট লম্বা একচালায় তৈরি হয় প্রতিমা। মতিলাল পরিবারের মধ্যে সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যের নামে মহিষের পিঠে লিখে সংকল্প করে দেবীর বোধন পুজো শুরু হয়। দেবী এখানে সিংহবাহিনী অতসীবর্ণা দশভুজা।[৯]

এই বংশের কৃতিমান পুরুষ বিশ্বখ্যাত বিশিষ্ট দার্শনিক ডঃ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল (১৯৩৫ - ৯১ খ্রিস্টাব্দ)। জয়নগরের মানুষ যার জন্য গর্বিত। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দর্শনচর্চার মানসে সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা করেন। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে মাস্টার ও ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে কানাডার টরেন্টো, আমেরিকার শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন। মাত্র ৪০ বছর বয়সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের স্পলডিং অধ্যাপক পদে বসার দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে দুর্লভ সন্মান অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি হল, 'Epistomology', 'Logic and Grammar in Indian Philosophycal Analysis', 'Logical and Ethical issues of religious belief' উল্লেখযোগ্য।[১০]

এই বংশের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে এই পরিবারে জন্মান অন্যতম কৃতিসন্তান বিশ্বনাথ মতিলাল। তিনি কলকাতার বহুবাজার (বৌবাজার) অঞ্চলের মতিলাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এখানেও প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা করেন আজ থেকে ২৫০ বছর আগে রত্নেশ্বর মতিলাল।

বিশিষ্ট গবেষক প্রভাত ভট্টাচার্য 'জয়নগর-মজিলপুর দুর্গা পূজার সমীক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "জয়নগর মতিলাল বাড়ির দুর্গাপুজো সম্পর্কে বলেন ঐ বংশের শ্রীবাবু মতিলাল (৬০ বৎ) মহাশয়– আমার উর্দ্ধতন পুরুষগণ মাতা জয়চণ্ডীর পূজারি। তাই প্রাচীনকালে মহাত্মা গুণানন্দ মতিলাল মহাশয় জয়নগরে আসার পর থেকে দুর্গাপুজোর সময় মাতা জয়চণ্ডীর বিশেষ পূজা করতেন। বর্তমান জয়চণ্ডী মন্দিরের সামনে দালানের ধংসাবশেষ ছিল। একথা আমি আমার পিতৃদেবের নিকট থেকে শুনেছি। স্বর্গীয় গুণানন্দ মহাশয়ের পঞ্চম পুরুষ– রামকৃষ্ণ, কৃপারাম, কেনারাম, মনোহর ও বাঞ্ছারাম উপযুক্ত বয়সে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করেন। অতঃপর জয়নগরের দুই দালানে দুর্গাপুজো শুরু হয়। জয়নগরে এই পূজা মতিলাল বংশের আভিজাত্য রক্ষা করে আছে আনুমানিক দু'শত বৎসরেরও বেশি। অপরটি বন্ধ হয়ে গেছে।"[১১]

গুণানন্দ মতিলালের হাত ধরে ষোড়শ শতাব্দী থেকে চলে আসছে মতিলাল বাড়ির পুজো। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে এই বাড়িতে পুজো শুরু হয় ঢাকের বাজনা বাজিয়ে। এই বংশের ১১তম পুরুষ তুষার মতিলাল জানালেন এখানে প্রতিপদ থেকে বোধন শুরু হয়। প্রতিদিন দু'বার ভোগ হয় পুজোতে। এই ভোগ নিরামিষ হয়। সকালে খিচুড়ি ভোগ, দুপুরে অন্ন ভোগ ও রাতে লুচি। পুজো

বাড়ির এয়োস্ত্রীরা করে থাকেন। এখানে সেকালে বলি প্রথা ছিল, এখন কোন বলি হয় না। পরিবারের উত্তর পুরুষেরা শাক্তমতের পরিবর্তে বর্তমানে বৈষ্ণবমতে পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে বলির খাঁড়াটি সযত্নে রক্ষিত আছে। দশমীর সন্ধ্যাতে নিয়মরীতি অনুযায়ী ঠাকুর বিসর্জন হয়। বাৎসরিক পূজার সময়ে পরিবারের বিভিন্ন সদস্য যারা বাইরে থাকে তারা বাড়িতে ফেরে এবং একত্রিত হয় বিশেষ আনন্দে। পূজার ক'দিন মতিলাল বাড়িতে আনন্দ নেমে আসে।

বাড়ির অন্যতম সদস্য বানী মতিলাল বলেন, মা মহামায়াকে সোনার গহনায় ও রূপোর অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। কলা বউকে নতুন বেনারসী পরানোর রীতি রয়েছে। সপ্তমীর সকালে কলা বউ স্নান করানো হয়। বাস্তুদেবতা রঘুনাথ জিউর নিত্য ভোগারতি হয়ে থাকে। মতিলাল বাড়ির 'হাঁড়ি লক্ষ্মী' ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দুর্গাদালানে চারদিন পূজিত হন। তারপর দশমীর দিন নির্দিষ্ট স্থানে গৃহে প্রবেশ করেন। নবমী ও দশমীর দিন দুর্গা মণ্ডপের সামনে বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা থাকে। পুজোর কয়দিন সুদূর মুর্শিদাবাদ এবং স্থানীয় লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ঢাকির চারটি দল দিবারাত্র মায়ের সন্মুখে বাজনায় বোল তোলেন। বিজয়ার সিঁদুর খেলার দৃশ্য অতি মনোরম। দশমীতে পরিবারের সকল সদস্য দেবী পরিবারকে নিয়ে আসেন 'রাজার গঙ্গা ঘাটে' ভাসানের জন্য।

গাঙ্গেয় জনপদ জুড়ে যে গুটিকতক বনেদি বাড়ির পুজো আজও স্বমহিমায় ঝলমল করছে তার অন্যতম মতিলাল বাড়ির পারিবারিক পুজো। প্রায় তিনশ বছরের পুজো এখনও পরিবারের সকলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে বনেদি পুজোর ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন। বর্তমানে এঁরাই এই পুজোর ধারক ও বাহক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ১। তুষার মতিলাল (৬৮), ২। বানী মতিলাল (৬২)।

তথ্যঋণ :

১। দত্ত, কালিদাস- দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতীত, সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা, বারুইপুর, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৮৯৮, পৃষ্ঠা ২৫।
২। প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৬।

৩। প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৪।
৪। বিদ্যাভূষণ, নকুলেশ্বর- কুমুদানন্দ (ঐতিহাসিক উপন্যাস), ২০১ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ১৩১৪, পৃষ্ঠা ৪৪।
৫। ভট্টাচার্য, লালমোহন – অতীতের জয়নগর-মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, পৃষ্ঠা ১।
৬। প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩।
৭। দাস, শৈলেন- জয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়চণ্ডী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ, মহাষষ্ঠী, ১৩ আশ্বিন, ১৪২১, পৃষ্ঠা ২।
৮। দাস, শৈলেন- জয়নগরের প্রাচীন দুর্গা পূজার ইতিবৃত্ত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ, মহাপঞ্চমী, ৩০ আশ্বিন, ১৪২২, পৃষ্ঠা ১২।
৯। নস্কর, দীপঙ্কর- দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাড়ির দুর্গা, অমর ভারতী, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০২৩, পৃষ্ঠা ৩১৪।
১০। পশ্চিমবঙ্গ, জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা ২৮৩।
১১। নিম্নবঙ্গ, বর্ষ ১ম, ৫ম সংখ্যা, মাসিক সংকলন, ২৩শে আশ্বিন ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ২।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

প্রাণী (বন্যপ্রাণী) সংরক্ষণ ও সংস্কৃতসাহিত্যের ভাবনা

(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মেঘদূতম্, হর্ষচরিতম্, নৈষধচরিতম্, সম্রাট অশোকের শিলালেখ)

পবিত্র বর্মন

শোধছাত্র, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নিউদিল্লী

শোধসার

বন্যপ্রাণী পরিবেশের অঙ্গস্বরূপ। বন্যপ্রাণীগুলি রয়েছে বলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রয়েছে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার প্রধান কারণ বিবিধ প্রাণীসমূহ। এই প্রাণীসমূহ পরিবেশের তথা সমাজের দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে বিবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। বন্যপ্রাণী পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে, তার ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রয়েছে। তাই প্রাণীসংরক্ষণ অবশ্য কর্তব্য। প্রাচীনকালে ঋষি মনীষীদের ভাবনা থেকে প্রাণী সংরক্ষণের দিকটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা বন্যপ্রাণীসমূহকে কিভাবে বশীকরণ করত ও সযত্নে পুত্রস্নেহে পশুপালন করত সে-দৃষ্টান্ত আজ সংরক্ষণের দিকটি নির্দেশ করে। সংস্কৃতসাহিত্যের এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে ঋষিগণ, কবিগণ সমাজের ও কাব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণীসমূহের স্থান দিয়েছেন এবং প্রয়োজনে পশুগুলিকে সযত্নে লালিতপালিত করা তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এই ভাবনাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সংরক্ষণের চিন্তাধারা নতুন কোনো চিন্তা নয়। তা বহুপূর্বেই চিন্তা বা ভাবনার বস্তু হয়ে উঠেছিল। কারণ কোনো নিয়ম-নীতি না মেনে অসংখ্য পশুহত্যা করে কোন প্রজাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিণাম এর ফল স্বরূপ এই সংরক্ষণ। লুপ্ত হতে থাকা প্রজাতিগুলিকে সংরক্ষণ করা নাহলে বিলীন হয়ে যাবে সেই প্রজাতি। আর এই প্রাচীন চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শুরু হয়েছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণনীতি।

কূটশব্দ

1. সংরক্ষণ, 2. প্রাণীসংরক্ষণ, 3. সচেতনতা, 4. সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাণীর ভূমিকা, 5. বন্যপ্রাণীর দ্বারা কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধি।

ভূমিকা

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ একটি সামাজিক কর্তব্য। মানুষ যেদিন থেকে কোননিয়ম বা শৃঙ্খলা না মেনে একের পর এক পশুহত্যা করে চলেছেন তাতে পরিবেশের অনেক পশু-প্রজাতি লোপ পেতে শুরু করেছে। আর তাতে অরণ্য হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীহীন। তার ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নষ্ট হতে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন হয়েছে পশুসংরক্ষণ করা। আর সেই জন্য সারাবিশ্বের দেশগুলোতেও পশুসংরক্ষণ করতে চলেছে।

3 মার্চ দিনটিকে বিশ্ব বন্যপ্রাণীদিবস হিসেবে পালন করা হয়। তাই ভারতবর্ষে পশুসংরক্ষণের আইন 1972 সালে পাশ হয়। আর তারপর থেকে পশুসংরক্ষণে সচেতনতার মনোভাব জাগানোর প্রচেষ্টা চলছে দেশবাসীর কাছে। সমাজের যেকোন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অতিরিক্ত পশুহত্যা করা ঠিক নয়, তা সর্বকালে বিদিত। আর সেই সচেতনতা বৃদ্ধি করা সরকার এবং জনসাধারণের কর্তব্য। সংস্কৃতসাহিত্য গুলিতেও তার উল্লেখ ও পূর্বাভাস আমরা পেয়ে থাকি। ফলে সচেতনতা গড়ে তুলতে আমাদের সহায়ক সংস্কৃত ঋষি, মনীষী, কবিদের চিন্তন। তাদের ভাবনা কাব্যে ফুটে উঠেছে এবং দেখানো হয়েছে পশুসংরক্ষণের দিকটি। বর্তমান সমাজ সেই পথ অনুসরণ করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আগ্রহী হলে তবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বাস্তুতন্ত্র।

মূল আলোচনা

সংরক্ষণ-উপভোগ ও সংস্কৃতসাহিত্যের ভাবনা : সাধারণত কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতি তে অনেক বস্তু-সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার হয়ে থাকে আর সেই ব্যবহারের বা উপভোগের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রয়োজন হয় সংরক্ষণের। সমাজ সভ্যতায় যেমন প্রয়োজনের তাগিদে উপভোগ করে থাকি ঠিক তেমনই সৃষ্টির ক্রমকে অচ্যুত রাখতে ভারসাম্যকে যথাযথ বোঝায় রাখতে প্রয়োজন সংরক্ষণেরও। শুধু উপভোগ

করে অবশিষ্ট অংশটিকে যদি অপচয় বা তিরস্কার করা হয় তাহলে সমাজের হানি ঘটবে। সমাজ নষ্ট হয়ে পড়বে, কালের বিবর্তনে অভাব দেখা দেবে। তাই সামগ্রিক দিক থেকে বিচার করলে একটাই বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহল সংরক্ষণ। আর সেই সংরক্ষণের যেকোন বস্তু বা প্রাণী বা অন্যকোন সম্পদেরও হতে পারে। সংস্কৃতসাহিত্যে সেই সংরক্ষণের দিকটি বহুপ্রাচীন নিদর্শন ও সাহিত্যতত্ত্ব থেকে মেলে। বন্যপ্রাণী সমাজের অঙ্গস্বরূপ ও সৌন্দর্যের প্রতীকও বটে তা অনেক সাহিত্যে উল্লেখিত।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ও সংস্কৃতসাহিত্যের ভাবনা : 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' মহাকবি কালিদাস রচিত একটি অপূর্ব দৃশ্যকাব্য। এখানে কবি কাব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনেক প্রাণীর কথা তুলে ধরেছেন এবং সেই প্রাণীগুলো সযত্নে লালিত-পালিত করার কথাও উল্লেখ করেছেন। যে কোন পরিস্থিতিতে প্রাণীসংহার উচিত কর্ম নয়, তা কবি এই নাটকে দেখিয়েছেন। অপরদিকে বন্যপ্রাণী হাতির দ্বারা সামাজিক কোন কর্ম বা অনুষ্ঠান বিঘ্ন করে দেওয়ার দৃশ্যও দেখতে পাই এবং সেখানে মানুষের দ্বারা অশালীন আচরণ না দেখে হাতি প্রাণীটির প্রতি স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করে- "तीव्राघातप्रतिहतस्तरुस्कन्धलग्नैकदन्तः..."[1] আবার সখের বশীভূত হয়ে রাজা দুষ্যন্ত হরিণ হত্যা করতে উদ্যত হলে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ বা বৈখানস পশুহত্যা করতে বারণ করে এবং তৎক্ষণাৎ দুষ্যন্তের মধ্যে সচেতনতা ও সম্মান উদারতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে– "नखलुनखलुवाणःसन्निपात्योऽयमस्मिन्"[2] - এর পাশাপাশি

[1]तीव्राघातप्रतिहतस्तरु स्कन्धलग्नैकदन्तः
पादाकृष्टव्रततिवलयासङ्गसञ्जातपाशः।
मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसारङ्गयूथः
धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः।। (अभिज्ञानशकुन्तलम् – 1/30)

[2]न खलु न खलु वाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्
मृदुनि मृगशरीरे पुष्पराशाविवाग्निः।
क्व वत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम्

মাতৃহীনা মৃগশাবককে সন্তানস্নেহে শকুন্তলা সযত্নে লালনপালন করে বড়ো করে। আর এখানেই পশুপ্রেম বিশেষভাবে উপলব্ধি হয় এবং মনুষ্য-পশুর মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে তা কবির বর্ণনায় স্পষ্ট। এখানে মৃগশাবকটির প্রতি শকুন্তলার মাতৃত্বের দিকটি ফুটে উঠেছে-"यस्यत्वयाव्रणविरोपणमिङ्गुदीनां"[3]

উপরোক্ত ঘটনাগুলি দেখে একটিই কথা স্পষ্টই বোঝা যায় তাহল সংরক্ষণ। আর কবি কালিদাস তার রচনার এই দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজন। কবি সংস্কৃতসাহিত্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আভাস দিয়ে গেছেন তার রচনাগুলির মাধ্যমে এবং সংরক্ষণ যে নিদারুণ জরুরী তা সমর্থন করেছেন। সাহিত্য সমাজের দর্পণ হয়ে মনুষ্যসমাজকে প্রতিনিয়ত মার্গদর্শন করে থাকে, সেখানে সংরক্ষণের দৃষ্টান্ত সমাজকে সংরক্ষণে সচেতন করে তোলে।

মেঘদূতম্ ও সংস্কৃতসাহিত্যের ভাবনা : 'মেঘদূতম্' মহাকবি কালিদাস রচিত অনবদ্য একটি রচনা। এখানে কবি গ্রন্থের চারুত্ব ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য বেশকিছু পশুপ্রাণীর আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রন্থে উল্লেখিত যক্ষ উন্মত্ত হয়ে মেঘকে বন্ধু ভেবে বার্তা দিতে উদ্যত হয়ছিল। আর সেই মেঘ কোনপথে কিভাবে সেই বার্তা যক্ষপত্নীর কাছে পৌঁছে দেবে তা বর্ণনা রয়েছে। আর সেই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে প্রাণীসমূহের কথা। মেঘ ধীরে ধীরে সঠিক পথে এগিয়ে যাবে আর মেঘের পথপ্রদর্শক, সঙ্গী হবে চাতকপাখি, বলাকা (বক), রাজহংস, ময়ূর প্রভৃতি প্রাণী। আর মেঘের এই যাত্রাপথ একাকীত্ব যেন মনে না হয় তার জন্য পশু-প্রাণীর সঙ্গপ্রদান ও পাহাড় পর্বতের

क्व च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते।। (अभिज्ञानशकुन्तलम् – 1/10)

[3]यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां
तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे।
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते।। (अभिज्ञानशकुन्तलम् - 4/14)

মনোরঞ্জন দৃশ্য বর্ণিত – "मन्दमन्दंनुदतिपवनश्चा- नुकूलोयथात्वां "[4] আবার কিছুটা পথ যাওয়ার পর মেঘকে পুনরায় সাথদেবে রাজহংস। মেঘ যেন কখনো একা হয়ে পথে থেমে না যায় তাই প্রাণীর সহায়তায় এখানে লক্ষণীয়। অপরদিকে বার্তাবহন করতে গিয়ে মেঘ যেন মতিভ্রম না হয় বা ইচ্ছে শক্তি নষ্ট না হয়, তার জন্য ময়ূরের অপরূপ নৃত্যদর্শনে মেঘের অলসতা, চঞ্চলতা যেন দূর করা হয় – "उत्पश्यामिद्रुतमपिसखेमत्प्रियार्थंयियासोः..."[5] গ্রন্থে চাতক, বক, রাজহংস, ময়ূর প্রভৃতি প্রাণীর কর্মকুশলী অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে রূপ দিয়ে কবি স্পষ্ট বলতে চেয়েছেন সমাজে বন্যপ্রাণীর মূল্য কতখানি। আর সেই বন্যপ্রাণীগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ তা কবির লেখনীতে ফুটে উঠেছে। তাই মনুষ্যসমাজকে সংরক্ষণে সচেতন হতে হবে। সমাজের রক্ষক হিসেবে মনুষ্যসমাজকে পশুপ্রাণী রক্ষাকর্তব্য ও দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

হর্ষচরিতম্ ও সংস্কৃতসাহিত্যের ভাবনা : 'হর্ষচরিতম্' মহাকবি বাণভট্ট বিরচিত সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের একটি অনবদ্য রচনা। কবি গ্রন্থের বেশকিছু প্রাণীর কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাতি, ঘোড়া, মৃগ, সিংহ প্রভৃতি। কিন্তু অন্যদিকে তিনি অষ্টপদ বিশিষ্ট শরভা নামক একটি প্রাণীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রাণীর অস্তিত্ব বহুপূর্বে ছিল। কবি এই প্রাণীসমূহের কথা

[4]मन्द मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः।
गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः
सेविष्यन्त्ये नयनसुभगं खे भवन्तं वलाकाः।। (मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 9)

[5]उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यियासोः
कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते।
शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत्।। (मेघदूतम्, पूर्वमेघः - 23)

উল্লেখ করে সাহিত্যে তথা সমাজে বন্যপ্রাণীর প্রয়োজন কতখানি তা তুলে ধরেছেন। অপরদিকে প্রাণীসংরক্ষণ কতটা প্রয়োজন তা কবি স্পষ্ট শরভা নামক প্রাণীটির মাধ্যমে দেখেছেন। সংরক্ষণ আইন যদি বহুপূর্বে আরো সুস্পষ্টভাবে পালন করা হতো তাহলে শরভা নামক প্রাণীটির দর্শন আজও হয়তো সম্ভবপর হতো। তাই সংস্কৃতসাহিত্যে সংরক্ষণের দিকটি প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাই কবি দেখিয়েছেন–"सन्तिश्वान इवासंख्या जातिभाजो गृहे गृहे..."[6]

নৈষধচরিতম্ ও সংস্কৃতসাহিত্যের ভাবনা : 'নৈষধচরিতম্' শ্রীহর্ষ প্রণীত সংস্কৃতসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য। কাব্যে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য পশুটি হল হংস (পাখি)। কবি কাব্যের অনবদ্য সৃষ্টির জন্য পশুর বা পাখির আশ্রয় নিয়েছেন। আর এখান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব সংস্কৃতসাহিত্যে অনেকখানি। কাব্যে বর্ণিত হংসটি পশু হলেও নল ও দময়ন্তীর প্রণয়ের বার্তা বাহক ছিলেন। রাজা নল হংসটিকে উদ্যানে ঘুরতে দেখে, বন্দী করে এবং হত্যা করতে চাইলে হংসটির করুণ আর্তনাদ করে প্রাণ ভিক্ষা চায়। রাজা নল তার (হংস) পরিবারের বিবরণ শুনে বিস্মিত ও লজ্জিত বোধ করেন এবং অনুশোচনাবশত দয়ার্দ্র করে দয়ারসাগর স্বরূপ তার হৃদয়ে করুণরসের নদীর মতো কথাগুলি মনে বিধঁল। রাজা নলের এই মনোভাব বা আচরণ পশুসংরক্ষণের দিকটি ফুটিয়ে তোলে এবং মানুষের সঙ্গে পশুর যে নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কবি শ্রীহর্ষ কাব্যে হংস ছাড়াও আরো অন্য পশু-পাখির কথা উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃতসাহিত্যে "मदेकपुत्राजननीजरातुरानवप्र-सूतिर्वरटातपस्विनी..."[7]

[6]सन्तिश्वान इवासंख्या जातिभाजो गृहे गृहे।
उत्पादका न वहवः कवयः शरभा इव।। (हर्षरचितम् - प्रथमोच्छ्वास, श्लोक 5)

[7]मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी।

সম্রাট অশোকের শিলালেখ ও সংস্কৃতসাহিত্যের ভাবনা: বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ভাবনা ও নিয়ম-নীতি আজকের কোন আইন নয়, তা বহুপূর্বেই সম্রাট অশোকের দ্বারা স্বীকৃত লাভ করেছে। মহামতি অশোক বিনা কারণে প্রয়োজন ছাড়া বা অতিরিক্ত পশুহত্যা করতে বারণ করেছেন। আর সেই নিয়ম যদি কেউ অমান্য করে, প্রয়োজন ছাড়ায় পশুহত্যা করে তাহলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। অশোকের এমন দৃষ্টিভঙ্গি পশুসংরক্ষণের দিকটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। অশোক তার প্রথম, অষ্টম শিলালেখে অনেক পশুর কথা উল্লেখ করেছেন। আর ময়ূর, মগপশু গুলোকে সংরক্ষণের কথাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যা তাঁর অভিলেখে উল্লেখিত রয়েছে। সংস্কৃত তথা প্রাচীনসাহিত্যগুলিও এই সংরক্ষণের যথার্থ সমর্থন করেছেন, তা অন্যসাহিত্যেও শিলালেখে দেখে থাকি।

"त्रयःएवप्राणाःआलभ्यन्तेसूपार्थायद्वौमयूरौ,

एकःमगः ।सोऽपिमगःनधुवः ।एतेऽपित्रयःप्राणाःपश्चात्नआलप्स्यन्ते ।"[৪]

উপসংহার : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কতটা প্রয়োজন ও কিভাবে করতে হবে তা প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। আর সেই ভাবনা মাথায় নিয়ে বর্তমান সমাজ প্রাণীসংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়েছে বা দিতে চলেছে। সমাজে বন্যপ্রাণীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও সামাজের আংশিক চাহিদাপূরণের দাবি রাখে। তাই বর্তমান সমাজকে আরো বেশি যথেষ্ট সচেতন হতে হবে ও প্রাণীসংরক্ষণের দিকটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাণী সমাজের অঙ্গ। আর সেই অঙ্গের যদি যথাযথ যত্ন বা পরিচর্যা না হয় তাহলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ভেঙ্গে যাবে এবং সমাজের চরম ক্ষতিও হতে পারে। তাই সর্বদেশকে একত্রিত হয়ে বন্যপ্রাণীকে আশ্রয় প্রদান করার প্রয়োজন। কারণ অনেক বন্যপ্রাণী জঙ্গলের অভাবে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে এবং লোকালয়ে আসতে

गतिस्तयोरेषः जनन्तमर्दयन्नहो विषे! त्वां करुणा रुणाद्धिनो।(नैषधचरितम् - 1/135)

[৪]उपकार(संस्कृतनेट/सेट,पृष्ठा- 742)

বাধ্য হচ্ছে। সরকার ও জনগণ সচেতন হয়ে বন্যপ্রাণীর সুবিধার্থে জঙ্গল অধিকমাত্রায় ধ্বংস না করে তাদেরকে আশ্রয় করে দেওয়া প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সবচেবেশি প্রয়োজন জনসাধারণকে সচেতন করা বা সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। জনগণ সচেতন হলে তবেই সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। আর সরকারকেও উক্তবিষয় তদারকি প্রয়োজন ও পাশাপাশি দণ্ডবিধানের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। পরিবেশ থেকে হারিয়ে গেছে এমন অনেক পশুপ্রজাতি, যার অস্তিত্ব এখন কল্পনার আধার। যেসব প্রাণী রয়েছে তাদের সংরক্ষণ করলে আগামী পৃথিবী বা প্রজন্ম এই বন্যপ্রাণীগুলির দর্শন ও তাদের উপকারের ফল দেখতে পাবে। কারণ এখনও প্রাণীকে কিভাবে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা হয় তা অতুলনীয় দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়। আর তাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মনুষ্যগণের মূল কর্তব্য।

পরিশেষে বলতেই হয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করাটা খুবই জরুরী। আর তাই প্রথমে জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে, তথা সরকারকেও তৎপর হতে হবে।

সন্দর্ভগ্রন্থসূচী :

1. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ - মহাকবিকালিদাস, বসু, ডঃ অনিলচন্দ্র (সম্পা.), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা, 2012
2. মেঘদূত ও সৌদামনী – মহাকবি কালিদাস, চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ(সম্পা.),সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, 2016
3. রঘুবংশম্ – মহাকবি কালিদাস, দাস, ডঃ দেবকুমার(সম্পা.), শ্রীবলরাম প্রকাশন, কলকাতা, 1416 (বঙ্গাব্দ)
4. সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস - গোপ, যুধিষ্ঠির (সম্পা.),সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা, 2011
5. সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস - দাস, ডঃদেবকুমার (সম্পা.), শ্রীবলরাম প্রকাশন, কোলকাতা, 1419 (বঙ্গাব্দ)
6. সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস - বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ(সম্পা.),পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, কলকাতা, 2015

7. অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ – মহাকবি কালিদাস, চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ (সম্পা.) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, 1959
8. রঘুবংশম্ – মহাকবি কালিদাস, বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক কুমার(সম্পা.), সদেশ, কলকাতা, 2017
9. উপকার (সংস্কৃত নেট/সেট) - পাণ্ডে, ডঃ মিথিলেশ (সম্পা.), উপকার প্রকাশন, আগরা,
10. নৈষধচরিতম্ - শ্রীহর্ষ, দাস, ডঃ দেবকুমার(সম্পা.),সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, 2016
11. হর্ষচরিতম্ – মহাকবি বাণভট্ট, চক্রবর্তী, ডঃ অলকা(সম্পা.), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, 2002

মৃচ্ছকটিকম্ - শূদ্রক, দে, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ও সিদ্ধান্ত, শ্রীশুভেন্দুকুমার(সম্পা.), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,1407 (বঙ্গাব্দ)

12. নৈষধীয়চরিতম্–শ্রীহর্ষ, তিবারী, ডঃ শ্যামলেশকুমার (সম্পা.), চৌখম্বাসুর ভারতী প্রকাশন, বারাণসী, 2011
13. শিশুপালবধম্– মহাকবিমাঘ, বসু, ডঃ অনিলচন্দ্র(সম্পা.), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, 2003

অন্তর্জাল–

1. https://hmn.wiki/bn/Wildlife_Protection_Act%2C_1972
2. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1572331
3. https://as.vikaspedia.in/rural-energy/Asoni
4. https://bn.m.wikipedia.org/wiki

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

সাধারণ শ্রেণীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অবদান

পবিত্র বিশ্বাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার, সাগর সমন্বিত সরকারি বিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

যুগ যুগ ধরে প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ প্রথার মত নিষ্ঠুর, অমানবিক, অত্যাচারে যে সকল বিখ্যাত ব্যক্তিগণ জীবনভর সহ্য করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। অদম্য সাহস ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে সমাজের যে কোনো প্রতিবন্ধকতাকে অতি সহজে অতিক্রম করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তা আর একবার প্রমাণ করলেন ডঃ বি.আর. আম্বেদকর। ছোটবেলা থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্ত রকম বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে তিনি বিশ্বের একজন অগাধ পাণ্ডিত্যের বা জ্ঞানের অধিকারী হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সমাজের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার মত যে সামাজিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এইসব ব্যাধি নিরসন সম্ভব হয়েছে।এই প্রবন্ধে টেক্সচুয়াল অ্যানালিসিস পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ

জাতিভেদ, সাধারণ শ্রেণী, অস্পৃশ্যতা।

মূল আলোচনা

পৃথিবীতে কিছু ব্যক্তি তাঁদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইতিহাসে স্থান পায় আবার কিছু ব্যক্তির কর্মকাণ্ডই ইতিহাস তৈরি করে । এরকমই একজন ব্যক্তি হলেন ড: বি. আর.

আম্বেদকর। যিনি সকলের কাছে ‘বাবাসাহেব’ নামে পরিচিত। বাবাসাহেব শুধুমাত্র দলিত শ্রেণীর মুক্তিকামী কণ্ঠস্বর ছিলেন না। তিনি হলেন ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় দলিত নেতা, উচ্চ শিক্ষিত, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী, উদারমনা গণতন্ত্রের প্রবক্তা। জাতপাত প্রথার শিকার হয়ে তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন দলিত সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে দলিত সমাজ যেমন পিছিয়ে পড়বে তেমনি ভারতীয় সমাজও পঙ্গু হয়ে পড়বে। তাই ভারতবর্ষের দলিত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য বাবাসাহেব আম্বেদকর যে মহাসংগ্রামের শুভারম্ভ করেছিলেন। তার ঢেউ শুধুমাত্র নিম্ন শ্রেণি তথা দলিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা আবালবৃদ্ধবণিতাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের মৌ শহরে রামজি মালোজী শাকপাল এর ঘর আলোকিত করেন আম্বেদকর। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার ১৪তম সন্তান। মাতার নাম ছিল ভীমাবাঈ। ছোটবেলায়ই তাঁর মায়ের মৃত্যু হওয়ার জন্য তিনি মাসির কাছে মানুষ হন। একদিকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়া অপরদিকে সমাজ থেকে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা তাঁকে আরো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তুলেছিল। অস্পৃশ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করার অপরাধে ছোটবেলা থেকেই তিনি নিদারুণ কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং বর্ণভেদ প্রথার নিষ্ঠুর পরিহাস এর শিকার হয়েছিলেন। স্কুলজীবন তাঁর কাছে যে কি ভয়াবহ ছিল তা সকলেরই জানা। যা বর্তমানে আমরা সভ্য সমাজে কল্পনা করতে পারিনা। মাত্র ৫ বছর বয়সে দাপোলির স্কুলে তাঁর প্রথম শিক্ষা শুরু হয়।বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তিনি প্রারম্ভিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। আম্বেদকর যে গ্রামে বসবাস করত তার নাম ছিল আম্বাবাদেকর। গ্রামের নাম অনুসারে তাঁর পদবী ছিল আম্বাবাদেকর। আম্বেদকরকে এই পদবীটি দিয়েছিল তাঁর স্কুলের প্রিয় শিক্ষক মহাদেব আম্বেদকর। ১৯০৭ সালে বোম্বের এলফিনস্টোন হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। এই সময় প্রবল অর্থ কষ্টের জন্য তাঁর পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

তখন বারোদার রাজা গয়াকওয়াদ সায়াজী রাও(৩য়) তাঁকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯১২ সালে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও অর্থনীতিতে স্নাতক হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৫ সালে এম.এ.পাস করেন। "The Evolution of Provincial Finance in British India: A Study in the Provincial Decentralization of Imperial Finance" বই খানির জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অফ ফিলোসফি' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২১ সালে "Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India" গবেষণাপত্রের জন্য তাঁকে 'মাস্টার অফ সাইন্স' ডিগ্রী এবং ১৯১৩ সালে "The Problem of the Rupee :its Origin and its Solution" থিসিস এর জন্য অর্থনীতিতে তাঁকে 'ডক্টর অফ সাইন্স' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২৭সালে "The Evolution of the Provincial Finance in British India'' গবেষণামূলক গ্রন্থটির জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি প্রদান করে। দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সালের ১২ই জানুয়ারি ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে তাঁর উচ্চতম অবস্থানে উত্থান ও মহান কৃতিত্বের জন্য 'ডক্টর অফ লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করে। সারা জীবনে তিনি একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন তার মধ্যে কয়েকটি হল; Who were Shudras?, History of Indian currency and Banking, Manu and the Shudras, Untouchables or the Children of India's Ghetto, Buddha and his Dharma, Annihilation of Caste, Preservation of Social order, Communal Deadlock, The Constitution of British India, Revolution and Counter Revolution in India, Buddha and Kal Marx, Preservation of Social order ইত্যাদি। এহেন বিখ্যাত ব্যক্তির পাণ্ডিত্য ও অবদানকে কোন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। অনেকে তাঁকে শুধু দলিত শ্রেণীর অগ্রদূত, দলিতের মুক্তিদাতা, দলিতের

ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন। তবে তাঁকে শুধুমাত্র দলিত শ্রেণীর উন্নয়নকারী বা কাণ্ডারী হিসেবে অভিহিত করা উচিত নয় কারণ তিনি শুধুমাত্র দলিত শ্রেণীর জন্য চেষ্টা করেননি। তিনি সমগ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য আমরণ চেষ্টা করেছিলেন।

যদি আমরা ঋগ্বেদের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে তৎকালীন সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। এই ভাগ কর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিভাজন জন্ম অনুযায়ী নির্ধারণ হয়। যা আমরা মনুসংহিতার দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি। ডক্টর বি. আর. আম্বেদকর তাঁর বিখ্যাত 'অ্যানিহিলেশন অফ কাষ্ট' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন প্রথমে সমাজের মধ্যে বিভাজন কর্ম অনুযায়ী হলেও পরবর্তীকালে তা জন্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এই প্রথা অনুযায়ী সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ক্রমানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শূদ্র ও দলিত শ্রেণী সমস্ত দিক থেকে বঞ্চিত ছিল। এই বৈষম্যমূলক কাঠামোর দরুন সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অসাম্য ও বৈষম্যের এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যা সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজের অগ্রগতির অন্তরায়। এ রকম এক পরিস্থিতিতে আম্বেদকর উচ্চ-নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে এক মানবতার বন্ধণে আবদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও আইনি পদক্ষেপ শুরু করেন। তাঁর এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ শ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল।

প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। আর এই কুসংস্কারের অন্যতম উৎস ছিল তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি অন্যতম গ্রন্থ ছিল 'মনুসংহিতা'। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। যদিও ঋকবেদের যুগে তা কর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মনু শাসনকাল থেকেই তা জন্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হতে শুরু করে । ফলে এই জাতিভেদ প্রথা

সমাজের মানুষের মধ্যে একটি বিভেদের প্রাচীর তুলে দেয়। যা একটি সুস্থ, স্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থার প্রগতির অন্তরায়। ডক্টর বি. আর. আম্বেদকর সমাজের কল্যাণের জন্য অর্থাৎ দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রথার প্রবল বিরোধিতা করেন। আম্বেদকর ১৯২৭ সালে 'মাহাদ সত্যাগ্রহ' আন্দোলন চলাকালীন সময়ে তিনি সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে ১৯২৭ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর 'মনুসংহিতা'কে প্রকাশ্য দিবালোকে পুড়িয়ে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ফলে সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

হিন্দুসমাজের সামাজিক বিধিনিষেধ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আম্বেদকর আমরণ সংগ্রাম করেছেন। অস্পৃশ্য সমাজে জন্মগ্রহণের কারণে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি অস্পৃশ্য সমাজের আত্মমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক অপরাধ। এই অপরাধ যুগ যুগ ধরে নদীর স্রোতের মত ভারতীয় সমাজে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এই অস্পৃশ্যতার ব্যাধির স্বীকার হয়ে বহু মানুষের স্বপ্ন অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি এই প্রথায় অনেকের জীবন পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে। আম্বেদকর নিজের জীবনেও এই অমানুষিক প্রথার স্বীকার হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রথার অবলুপ্তি একান্তই প্রয়োজন। 'মুখনায়ক' ও 'বহিস্কৃত ভারত' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সমাজের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারগুলিকে দূর করে মানুষকে নতুন এক কুসংস্কারমুক্ত সমাজ প্রবর্তনের পথ দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় সংবিধানের ১৭ নং ধারায় তিনি 'অস্পৃশ্যতা' বিলুপ্তির কথা ঘোষণা করেছেন। ১৯৫৫ সালের এই সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূল করার জন্য 'প্রোটেকশন অফ সিভিল রাইটস অ্যাক্ট' পাস হয়।

বাবাসাহেব আম্বেদকর এমন একটি দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে সতীদাহ প্রথার মত অমানবিক ও কুসংস্কারমূলক প্রথাকে আনন্দ উৎফুল্ল সহকারে পালন করা হত। বাল্যবিবাহের মত নারী জীবনকে নিঃশেষিত করে দেওয়ার প্রথাকে

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। বিধবা নারীকে দাস-দাসী, পতিতাবৃত্তির মত প্রথাকে অবলম্বন করে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করতে হত। নারীকে কল্পনা করা হত সন্তান উৎপাদনকারী যন্ত্র হিসেবে। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ভারতীয় নারীদের যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায় যে নারীদেরকে কতটা কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করে বেঁচে থাকতে হত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে, নারীকে যে রূপ ইচ্ছা ব্যবহার করে ছিন্ন বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করা যায়। মনুসংহিতার বলা হয়েছে, নারীর দেওয়া দান অশুদ্ধ, ঈশ্বর তা গ্রহণ করবে না। নারীর কোন স্বাধীনতার নেই তারা বাল্যকালে পিতার অধীনে যৌবনে স্বামীর অধীনে এবং বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অধীনে থেকে জীবন অতিবাহিত করবে। তাদের নিজস্ব কোন শখ আল্লাহ বা স্বাধীনতা থাকবে না। নারীর প্রতি এরূপ বিধান দেখে আম্বেদকরের হৃদয় কেঁদে উঠেছিল । গীতায় বলা হয়েছে নারী মাত্রই শূদ্রানী, নরকের দ্বার। তিনি বলেছেন, স্ত্রী স্বামীর দাস নয়, সে স্বামীর জীবন সঙ্গিনী। উভয়ের মর্যাদা সমান। মানব সম্পদের প্রায় অর্ধেক হল নারী। নারীকে যারা হেয় প্রতিপন্ন করে তারা মানব সমাজের শত্রু। 'নারীর মর্যাদা সুরক্ষা' আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি প্রথম নারীর অধিকার আদায়ের জন্য মহারাষ্ট্রে ১৯২৮ সালে ২২ শে অক্টোবর আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষা, নারী সুরক্ষা, নারীর আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ 'মহিলা সংঘ' এর নেতৃত্বে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ নিয়ে মহারাষ্ট্রের নাসিকে কালারাম মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নিয়ে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। সমস্ত রকম পুলিশি বাধা-বিপত্তি, অত্যাচার সহ্য করে সকাল ১১ টা নাগাদ মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, এই দ্যাখো নারীর স্পর্শে মন্দির অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে না । দেবতারাও মন্দির ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে না।

নারী জাতিকে তিনি যে কতটা অন্তর থেকে ভালবাসতেন তা বোঝা যায় যখন তিনি ভারতের মন্ত্রী ছিলেন। নারী জাতির জন্য তিনি একাধিক কর্মসূচির রূপায়ণ

করেন; চাকরিরতা মহিলা কর্মীদের মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি, সমকাজে নারীর সমবেতন, নারীদের জন্য আলাদাভাবে 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' এর মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগ। নারী জাতির বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য ১৯৪৮ সালের 'হিন্দু কোড বিল' সংসদে পেশ করেন । এই বিলের প্রধান কয়েকটি বিষয় ছিল 'হিন্দু ম্যারেজ ল' চালু করা, মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের পূর্ণ অধিকার, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার, বিচ্ছেদকারী নারীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি। কিন্তু তৎকালীন সমাজে পার্লামেন্টের সদস্যরা প্রায় ৩ বছর ধরে প্রবল বিরোধিতা করে। ফলে জওহরলাল নেহেরু ১৯৫১ সালে ২৫ শে অক্টোবর বাধ্য হয়ে এই বিল বন্ধ করে দেন। তাই আম্বেদকর দুঃখ-কষ্টে হতাশায় আইন মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। তা সত্ত্বেও নারীদের উন্নয়নের জন্য তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন । তাই ভারতীয় সংবিধান রচনাকালীন সময় একাধিক ধারায় নারীরা যাতে সমান অধিকার ভোগ করতে পারে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এরকম কয়েকটি ধারা হল; ১৫ (এ) নং ধারা, ১৬ (এ) নং ধারা, ১৯ নং ধারা, ২৩ নং ধারা, ২৯ নং ধারা, ৪৫ নং ধারা, ৪৬ নং ধারা, ৩৩০ নং ধারা, ৩৩২ নং ধারা প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ হল বৈচিত্র্যময় দেশ। নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা মতের মিলন ক্ষেত্র। এই বৈচিত্র্যকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে আমাদের এই সংবিধান। যার অন্যতম কৃতিত্বের অধিকারী হলেন ডঃ বি. আর. আম্বেদকর। দেশের উন্নয়নের জন্য তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দেশবাসীর উন্নয়নের কথা ভেবে নিদারুণ কষ্ট যন্ত্রনার মধ্যে ভারতীয় সংবিধান রচনা করেছিলেন।ভারতের সংবিধান রচনা করার জন্য তৎকালীন কংগ্রেস দলের ৩ জন সদস্য আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, কানাডার মত দেশ ঘুরেও সংবিধান রচনার কোন সুরাহা না মেলায় অবশেষে তারা বিলেতে তৎকালীন সংবিধান বিশেষজ্ঞ জেমস মার্ক এর কাছে হাজির হলে তিনি বলেন ভারত একটি বহুবৈচিত্র্যময় দেশ। এদেশের সংবিধান তৈরির করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই বৈচিত্র্যময় দেশ সম্পর্কে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাই তিনি

বলেন এই সংবিধান তৈরি করার একমাত্র উপযোগী ব্যক্তি হলেন আপনার দেশের বিশিষ্ট পন্ডিত ও আইনজ্ঞ ডঃ বি.আর.আম্বেদকর। তিনিই আপনাদের দেশের জন্য সংবিধান তৈরি করতে পারবেন। উপায়ান্তর না পেয়ে তারা আম্বেদকর এর কাছে হাজির হন। তখন আম্বেদকরের সভাপতিত্বে ৭ জন সদস্য মিলে খসড়া কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি হন আম্বেদকর। সভাপতি হিসেবে যখন তিনি সংবিধান তৈরির দায়িত্ব নেন তখন তিনি মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ।একদিকে টিবি রোগে তাঁর ছেলের মৃত্যু, বিনা চিকিৎসায় স্ত্রীর মৃত্যু, অন্যদিকে তিনি নিজেই ডায়বেটিস ও ব্লাডপ্রেশারে ভুগছেন। এমতাবস্থায় রাত জেগে সংবিধান-এর মতো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখার কাজ করা কতটা কঠিন তা সকলেই অনুমান করতে পারেন। ডঃ আম্বেদকরের নিত্য সঙ্গী শ্রী নানক চাঁদ রত্তু তাঁর শরীরের অবস্থার অবনতি দেখে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও দেশবাসীর জন্য নিজের জীবনকে বাজী রেখে ২ বছর ১১মাস ১৮ দিন অর্থাৎ প্রায় ৩ বছর ধরে সংবিধান রচনা করেন। ১৯৪৯ সালে ২৬ শে নভেম্বর নানা বাধা-বিপত্তি, সমালোচনা এবং চুলচেরা বিশ্লেষণের ফলে সংবিধান রচনার কাজ শেষ হলে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এই সংবিধান কার্যকরী হয়। এই সংবিধান বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশের সংবিধানের ভালো ও অভিনব বৈশিষ্ট্যের সমন্নয়ে গড়ে উঠেছে। এই সংবিধান ২২ টি পার্ট, ৮ টি তফসিল এবং ৩৯৫ টি ধারা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য বর্তমানে সংবিধানে ২৫ টি পার্ট, ১২টি তফসিল এবং বিভিন্ন ধারা উপধারা মিলে এর সংখ্যা প্রায় ৪৬০ টি। তাঁর রচিত এই সংবিধান দেশের প্রতিটি মানুষকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আইন হল এই সংবিধান। দেশবাসীর স্বার্থে এই আইনের সুষ্ঠ প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন এই সংবিধানের যদি অপব্যবহার করা হয় তাহলে তিনি হবেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সংবিধান পুড়িয়ে দিতে বাধ্য হবেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন আইন শৃঙ্খলা হল রাজনীতির ঔষধ যেখানে রাজনীতি অসুস্থ হয়ে পড়ে

সেখানে এই ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়।

ইতিহাস সাক্ষী শ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের সঠিক মূল্য পায় না।মালিকপক্ষ শ্রমিককে দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয় এবং তার জন্য তাদের কোন অতিরিক্ত মূল্য দেয় না। প্রাচীনকাল থেকেই শ্রমিকদের বেশি করে খাটিয়ে মালিকপক্ষ তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করছে। শ্রমিকদের সুষ্ঠ, স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোনরকম পন্থা বা পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে না। এর ফলে শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। কার্ল মার্কস তাঁর 'উদ্বৃত্ত মূল্যে'র তত্ত্বে দেখিয়েছেন পুঁজিপতিরা কিভাবে শ্রমিকদের শ্রম আত্মসাৎ করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। শ্রমিকদের এই দুঃখ, কষ্ট লাঘব করার জন্য আম্বেদকর দুর্ঘটনা বা অকাল মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ আইন, শ্রমিক নিরাপত্তার জন্য ফ্যাক্টরি আইন, শ্রম কমিশন গঠন, স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা, সবেতন ছুটি আইন, নির্দিষ্ট সময় মজুরি দেওয়ার আইনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়া অতিরিক্ত শ্রমের জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রদান আইন, দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী মজুরি ও ভাতাপ্রদান আইন, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৪২ সালে আম্বেদকর শ্রমিকদের প্রতিদিন ১২ ঘন্টা কাজের জায়গায় ৮ ঘন্টা কাজের ব্যবস্থা করেন। বাবাসাহেব ভারতবর্ষের জলবিদ্যুৎ নীতির প্রবর্তক। কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের সেচপ্রকল্পগুলির উন্নতির জন্য তিনি 'কেন্দ্রীয় জল কমিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষি প্রধান দেশ হল ভারতবর্ষ। এই কৃষি হল আমাদের দেশের মূল ভিত্তি। দেশকে অর্থনীতির দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য তিনি সমস্ত পতিত জমি উদ্ধার করে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় আনার প্রস্তাব দেন। ১৯৪৪ সালে ৩রা জানুয়ারি আম্বেদকর বাংলা ও বিহার সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দামোদর নদীর বন্যা রোধের পরিকল্পনা করেন এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাষবাসের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি 'কেন্দ্রীয় প্রযুক্তিগত বলপরিষদ' এবং 'কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ' এর প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়া 'সেন্ট্রাল টেকনিকেল পাওয়ার বোর্ড', 'ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রিড সিস্টেম' ও 'সেন্ট্রাল ওয়াটারওয়ে ইরিগেশন অ্যান্ড নেভিগেশন কমিশন'ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হিল্টন ইয়ং কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৩৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলার জন্য ১৯৩৫ সালে ১লা এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ভারত সরকারের উন্নয়নমূলক নীতি নির্ধারণে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯২৩ সালে 'The Problem of Rupee: Its Origin and Its Solution' গ্রন্থে আম্বেদকর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের রূপরেখা নির্ধারণ করে দেন। তাঁর দেওয়া প্রস্তাবনা থেকেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বা আর. বি. আই. এর রূপরেখা ও নীতি নির্দেশিকা তৈরী করেন হিল্টন ইয়ং কমিশন। ১৯৫৯ সালে 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' গঠিত হয়। এটি একটি সরকারি অফিস, যেখানে বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের নাম নথিভুক্ত করেন এবং বিভিন্ন সময় তাদের এখান থেকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' এর গঠনের ধারণা তাঁরই।

আম্বেদকর মনে করেছিলেন একটি সমাজের অগ্রগতির জন্য শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। তাই তিনি সার্বজনীন শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন 'জ্ঞান প্রতিটি মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি'। তাই এই জ্ঞান বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হল শিক্ষা। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড ডঃ আম্বেদকর তা রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষা একমাত্র হাতিয়ার। তাই তিনি দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি "শিক্ষিত হও, সংগঠিত হও, লড়াই কর"। একটি দেশ বা জাতির উন্নতির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যে অবদান কতখানি তাও তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর রাজারাম কলেজের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বলতেন জ্ঞানই হল মানুষের জীবনের ভিত্তি এবং জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা করতে হবে। এছাড়া তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির

কথা বলেছেন এবং তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে সেই জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের কথাও বলেছেন।

ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র। এখানে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশ একাধিক রাজ্য সরকার রয়েছে। সমগ্র দেশে সাংগঠনিক ও আইনি ব্যবস্থাকে একত্রিত করার জন্য তিনি অভিন্ন দেওয়ানিবিধি আদালতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে অভিন্ন দেওয়ানি ব্যবস্থা চালু করেন। ভারতীয় সংবিধানের ৪৪ নং ধারায় অভিন্ন দেওয়ানি আদালতের কথা বলা হয়েছে।

মানুষের সবচেয়ে কাছের ও প্রিয় বন্ধু হল গাছ। গাছ ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না।গাছের সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক। গাছ ও মানুষ একে অপরের ওপর অঙ্গাঙ্গিভাবে নির্ভরশীল। পরিবেশ রক্ষার জন্য গাছের গুরুত্ব অপরিসীম একথা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি জনসাধারণকে গাছ বসানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ঔরঙ্গাবাদে থাকাকালীন সময়ে তিনি দর্শনার্থীদের কলেজ কম্পাউণ্ডে প্রত্যেককে একটি করে গাছ লাগানোর কথা বলেছিলেন।

আম্বেদকর হলেন অন্ধকারের আলোর দিশারী, আশাহীনদের আশা জাগরণের প্রতীক, কণ্ঠস্বররোধকারীদের কণ্ঠস্বর এবং প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি। একটি দেশকে আধুনিকীকরণ করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার তার সমস্ত ব্যবস্থাই ডঃ বি.আর.আম্বেদকরের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাঁকে 'ভারতের আধুনিক মনু' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ডঃ বি. আর. আম্বেদকর ছিলেন নারী মুক্তির অগ্রদূত, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধা, খসড়া কমিটির সভাপতি, আধুনিক বুদ্ধ এবং ভারতের সংবিধানের জনক। তবে অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় যে, তাঁকে শুধু দলিত আন্দোলনের অগ্রদূত বলে সম্বোধন করা হয়। একথা কিন্তু বাস্তবে সত্য নয় কারণ তিনি শুধুমাত্র দলিত শ্রেণীর জন্য কাজ করেননি। তিনি যে সাধারণ শ্রেণীর জন্য একাধিক প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তা এই প্রবন্ধেই আলোচনা করা

হয়েছে। সত্যি কথা বলতে এইরকম মহান ব্যক্তির কীর্তিকলাপকে কোন একটি বা দুটি প্রবন্ধের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করা সত্যিই অসম্ভব ব্যাপার। ভারতবর্ষ তথা বিশ্ববাসীর গর্ব যে ভারতবর্ষের মত একটি দেশে এ রকম একটি নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। বর্তমানেও এই নক্ষত্রের আলোয় আমরা আলোকিত হয়ে আছি। তাই তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ২০১২ সালে হিস্ট্রি টি.ভি. ১৮ আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীয়দের ভোটের দ্বারা তিনি 'শ্রেষ্ঠ ভারতীয়' নির্বাচিত হন। যখনই যেখানে আমরা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অথবা যে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই, তখনই আমরা আম্বেদকর এর চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডকে স্মরণ করি।

রেফারেন্স :

১. Ambedkar, B. R. (2021). 'THE PROBLEM OF THE RUPEE : ITS ORIGIN AND ITS SOLUTION', Borgaon Meghe, Wardha, Maharashtra, Sudhir Prakashan.

২. Basu, D. D.(2007). 'Introduction to the Constitution of India', New Delhi, Wadhwa and Company.

৩. Biswas, P. (2022). 'Relevance of Ambedkar in the Current Socio-Political Perspectives of India', Goyal, M. & Datta, K. (Ed.) Dr. B. R. Ambedkar An Overview of his Thoughts and Actions. Jaipur, Book Enclave, pp. 91-103.

৪. Babare, S. (2016). 'Dr. B. R. Ambedkar and Women Empowerment in India', Research Front, 4(1),pp.23-26.

৫. Chowdhury, J.(2022). 'Relevance of Ambedkar in the Current Socio-Political Perspectives of India', Goyal, M. & Datta, K.(Ed.), Dr.B.R.Ambedkar An Overview of his Thoughts and Actions. Jaipur, Book Enclave, pp.24-30

৬. Chaudhary, P. (2016).Hindu Code Bill: Towards Liberation of Women Contemporary voice of Dalit. 8(2), PP.153-162.

৭. Dhanvijy, V. (2012). 'Dr. Babasaheb Ambedkar's Efforts for Women Empowerment and Present Status of Women in Society', International Interdisciplinary Research Journal (EIIRJ), P. 111.

৮. Keer, D. (1990). 'Dr. Ambedkar life and Mission', Mumbai, Popular Prakashan.

৯. Kuber, W. N. (1991). 'Ambedkar :A Critical Study', New Delhi, Peoples Publishing House.

১০. Mohan, S. S. (2018). 'B. R. Ambedkar's Vision On Social Justice In India', International Journal of Information Movement (IJIM).

১১. Nath , J. P. (2002). 'Socialist Leader in India', New Delhi, Kanishka Publishers.

১২. Prasad, K. B. R. (2020). 'Dr. B.R. Ambedkar's Concept of Social Justice and Constitution of India', IJCRT, Vol. 8.

১৩. Raghavendra, R. H. (2016). 'Dr. B. R. Ambedkar's Ides on Social Justice in India Society', Sage Publications.

১৪. The Hindu Code Bill — Babasaheb Ambedkar and his Contribution to Women's Rights in India. (2019) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dalithistorymonth.medium.com/the-hindu-code-bill-babasaheb-ambedkar-and-his-contribution-to-womens-rights-in-india-872387c53758&ved=2ahUKEwiJq7GuxI__AhWJOnAKHUaEDwAQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw1bsEQiNLxaeHg29FJtUQfw

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মা.(১৪২৭)- 'মনুসংহিতা', কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,

১৬. সান্যাল, আ.(২০০০), 'বাবা সাহেব ড: আম্বেদকর রচনা সম্ভার'(সম্পা),বাংলা সংস্করণ- অষ্টাদশ খণ্ড, নতুন দিল্লী, ডঃ আম্বেদকর ফাউন্ডেশন সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার.

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

রণবীর পুরকায়স্থ ও ইমাদউদ্দিন বুলবুল-এর উপন্যাসে প্রতিফলিত দেশভাগের চিত্র : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন

পম্পা দাস
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

দেশভাগ বাঙালি জীবনের একটি বিয়োগাত্মক অধ্যায়। কিন্তু কথাসাহিত্যে তার প্রতিফলন এখনও খুব বেশি হয়নি। কেন হয়নি, তার ব্যাখ্যা অনেক পন্ডিত অনেক ভাবে দিয়েছেন। তবে যেটুকু হয়েছে তা নিয়ে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন হওয়া প্রয়োজন। এই বরাক অঞ্চলও দেশভাগের অভিশাপ সমানভাবে বহন করে চলেছে। এই অঞ্চলের দুটি উপন্যাসিক একই নদীর নামে দুটি আলাদা উপন্যাস লিখে সেই আখ্যানের বর্ণনা দিয়েছেন। আমার আলোচনার বিষয় হলো ইমাদউদ্দিন বুলবুলের 'সুরমা নদীর চোখে জল' ও রণবীর পুরকায়স্থ-র 'সুরমা গাঙর পানি' এই দুই উপন্যাসে প্রতিফলিত দেশভাগের চিত্র : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন–

১) 'সুরমা নদীর চোখে জল' উপন্যাসের পটভূমি হল দ্বিখন্ডিত ভারতবর্ষের চিত্র ও ১৯৫০ সনের দাঙ্গার ঘটনা। ১৯৫০ সনের রায়টের বছর যখন উত্তরভারত, পশ্চিমভারত ও পূর্বভারত জুড়ে হিন্দু-মুসলমান ব্যাপক ভাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়েছিল।

'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসের পটভূমি ১৯৩০ সনের থেকে শুরু করে দেশভাগের পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন- "ব্রিটিশদের সংগে লড়াই করতে জন্ম হয় কাছাড় হাইস্কুলের। স্বদেশী আন্দোলনের দিন তখন। বন্দেমাতরম আর নেতাজী নিয়ে মানুষের উন্মাদনা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আর মাস্টারদা তখন নয়নের মনি। ভগতসিং এর ফাঁসি হয়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় কলাপাতায় লবন বানানোর ধুম শিলচরে"। [১]

২) বিশেষত বলা যায় ভারত পাকিস্থানের সীমা নির্ধারণকারী সুরমা নদীকে কেন্দ্র করেই 'সুরমা নদীর চোখে জল' উপন্যাসের বয়ন সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এই নদী তীরবর্তী গ্রাম 'হরিনগর' এবং এই গ্রামের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, সবকিছুই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এছাড়া উপন্যাসটিতে উপস্থাপিত চরিত্র, মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, ভাষা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবকিছুই কাছাড়ের অতি পরিচিত চিত্র।

আবার 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসটিও সুরমা নদীকে কেন্দ্র করেই কাহিনি এগিয়ে গেছে, গুরু সৃষ্টিধর ওঝা বৈতলকে বলেছে–"দেখরে বা আমরার দেশ। কুটিকুটি মানুষ নিচে দেখরায়, এরা সব আমরার ভাইবেবাদর। সব সিলেটি। আর অউসে বড়দড়ি এক গাছা দেখরায়, দড়িনায়, আমরা সেমা, আমরার সুরমা নদী, কি সুন্দর নদী দেখরায়নি" [২]

আসলে দুটি উপন্যাসই সুরমা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সুরমা নদীর একপাড়ে কাছাড়ের হরিনগর গ্রাম ও অপর পাড়ে সিলেটের রইদপুয়ানি গ্রাম।

৩) 'সুরমা গাঙর পানি' অনেক গভীর জীবনদর্শনের কথা ঔপন্যাসিক মাঝে মাঝেই গল্পে দেখিয়েছেন। কিন্তু 'সুরমা নদীর চোখে জল'-এ কোনো গভীর দার্শনিক তথ্য তুলে ধরা হয়নি। লেখক যেভাবে জনজীবনকে দেখেছেন ঠিক সেভাবেই আখ্যানের বর্ণনা দিয়ে গেছেন।

৪) একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দুটি আখ্যানই রচিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের উপন্যাসে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা সমানভাবে এঁকেছেন। ইমাদউদ্দিন বুলবুল সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে তাঁর 'সুরমা নদীর চোখে জল' উপন্যাসটির আলোচনায় রণবীর পুরকায়স্থ-ও 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন– "আমরা উভয়েই আমাদের সংস্কৃতির আখ্যান রচনা করি। আমরা মানুষের আখ্যান রচনা করি। কেউ জামানের কথা বলি তো কেউ মৎস্যজীবি বৈতলের কথা। উপন্যাস রচনায় আমরা একই পথের পথিক"।[৩]

ইমাদউদ্দিন বুলবুল স্বসমাজের নিখুঁত দর্পণে একেঁছেন তাঁর আখ্যান। যেখানে ধর্মীয় পরিবেশে থেকেও মানুষ প্রধান। ধর্মীয় আবহে বড় হয়ে উঠেছে ছোট্ট জামান। আর রণবীর পুরকায়স্থ-র 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে দেখিয়েছেন ধর্মীয় আবহকে

অস্বীকার করে একটা ছেলে (বৈতল) ও তাঁর বন্ধুরা কিভাবে বড় হচ্ছে। আর 'সুরমা নদীর চোখে জল' উপন্যাসে অন্য কোনো ধর্মের জায়গা নেই শুধু মুসলিম সমাজের কথা আছে।

৫) 'সুরমা নদীর চোখে জল'-এ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বারবার বলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে ইতিহাস চেতনা সেভাবে আমরা দেখতে পাই না।

৬) 'সুরমা নদীর চোখে জল' আখ্যানের বিস্তৃতি অনেক বেশী ভারত বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে সৌদি আরবের কথা এবং সেখানকার দাঙ্গার কথা ও তুলে ধরেছেন উপন্যাসিক। কিন্তু 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসের আখ্যানের বিস্তৃতি ভারত বাংলাদেশের সীমানার মধ্যেই দেখিয়েছেন উপন্যাসিক রণবীর পুরকায়স্থ।

৭) ভাষা এবং সংলাপের ব্যবহারে দুজনেই সিলেটি উপভাষাকে ব্যবহার করেছেন। 'সুরমা নদীর চোখে জল' এর উপন্যাসের উপভাষাকে কিছুটা পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে। যাতে বাংলাভাষী সব অঞ্চলের লোক পড়তে যাতে কোন অসুবিধা না হয়।

'সুরমা গাঙর পানি'তে সিলেটি উপভাষা হুবুহু ব্যবহার করা হয়েছে। এতে যারা সিলেটি উপভাষা বুঝেন না তাদের জন্য আখ্যানের কথা অনেক কঠিন হয়েছে। রণবীর পুরকায়স্থ তাঁর উপন্যাসের ভাষা নিয়ে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, "আমার গ্রন্থনার ভাষা বড়োই জটিল, সংকেত বহুল। বেশি দেরি হয়ে গেলে সংকেতের অর্থ আমিও বলতে পারব না"।[৪]

৮) লোকসংস্কৃতিকে 'সুরমা নদীর চোখে জল' উপন্যাসে একটি প্রধান উপজীব্য করে তুলা হয়েছে, কিন্তু 'সুরমা গাঙর পানি'তে লোকসংস্কৃতির উপাদান তাঁর কথা গানে এবং লোককাহিনিতে সেভাবে আসেনি। উপন্যাসের শুরুতে একটি সিলেটি বিয়ের গানের প্রথম দুটিলাইন তুলে দেয়া হয়েছে–

"লীলাবালী লীলাবালী
ভর ও যুবতীসই
কী দিয়া সাজাইমু তোরে,"

এই উপন্যাস সেই সংস্কৃতির উপাখ্যান, যে উপখ্যান সে সংস্কৃতির কথা বলে। সেলিনা হুসেন তাঁর অমর উপন্যাস 'নীলময়ূরের যৌবন' এর প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে ও শুরুতে লিখেছেন- 'অপনা মাংসে হরিণা বৈরী'।[৫]

৯) দুটি উপন্যাসের লেখকই অশ্লীল ঘটনাকে ও সরাসরি অশ্লীলতার পর্যায়ে না দিয়ে সাংকেতিক ভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন 'সুরমা নদীর চোখে জল' উপন্যাসে রয়েছে মেয়ে ছাগলের ঋতুমতি হওয়া। তা ছাড়া সেবুলের গান ইচকদান বিচকদানা। এ গুলো অশ্লীল ব্যবহার কিন্তু লেখক সরাসরি অশ্লীলতার দোষে দোষী হয়নি।

১০) দুটো উপন্যাসই শিশুমনের বর্ণনা খুব ভালোভাবেই তোলে ধরা হয়েছে। যেমন জামানের ছয় বছর বয়সে বারুণী মেলার দর্শন কিংবা হাতির বাচ্চার পোষ বানানো দেখা। আবার বৈতলের জল দেখলে দুরন্ত হয়ে উঠে তার প্রান। জলের অতল থেকে তুলে আনে আধমণি বোয়াল। জমিদারবাড়ির দেবি মায়ের হাসিটুকুর সংগে বৈতল মিলিয়ে নেয় তার মার হাসিকে।

১১) দুটো উপন্যাসেই শেষের দিকে একই এলাকায় নায়কের বসবাস, শিলচরের মালুগ্রামে এসে বসবাস করে জামান ও বৈতল।

১২) উভয় উপন্যাসেই দেশভাগের যন্ত্রনাটা আছে, দেশছাড়ার কথা শুধুমাত্র 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে রয়েছে, বৈতল সিলেট ছেড়ে দুর্গাবতীকে নিয়ে মালুগ্রামে প্রথমে রিফিউজি হয়ে এসেছিল। কিন্তু জামান এর দেশত্যাগের কথা না জানালেও দেশভাগের যন্ত্রণাটা সে নিজের দেশে থেকে ও অনুভব করেছে প্রতিপদে। জামানের দাদু তাকে বলে– 'ঘরের কাছে বিদেশ দাদু ভাই কি যে কষ্ট সহ্য করা যায় না'।[৬]

১৩) 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে বর্ণভেদ-এর কথা বলেছেন। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই মায়ের কথা রঙ নিয়ে বৈতলের গর্ব। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন–
"মার সাদা রঙের হাত কে চুনের ফুটো ভেবে অলৌকিক চুন নিয়ে পানে ঘসে"।[৭]
কিন্তু 'সুরমা নদীর চোখে জল' উপন্যাসে বর্ণভেদের কথা কোনো ভাবেই উঠে আসেনি।

১৪) 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে পুরানের উল্লেখ আছে। রামায়নের বানরদের সেতু বন্দের কথা, মনসামঙ্গলের কথা বিস্তৃত আকার রয়েছে। কৃষ্ণ সুদামার বিচ্ছেদ-

এর কথা আছে। আর 'সুরমা নদীর চোখে জল' উপন্যাসে আছে আরবের হজ যাত্রার কথা।

(১৫) দুটো উপন্যাসেই হাসনরাজার গানের প্রসঙ্গ অনেকবার এসেছে। 'সুরমা নদীর চোখে জল' এ আছে–

"আমারে ভাসাইলায় গো আল্লা
সুরমা নদীর গাঙে"।[৮]

আর 'সুরমা গাঙর পানি' উপন্যাসে হাসনরাজার অনেক গান আছে–

"আমি ইমুলনাগ রয়ে
আমিয়া ছিখেইড় খেলিতে
ভবসাগরে রে,
আমি রাধা আমি কানু
আমি শিবশঙ্করি"।[৯]

ইমাদউদ্দিন বুলবুল ও রণবীর পুরকায়স্থ দুজনেই শিল্পসম্মতভাবে কাহিনিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল ইমাদউদ্দিন যেমন সহজ সরল ভাষায় কাছাড়ের জনজীবনকে তুলে ধরেছেন তেমনি রণবীর পুরকায়স্থও বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল, বরাক অঞ্চলের প্রত্যক্ষ জীবন তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। রণবীর পুরকায়স্থ, সুরমা গাঙর পানি, একুশশতক, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১২, পৃঃ ৯৩।
২। তদেব, পৃঃ ৪৬।
৩। কান্তার ভূষণ নন্দী, যাপনকথা, ডিসেম্বর ২০১৫, গুয়াহাটি, পৃঃ ৪৬।
৪। তদেব, পৃঃ ১৪৭।
৫। pottonayak, Createcrit, Anandaram, Nogaon, Assam, 2015
৬।ইমাদউদ্দিনবুলবুল, 'সুরমা নদীর চোখে জল' ২০১৩, শিলচর, পৃঃ ২০।
৭। রণবীরপুরকায়স্থ, সুরমা গাঙর পানি, একুশশতক, কলকাতা অক্টোবর, ২০১২, পৃঃ ৯।
৮। ইমাদউদ্দিন বুলবুল, 'সুরমা নদীর চোখে জল' ২০১৩, শিলচর, পৃঃ ১৯।
৯। রণবীরপুরকায়স্থ, 'সুরমা গাঙর পানি', একুশশতক, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১২, পৃঃ ৫২।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

‘‘তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ’’: প্রসঙ্গ বিষ্ণু দে’র কবিতা

পরেশ চন্দ্র মাহাত

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বাংলা কাব্য সাহিত্যে তিরিশ দশক এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দশক। কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের কবিতায় যে রবীন্দ্র-বিরোধীতার সূত্রপাত হয়েছিল, এই দশকের কবিদের কবিতায় তার চরম রূপ নিল। এই দশকের কবিরা বাংলা কবিতায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলেন। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে কাব্যে সত্য-সুন্দর-শিবের আরাধনায় না মেতে তাঁরা সমকালীন অসুন্দরের ছবি তাঁদের কবিতার মূল বিষয়বস্তু করলেন। তিরিশ দশকের কবিদের এই কাব্য আন্দোলনে যে সমস্ত কবিরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের মধ্যে বিষ্ণু দে- র নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। কিন্তু এই সময় পর্বের কাব্যাকাশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সূর্য মধ্যগগনে বিরাজমান। রবীন্দ্রপ্রতিভার দ্যুতি এতটাই প্রখর এবং তীব্র ছিল যে সেই সময় পর্বে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমেচ্ছুক কবিদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া লাগতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিভা সম্পন্ন ও দূরদৃষ্টির অধিকারী তিরিশ দশকের কবিরা খুব তাড়াতাড়ি এবং অল্প সময়ের ব্যবধানেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে,তাঁদের কবিসত্তার প্রকাশ ঘটাতে চাইলে রবীন্দ্র বিরোধীতায় না গিয়ে তাঁকে স্বীকার করে ও আত্মস্থ করে কবিতা লেখায় অগ্রসর হতে হবে। তাই এই দশকের প্রায় সমস্ত কবিরা প্রথমে রবীন্দ্র স্তুতি করেই কাব্য জগতে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁরা নিজস্ব স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় সফলও হয়েছেন। আমার আলোচ্য কবি বিষ্ণু দে-ও সেই কর্ম যজ্ঞে সফল কবি।

মূলশব্দ

জীবনকথা–রবীন্দ্র আরতি –রবীন্দ্র প্রভাব – উপসংহার।

মূল প্রবন্ধ

তিরিশ দশকের এক প্রতিভাবান ও উল্লেখযোগ্য কবি হলেন বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। বামপন্থী পন্থায় বিশ্বাসী কবি উত্তর কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যের নিয়ে এম. এ. পাশ করেন। এবং রিপন কলেজে (বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা শুরু করেন এবং শেষ করেন মৌলানা আজাদ কলেজে। আধুনিক কবিতার ইতিহাসে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর কাব্য জীবন বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশের সমকালে শুরু হয়। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকা ‘প্রগতি’তে তিনি নিয়মিত কবিতা লিখতেন। একটা আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে শ্যামল রায় ছদ্মনামে কল্লোল-১ ও মহাকাল-২ নামক দুটো পত্রিকায় কবিতা লিখতে হয়েছিল। অস্তিবাদী এই কবির লেখা কাব্যে এলিয়টের প্রভাব যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার প্রভাব ও অনুষঙ্গও বর্তমান। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি তাঁর কবিতায় কীভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গানুষঙ্গ এসেছে তার যথাসাধ্য বর্ণনা দেব।

তিরিশ দশকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যগগনে বিরাজমানরত। তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণে ঝলসিত হয়েছেন সেই সময়কালের প্রায় সমস্ত কবিগোষ্ঠী। আমার আলোচ্য কবি বিষ্ণু দেও সেই সমস্ত কবিদের তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। তিনি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রানুসরণ করেছেন অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ততা ও সুপ্রকৌশলে। অনুপ্রাণিত ছিলেন তার কথা তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। কারণ হিসাবে তিনি লিখেছেন– ‘‘...তাঁর নক্ষত্রবিহারি প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকে বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ং সম্পূর্ণ।’’[৩]

বিষ্ণু দে’র সাতচল্লিশ বছর সারস্বত সাধনায় মোট সতেরো খানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । তাঁর কাব্য সরণী বেয়ে হাঁটলে দেখা যাবে যে, পাশ্চাত্যের কবি

এলিয়টের কবিতার প্রভাব, অনুষঙ্গ ও অনুসরণ যেমন আছে, তেমনই তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার প্রভাব, অনুষঙ্গ ও অনুসরণ একেবারেই দুর্লভ নয়। বরং প্রচুর পরিমাণে সুলভ ও লক্ষণীয়।

বিষ্ণু দে'র কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ বা প্রসঙ্গের অবতারণাকে আলোচনার সুবিধাতে আমি দুটি পর্বে ভাগ করলাম। প্রথম পর্বে দেখা যায়, নিজের মত প্রকাশের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতাদর্শের বিরোধ। দ্বিতীয় পর্বে কিন্তু তিনি আর বিরোধিতা না করে তাঁর স্তুতি ও প্রশংসাতেই মত্ত। রোমান্টিক প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখা যায় না কোনো দুর্গন্ধময়যুক্ত পঁচা বিষয়ের আভাস। তাঁর কবিতার প্রেম অনাবিল ও বাস্তব স্বপ্নবিলাসে ভরপুর পরিপূর্ন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় "...রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিতরুচির এ উত্তরাধিকার অস্বীকার করা কোনো গোঁড়ামিতেই আর সম্ভব নয়।"[৪]

অপরদিকে বিষ্ণু দে'র কবিতায় দেখা গেল প্রেম শাশ্বত নয়, অশাশ্বত। তাই তো তিনি রবীন্দ্রনাথের মতকে মানতে দ্বিধান্বিত হয়েছেন। তাঁর অন্তরাত্মা মেনে নিতে চাই না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে বললেন –

"পুরূরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে গীতস্বর দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিত বিশ্ব মাঝে।"[৫]

অপরদিকে বিষ্ণু দে বলেন –

"আমি নহি পুরূরবা। হে উর্বশী,
ক্ষণিকের মর অলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো গড়ে তুলি আমার ভুবন।"[৬]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ নরহত্যা লীলা, অস্থির সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবি গোষ্ঠীদের চিন্তা-চেতনাকেও আন্দোলিত করেছিল। কবি অধ্যাপক বিষ্ণু দেকেও এই অস্থির সামাজিক পরিস্থিতি প্রভাবিত করেছিল। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাল না মিলে বলে উঠলেন –

"হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।"[৭]

এলিয়ট তাঁর কবিতায় অন্যান্য বিখ্যাত কবিদের গুরুত্বপূর্ণ উক্তির অথবা চরণাংশের ব্যবহার ঘটিয়েছেন নির্দ্বিধায়। এলিয়ট তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'The west land' কাব্যে দান্তে, টেনিসন, সেনেকা, হাক্সলী ও সেক্সপিয়র প্রভৃতি কবিদের চরণ নির্দ্বিধায় এবং অত্যন্ত সুচারুভাবে ব্যবহার করেছেন। বিষ্ণু দে-ও এলিয়টের পথের পথিক। তাঁর মতো তিনিও রবীন্দ্র পংক্তির অথবা চরনাংশের প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পংক্তির সাহায্যে তিনি তাঁর নিজের অন্তরের মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উর্বশী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই বিষ্ণু দে উচ্চারণ করেন –

"পলাতকা উর্বশীর প্রতি পদপাতে
দুলে দুলে ওঠে স্নায়ু আলোড়িত উতলা কম্পনে।"[৮]

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি'(১৯৩৭)। এই গ্রন্থেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের পংক্তির ব্যবহারের মাধ্যম অস্তিবাদে কুঠারাঘাত করেছেন। এই কুঠারাঘাতের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় 'শিখণ্ডীর গান' ও 'টপ্পাঠুংরি' কবিতায়।

বিষ্ণু দের কবিতার ভাষা দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত। জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে, "আমার কালের সবচেয়ে দুর্বোধ্য অথচ সবচেয়ে সৃষ্টিশীল কবির নাম বিষ্ণু দে।"[৯] তাঁর বিদেশি উপমা ব্যবহার রবীন্দ্রনাথকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁর এই ব্যবহারকে রবীন্দ্রনাথের 'জবরদস্তি' বলে মনে হয়েছে। 'চোরাবালি'র কবিতা পড়ার সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে সম্পর্কে বলেন– " বিষ্ণু দে-র কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে, – সেটা দুর্বলতা।...কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচুট লাগাতে থাকে তবে সেটা বলতেই হবে এটা জবরদস্তি।"[১০]

বিষ্ণু দে'র দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের একটি অসাধারণ ও বিতর্কিত কবিতা 'ঘোড়সওয়ার'। এই কবিতা নিয়েও রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ ছিল। যদিও বিখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কোনো অভিযোগ করেননি। কিন্তু ১১ই এপ্রিল ১৯৩৯ সালে লিখিত অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ জানিয়েছেন– "একটা সংশয় তাঁর (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) আশ্বাস সত্ত্বেও রয়ে গেল। তিনি বলেছেন, এই

কবিতাটির অবলম্বন রিরংসা নয়।...সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত্র করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন। কাব্য হিসাবে এর গুণপনা আছে, কিন্তু শ্রাব্য হিসাবে এটা আমার কাছে বহুদূরে বর্জনীয়।...মেলাতে পারলুম না।"[১১]

এরপরের কাব্য থেকে বিষ্ণু দে'র চিন্তাধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এই দ্বিতীয় পর্বে আর রবীন্দ্রনাথের মতকে খণ্ডন করেননি। এই পর্বে দেখা যায় সেই ক্ষুরধার কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সেই ধারালো তীর একেবারে স্থিমিত। রবীন্দ্রনাথের 'হ্যাঁ-সূচক' চিন্তাচেতনায় নিজেকে সামিল করেছেন। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবি বিষ্ণু দে'ও নিজেকে সেই হ্যাঁ-সূচক স্বর্গরাজ্যে নিজের মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা লাভে নিজেকে সর্বদা সচেষ্ট রেখেছেন। আর সেই চেষ্টার সফল প্রয়াসবিলাসী কবি তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পূর্বলেখ'(১৯৪১) রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছেন। 'পূর্বলেখ', 'সাত ভাই চম্পা' ও 'সন্দ্বীপের চর' কাব্যত্রয় যখন রচিত হয় তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণহুংকার আবার দেশের মধ্যে ভারতছাড়ো আন্দোলন, ছেচল্লিশ এর মন্বন্তর ও যার শেষ পরিণাম দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ। আর এই সময়ের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বিষ্ণু দের সঙ্গে বামপন্থীদের বিচ্ছেদ ঘটে। "বিচ্ছেদের সেই দুর্বিসহ দিনগুলিতে কবি কিন্তু নিজের শিল্প দৃষ্টি থেকে ভ্রষ্ট হন নি।"[১২]

বিষ্ণু দে'র সপ্তম কাব্যগ্রন্থ 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'(১৯৫৩) এর কবিতাগুলির সময়কাল হল ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে। এই কাব্যগ্রন্থে বিষ্ণু দের রবীন্দ্র-ভক্তির চরম ও পরম রূপ প্রতিফলিত হল। এই কাব্যে যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণাংশ-এর ব্যবহার করেছেন, পাশাপাশি রবীন্দ্র স্তুতিও লক্ষ করা যায়। এই রবীন্দ্রভক্তির প্রামাণ্য স্বরূপ তিনি এই কাব্যের প্রথম ও শেষকবিতা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছেন। প্রথম কবিতার নামকরণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন এবং শেষ কবিতা তাঁর জন্মদিনকে নিয়ে। 'পূর্ণতার প্রতীক' রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে'র দৃষ্টিতে–

"আনন্দে নিশ্বাস টানি, হৃৎস্পন্দে আশার আশ্বাস
শুনে আসা দীর্ঘকাল অভ্যাস তবুও

হটাৎ হাওয়ায় আসে উপবাসী মানুষের রোদনের দুয়ো,
কেটে যায় বিটোফেনী সিম্ফনির গন্ধর্ব বাতাস।
মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি-আলোয়
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবি-কে,"[১৩]

আবার শেষ কবিতা হল '২৫শে বৈশাখ'। এখানে কবি বলছেন আমরা গান করি কিংবা গান শুনি সবই রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া। ফুলে ফুলে, বনে, পথে, ঘরে ঘরে, সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতি মুহূর্তে যে আমরা ছবি দেখি, সেটা রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিকৃতি। কবিতায় তিনি বলেছেন–

"আমরা যে গান শুনি,গান করি আকাশে হাওয়ায়
ফুলে ফুলে বনে পথে ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় সকালে,
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি স্তব্ধ ছন্দের মাথায়
রঙের রেখায় মুক্তি কল্পনার নব নব তালে
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা
হাজার সন্ধ্যার সূর্য প্রত্যুষের হাজার সবিতা ---
রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজলে জাহ্নবীকে বাধিব না,.... [১৪]

গদ্যছন্দে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম বিশিষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পুনশ্চ' (১৯৩২)। এই কাব্যের 'কোমল গান্ধার' নামে একটি কবিতা আছে, সেই কবিতার সঙ্গে বিষ্ণু দে'র কাব্য 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'এ ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান। পুনশ্চ-এর 'কোমল গান্ধার' কবিতার প্রথম চরণাংশ নিয়ে রচিত কবিতা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে'। এই দুই কবিতা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে'র কোমল গান্ধার এক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

"ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না।
চলায় বলায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান –
কেন যে তার পাইনে কিনারা।" [১৫]

আবার বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় কোমল গান্ধারের স্বরূপ নির্ণয়ে বলেছেন–

"পাথরে পাথরে মানুষের অঙ্গীকার
অজ্ঞান পাথর খুলে খুলে মামল্ল-সৈকতে
নিস্তব্ধ পাথর কেটে আমাদের চৈতন্যের সমুদ্রে সমুদ্রে
ঢেউ তুলে সমুদ্রে হাওয়ায়
দীর্ঘছন্দ তোমার বাহুতে দুলে দুলে
'সমুদ্রের কোমল গান্ধার'।"[১৬]

কবি বিষ্ণু দে'র নবম কাব্যগ্রন্থ 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৬০) এর রবীন্দ্রানুসরণ ও রবীন্দ্র প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখ। বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালির গর্বের দিন। এই দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হয়। কেন সাড়ম্বরে পালিত হবে না? উত্তর হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বকবি, বিশ্বের কবি। 'জনগণ মণ অধিনায়কে'র কবি, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'র কবি। তাই বিষ্ণু দে-র জিজ্ঞাস্য –

"তুমি কি কেবলই স্মৃতি, শুধু উপলক্ষ, কবি?
*** *** *** *** ***
মঞ্চে মঞ্চে কেবলই কি ছবি ?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ ?"(তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ)

এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কবিতার মধ্যেই। কবি বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের হয়ে জবাব দিয়েছেন। বলে উঠেন–

"তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরের;
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো
সে কঠিন ব্রতের গৌরবে,

আমাদের বিকারের গড্ডল ধুলার দিনগত অন্যায়ে কুৎসিতে
শুনি সুন্দরের গান"(তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ)

রবীন্দ্রনাথের অস্তিদর্শনে পুরোপুরি সমর্থন দিয়েছেন কবি বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি–

"তবু শূন্য শূন্য নয়, ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা একা সে অগ্নিতে, দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।"[১৭]

এরই প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয় বিষ্ণু দে'র কবিতার পরতে পরতে। কবি যতই পরিপক্ক হয়েছেন, ততই তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আসক্ত হয়ে পড়েছেন। রবীন্দ্র-ভক্তি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। তাঁর অস্তিবাদী মতাদর্শের সাথে সাথে তাঁর ভাষা, মানসিকতা ইত্যাদির মিল দেখা গেছে। রবীন্দ্র-ভক্তির চরম বহিঃপ্রকাশ প্রকাশিত হয়েছে 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু' কবিতায়। যেমন–

> "তোমার আমার কয়েকজনার মানস রাবীন্দ্রিক ভাষাই খোঁজে, যদিও সেই মহাপুরুষ একক মাহাত্ম্যে অতুলনীয়, যেন বা অতিমানব, নৈরাত্ম্যে স্বাধীন তিনি। একালে বুঝি কেউই নেই সেই রকম কেন্দ্রিক।"[১৮]

এই অতিমানব, মহাপুরুষের একক মাহাত্ম্য বিষ্ণু দে'কে প্রভাবিত করেছে। তাইতো কবি 'নব প্রতিষ্ঠায়' কবিতায় সেই অতিমানব, মহাপুরুষের আবির্ভাবের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে। তাই কবি সংকোচে বলেন –

"আমার ব্যাপক দুঃখ রূপান্তরে উন্মুখ নিষ্ঠায়
তোমাকেই চায় তাই যন্ত্রণার নব প্রতিষ্ঠায়।"

সেই সঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা অভিভূত করেছিল ?' কবিকে, তার প্রত্যুত্তরে বিষ্ণু দে জানান –

"আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে;
আমরা কেমন করে দুর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি
কোন রবিরস্মি কোন বাঁশি কোন তূর্যের নির্ঘোষে

কবে বা কখন কিসে করে দিলে রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী!
আমাদের সূর্য দেখা সূর্যালোকে প্রত্যুষে প্রদোষে।।"

এছাড়া রবীন্দ্রগানের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে 'গান' কবিতায়। আবার রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যের 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতার সাথে বিষ্ণু দের 'বামী' কবিতার ছাপ লক্ষ করা যায়।

পঞ্চাশ বছর বয়সে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল কর্ম তথা দশম কাব্যগ্রন্থ হল 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'। প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। অন্নদাশংকর রায়কে উৎসর্গীকৃত এই কাব্যের প্রথমে মোট ১০২টি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়। পরে কবি-পুত্র জিষ্ণু দে জানিয়েছেন যে, দুটি কবিতা বাদ দিয়ে আরও চারটি কবিতা ('মেটে কি এ সাধ', 'উত্তর', 'ভৈরবীর পত্রাবলী পাঠোদ্ধার' ও ' মৎসার্টের একটি কবিতা শুনে') যোগ করে মোট ১০৪টি কবিতা নিয়ে নতুন ও বর্ধিতভাবে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ প্রাপ্ত এই কবিতা সংকলনে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে, তেমনি তাঁর সৃষ্টি চরিত্রকে নিয়ে অথবা তাঁর কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। রবীন্দ্রানুগত্যের উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'দামিনী'। জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'আমার কালের কয়েকজন কবি' গ্রন্থে 'দামিনী' কবিতার উৎস হিসাবে চতুরঙ্গের দামিনীর কথা বলেছেন। এই কবিতায় রবীন্দ্র প্রেমভাবনার সঙ্গে বিষ্ণু দের প্রেমভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। চতুরঙ্গের দামিনীর 'মিটিল না সাধ' আক্ষেপানুরাগ কিংবা কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের–

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা
*** ****** *** ***
জনমের সাধ ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা
সকলি ফুরায়ে যায় মা
আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল।"

বিষ্ণু দের দামিনীও বলে উঠে–

"আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে ।।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রের দ্বারা কবি বিষ্ণু দে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই আকৃষ্টতার ছাপ লক্ষ করা যায় , কবিপুত্র জিষ্ণু দে কথিত বটুকাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র দ্বারা সুর আরোপিত কবিতা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'এ। সেখানে শচীশ, বিনয় ও গোরার কথা আছে। যেমন–

"সরু ফালি কলকাতার জোলো মাটি দিয়েছিল তবু কিছু রস, কিছু রৌদ্র
শচীশকে বিনয়কে, তবু গোরা আরো বহু স্বদেশী ছেলেরা
কলকাতাকে চিনেছিল, সুস্থ হতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ স্ববশ।" [২০]

এই কাব্যের অন্তর্গত আরেক বিখ্যাত কবিতা হল 'রবীন্দ্রনাথ'। সমগ্র কবিতাটিকে কবি তিনটি অংশে ভাগ করেছেন। প্রথম অংশ বারো পংক্তির, মাঝের ও শেষ অংশে চোদ্দ ও পনেরোটি পংক্তি রয়েছে। সমকালীন ক্লেদাক্ত, দুর্গন্ধময় ও ব্যথাময় পরিবেশকে পরিবর্তনের জন্যে অস্তিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান জানিয়েছেন–

"শতাব্দীর সূর্যে এসো অভীপ্সার তীব্র মেঘে তুমি'[২১]

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যের 'মেটে কি এ সাধ', 'উত্তর', 'ভুবন ডাঙায়', 'শত-বার্ষিকী', 'আলেখ্য', 'সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে', ও 'পরকে আপন করে' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রানুষঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

কবির পঞ্চাশোত্তর কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'সেই অন্ধকার চাই', 'সংবাদ মূলত কাব্য', 'ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে', 'ঈশাবাস্য দিবানিশা', 'চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর', 'উত্তরে থাকো মৌন', এবং 'আমার হৃদয়ে বাঁচো'। এই সমস্তকাব্যের বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কবি বিষ্ণু দে-- কোথাও রবীন্দ্র কবিতার ভাব, কোথাও রবীন্দ্র সংগীতের , আবার কোথাও রাবীন্দ্রিক সুন্দরের কথা । 'ঈশাবাস্য দিবানিশা'র 'পদ্মার গঙ্গায় রুদ্র সাধনার' ও 'রবিকরোজ্জ্বল নিজ

দেশে', আবার 'চিত্ররূপমত্ত পৃথিবীর' 'সুজলা সুফলা', ও 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু', এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ 'আমার হৃদয়ে বাঁচো'র 'আজও মনে পড়ে সেই বরানগরের পাঠ আর গান' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রানুষঙ্গের কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ করা যায়। যেমন 'রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে' কবিতায় সেই রবীন্দ্র আরতির কথায় ধ্বনিত–

"আজো চাই সকলেই কেউ জেনে কেউ বা না বুঝে
নামাই মানস গঙ্গা রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে,
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে সমতলে মন্দিরে গম্বুজ।"[২২]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান যে, কবি বিষ্ণু দে তাঁর কাব্য জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের সৃষ্টিকর্মে রবীন্দ্রচর্চা করে গেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর কবিতায় নিজস্ব স্বকীয়তার উজ্জ্বল ছাপও বর্তমান।

তথ্যসূত্র:

১) সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা –২৮৫।
২) তদেব, পৃষ্ঠা – ২৮৮।
৩) দে বিষ্ণু, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২০, আশ্বিন ১৩৫৯, পৃষ্ঠা – ১৪।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪।
৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিত্রা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩০২,পৃষ্ঠা -১১।
৬) দে বিষ্ণু, উর্বশী ও আর্টেমিস, সিগনেট প্রেস, কলকাতা২০, প্রথম সিগনেট সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা –২৯।
৭) তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৯।
৮) তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৭।
৯) ভট্টাচার্য জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, ভারবি, কলকাতা – ৭৩, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৪, পৃষ্ঠা ১৭৩।
১০) বন্দ্যোপধ্যায় দেবীপ্রসাদ, জীবনানন্দ দাশ: বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জুলাই ২০০৭, পৃষ্ঠা – ৯৩।
১১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা,প্রথম প্রকাশ ১৩৮১,

পৃষ্ঠা – ২৬৫।
১২) ভট্টাচার্য জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, ভারবি, কলকাতা – ৭৩, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৪, পৃষ্ঠা – ১৭৬।
১৩) দে বিষ্ণু, নাম রেখেছি কোমলগান্ধার, সিগনেট প্রেস,কলকাতা -২০, প্রথমপ্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, পৃষ্ঠা -১৩।
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা -১৩০।
১৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আশ্বিন ১৩৩৯, পৃষ্ঠা – ৩৫।
১৬) দে বিষ্ণু, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, সিগনেট প্রেস, কলকাতা -২০, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, পৃষ্ঠা -১২৭।
১৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা – ৭৫।
১৮) দে বিষ্ণু, শ্রেষ্ঠকবিতা, নাভানা, কলকাতা -৭২, প্রথম প্রকাশ- জ্যৈষ্ঠ১৩৬২, পৃষ্ঠা –১৮১।
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা –১৩৭।
২০) দে বিষ্ণু, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২২, পৃষ্ঠা – ১০।
২১) দে বিষ্ণু, শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, কলকাতা -৭২, প্রথম প্রকাশ- জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, পৃষ্ঠা – ১৪৯।
২২) তদেব পৃষ্ঠা –১৭৪।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) সেন মজুমদার জহর, বাংলা কবিতা: মেজাজ ও মনোবীজ, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮।
২) মিশ্র অশোক কুমার, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, অক্টোবর ২০২০।
৩) ত্রিপাঠী দীপ্তি, আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, ২০১৩।
৪) ভট্টাচার্য জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, ভারবি, কলকাতা – ৭৩, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৪।
৫) বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, বাংলা কবিতার কালান্তর, দেজ পাবলিশিং,কলকাতা -৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১৫।
৬) সেন অরুণ, বিষ্ণু দে, এ ব্রতযাত্রায়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা -০৬, প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৩৬০।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বাংলা সাহিত্যে অর্থনীতি প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সমবায় নীতি"

পৌলমী সরকার
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবিরূপে পরিচিতি লাভ করেন সমগ্র বিশ্বে কিন্তু অর্থনীতিবিদ সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি কতটা স্বীকৃত সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। পল্লী সমাজের গণমানুষের মান উন্নয়নে কৃষি ও সামগ্রিক সামাজিক অবকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং কিভাবে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটাতে হবে সে সম্পর্কে তাঁর ভাবনার বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী দিকনির্দেশনামূলক তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধে কৃষি ভাবনা, সমবায় ভাবনা, গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তীর্ণ আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধে বলেছেন যে, দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করাই মানুষের ধর্ম। এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলেই মানুষ লোভ, ক্রোধ, মোহের মতো রিপুর শিকারে পরিণত হয়। ধনীর ধনে দারিদ্র্য হরণের ক্ষমতা নেই সেই কথাটা তাঁর সমবায় ভাবনার মূলে রয়েছে। সাধ্যমত মিতব্যয়িতা নিশ্চিত করা সমবায়ের অন্যতম নীতি। এতে সঞ্চয় ও আয় বাড়ে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রায় সকল কাজই সমবায় ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থনীতিবিদ না হয়েও পল্লী উন্নয়ন, সামাজিক বনায়ন, কৃষিঋণ দানে কৃষি তথা গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে এবং তিনি কোন মানদণ্ডে মূল্যায়ন করেছেন সে বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক

আলোচনা আবক্ষমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে স্থান পেয়েছে। কৃষিঋণের প্রবর্তন, প্রয়োগ ও সুফল সম্পর্কে তাঁর নীতিনির্ধারণী তত্ত্ব আজকের প্রেক্ষাপটে প্রায়োগিক বিশ্লেষণ অতিশয় গুরুত্ব পেয়েছে। সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একদিক, অন্যদিকে তিনি ছিলেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভাবনার প্রবক্তা ও উদ্যোগ গ্রহণের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। অর্থনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক পরিবর্তনের নতুন ধারণার প্রবর্তক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুধা চিন্তিত আধুনিক মতবাদ ও ব্যবহারিক কৌশল আলোচনা ও বিশ্লেষণ গুরুত্বের দাবিদার। সর্বপ্রথম গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন, সমবায় আন্দোলন ও এইসব ভাবনাগুলির বাস্তবায়ন সার্বিকভাবে তৎকালীন প্রান্তিক মানুষের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছে সে দিকটি আলোকপাত করা। বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এসব ভাবনাগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ ও তা নিরূপণের প্রয়াসও আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি ভাবনা, সমবায় ভাবনা, গ্রামীণ ব্যাংক, পল্লী উন্নয়ন ।

মূল প্রবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে অর্থনীতির সরাসরি যোগ দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধে। সাধারণ অর্থে সমবায় বলতে বোঝায় একটি সমাজের কিছু ব্যক্তি একত্রিত হয়ে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায় ভাবনা ব্যাপক ও বিশেষ কিছু ধারণা বহন করে। সুতরাং একারণে তাঁর সমবায় ভাবনা অন্যান্য ভাবনার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা অনুসারে, তাঁর সমবায় ভাবনাটি মূলত আয়ারল্যান্ড ও রুশ সমাজ কাঠামোর উন্নয়ন ভাবনা থেকে এসেছে। তিনি সমবায় ভাবনাটির এমন কিছু সুনির্দিষ্ট তত্ত্বগত দিকে আলোকপাত করেছেন যা প্রচলিত ধারণা থেকে কিছুটা ভিন্ন। বাহ্যিক কিছু অর্থনৈতিক বা সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কিছু সংঘবদ্ধ মানুষের সমন্বিত রূপ হলো সমবায়। কিন্তু তিনি সংঘবদ্ধতার তুলনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন পারস্পরিক মানসিক একাত্মতার ওপর অর্থাৎ আদর্শগত ঐক্যবদ্ধতা।

কেবলমাত্র শ্রম এবং অর্থ বিনিয়োগ করে নয় বরং কাউকে না ঠকিয়ে মানসিক ঐক্যবদ্ধতার সমন্বিত রূপের ভেতর নিহিত আছে একটি আদর্শ সমবায় কাঠামো। এ প্রসঙ্গে বলা যায়– কর্মশ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করবার জন্য তিনি সমবায়নীতির পথ তাঁর কর্মের পথ হিসেবে গ্রহণ করেন। একতার বদলে ঐক্যের ও সংঘবদ্ধ শক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে চাইলেন সমবায়ের মাধ্যমে সে শক্তি অর্জন দুর্বলের পক্ষে সম্ভব। তাঁর ভাষায় – "অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন।" এইভাবে তাঁর সমবায় ভাবনা কর্মের পথ ধরতে চেয়েছে।

কোনো ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা চলতে গেলে তখনই সে একটি টুকরো মানুষ এবং সে হয়ে পড়ে একটি অপূর্ণাঙ্গ মানুষ। একটি অসম্পূর্ণ মানুষ একা কোনো কিছু করতে পারে না, দশজনে মিলে যা করতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে সমবায় খামার গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমবায়ের মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। তাঁর মতে মানুষ যখন একত্রিত হতে পারে না তখনই তাঁর দিকটি প্রকাশ পায়। মানুষের এই ক্ষুদ্রতাকে তিনি অনুর্বর বালু মাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বালু মাটি একত্রে দানা বাঁধতে পারেনা বলে সে মাটিতে ফসল হয় না। কর্মশ্রমকে একত্রিত করে জনসাধারণের জন্য অর্থশক্তি অর্জনে তিনি সমবায়নীতির পথকে সঠিক পথ হিসেবে মনে করতেন। সমবায়ের মাধ্যমে দুর্বলের পক্ষেও সেই শক্তি অর্জন সম্ভব যে শক্তি ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁর মতে, অসংখ্য দরিদ্র মানুষ যখন নিজস্ব সামর্থ্য একত্রিত করতে পারবে সেই মিলনই মূলধন। তাঁর সমবায় ভাবনায় তাঁর নিজস্ব মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে, তিনি চেয়েছিলেন সমবায় ব্যবস্থায় কোনো আমলাতান্ত্রিকতার উপস্থিতি থাকবে না, সমবায়নীতির মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাতে জনগণের পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসন বহাল থাকবে এবং তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগ ঘটাতে হবে। পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধতা ও সংঘবদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগের সঙ্গে সমবায় ব্যবস্থায় জনগণের সার্বভৌমত্বের সমন্বয়– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায় ব্যবস্থার এ

ধারণা নিঃসন্দেহে গতানুগতিক সমবায় ধারণা থেকে ভিন্ন মাত্রার সংযোজন বলা যায়। সমবায়কে তিনি এভাবে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করতেন ধন-সম্পদ কোনো একক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের হাতে গচ্ছিত থাকবে না, সর্বসাধারণের শক্তি সম্মিলিত হয়ে সে ধন হবে সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের সম্পদ। পল্লীকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়, সেচ সমবায়, মৎস্য চাষ সমবায়, তন্তুবায় সমবায়, সমবায় ভাণ্ডার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর সমবায় ভাবনাটি অর্থনীতিতে Cooperative Society-কেই বোঝায় না, ভাবনাটির দ্বারা Economic of large scale production concept-কেও নির্দেশ করে। এক কথায়, কেবল ঐক্যবদ্ধতা দিয়ে নয় একটি আদর্শ সমবায় গড়ে তুলতে হলে সততা এবং মানসিক সংঘবদ্ধতা থাকতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

> "বালি জমিতে ফসল হয়না, কেননা তাহা আঁট বাঁধে না, তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি, পাতা-পচা প্রভৃতি এমন কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে। মানুষেরও ঠিক তাই, তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।"

তাঁর যৌথ খামার ধারণাটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাঁর সমবায় ভাবনাটি। তিনি মনে করতেন আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির প্রধান বাধা হচ্ছে খণ্ড খণ্ড জমি। সমবায়নীতির মাধ্যমে খণ্ড-বিখণ্ড জমিগুলোকে যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির আওতায় এনে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য ঘোচাতে হলে সর্বপ্রথম তিনি কৃষককে আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে আত্মশক্তির জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো আত্মবিশ্বাস। তিনি সবসময় মনে করতেন, প্রত্যেক মানুষ এক অফুরন্ত শক্তির আধার। মানুষের মধ্যে যে গুপ্ত শক্তি বিরাজমান সেটিকে জাগিয়ে তুলতে পারলে তার দ্বারা সবকিছু সম্ভব। তিনি মানুষের ভেতরের এসব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার কথা বলেছেন। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে সমবায়ের

মাধ্যমে আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির মাধ্যমে জমিতে ট্রাক্টর ব্যবহারের মাধ্যমে টুকরো জমির আল উঠিয়ে একত্রে ফসল ফলানো, উৎপাদিত ফসল সমবায় গোলায় রাখা এবং পণ্য বিপনণের সুযোগ্য ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেনএবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর ফলে কৃষকের শ্রম সাশ্রয় হয়, পরিবহন ও বিপণন খরচ কম হয়। কৃষকের পক্ষে তার শ্রম অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে আয় বাড়ানো সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব গভীরভাবে অবলোকন করেছিলেন কৃষক তার আলবাধা সুনির্দিষ্ট জমিতে হালের লাঙল ও জোয়াল ব্যবহার করে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সামান্য ফসল পায় যার দ্বারা তার জীবন নির্বাহ ও কৃষিঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কৃষকের এই নিষ্পেষিত জীবন তাঁকে বিষণ্ণ ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিভাবে সমবায়ের মাধ্যমে জমি একত্রিতকরণ করে যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির আওতায় এনে উৎপাদন বাড়ানো যায় সে তথ্য কৃষকের দ্বারে গিয়ে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চিত্র হলো কৃষকরা সর্বদা দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত। তাদের এই অবস্থা অপরিবর্তনীয়। দরিদ্র ক্রমশ দরিদ্র হচ্ছে এবং ধনীরা ততোধিক ধনী হচ্ছে। এর কারণ হলো বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের ভয়ংকর আগ্রাসন। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন সমবায় পদ্ধতি গড়ে তোলা। তিনি মনে করতেন মানুষ তার কর্মদক্ষতা দিয়ে উৎপাদন ও উপার্জন করতে পারে এবং এর সুফল সম্মিলিতভাবে ভোগ করতে পারে। সমবায়ের পথ হলো সত্য ও ন্যায়ের পথ। একমাত্র সমবায়নীতির মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস এবং সমবায় নীতির মধ্যে নিহিত রয়েছে অংশীদারিত্ব, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ভরসার অর্থনীতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায় চিন্তার সারকথা প্রীতির মাধ্যমে লোকসাধারণের হিতসাধন। এই প্রীতি আর ভালোবাসা প্রজাসাধারণকে, বিশেষ করে দরিদ্র কৃষক সমাজকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডে উৎসাহ জোগাবে, গতিময়তা আনবে। তিনি সমবায়কে মুক্তির একমাত্র পথ বলেছেন। তিনি এটিকে মনুষ্যত্বের মূলনীতি হিসেবে দেখেছেন। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হিসেবে

আখ্যায়িত করেছেন। সমবায়ের সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির সংমিশ্রণের ওপর জোর দিয়েছেন। এমনকি তিনি আয়ারল্যান্ড ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার কোঅপারেটিভ পদ্ধতি দেখে অভিভূত হয়েছেন। স্বদেশে প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছেন।গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে 'মণ্ডলী' প্রথার পাশাপাশি 'সমবায় নীতি' বাস্তবায়নে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা তাঁর এক অসাধারণ পদক্ষেপ। শিলাইদহে ও পতিসরে কৃষিব্যাংক স্থাপনের পর তিনি কৃষকদেরকে সমবায়ী হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। তাছাড়া, সমবায়ের মাধ্যমে কুটির শিল্পেরও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীতে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তিনি সমবায়ে বিশেষ সফলতা লাভ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধে দরিদ্র মানুষের উন্নতি কল্পে সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যকে জয় করার মতো আত্মবিশ্বাস নেই। এই আত্মবিশ্বাস না থাকার কারণ হলো তাদের মধ্যে একতার অভাব। তাঁর কথায়, 'পরস্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষ-ই পুরো, একলা মানুষ টুকরো মাত্র।' তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে দরিদ্র মানুষ একজোট হয়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে দারিদ্র্যকে জয় করতে পারবে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, পল্লীগ্রামে তিনি দেখেছেন দরিদ্র চাষী এবং সম্পন্ন চাষীদের ছোট-বড় ক্ষেত্র পর পর রয়েছে। তাদের হাল বদল তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কম-বেশী আছে। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে পরিশ্রম করছে এবং ফলও পাচ্ছে আলাদা আলাদা। এই অসাম্য দূর করার জন্যই তিনি সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন যে, চাষীরা যদি তাদের সকলের ফসলের ক্ষেত এবং মূলধন একত্র করে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিকার্য করে তারা তবে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপন্ন করতে পারবে।

সে ফসল একসাথে গোলাগত করে বিক্রির ব্যবস্থা করলে অপেক্ষাকৃত খরচ কম পড়বে, লাভও বেশী হবে। এই লাভের অর্থ তাদের প্রত্যেকের মূলধনের অনুপাত ভাগ করে নিতে পারবে। এইভাবে একজন ছোট, দরিদ্র চাষীও তার দারিদ্র্যকে জয় করতে পারবে বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে 'রাশিয়ার চিঠি'-

তে তিনি বলেন—"চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে - জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর। দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা। কিন্তু এ দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে পড়বে, আর তাতে দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কোলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে।"

অন্নসাধনার ক্ষেত্রে কৃষিই মানুষকে ব্যক্তিগত খন্ডতার থেকে বৃহৎ সম্মিলিত সমাজের ঐক্যে উত্তীর্ণ করতে পেরেছিল। ধর্মসাধনায় ব্রহ্মবিদ্যার সেই একই কাজ। যখন প্রত্যেক স্তবকারী আপন স্তবমন্ত্র ও বাহ্যপুজাবিধির মায়াগুণে আপন দেবতার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তারের আশা করত– তখন দেবত্ববোধের ভিতর দিয়ে মানুষ আত্মায় আত্মায় পরমাত্মায় মিলনের ঐক্যবোধ সুগভীর ও সুবিস্তীর্ণ করে লাভ করেছিল।

পরিশেষে তাই বলা যায়, দরিদ্র দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন পদ্ধতির মূলনীতি এই বিশ্লেষণে প্রকাশিত। আধুনিককালীন অর্থনীতির বিবর্তনের যে প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্র-মানসে ঘটেছে তার আলোচনা আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে সুস্পষ্টরূপে করেছি।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬১, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, কলকাতা।

২। ঘোষ, নিত্যপ্রিয়, বিষয় রবীন্দ্রনাথ নিত্যপ্রিয় ঘোষের প্রবন্ধ, গাঙচিল।

৩। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রবীন্দ্র জীবন কথা, আনন্দ পাবলিশার্স।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অনুসন্ধান

প্রশান্ত কুম্ভকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন প্রেক্ষণের মধ্যে একটি হল সামাজিক শিক্ষা অপরটি মূল্যবোধ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মানে দৈবী নির্ভর কাহিনী নয়। দেবতার অন্তরালে সামাজিক মানুষের বিবিধ গতিপ্রকৃতি সেখানে প্রস্ফুটিত হয়েছে। পরিবার ও সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য সামাজিক মূল্যবোধগুলির ভূমিকা সেসময় ছিল অন্যতম। মানুষের আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন জীবনযাপনে মূল্যবোধ না থাকলে তাকে মানুষের জীবন বলা সমীচীন হবে না। বর্তমানের মতো মধ্যযুগে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ছিল না। পরিবার ও সমাজে একটা নীতি, আদর্শ ও শিক্ষা ছিল। যা এখন নেই বললেই চলে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব ও নগ্ন চিত্র সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে উঠে আসছে। মানুষ যন্ত্রে পরিণত হতে বসেছে। তাই সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের এখন বড়োই প্রয়োজন। এই সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধগুলি মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করত এবং সেখান থেকে বর্তমান যুগসমস্যা সমাধানের কোন উপায় আছে কিনা সেগুলি খুঁজে বের করাই আমাদের এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মূল শব্দ

সমাজ, সামাজিক শিক্ষা, মূল্যবোধ, নৈতিক আদর্শ, মনুষ্যত্ব।

মূল প্রবন্ধ

সামাজিক শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের দ্বারা জ্ঞাতসারে বা

অজ্ঞাতসারে মানব আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ সমাজে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তাকেই সামাজিক শিক্ষা বলে। আর মূল্যবোধ বলতে বোঝায় এক ধরণের বিশ্বাস যা সমাজের কল্যাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করা হয়। এটি মানুষের আচরণের একটি সামাজিক মাপকাঠি। পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, ধর্ম, বিদ্যালয়, বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, বই প্রভৃতি থেকে মানুষ সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের আলোচনার বিষয়টি হল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আমাদের সমাজে এই সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধগুলি কেমনভাবে সমাজকে পরিচালিত করত। অনেকেই মনে করেন যে, মধ্যযুগের সাহিত্য দৈবনির্ভর এবং অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। তাতে কি সমাজ আর কি শিক্ষামূলক উপাদান থাকবে! তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য দৈবনির্ভর হলেও সমাজ বহির্ভূত কিন্তু নয়। কারণ সাহিত্য ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতার আড়ালে আসলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সমসাময়িক সমাজ, ব্যক্তিত্ব, জাতি ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা। মধ্যযুগের কবিরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু, ক্ষণভঙ্গুর পথ পরিক্রমা করে তাতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। সেই পথেই পা দিয়ে এগিয়ে চলেছে সমাজের নতুন প্রজন্ম।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে কাব্যটির কথা বলতে হয়, সেটি হল বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। কারণ এই গ্রন্থটিই মধ্যযুগে রচিত প্রথম প্রামাণিক কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি তেরটি (১৩) খণ্ডে বিভক্ত। এই কাব্যের 'ভারখণ্ডের' অন্তর্গত ১৮৫ সংখ্যক পদে আছে –

" কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হআঁ দুঠমনে।
প্রবল হৈআঁ সূদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে।।
পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।
পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপমনে।।
সেবকে লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতি।

আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী।।
শরণ জনের লোকে লংঘিব পরাণ।
দাতাএঁ লংঘিব আপণেয়ি দিআঁ দান।।"[১]

এখানে বলা হয়েছে যে, যেদিন সমাজে কনিষ্ঠ দুষ্টমনা হয়ে জ্যেষ্ঠকে লঙ্ঘন করবে, শূদ্র প্রবল হয়ে ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করবে, পুত্র যখন পিতাকে লঙ্ঘন করবে, শিষ্য গুরুকে লঙ্ঘন করবে, সেবক প্রভুকে লঙ্ঘন করবে, স্ত্রী পতিকে লঙ্ঘন করবে, পাপে নিমগ্ন হয়ে মানুষ যখন পুণ্যকে লঙ্ঘন করবে, তেমনি শরণাগতকে লোকে হত্যা করবে, দাতাই অপহরণ করবে তখন সমাজের পতন নিশ্চিত হবে। অর্থাৎ সেকালে সমাজের একটি মূল্যবোধ ছিল এবং সমাজের একটি জীবনাদর্শ ছিল। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধার চোখে দেখবে, পিতার কথা পুত্র কখনো অমান্য করবে না, শিষ্য কখনো গুরুকে লঙ্ঘন করবে না, স্ত্রী পতির বাধ্য হবে, আশ্রিতকে কেউ হত্যা করবে না, দাতা দান করে দানগ্রহীতাকে অত্যাচার করবে না। এগুলি সবই সামাজিক আদর্শ যা তৎকালীন সময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমান দিনে পিতা-মাতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, গুরুর প্রতি শিষ্যের শিষ্ঠ আচরণ, বড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা- এই কোমল অনুভূতিগুলির বড়োই অভাব। আশাপূর্ণা দেবীর 'গাছের পাতা নীল', বিমল মিত্রের 'ভগবান কাঁদছে', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কেউ না', রমাপদ চৌধুরীর 'বেঁচে থাকা', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'ঝাঁড়ফুক', মতি নন্দীর 'বুড়ো লোকটা' প্রভৃতি কয়েকটি আধুনিক বাংলা উপন্যাস পড়লেই বোঝা যায় আমাদের মানসিকতা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাই বলেছেন –

> " আজ বাঙালির জীবন হয়ে গেছে রাজনীতি সর্বস্ব। বাঙালির যে অন্য জীবন- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক– তা আজ ঝাপসা হয়ে গেছে।.....আজ বাঙালির পারিবারিক সম্পর্ক এমন দাঁড়াচ্ছে যে, পিতা পুত্রকে খুন করছে, মাকে খুন করছে ছেলে। শিক্ষকও ছাত্রকে মারছে, ছাত্রও মারছে শিক্ষককে। এ কোন সংস্কৃতির মূল্যবোধ! শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা দিন দিন কদর্য হয়ে উঠছে কেন! অল্প বয়সীদের কেন এত উদ্দাম ও কুৎসিত নৃত্য। এ কোন্ সংস্কৃতি তৈরি করছে!"[২]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের সমসাময়িক কালে স্ত্রীহত্যাকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী'দের সমাজে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শতাধিক ব্রাহ্মণ আর অগণিত গরু হত্যায় যে পাপ হয়, এক নারী হত্যায় তার থেকে অনেক বেশী পাপ হয়। 'বাণখণ্ডের ' অন্তর্গত ২৯৮ সংখ্যক পদে আছে –

" শতেক ব্রাহ্মণ আর মায়িলেঁ গোকুল।
যে পাপ সেহো নহে তিরীবধ তূল।।"[৩]

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত রাধাদাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত গীত' কাব্যেও স্ত্রী হত্যাকে মহাপাপ অর্থাৎ সর্বাধিক নিন্দনীয় পাপকর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাব্যের ৮২ সংখ্যক পদে বলা হয়েছে –

"তিরি বধ পাতক ঘুচাহ কর পার'
জনমে জনমে জস ঘুসিব সংসার।।"[৪]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' ধর্মাধর্ম ও পাপপুণ্য বোধেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এইসব বোধ বংশ পরম্পরায় সমাজে প্রচলিত ছিল। পুণ্যকর্মে স্বর্গে বাস অর্থাৎ পূণ্যকর্ম করলে জীবনে নানা রকম সুখভোগ হয় আর পাপকর্ম করলে নরকবাস অর্থাৎ বিষময় ফল ভোগ করতে হয়। 'রাধাবিরহ' খণ্ডে বলা হয়েছে –

" পুণ্য কইলেঁ স্বগগে জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপে হএ নরকের ফল।।"[৫]

যৌথ পরিবার প্রথা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' একটি অন্যতম সামাজিক চিত্র। রাধা, তাঁর স্বামী আইহন, শাশুড়ী, জটিলা ও কুটিলা নামে দুই ননদিনী, বৃদ্ধা বড়াই প্রমুখকে কেন্দ্র করে একটি যৌথ পারিবারিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। এই যৌথ পরিবারকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য নারী ও পুরুষেরা তাঁদের কাজ ভাগ করে নিয়েছেন। তাই এই কাব্যে আমরা দেখি, গোয়ালা সমাজের মেয়েরা ব্যবসা ও জীবিকার কাজে দধিদুগ্ধের পসরা সাজিয়ে মথুরার হাটে বিক্রি করতে গেছেন। তৎকালীন সময়ে মেয়েদের এই স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে উদার মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

পরবর্তী ক্ষেত্রে 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও আমরা নারীর স্বাধীন রূপ দেখতে পাই। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' আমরা দেখি, কালকেতু ও ফুল্লরা নিজেদের পারিবারিক দায়িত্বকে ভাগ করে নিয়েছে। কালকেতু সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরে পশুবধ করে নিয়ে আসে, আর ফুল্লরা সেই মাংস হাটে বিক্রি করে। 'চণ্ডীমঙ্গলের' বণিকখণ্ডেও দেখা যায়, ধনপতির দাসী দুর্বলা বাজারে জিনিস কিনতে যায়। আবার 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে আমরা নারীর বীরাঙ্গনা রূপ প্রত্যক্ষ করি। সেখানে দেখা যায়, শিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়া যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী বীর্যবতী রমণী। তার পিতৃরাজ্য আক্রান্ত হলে সে অশ্বারোহণে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেছে এবং কাব্যের নায়ক লাউসেনকেও পরাজিত করে ইচ্ছানুযায়ী তাকে বিবাহ করেছে। বাঙালি নারীর সাহস, বীর্যবত্তা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ তো গেল সাহিত্যে নারী চরিত্রের আলোকিত দিক। মধ্যযুগে সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবেও নারীদের অবদান আছে। মধ্যযুগে রামায়ণের অনুবাদক হিসেবে আমরা চারজন মহিলা কবির নাম খুঁজে পাই। তাঁদের নাম হল চন্দ্রাবতী, গঙ্গামণি দেবী, সৌদামিনী দেবী এবং সুবর্ণনলিনী দেবী। এদের মধ্যে চন্দ্রাবতী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠা। ইনি 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের বিদূষী কন্যা। রামায়ণের অনুবাদ ছাড়াও তাঁর লেখা 'দস্যু কেনারামের পালা' মৈমনসিংহে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সুতরাং সেকালে মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখার মতো যে মতামতগুলি শোনা যায় সেগুলি সর্বৈব সত্য নয় বলেই আমাদের মনে হয়।

এরপর বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এখানেও আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি, তা সহজ-সরল পথে হয়নি। সমাজের অনেক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি কৃষ্ণকে কাছে পেয়েছেন। শুধু সামাজিক বাধাই নয়, প্রকৃতিও রাধাকে বাধা দিয়েছে। বিদ্যাপতির 'অভিসারের' পদে আছে –

" মন্দির বাহির কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।

তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।"[৬]

গৃহের বাইরে কৃষ্ণের কাছে যেতে তাঁর প্রথম বাধা হল কঠিন দরজা। তার ওপর বাইরে কর্দমাক্ত পথ, কারণ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। রাধার নীল শাড়িতে তো এই বৃষ্টি আটকাবে না। তাহলে রাধা কৃষ্ণকে পাবেন কী করে! কারণ 'হরি রহ মানস-সুরধনী পার'। তার জন্য রাধাকে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। বিদ্যাপতির আরেকটি পদে রয়েছে –

" কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।"[৭]

মাটির উপর কাঁটা পুঁতে, কাপড়ে নূপুর বেঁধে, কলসীর জলে পথ পিচ্ছিল করে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছানোর জন্য পথ চলার সাধনা করছেন রাধা। রাস্তায় সাপের ভয়কে জয় করার জন্য তাঁর অলংকারগুলি ওঝার কাছে বন্ধক দিয়ে সাপের মুখবন্ধনের মন্ত্র শিখেছেন। তবে তিনি কৃষ্ণকে পেয়েছেন। এখানে কৃষ্ণ হলেন রাধার কাছে চূড়ান্ত লক্ষ্য (Goal) আর সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে (Achieve) গেলে যে চূড়ান্ত পরিশ্রম করতে হয়, সাধনা করতে হয় তারই একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল রাধার কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

পঞ্চদশ শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝার অনূদিত রামায়ণ গ্রন্থেও সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। ভারতবর্ষের সাধনা, আরাধনা ও সংকল্পের ইতিহাস হল রামায়ণ। রবীন্দ্রনাথের মতে কবি বাল্মীকির কাছে রাম কোনো অবতার ছিলেন না। তিনি মানুষই ছিলেন। এখানে দেবতা নিজেকে খর্ব করে মানুষ করেন নি, মানুষই নিজগুণে দেবতা হয়ে উঠেছেন।[৮] মানুষের চরম আদর্শ স্থাপনের জন্যই কবি রামায়ণ রচনা করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আরো বেশী করে যুক্ত হয়েছে বাঙালিয়ানা। এখানে বাঙালির ঘরের কথাকেই বৃহৎ করে দেখানো হয়েছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ও ভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ

তাকেই বড়ো করে দেখিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন – " পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।"[৯] এই কারণেই ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা তথা আপামর জনসাধারণ রামায়ণ থেকে এখনও শিক্ষা লাভ করে চলেছে। ভারতবাসীদের কাছে রাম, লক্ষণ, সীতা যত সত্য, ঘরের লোকও ততটা সত্য নয়। আদর্শ রাজা তথা শাসক হিসেবে শ্রীরাম, ভাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা হিসেবে লক্ষণ, আদর্শ স্ত্রী হিসেবে সীতা, আদর্শ সেবক হিসেবে হনুমান প্রভৃতি চরিত্রগুলি বাঙালির জীবনে অম্লান হয়ে থাকবে।

ষোড়শ শতকে রচিত মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এইকাব্যের স্থানে স্থানে সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের পরিচয় রয়েছে। যেমন, এই কাব্যের নায়ক কালকেতুর 'গুজরাট নগর পত্তন' অংশে এক অসম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের ছবি ফুটে উঠেছে। আমাদের এই একবিংশ শতকেও যেখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানি প্রায় লেগেই থাকে, সেখানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাই। দেবী চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু গুজরাট নগর স্থাপন করলে সেখানে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষেরা স্বতন্ত্র স্থান পেয়েছেন, যাতে কারো কর্মে ও ধর্মে কোনো অসুবিধা না হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছাড়াও অসংখ্য বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় যাদের কালকেতু তার নবনির্মিত নগরীতে স্থান দিয়েছেন।[১০] এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্মের দ্বারা সমাজের সেবায় ব্যাপৃত হয়েছে।

গুজরাট নগরীতে শুধু হিন্দু জাতিরই স্থান হয়নি, বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমান জাতিও সেখানে স্থান পেয়েছে। নগরের পশ্চিম দিকে হাসনহাটি নামক স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের বসতি স্থাপিত হয়েছে। যেমন –

" রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা।
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।।
বলদে বাহিয়া নাম ধরাল্য মুকেরি।
পিঠা বেচি কেহ নাম ধরাল্য পিঠারি।।

মৎস বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবাড়ি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।।
কাগজী ধরিলা নাম কাগজ করিয়া।
নানাস্থানে বুলে কেহ কলন্দর হৈয়া।।
রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গণ করিয়া।
ধরিলা হালান নাম কুদ্দুস ধরিয়া।। "[১১]

অর্থাৎ, রোজা নামাজ যারা করতো না তারা 'জোলা' নামে চিহ্নিত হলো। তাদের বৃত্তি হল তাঁত বোনা। মুকেরিরা বলদের ব্যবসা করতো। 'পিঠারিরা' পিঠা বিক্রি করতো। যারা মাছ বিক্রি করতো তারা কাবাড়ি নামে পরিচিত হলো। সেসময় কাগজ তৈরি হতো। একাজে যারা নিযুক্ত থাকতো তাদের 'কাগজী' বলা হতো। আর কাপড়ে রং করা যাদের বৃত্তি ছিল তাদের 'রঙ্গরেজ' বলা হতো। মুসলমানদের আরো অনেক উপবর্ণ রয়েছে যারা কালকেতুর নগরে নিশ্চিন্তভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়েছে।

সুতরাং দেখা গেল কবি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কালকেতুর নবনির্মিত গুজরাট নগরে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে কৃষকদের প্রতি তাঁর একটা আলাদা শ্রদ্ধার জায়গা আছে। কারণ কালকেতু কৃষকদের মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ দানের পক্ষপাতী। বাংলাদেশ মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষকেরাই আমাদের প্রতিপালক। চাষাবাদকে কেন্দ্র করেই বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপায়ণ। তাই কালকেতু বুলান মণ্ডল নামক এক চাষীকে বলেছে –

" আমার নগরে বৈস যত ইচ্ছা চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর।।
নাহিক বাউড়ী দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ী নানা বারে যত কড়ি
নাহি নিব গুজরাট বাসে।।

পার্বণী পঞ্চক যত গুড়া লোণ সানা ভাত
ধানকাটি কলমকসুরে।
যত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহি বাড়ায়িব পুরে।। ”[১২]

অর্থাৎ, কালকেতুর নগরে থেকে চাষবাস করলে প্রথমে সে কর নেবে না। তিন বছর পর থেকে কর দিতে হবে। এর জন্য কালকেতু জমিদারের অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর করে দিতেও রাজি। কোন রকম বাড়তি সুদ দিতে হবে না, সুবিধা মতো সুদ দেবে। জমি দখলের জন্য বাঁশ পোতার কোন রকম কর লাগবে না। পূজাপার্বণ উপলক্ষে বা ধান কাটার জন্য সুদ, ধান বেচার জন্য কোন রকম সুদ দিতে হবে না।

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের মধ্যে আরো একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল বৃক্ষসংরক্ষণ। বন কেটে গুজরাট নগরী স্থাপনের সময় দেখা যায় যে, ঝোপঝাড় ও কিছু বৃক্ষ কাটার সাথে সাথে অনেক বৃক্ষ সংরক্ষণের কথাও বলা হয়েছে। যেমন –

“ কাঁঠাল কদলী রাখিল গুয়া অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া।
মালতী মল্লিকা রাখিল চাঁপা ভুজঙ্গকেশর রাখিল জবা।
টগর তুলসী রাখিল রঙ্গন কারুণা কমলা ছেলঙ্গ টাবা।
তাল নারিকেল নগরের শোভা শঙ্কর পূজিতে রাখিল বিল্ববন।।
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম।”[১৩]

সুতরাং, দেখা গেল বন কেটে বসতি স্থাপনের জন্য কিছু গাছ কাটতে হলেও বৃক্ষকে কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয়, তারও বর্ণনা রয়েছে এই অংশটিতে।

কালকেতু কর্তৃক অসংখ্য জলাধার নির্মাণ আমদের কাছে আরো একটি শিক্ষা-মূলক দিক। জলই জীবন। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের আধার নির্মাণ না করলে নগরী স্থাপনের কোন মানেই হয় না। কালকেতু তাই নগরীর বিভিন্ন স্থানে জলাধার নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বাড়িতে কুয়োর ব্যবস্থা করে দিয়েছে –

“ বামভাগে দুর্গামেলা তার পাশে নাটশালা
সিংহদ্বার পূর্বে জলাশয়।
খিড়কী উত্তর ভাগে জলহরি তার আগে
প্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয়।।”[১৪]

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের ‘বণিকখণ্ডে’ ধনপতি ও খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্তের ‘বিদ্যারম্ভ’ অংশ থেকে তৎকালীন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়। সেখানে বলা হয়েছে –

“ রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায় কোষ নাটিকা
গণ বৃত্তি শব্দের বর্ণনা।
জানিতে সন্ধির তত্ত্ব পড়িল অনেক মত
বিদ্যা বিনা নহে অন্যমনা।।
পড়িল কখন দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী
নানা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল।।
জৈমিনি ভারতামৃত তবে পড়ে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেত মুনি
রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব।।
অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে দুই সপ্তশতী
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতী।
হিত-উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী।।
কাব্যপ্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
দিবানিশি নাহি জানে পড়ে সাধু সাবধানে
প্রসন্ন রাঘব রাম গুণে।।”[১৫]

টোলে পড়াশুনোর পাশাপাশি ছাত্রদের মধ্যে আলোচনারও সুযোগ ছিল। কাব্যে আমরা দেখি শ্রীমন্ত রাম ওঝার পুত্র দামোদরের সঙ্গে পুরাণের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় একে বলা হয় গ্রুপ ডিসকাশন যা বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের

আখড়া পালাতেও আমরা লাউসেন ও কর্পূর সেনের বিদ্যার্জন প্রসঙ্গে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় একটা পরিচয় পাই। যেমন –

"বল বুদ্ধে লাউসেন বাড়ে প্রতিদিন।
বেদজ্ঞান বিজ্ঞ হন পড়িয়া পাণিন।।
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম।।
জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যায় বাড়িল দুই ভাই।
অতঃপর মল্লবিদ্যা শিখাইতে চাই।।"[১৬]

পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখব এই শ্রীমন্ত এবং লাউসেন বিভিন্ন বাধা ও প্রলোভনকে উপেক্ষা করে, কামনাকে দমন করে, নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে চিহ্নিত করছে। এছাড়াও মনসামঙ্গল, শিবায়ন, চৈতন্যজীবনী, পদ্মাবতী প্রভৃতি সমস্ত কাব্যেই সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে যা আমাদের সমাজে প্রয়োগ করে আমরা একটা সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য দৈবনির্ভর হলেও সেকালীন সমাজ ও যুগজীবনকে যেভাবে কবিরা তাঁদের কাব্যে তুলে ধরেছেন, তাতে কাব্যগুলি এক একটি তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের দলিলে পরিনত হয়েছে। এগুলির সাহিত্যমূল্য কিন্তু কম নয়। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা থেকে আমরা কোনো শিক্ষা নিতে পারি কিনা, সেখানে আমাদের জীবন সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় আছে কিনা, উপায় থাকলে সেগুলি বর্তমানে কতটা উপযোগী। এই তথ্যগুলি খঁজে বের করাই আমাদের এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় যেসব সামাজিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের নিদর্শনগুলি খুঁজে পেয়েছি, সেগুলিকে সমসাময়িক কালে প্রয়োগ করে সমাজকে আরও সুন্দর, স্বভাবিক ও শিক্ষাব্যবস্থার অনুকূল করে গড়ে তুলতে পারব– এই আশা রাখি।

তথ্যসূত্র :

১। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০১১, পৃষ্ঠা: ৩০৩।

২। রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : 'রবিবারের বাঙালি', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা : ১৩ ।

৩। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০১১, পৃষ্ঠা: ৩৭২।

৪। যুধিষ্ঠির মাজী : 'রাধাদাস প্রণীত কৃষ্ণলীলামৃত গীত', সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা: ৬২।

৫। মিহির চৌধুরী কামিল্যা : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত', শিলালিপি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১১৫।

৬। সত্য গিরি : 'বৈষ্ণব পদাবলী', রত্নাবলী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৫, পৃষ্ঠা : ২৪৯।

৭। তবেদ, পৃষ্ঠা: ২৪৬।

৮। দীনেশ চন্দ্র সেন : 'রামায়ণী কথা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ৯।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা : ১০।

১০। সুখময় মুখোপাধ্যায় : 'চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃষ্ঠা : ১০৩ - ১০৭।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা : ১০৩।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা : ১০৪।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা : ৯২।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ৯২।

১৫। দেবেশ আচার্য : 'কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল', ২য় খণ্ড, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৯৭।

১৬। ভবেশ মজুমদার : 'রাঢ়ের ধর্মঠাকুর ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গল', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০২০, পৃষ্ঠা : ৭৭।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

‘রক্তে বোনা ধান’ ও ননী ভৌমিকের কয়েকটি গল্প

প্রীতম চক্রবর্ত্তী
কলেজ শিক্ষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

সারসংক্ষেপ

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতক জুড়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল বহুবার। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কৃষকদের জীবিকা সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থী চেতনা, যার চূড়ান্ত ধরা পড়েছে তেভাগা আন্দোলনে। এই কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই ননী ভৌমিক লিখেছেন অনেকগুলি গল্প। যেখানে সোনার ধানের প্রতি কৃষকের মমত্ববোধ যেমন আছে, তেমনই আছে শোষকের প্রতি শাণিত প্রতিবাদ। অসহায় মানুষের আর্তির সঙ্গেই ধ্বনিত হয় বেঁচে ওঠার গান। লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শকে অতিক্রম করে যায় গল্পগুলির মানবিক আবেদন। এই গল্পগুলি কল্পিত কাহিনি মাত্র নয়, ইতিহাসের এর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে অন্তহীন-প্রতিবাদের আখরে গেঁথে নিয়েছেন কথাকার ননী ভৌমিক।

সূচকশব্দ

কৃষক-বঞ্চনা, ফসল, বন্টনে অসাম্য, বিদ্রোহ, পুলিশী অত্যাচার, অন্তহীন লড়াই।

মূল প্রবন্ধ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা অনুসরণ করেই বলা যায় শাসকের রঙ বদলালেও শোষণের রূপ আবহমান কাল ধরে অপরিবর্তিত। ক্ষুধার্তের আর্তনাদ কোনো কালেই থামেনি। আর ‘শত শত সাম্রাজ্যের’ উত্থান-পতনের পরেও শ্রমজীবী মানুষেরা কাজ করেই চলে। বাংলার কৃষক সমাজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সত্য। তবু ঔপনিবেশিক

শাসনব্যবস্থায় বাঙালি কৃষকদের অবস্থানগত পরিবর্তন চিহ্নিত করে বিষ্ণু বসু জানাচ্ছেন—

> “... প্রাক্ ইংরেজ যুগে জমির মূল মালিক ছিল কৃষক। রাজশক্তি আনুপাতিক খাজনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু ইংরেজ আমলে জমির মালিকানা বর্তাল শাসক শ্রেণির উপর। ইংরেজরা প্রথমে ‘সূর্যাস্ত আইন’ ও পরে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’-এর মধ্যে দিয়ে কৃষকদের অধিকার তো হরণ করলই, উলটে এমন নতুন এক জমিদার-শ্রেণি তৈরি করল যারা শ্রেণিস্বার্থের কারণেই হয়ে উঠল ইংরেজদের অনুরাগী ও কৃষকদের বিরোধী।”[১] (বসু, মিশ্র, ২০০৩, পৃ. দশ)

যার ফলশ্রুতি আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতক জুড়ে বৃহত্তর-বাংলায় একের পর এক কৃষক-বিদ্রোহ। ত্রিপুরার রোশনবাদ থেকে শুরু করে পূর্ববঙ্গে সন্দ্বীপের চর, মৈমনসিংহ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্রোহের আগুন। কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় জমিদার কর্তৃক বিবিধ অবৈধ আদায়, জরিপ প্রণালীতে জালিয়াতি, অবৈধ করের কবুলিয়ত গ্রহণ ও কৃষককে পাট্টা দিতে অস্বীকার। বিশ শতকেও কৃষিজীবীর সংকট কাটেনি— বিষয়টি মহত্মা গান্ধীর চোখেও পড়েছিল, তবে ‘কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক এবং আধাসামন্ততান্ত্রিক শোষণ’ থেকে মুক্ত করার জন্য প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ তিনি নেননি। বরং বিশ শতকের তিনটি দশক পেরিয়ে কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কমিউনিস্ট মতাদর্শটি।

মনে রাখতে হবে এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে প্রগতিবাদী ধারণা স্পষ্ট হচ্ছে। ১৯৩৫-এ লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা বিদেশে ‘ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেছিল; স্বদেশের মাটিতে পৌঁছে তা হল ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ (১৯৩৬), এরপর—

> ‘১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুন গোর্কির মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হবার পর ১২ জুলাই কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’র পক্ষ থেকে আয়োজন করা হল এক শোকসভার। এই শোকসভাতেই নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি করে ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে ঘোষিত

হল ‘বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ’ গঠনের সংবাদ। এই সংঘ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করল ‘প্রগতি’ নামের রচনা সংকলন— যে-সংকলনে বিশ্ব-পরিস্থিতিকে ঘিরে বাঙালি চিন্তা চেতনার স্বরূপ উন্মোচিত হল।’[২] (চক্রবর্তী, ২০১১, পৃ. ১০২)

এর সূত্রেই ‘পূর্বাশা’, ‘অগ্রণী’, ‘অরণি’ প্রভৃতি পত্রিকার উন্মেষ ও বিকাশ, আর— ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মার্কসবাদে বিশ্বাসী নীরেন্দ্রনাথ রায়, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমবেত হয়ে প্রগতিচেতনার প্রসার ঘটালেন।’[৩] (চক্রবর্তী, ২০১১, পৃ. ১০২) আর এই সব পত্রিকাতেই সফল সাহিত্যকৃতির পরিচয় রেখেছিলেন বিশ-শতকের অন্যতম বামপন্থী লেখক ননী ভৌমিক। অবশ্য ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে প্রতিবেদন রচনাতেও বিশেষ কৃতিত্বের ছাপ তিনি রেখেছিলেন। ১৯৪৬ এর দাঙ্গার সময় দুই-বাংলার ভয়ঙ্কর রূপ খুব কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ পেয়েছিল পূর্বোক্ত পত্রিকাতেই। মনে রাখতে হবে তিনি শুধু অর্থাভাবে এম. এসসি পরীক্ষা দিতে না পারা কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ সদস্য বা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের সাংবাদিক অথবা রুশ সাহিত্যের অনুবাদক মাত্র নন, চল্লিশের গুরুত্বপূর্ণ কথাকার তিনি। যে সময়কে ‘যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-দেশভাগ-স্বাধীনতা বাঙালির ইতিহাসে এক ক্ষুব্ধ সময়ের পটভূমি’ হিসেবে চিহ্নিত করে উত্তম পুরকাইত লিখেছেন—

> ‘... চল্লিশের তরুণ গল্পকাররা লিখতে এসেছিলেন কথাসাহিত্যে বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। প্রত্যক্ষ বা চেতন বাস্তবতার আড়ালে অবচেতন বা অচেতন বাস্তবতার প্রথম কারিগর জগদীশ গুপ্তের উত্তরাধিকার বর্তেছিল মানিকের উপর, তেমনি চল্লিশের গল্পকাররা বিশেষভাবে মানিকের বাস্তবতার উত্তরাধিকারকেই অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই চেয়েছেন বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবন অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও সভ্যতার সংকটগুলোকে চিহ্নিত করতে। মনোবিশ্লেষণে তো বটেই বাস্তব উপস্থাপনাতেও তাঁরা অনেকাংশে

> মানিকের মতোই বাস্তববাদী।’[৪] (পুরকাইত, ২০২৩, পৃ. ১৮)

কৃষক আন্দোলনের বাস্তবতা অনুসরণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘হারানের নাতজামাই’ বা ‘ছোটবকুলপুরের যাত্রী’র মতো গল্প। ময়নার মায়ের সাহসিকতা আমাদের যেমন অবাক করে তেমনই স্মরণে আনে— ‘জলপাইগুড়ির সুন্দরদীঘির বুড়িমা, দেবীগঞ্জের বৃদ্ধ রাজবংশী বিধবা পুণ্যেশ্বরী দেব্যা, পচাগড়ের বুড়ি ও বুড়ির মা (শিখা নন্দী, তিলকতারিণী দেবী), দিনাজপুরের রাজবংশী গৃহবধূ জয়মণি, দীপশ্বরী, শিখা বর্মণ, জয় বর্মণী, মাতি বর্মণী, কাকদ্বীপের উত্তমী, বাতাসী বা বীরমাতা অহল্যা...’[৫] (ঘোষ, ২০১৬, পৃ. ২৮) প্রমুখের কথা। ধানের বদলে যারা ‘জান’ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই বাস্তব ছবি শুধু রাজনৈতিক মতাদর্শ বা সাংবাদিকের মন নিয়ে দেখেননি, মরমী কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ননী ভৌমিক, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর-মারী-মড়কের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামকে দেখেছিলেন জীবনমুখী কথাশিল্পী, যার বাস্তব-প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন গল্পভুবনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

‘প্রগতি লেখক সংঘে’র ইস্তেহারে বলা হয়েছিল— ‘আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যিককে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা— ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যাকিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মন্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করবো।’[৬] (চক্রবর্তী, ২০১১, পৃ. ১০৩) এবং এও বুঝিয়ে দেওয়া হয়— ‘... প্রগতিচেতনা বলতে কোনও বিদেশীয় চেতনাধারাকে অনুসরণ বোঝায় না, জাতীয়-অন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশ-স্বকাল ও স্বসমাজের পুনর্মূল্যায়নকে বোঝায়।’[৭] (চক্রবর্তী, ২০১১, পৃ. ১০৩) প্রগতির এই বৈশিষ্ট্যই ননী ভৌমিক ধরেছিলেন তাঁর তেভাগা আন্দোলন-কেন্দ্রিক গল্পসমূহে। এই কৃষক সংগ্রামের সাধারণ পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক সুস্নাত দাশ লিখেছেন— ‘অবিভক্ত বাংলায়

১৯৪৬-৪৭ এবং উভয় বাংলায় উত্তর-উপনিবেশকালে (১৯৪৮-৪৯) গড়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ জনতার অংশগ্রহণে পরিচালিত তেভাগা-কৃষক সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলন রূপে আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান পেয়েছে। উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগের দাবিতে সংগঠিত বাংলার প্রায় ষাট লক্ষ ভাগচাষী-বর্গাদারদের দুটি পর্যায়ে চলা এই আন্দোলন-সংগ্রাম ছিল এমনই একটি জ্বলন্ত বিষয় যার সঙ্গে জনগণের বেঁচে থাকা ও জীবনধারণের প্রশ্নটি ছিল সম্পৃক্ত।'[৮] (দাশ, ২০১১, পৃ. ১০০) এই প্রশ্নেরই অন্বেষণ করেছেন গল্পকার ননী ভৌমিক তাঁর 'ধানকানা', 'গেরস্তি', 'অর্ডার', 'বাদা' প্রভৃতি রচনায়।

স্বাধীনতার বছরেই প্রকাশ পেয়েছিল লেখকের প্রথম গল্প-সংকলন 'ধানকানা'। ননী ভৌমিক জানিয়েছেন এই বইয়ের অন্তর্গত গল্পগুলির (১০টি) রচনাকাল ১৯৪৪ থেকে '৪৬। নামগল্পের পটভূমিতে আছে কৃষক-প্রাণের অকৃত্রিম অনুভূতি ও তেভাগার কালচেতনা। ১৩৫০-৫১ বাংলা বছরে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও ফৌজের কাজ করে 'ছাপান নোট' রোজকার করার জন্য কৃষিকাজে মজুরের অভাব পড়েছিল। কিন্তু 'তৃতীয় বছর' অর্থাৎ ১৩৫২-য় আবার 'জোতদারের খালানে এসে জুটল বিহারী ক্ষেত মজুররা'— এখান থেকেই আলোচ্য গল্পের সূচনা। গল্পের কেন্দ্রে আছে আঁধারু, বলা বাহুল্য উত্তরবঙ্গের 'পোলিয়া' জাতের সেই মানুষটি ভূমিহারা কৃষকসমাজের সামগ্রিক প্রতিনিধি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা মেরামতির কাজ সে পেয়েছিল, মজুরিও নেহাত কম ছিল না। উপার্জন হলেও ধানজমিতে কাজ করার সুখ সেখানে পায়নি এই মানুষটি। আর 'আধবুড়ো' বিহারী ভূমিহীন লোকটি জমির প্রশ্নে উত্তর দেয়— 'জমি নেই, কিন্তু একটা নিয়ম আছে কি জমিদারের ক্ষেতে খাটলে ফসলের একটা ভাগ পাওয়া যায়। তো সেটাও জমি চাষ করাই হল?'[৯] (ভৌমিক, ১৯৫৩, পৃ. ১২৩) আঁধারুও রাস্তার কাজ ছেড়ে চলে যাবার সময় কোনো 'আধিয়া'র জমিতে খাটতে চেয়ে বিফল মনোরথ হয়েছে; তার পরেও তামাকের খেত থেকে 'একদলা' মাটি তুলে 'ঝানু চাষী'র মতো পরীক্ষা করেছে।

'ধানকানা'য় শুধু রিক্ততার ছবি নেই, স্বপ্নের মাস্তুলও বেঁধেছেন গল্পকার— 'নিকোনো তকতকে খালানে মরাই বাঁধা হয়েছে। উঁচু উঁচু মরাইয়ের ওপর শীষ

সমেত পাকাধান সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মুকুটের মতো। নোলক-পরা, বুকে কাপড় জড়ানো চাষী-বৌ ধানের গোছা আছাড় মেরে মেরে ঝাড়াই করছে। গুঁড়ো গুঁড়ো খড় উড়ে পড়ছে তার সারা গায়ে।'[১০] (ভৌমিক, ১৯৫৩, পৃ. ১২৬) আবার এরই বিপরীতে আছে সাঁওতাল চাষীদের সংগ্রাম। তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে কালী জোতদারের বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন জাগিয়ে রাখে। আইন জোতদারের পক্ষে থাকলেও শ্রমজীবী মানুষের 'রক্তাক্ত লড়াই' থামে না। তারই প্রভাবে যেন 'অসুস্থের মত ধান কাটার কাজ খুঁজে বেড়ায় গাঁ-ছাড়া মানুষটা।'[১১] (ভৌমিক, ১৯৫৩, পৃ. ১২৮) অকালে দুই সন্তানের মৃত্যুর পরেও 'গিরস্তি'র স্বপ্ন আঁধারুর চোখে। হালের জন্য সস্তায় গরুর খোঁজ করে। অন্যের খালানের কাজ ছেড়ে ফিরতে চায় গ্রামে, সেই 'আনিয়াগঞ্জ থানার দুই লম্বর রিউনিয়ন দুগ্‌গাপুর', পাঁচ বিঘে বন্দকী জমির মালিক আঁধারুর ইচ্ছে— 'জোতদারের হাতে পায়ে ধরে আধি নেবে আরও দশ বিঘা। সাড়ে তিনকুড়ি টাকা আছে আরও চার কুড়ি টাকা ধার নেবে মহাজনের কাছ থেকে। ভাঙা বাড়িটা সারাবে। এ বছর যেমন তেমন একজোড়া গরু কিনবে টাকা ধার করে। তারপর ফসল উঠলে শোধ দিয়ে দেবে সমস্ত। অবিশ্যি জোতদার বলবে, দুনো সুদ দাও। কিন্তু ও দেবে না। কেননা, পাঁচগণির সাঁওতালরা কি করেছিল? তীরে বিষ মাখিয়ে রাখেনি তারা?'[১২] (ভৌমিক, ১৯৫৩, পৃ. ১৩১) — প্রতিবাদের এই স্বর শুরুতেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। ততদিনে আঁধারুর ধানজমি 'ডাঙা' হয়ে সেখানে ধানকল বসে গেছে; বঙ্কু জোতদার কিনে নিয়েছিল আকালের সময়েই। 'ইংরেজি জানা উকিল আমলা'র ফন্দিতে তা উদ্ধার করতে পারেনি আঁধারু। পশ্চিমা মজুরদের সঙ্গে দশআনার মজুরিতে রাস্তা খোঁড়ার কাজেই 'জাত চাষি' আঁধারুর ভবিতব্য লেখা থাকে।

আঁধারুর গেরস্তির আশা ব্যর্থ হয়েছিল, আর 'গেরস্তি' নামের গল্পে লেখা হয়েছে বানসর আর তাঁর মেয়ে মরালীর জীবনের অন্য বেদনগাথা। জোতদারের নির্মম শোষণের ছবি ধরা আছে সেই গল্পে। ভাগচাষী হিসেবে 'আধি'তে জমি নেবার জন্য অল্প-বয়সে মেয়ে মরালীর বিয়ে দিয়ে সেই পণের বিনিময়ে গরু কিনেছিল বানসর। সমাজের কটাক্ষ উপেক্ষা করেছিল শুধু সোনার ফসল ফলানোর আশায়। পটভূমি

মন্বন্তর-উত্তর বাংলা,— মোড়ল-গাঁ শূন্য। আধি জমির জন্য জোতদারের কাছে বেশিই কবুল করেছে বানসর— তেভাগা নয়, আধা-আধি ভাগ; তার ওপর আছে গোলা-মোছানি, ধান-তোলানি, গোমস্তা-সেলামী— কৃষক পীড়নের বাস্তব ছবি ধরা পড়েছে এখানে। মনে আসে বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকটির কথা, 'কৃষক আন্দোলনের শহিদদের উদ্দেশে' উৎসর্গীকৃত নাটকে সমাজকর্মী সর্দার ত্রিভুবন জোতদার প্রভঞ্জনকে বলেছিল—

> "এই তো দেখলম তুমার হাতির খেলাঠো খোলানের ময়দানে। কর্জা ধানের সুদের দায়ে আধিয়ারের মস্তকটা ফাঁড়ি দিলে তুমি লাঠিবাজি করি। আধিয়ারের রক্ত খেলানের মাটি যদি না ভিজলে তো কীসের দাপট তুমার! তারপর, চাল দিয়েই বেচাল তুমি, সুরতি নিলে তুমি সে চাল— আমাক পাঠাইলা ওই অতগুলান মারমুখী রুধী-আধিয়ারের সাথ সমঝোতা করতে।"[১৩] (ভট্টাচার্য, ২০১০, পৃ. ৫৯-৬০)

গল্পে শুধু জোতদার নয়, ফড়ে-পাইকাররাও আগাম টাকা দিয়ে যায়; চালের দাম বাড়লে তারাও আসবে লাভের ব্যবসা করতে। জলে ডুবে যায় চাষের মাঠ, ঘরে আসে না সোনার ফসল। জোতদারের দল এসে 'নেংটি পরা' আতঙ্কিত মানুষদের 'এলোপাথাড়ি' চিৎকারে কর্ণপাত না করে কেড়ে নিয়ে যায় গো-ধন। 'নিঃশব্দে কাদামাখা হাত দিয়ে কপাল' চাপড়ানো আর জোতদারের গোলায় ফসল তোলা ছাড়া আর তো কিছু করার থাকে না আধিয়াদের। এসবের পরেও নতুন 'গেরস্তি'র স্বপ্ন দেখে বিবাহিতা মেয়ে মরালীকে নিয়ে আরও উত্তরে যাত্রা শুরু করে বানসর— 'হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে মরালী। খাটতে পারে জোয়ান বৌয়ের মতো। উত্তর দেশের আপরিচিত লোকদের সঙ্গে আবার লুকিয়ে কথাবার্তা ঠিক করে নেবে বানসর। আটকুড়ি টাকা পণ নেবে। গরু কিনবে। আর সেখানে অনেক জমি সস্তায় বন্দোবস্ত করা চলবে বৈকি। খোঁজ পেলে কুটুমেরা ডাং নিয়ে তেড়ে আসবে হয়ত; তবু...'[১৪] (ভৌমিক, ১৯৫৩, পৃ. ১১৯)। মূল্যবোধের এই পরিবর্তন কিন্তু পরিস্থিতি সঞ্জাত। যেমন মানিকের 'আজকাল পরশুর গল্পে' মুক্তা লোভী পুরুষের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু সমাজের কতিপয় মানুষ বসিয়েছিল বিচারসভা। আর

সেই বিচারসভার বিরুদ্ধেই গর্জে উঠেছিল সাধারণ মানুষ। গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণা বসু লিখেছেন—

> "যেখানে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে সেখানে মূল্যবোধের বিপর্যয়ও স্বাভাবিক। তাদের কাছে মুক্তা জাতীয় মেয়েদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা দুটি খেতে পেয়ে বেঁচে থাকার সমস্যা। বিচারসভা হয়, কিন্তু সভায় সাধারণ মানুষেরাই প্রতিবাদ করে জানায় যে মুক্তা কোনো দোষ করেনি। তাই বিচারের প্রশ্ন ওঠে না।... তারা এও বুঝেছে যে মুক্তা বা মুক্তার মতো মেয়েরা এই অসহনীয় অবস্থারই শিকার, তাদের কোনো দোষ নেই। গল্পটির মধ্যে তাই একটি যুগোচিত মানবিক বক্তব্য রয়ে গিয়েছে আর আছে একটি অত্যন্ত জরুরি আর্থসামাজিক সত্য— সেই সত্যই এই যে, অর্থনৈতিক জীবনের সংকট এবং পরিবর্তন মানুষের, মানুষের মানসিকতাকে পরিবর্তিত করে। মূল্যবোধগুলিও পরিবর্তিত হয়।"[১৫] (বসু, ২০০৩, পৃ. ১০৩)

কৃষক আন্দোলন দমনে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বারে বারেই। সুশীল জানার 'বউ' গল্পে কৃষক আন্দোলনের কর্মী অর্জুনের নব-পরিনীতা বধূটির বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল বুলেটে। তাঁরই 'বেটি' গল্পে পান্তি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাবা, প্রেমিক, সবার কাছে নির্যাতিত-প্রতারিত হয়েও তাদের লড়াইয়ের শরিক হয়ে পুলিশের অত্যাচারে অর্ধমৃত হয়ে ফিরে এসেছে। এর সঙ্গে ননী ভৌমিকের 'বাদা' গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সুস্নাত দাশ লিখেছেন—

> "'বাদা'র অন্ধ কন্যা ও সুশীল জানার 'বেটি' একই অবিচারের শিকার। তেভাগা কৃষক সংগ্রামের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে ছিল কৃষক পরিবারের নারীদের ব্যাপক, সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।"[১৬](দাশ, ২০১১, পৃ. ১১১)

সুন্দরবনের পটভূমিতে বাদা অঞ্চলে লাটদার আর ভাগচাষীর হিসেব কষার মাঝে অকাল বর্ষণে মাঠের ধান মাঠেই পচছিল। কারণ ধান ফললেই নৌকায় চলে আসছে

লাটদার, নায়েব, সিপাহী, ব্যাপারীর দল। অথচ এই বাদায় প্রথম চাষ শুরু করেছিল ঈশ্বর আর তার মতো আরও দুই চাষি। ধাঙড়েরা মাটি জঙ্গল কোপালেও চাষ করতে পারেনি। তিন বছর ধরে ঘাস পাতা পচে নোনা মাটি উর্বর হল, সোনার ফসল ফলাল তারা। অতিক্রম করেছে মড়ক-মারী; ছেলের বউ মরেছে না খেয়ে, আর খিদের জ্বালায় বিষ পাতা বা নোনা ঘাস খেয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে নাতনী। ঈশ্বরের সংগ্রামের জীবন শেষ হয়নি। অন্ধ নাতনী কামিনীকে নিয়ে ঈশ্বর অপেক্ষা করছিল আরও গভীর রাতের। অন্ধ মেয়েটিকে পৌঁছে দেবে নায়েবের কাছে, তাতে হয়ত বাঁচবে চাষের ধান। লাটদারের সঙ্গে সংঘাত করে এসে ফেরারী কেদার বিয়ে করতে চেয়েছিল ঈশ্বরের অন্ধ নাতনী কামিনীকে। যদিও এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক অপূর্ব সাহার মনে হয়েছে—

> "কেদারের হিংস্রতা নাটকীয় ও আরোপিত মনে হয় পাঠকের। একজন ফেরারি রাজনৈতিক কর্মীর সংসার স্থাপনের জন্য হঠাৎ লালসার কোন যুক্তিসংগত উত্তর মেলে না।"[১৭](সাহা, ২০২২, পৃ. ৭৮)

সাহসী ছেলে, তিরিশ বছর বয়স হয়েছে। সত্যিই বিয়ের জন্য মরিয়া হয়েছিল, নাকি ঈশ্বরের এই আত্মসমর্পণ সে মেনে নিতে পারেনি, তা অবশ্যই ভাবনার অবকাশ রাখে। কামিনীর ওই নাম, আর তার 'গ্রীবার কাঁচা ভঙ্গি' এবং 'ডাগর' শরীর একজন কৃষক আন্দোলনের প্রতিবাদী মুখ, যে 'লাটদার রাজা'কে মানেনি, ভয়ে সোনার ধান অন্যের গোলায় তোলেনি, তাকে এতখানি মরিয়া করে তুলবে শুধু বিয়ের ইচ্ছেতে, তা অবাক করে। কিস্তিতে ষাট টাকা পণ দিয়ে অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সেই নিয়ে বৃদ্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে মারামারিও শুরু করে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির করুণ পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও তাকে কিন্তু উদ্ধার করেনি, আক্রোশে 'থুক ফেলে থুক চাট খাও' বলে আর অভিশাপ দিতে দিতে কুয়াশা ভরা পচা ধান গাছের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। ঈশ্বর যদিও কেদারের সাহসের কথা স্মরণ করে তাকে 'ভালো লোক'ই বলেছে, তবু কামিনীর 'বিকৃত গোঙানি' কেদারকে খুব ইতিবাচক করে তুলে ধরে না।

'অর্ডার' গল্পে কৃষক নেতা লালমাধবের স্ত্রীকে শুধু ধরাই হয়নি, শাসক-পক্ষ থেকে

'টিপ্পনী'ও এসেছিল— 'উলঙ্গ করে দে শালীকে, উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রাখ— বলুক লালমাধব কোথায় আছে...'[১৮] (ভৌমিক, ২০২২, পৃ. ৩৩৬) পুরুষের যুদ্ধে কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণে নারী-নির্যাতনের ঘটনা তো রামায়ণ-মহাভারত থেকে 'মেরা মহান ভারতে' একইভাবে চলমান। কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসের শুরুর দিকেই দেখা গিয়েছিল রামের স্ত্রী দক্ষবালা পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়েছে; আর শেষদিকে মালতীর সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি—

> 'একটি উলঙ্গ নারী-মূর্তি। রক্তে মাটি ভিজে, পাশে শাড়িটাও খানিকটা ভিজেছে। ছেঁড়া ব্লাউজের একটা অংশ ওর পায়ের কাছে আর একটা অংশ বাঁহাতে জড়ানো। ... মেয়েটা গর্ভবতী হয়েছিল, স্রাব হয়ে গেছে। ... খড়গাদার পাশে পুরনো কোদাল পড়েছিল একটা। আগে হ্যারিকেনটা নিবোল হরি, তারপর সেই কোদালটা সজোরে চালাল, ঠিক ব্রহ্মতালুতে। অনেকক্ষণ মাংসপিণ্ডটা নড়ে নড়ে থেমে গেল।'[১৯] (মান্না, ১৩৯৫, পৃ. ১৫৭)

ননী ভৌমিকের গল্পে অবশ্য এতখানি নির্মম ছবি দেখা যায়নি, বরং 'মেয়েগুলাকে বেইজ্জত করিবার' বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে কৃষিজীবী জনতা। অসহায় মানুষগুলোর মুখে ফুটে উঠেছিল 'নির্বোধ মরীয়া ষড়যন্ত্র'। যথারীতি পুলিশের ফায়ার এবং প্রতিবাদী মুখের পিছু হটা— 'যাবার সময় লালমাধবের বৌ আর দুজন আহতকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নিয়ে গেল পিঠে করে।'[২০] (ভৌমিক, ২০২২, পৃ. ৩৩৮) লেখক 'বেঁধে বেঁধে' থাকার সূক্ষ্ম সুর বাঁধলেন। আর নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং নিজের মেয়ের কথা স্মরণ করে নীল-পাকড়ি আর ফ্যাকাশে নীল উর্দি ফেলে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়েছে চৌকিদার।

তবে এই গল্পের কেন্দ্র কিন্তু 'মুখের ওপরকার সতেজ জলুসটা প্রেতিনীর মতো বিবর্ণ' হয়ে যাওয়া লালমোহনের বউ বা শাসক পক্ষের 'বিকর্ণ' চৌকিদার নয়। পুলিশ মজিদ, যে একসময় হাওড়ার দাঙ্গা সামলেছে। মফঃস্বলের পুলিশদের চেয়ে সে অভিজাত। উত্তরবঙ্গে 'চাষা'দের 'গড়বড়' থামাতে গিয়ে অঞ্চলটিকে তার 'বহুৎ জংলা' মনে হয়েছে। তাঁর চোখ দিয়েই লেখক সমকাল চিনিয়েছেন— 'গত দুবছর

যাবৎ একটা অদ্ভুৎ অবস্থা হয়েছে দেশের। দুনিয়ার হালচাল বদলে গেছে। কেবল মার মার। খুন জখম— আংরেজ পেলে আংরেজ মারো নয়তো আপোসমে লড়ো হিন্দু-মুসলমান। মার-দাঙ্গা শুরু হয়েছে কলকাতায়— মার দাঙ্গা শুরু হয়েছে গ্রামেও। বেহার থেকে খবর দিয়েছিল আত্মীয়স্বজনেরা— ওখানেও শুরু হয়েছিল। ইস্। আফসোস হয় মজিদের।'[২১] (ভৌমিক, ২০২২, পৃ. ৩৩১) আর যে জংলা দেশে গেছে সেখানে লালমাধবের নেতৃত্বে রাজবংশী-মুসলমান-সাঁওতাল একসঙ্গে প্রতিবাদ করছে জোতদারদের। নিজেদের খালানে তুলেছে হকের ধান। আর সে খবর পুলিশের কানে তুলছে সরমে আলির মতো জোতদার। তিরিশ মণ ধানের খবর পুলিশের খাতায় হয়ে যায় সত্তর মণ। 'ধামা ধামা ধান' টেনে বের করে সরমে আলি। আর প্রতিবাদী জনতার দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ে পুলিশবাহিনী। অথচ ছ'মাস দাঙ্গার মধ্যে থেকেও 'চট করে স্ট্রিগার টানতে' পারেনি মজিদ। পলিমাটির 'চাং' তুলে এগিয়ে আসা অন্ধ বৃদ্ধটি লুটিয়ে পড়ে একাধিক গুলির আঘাতে। কিন্তু 'এই দারুণ শীতেও ঘেমে গেছে মজিদ। নোংরা ঘাম জমেছে কালো তোবড়ানো মুখের ওপর, কেমন বিভ্রান্ত চেয়ে আছে দশগুলি মিলিটারি রাইফেলটার দিকে।'[২২] (ভৌমিক, ২০২২, পৃ. ৩৩৯) রক্তাক্ত সময় আর অনিঃশেষ সংগ্রামের মধ্যে হয়ত সেই চাহনিতেই লেখক একটু আলোর ইশারা পৌঁছে দেন।

ননী ভৌমিকের জীবনের কথা বলতে গিয়ে রবিন পাল জানিয়েছেন—

> "ছাত্রজীবন থেকে ঝড়ের সঙ্গী, ছাত্র-আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কার। কলকাতায় এসে জড়িয়ে পড়েন কমিউনিস্ট আন্দোলনে, যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী ও বিধ্বস্ত বাংলার রূপকার।... জীবন ঝুঁকি নিয়ে কলকারখানা, খেত-খামারে, তেভাগা সংগ্রামে, গ্রামের অনেক ঘাঁটিতে, শ্রমজীবী শ্রেণির দরদী বন্ধু। জীবননীতি ও রাজনীতি মিলেমিশে গিয়েছিল। শৌখিন দর্শক কমিউনিস্ট নন, নির্ভীক সাহচর্যময় কলমদার। এ জীবন এক রূপকথার— বিস্ময়, মুহুর্মুহু পটপরিবর্তন, শেষত বিপদ।"[২৩] (পাল, ২০২২, পৃ. ৮৯)

এদেশে বামপন্থী আন্দোলনে সামিল হয়ে গ্রেফতার হয়েছেন; জেল খেটেছেন বিনা

বিচারে। তারপর পার্টির নির্দেশে রুশ সাহিত্যের বাংলা অনুবাদকের কাজ নিয়ে মস্কো পাড়ি দিয়েছেন। লেখিকা সুলেখা সান্যালের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক ও পরিশেষে বিচ্ছেদ। বিদেশেই বিয়ে করেছিলেন প্রগতি প্রকাশনের কর্মী রুশ-মহিলা শ্বেতলানাকে। একমাত্র সন্তান দিমা রহস্যজনকভাবে মারা যান। মানসিক স্থিতি হারিয়ে ফেলেছিলেন লেখক ননী ভৌমিক। ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'ধুলোমাটি'র জন্য বঙ্কিম পুরস্কার পাবার কথা। স্ত্রীও তাঁর 'বাঙালি লেখকজীবন'এর কথা আড়ালেই রাখতে চাইতেন, পাছে স্বামী তাঁকে ফেলে দেশে ফিরে যান। চরম দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জীবন। চেনাপরিচিতেরাও এড়িয়ে চলতেন তাঁকে। মারা যান পথ-দুর্ঘটনায়। তবুও সেই 'ট্র্যাজিক নায়ক' জীবনের প্রথম পর্বে যা রচনা করেছিলেন— চারটি গল্প-সংকলন, একটি উপন্যাস, তার মূল্য শুধু বাংলা কথা-পরিসরেই নয়, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাম্যবাদী আদর্শ ও মানুষের সংগ্রামকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন কথাবৃত্তের পরতে পরতে। শুধু কৃষক বিদ্রোহই নয়, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে যেমন লেখেন 'সীমান্ত', 'কাফের', 'কেলেপাথরী' বা 'সমীকরণ', তেমনই 'চোর' 'শহীদস্তম্ভ' প্রভৃতি গল্পে এসেছে দাঙ্গার কথা। আর 'প্রতিদ্বন্দ্বী, 'চেনা অচেনা' বা 'পাওয়া না-পাওয়া' গল্পগুলি কমিউনিস্ট কর্মীদের স্বপ্নানুসন্ধান ও লড়াইয়ের দলিল হয়ে আছে। তাঁর রচনা ফিরে ফিরে পড়া আসলে একটি সময়কে বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে দেখতে শেখা। যা প্রশ্ন তোলে, এবং প্রশ্ন করতে শেখায়।

তথ্যসূত্র :

১. বসু বি., মিশ্র অ. (সম্পাদিত) (২০০৩). সম্পর্ক, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

২. চক্রবর্তী, অ. (২০১১). 'বিশ শতক কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা', বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

৩. চক্রবর্তী, অ. (২০১১). 'বিশ শতক কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা', বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

৪. পুরকাইত, উ. (২০০৩). 'ক্ষুব্ধ সময়ের আখ্যান বিপন্নতার বহুস্বর' (প্রবন্ধ), কৃত্তিবাস, কলকাতা : প্রতিভাস

৫. ঘোষ, উ. (২০১৬). ‘হারানের নাতজামাই ও ছোটবকুলপুরের যাত্রী : নির্মাণের গান’, পাল, শ্রা. (সম্পাদিত). বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক, কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী,
৬. চক্রবর্তী, অ. (২০১১). ‘বিশ শতক কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা’, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
৭. চক্রবর্তী, অ. (২০১১). ‘বিশ শতক কথাসাহিত্যে সময়বীক্ষা’, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
৮. দাশ, সু. (২০১১). ‘বাংলা কথা-সাহিত্যে তেভাগা কৃষক সংগ্রাম’ (প্রবন্ধ), International Journal of Bengali Studies, অন্তর্জাল
৯. ভৌমিক, ন. (১৯৫৩). ‘ধানকানা’, কলকাতা: ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
১০. ভৌমিক, ন. (১৯৫৩). ‘ধানকানা’, কলকাতা:ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
১১. ভৌমিক, ন. (১৯৫৩). ‘ধানকানা’, কলকাতা: ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
১২. ভৌমিক, ন. (১৯৫৩). ‘ধানকানা’, কলকাতা: ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস
১৩. ভট্টাচার্য, বি. (২০১০). ‘দেবীগর্জন’, কলকাতা : দে’জ,
১৪. ভৌমিক, ন. (১৯৫৩). ‘ধানকানা’, কলকাতা: ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস
১৫. বসু, কৃ. (২০০৩). ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: শিল্পরূপ ও জীবনবোধ, কলকাতা : প্রতিভাস
১৬. দাশ, সু. (২০১১), ‘বাংলা কথা-সাহিত্যে তেভাগা কৃষক সংগ্রাম’ (প্রবন্ধ), International Journal of Bengali Studies, অন্তর্জাল
১৭. সাহা, অ. (২০২২). ‘ননী ভৌমিকের গল্পগুলো’ (প্রবন্ধ), ‘গল্পদেশ’, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, কলকাতা : কথারূপ
১৮. ভৌমিক, ন. (২০২২). ‘গল্পদেশ’, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, কলকাতা : কথারূপ
১৯. মান্না, গু. (১৩৯৫). ‘লখীন্দর দিগার’, কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী,
২০. ভৌমিক, ন. (২০২২). ‘গল্পদেশ’, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, কলকাতা : কথারূপ
২১. ভৌমিক, ন. (২০২২). ‘গল্পদেশ’, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, কলকাতা : কথারূপ
২২. ভৌমিক, ন. (২০২২). ‘গল্পদেশ’, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, কলকাতা : কথারূপ
২৩. পাল, র. (২০২২). ‘অগ্রন্থিত গল্পের ননী ভৌমিক’ (প্রবন্ধ) ‘গল্পদেশ’, চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, কলকাতা : কথারূপ

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

ড. প্রীতম দাস

সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগ, তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সর্বদা শিক্ষাকে সর্বাত্মক উন্নয়ন হিসেবে দেখেছেন, শুধু সাক্ষরতা হিসেবে নয়। তিনি শুধু মনের নয়, শিশুর সার্বিক বিকাশের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে "সাক্ষরতা নিজে কোন শিক্ষা নয়। সাক্ষরতা শিক্ষার শেষ, এমনকি শুরুও নয়। শিক্ষা বলতে আমি মানুষের শরীর, মন এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্যের সর্বোত্তম চিত্রকে বোঝাতে চাই।" জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী আধুনিক ভারতের জন্য শিক্ষার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, যাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম খসড়া বলা যেতে পারে। এই খসড়া ছিল কর্মকেন্দ্রিক, মূল্যভিত্তিক এবং গণমুখী। এটি ভারতে শিক্ষার বৃত্তিমুখী করণের প্রথম মডেল। গান্ধীজির শিক্ষার প্রকল্পটি 'দ্য বেসিক ন্যাশনাল স্কিম' নামে পরিচিত। এটি নির্দেশনার পদ্ধতির পরিবর্তে একটি দর্শন এবং একটি আদর্শ। এই সব অবশ্যই সুষম ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সুষম সমাজের জন্য সুসংগঠিত হতে হবে। সর্বোদয় আদর্শ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমবায়-সম্প্রদায়ের প্রধান আদর্শ। তিনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন যাতে, একটি সুষম ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ তৈরি করা সম্ভব হয়।

মূলশব্দ

বুনিয়াদি শিক্ষা, শিশু, বৃত্তিমুখীকরণ।

মূল প্রবন্ধ

মহাত্মা গান্ধীর মতে শিক্ষা হল– " একজন মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রক্রিয়া যা,- শরীর, মন এবং আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাক্ষরতা শিক্ষার শেষও নয়, এমনকি শুরুও নয়। এটি শুধুমাত্র একটি উপায় যার মাধ্যমে পুরুষ এবং মহিলা শিক্ষিত হতে পারে। সাক্ষরতা নিজেই কোন শিক্ষা নয়। তাই আমি শিশুর শিক্ষা শুরু করব একটি দরকারী হস্তশিল্প শেখানোর মাধ্যমে এবং এটির প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে এটি উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। এইভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়কে স্বনির্ভর করা যেতে পারে, শর্ত হল এই বিদ্যালয়গুলির তৈরির দায়িত্ব রাজ্য গ্রহণ করবে।" – ***এম কে গান্ধী***(অনুবাদ)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তার জন্য ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই প্রেম, ঈশ্বরই নীতিশাস্ত্র। সকল ত্যাগী প্রাণীর মধ্যেও তার ভ্রাতৃত্ব ছিল। তিনি একজন আইনজীবী হিসাবে তার লাভজনক কর্মজীবন ত্যাগ করেছিলেন এবং তার সহকর্মীদের কাছে চুক্তিভিত্তিক চাকরির আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন প্রেম, অহিংসা, সত্য ন্যায় ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ভিত্তিতে একটি আধ্যাত্মিক ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজপ্রতিষ্ঠার জন্যসংগ্রাম প্রয়োজন। তিনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন যাতে, একটি সুষম ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ তৈরি করা সম্ভব হয়। তিনি সবসময় শিক্ষাকে সর্বাত্মক উন্নয়ন হিসেবে দেখেছেন, শুধু সাক্ষরতা হিসেবে নয়। তিনি শুধু মনের নয়, শিশুর সার্বিক বিকাশের ওপর জোর দেন। তিনি বলেছিলেন যে- "সাক্ষরতা নিজে কোন শিক্ষা নয়। শিক্ষা বলতে আমি শিশু এবং মানুষের শরীর, মন এবং আত্মার মধ্যে সর্বোত্তম চিত্রকে বোঝাতে চাই।"

প্রাথমিক শিক্ষা: গান্ধীজির শিক্ষার প্রকল্পটি 'বেসিক ন্যাশনাল স্কিম' নামে পরিচিত। এটি নির্দেশনার পদ্ধতির পরিবর্তে একটি দর্শন এবং একটি আদর্শ। 1937 খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষাসম্মেলনে গান্ধীজির উদ্দীপনায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, সাত বছরের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। ঐ সাত বছরের শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে থাকবে একটি

উৎপাদনী শিল্প (সুতোকাটা এবং চরকা)। উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষায় উৎপন্ন দ্রব্যথেকেই ক্রমে ক্রমে শিক্ষকের বেতন আসবে। এই ধরনের শিক্ষার নাম হয় বুনিয়াদি শিক্ষা বা নঈতালিম (Nai Talim) বা নতুনশিক্ষা (New Education.)

বুনিয়াদি শিক্ষার চারটি স্তর:

1) প্রাক্‌বুনিয়াদি স্তর- 7 বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য।

2) বুনিয়াদি স্তর- 7 থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য।

3) উত্তরবুনিয়াদি স্তর- 14 থেকে 18 বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য।

4) বয়স্কশিক্ষা- বয়স্কশিক্ষা বুনিয়াদি শিক্ষার নির্ভরযোগ্য অংশ হওয়া উচিত।

বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য :

1) সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক দিকে আদর্শ নাগরিক তৈরী করা।

2) ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো।

3) মানসিক, দৈহিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক ব্যক্তিত্ব সংগঠন।

4) শিক্ষার শেষে সেই শিক্ষাকে ব্যবহার করে জীবিকা সংস্থানের ক্ষমতা সৃষ্টি করা।

5) শিক্ষার মাধ্যমে সর্বোদয়ের আদর্শে পৌঁছানো।

পরিকল্পনার কাঠামো :

1) ছেলে ও মেয়ে নির্বিশষে সমভাবে 7 থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা। মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করা এবং ইংরাজীর স্থান না রাখা।

2) নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন বিশেষ শিল্পকাজকে শিক্ষার ভিত্তি রূপে ব্যবহার। বিশেষ শিল্পটির সামাজিক মূল্য এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা। শিশুর শিক্ষাকে তার পরিবার ও পরিবেশের সঙ্গে সংযোজন।

3) পাঠ্যক্রমে গৃহীত হবে- (a) মৌলশিল্প, (b) মাতৃভাষা, (c) গণিত (d) সমাজপাঠ, (e) সাধারণবিজ্ঞান, (f) চারুকলা, (g) হিন্দী, (h) গৃহবিজ্ঞান, (।) শারীরশিক্ষা সবকিছুই থাকবে একসঙ্গে গাঁথা।

বুনিয়াদি শিক্ষার যে ফলশ্রুতি আশা করা হয়েছিল:

1) 14 বছর বয়স পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষা এবং অপচয় নিবারণ।

2) জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ।

3) ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে।

4) উৎপাদনীকাজের মাধ্যমে শিক্ষা।

5) ইংরাজীর বদলে মাতৃভাষা এবং হিন্দীর উপর গুরুত্ব।

6) শিশুকেই শিক্ষা প্রয়াসের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ।

7) সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা।

8) শিক্ষার মধ্যদিয়ে জাতীয়তা, দেশপ্রেম, ধর্ম নিরপেক্ষতা, অহিংসা এবং সর্বোদয়ের আদর্শ প্রসার।

গান্ধীজীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় টলস্টয় ফার্মের আশ্রমে দক্ষিন আফ্রিকায়। এর অনেক পরে, সেবাগ্রামে থাকার সময় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাপে গান্ধী তার প্রভাবশালী নিবন্ধটি লিখেছিলেন। *হরিজন* শিক্ষাসম্পর্কে। এতে, তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার মানচিত্র তৈরি করেছেন: গান্ধীজীর ভাষ্য অনুযায়ী- "এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে মন ও আত্মার সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভব। শুধুমাত্র প্রতিটি হস্তশিল্পকে যান্ত্রিকভাবে শেখানো উচিত নয়, যেমনটি আজ করা হয়, তবে বৈজ্ঞানিকভাবে অর্থাৎ শিশুকে প্রতিটি প্রক্রিয়ার কেন তা জানতে হবে।... আমি নিজে চন্দন তৈরি করা শিখিয়েছি এবং এমনকি এই লাইনগুলিতে স্পিনিং শিখিয়েছি। এই পদ্ধতিটি ইতিহাস এবং ভূগোলের জ্ঞানকে বাদ দেয় না। কিন্তু আমি মনে করি যে, এই ধরনের সাধারণ তথ্য মুখের কথার মাধ্যমে প্রেরণের থেকে হাতে কলমে সবচেয়ে ভালো শেখানো যায়। পড়ালেখার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে দশগুণ বেশি দান করে। বর্ণমালার চিহ্নগুলি পরে শেখানো যেতে পারে...অবশ্যই, ছাত্র তার হস্তশিল্পের মাধ্যমেও গণিত শেখে। আমি প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিই, যা আমার ধারণা অনুযায়ী বর্তমান ম্যাট্রিক-কম ইংরেজির সমান হওয়া উচিত...।"– 1937 **সালের** 31**শে জুলাই**, **হরিজন** (অনুবাদ)

মহাত্মা গান্ধী তার 'বুনিয়াদি শিক্ষা' শিরোনামের প্রবন্ধে লিখেছেন যে, এই শিক্ষা

গ্রামের শিশুদের মডেল গ্রামীণে রূপান্তরিত করার জন্য। এটি মূলত তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন, এর অনুপ্রেরণা এসেছে গ্রাম থেকে। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদেরকে, শহর হোক বা গ্রাম, ভারতে সবথেকে ভালো এবং স্থায়ী সবকিছুর সাথে যুক্ত করে। এটি শরীর এবং মন উভয়েরই বিকাশ ঘটায় এবং ভবিষ্যতের একটি গৌরবময় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিশুকে মাটির সাথে বদ্ধমূল রাখে। 6 এপ্রিল 1940-এ প্রকাশিত হরিজন জার্নালে তিনি এই ধারণাটি স্পষ্ট করেছেন এবং বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির উপর ব্যাপকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, এই ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য হল হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক বিকাশ করা অর্থাৎ "করার মাধ্যমে শেখা" বা "Learning by Doing"।

গান্ধীজীর মতে– প্রকৃত শিক্ষা কেবলমাত্র শারীরিক অঙ্গগুলির যথাযথ অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসতে পারে, যেমন হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি। অন্যকথায়, একটি শিশু শারীরিক অঙ্গগুলি বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করে। এটি তার বুদ্ধি বিকাশের সেরা এবং দ্রুততম উপায়। কিন্তু আত্মার অনুরূপ জাগরণের সাথে মন ও দেহের বিকাশ না ঘটলে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটবে না। আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ বলতে আমি বুঝি হৃদয়ের শিক্ষা। তাই মনের একটি সঠিক ও সর্বাত্মক বিকাশ তখনই ঘটতে পারে যখন এটি শিশুর শারীরিক ও আধ্যাত্মিক দক্ষতার শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এগুলি একটি অবিভাজ্য সমগ্রগঠন। এই তত্ত্ব অনুসারে, এটা মনে করা যেতে পারে যে, এগুলি তারা একে অপরের থেকে টুকরো টুকরো বা স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারে না।– **"গান্ধীর নির্বাচিত কাজ"**, **খণ্ড** 6, (*অনুবাদ*)

বুনিয়াদি শিক্ষার কিছু মৌলিক বিষয়:

1. সমস্ত শিক্ষাকে সত্য হতে হলে স্বাবলম্বী হতে হবে, অর্থাৎ মূলধনের আশায় এটি তার ব্যয়বহন করবে এবং অক্ষত থাকবে।
2. এতে, শরীর তথা আঙ্গুলের দক্ষতা চূড়ান্তপর্যায় পর্যন্ত কাজে লাগানো যাবে,অর্থাৎ দিনের কিছুসময়ের জন্য ছাত্রদের হাত দক্ষতার সাথে বস্তুর উপর কাজ করবে।এটি মূলত গুজরাটের আমেদাবাদের বস্ত্রবয়ন শিল্পকে কেন্দ্র করে ভাবা হয়েছিল।

3. আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।
4. এতে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিশেষ কোনো অবকাশ নেই। বুনিয়াদি সর্বজনীন নীতিশাস্ত্রের পূর্ণ সুযোগ থাকবে।
5. এই শিক্ষা, শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, পুরুষ বা মহিলার, যে কোন শিক্ষার্থীদের ঘরে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে।

–বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে এই ধরনের ম্যানুয়াল প্রশিক্ষণের প্রবর্তন ভারতে একটি দ্বিগুণ উদ্দেশ্যপূরণ করবে বলে তিনি মনে করতেন। এটি শিশুদের শিক্ষার জন্য অর্থপ্রদান করবে এবং তাদের একটি পেশা শেখাবে যার মাধ্যমে তারা তাদের খাদ্য ও অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সক্ষম হবে এবং কায়িকশ্রমের প্রতি তাদের সম্মান জাগ্রত করবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা:

মহাত্মা গান্ধী তার 'দ্য নিউ এডুকেশন' শিরোনামের প্রবন্ধে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে প্রকাশিত (সেপ্টেম্বর 1921 সংস্করণে) লিখেছেন যে, "অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, ভারতে যেখানে জনসংখ্যার আশি শতাংশেরও বেশি কৃষি এবং আরও দশ শতাংশ শিল্পে নিয়োজিত, সেখানে শিক্ষাকে নিছক সাহিত্যে পরিণত করা অপরাধ।"

যখন আমরা এই লাইনগুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন আমরা জানতে পারি যে, মহাত্মা গান্ধীর মতে, শিক্ষা শুধুমাত্র সাহিত্যজ্ঞানকে ধাক্কা দেওয়া বা অর্জন করা নয়। শিক্ষাকে বর্ণমালার জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এই সাহিত্যজ্ঞানের পাশাপাশি, শিক্ষার মধ্যে একজন ব্যক্তির নৈতিকবিকাশ, শারীরিকবিকাশ এবং মানসিকবিকাশ এবং সর্বোপরি কর্মের দিশা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। শিক্ষার বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা অসঙ্গতি যে, শিক্ষা আমাদের যুবসমাজকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, শিক্ষা পর্যাপ্ত চাকরির সুযোগ দিতে পারেনি এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়নি।

বর্তমানে যুবক-যুবতীরা উচ্চমান পেয়ে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে বা অন্যকোনও বিকল্প ডিগ্রি অর্জন করছে, কিন্তু তবুও তারা তাদের ভবিষ্যত গঠন করতে অক্ষম। সেক্ষেত্রে তাদের অর্জিত শিক্ষা বা ডিগ্রি অর্থহীন। জনসংখ্যায় ভারত আজ বিশ্বের প্রথম স্থান অর্জন করেছে এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার কারণে শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জনকারী তরুণ স্নাতকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে কোন সম্ভাবনা নেই। তাদের অনেকের একটি স্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য কর্মক্ষেত্রে কোন ইচ্ছা নেই। জীবন দক্ষতা ছাড়া বর্তমান শিক্ষা শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাসহীন শিক্ষিত বেকার যুবক তৈরি করে, যারা বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে পারে না। ফলে আজকের শিক্ষা তরুণপ্রজন্মকে কর্মের দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এটা সত্য যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বহুবছর ধরেই ত্রুটিপূর্ণ। স্বাধীনতার পর অনেক কমিটি-কমিশন গঠিত হলেও শিক্ষার সংস্কারে কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কৃষিকাজের সাথে জড়িত যুবকরা ডিগ্রী পায়, কিন্তু তারপর তারা কম বেতনে শহরে কাজ করতে বা চাকরি করতে চায়, যা তাদের আজকের চাহিদা মেটাতে পারে না। এরফলে গ্রামীণ যুবকরা শহরের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এই পরিস্থিতি গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি আমাদের দেশের অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলে।

যদি আমরা সঠিক সময়ে সচেতন না হই এবং মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পদক্ষেপ না নিই, তাহলে পরিস্থিতি এতটাই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে যে আমরা হয়তো তা নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হবো।

উপসংহার: জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী আধুনিক ভারতের জন্য শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, যাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম ব্লু-প্রিন্ট বা খসড়া বলা যেতে পারে, যেটি চাকুরীবিহীন, মূল্যভিত্তিক এবং গণমুখী। এটি ভারতে শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণের প্রথম মডেল। গান্ধীজীর মতে, শিক্ষা এবং জ্ঞান অবশ্যই কার্যকলাপ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত। তার শিক্ষার পরিকল্পনা, বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সংহতি আনতে সক্ষম যার দ্বারা একটি শিশু সামাজিক, মননশীল এবং কর্মমুখী হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত

উল্লেখযোগ্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ তে গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করে তোলার জন্য ভারত সরকার আগামীদিনে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশকিছু পরিবর্তন আনতে চলেছে।

তথ্যসূত্র ও ওয়েবসাইট:

১। https://www.mkgandhi.org/articles/basic-education.html(13.01.2020 তারিখে সংগৃহীত)

২। Trueman's Specific Series, UGC NET Education Specific, Danika Publishing Company.

৩। মহাত্মা গান্ধী গ্লোবাল ভিলেজ বুনিয়াদি শিক্ষার একটি মডেল: কায়িকশ্রমের জন্য স্বনির্ভরতা এবং সম্মান শেখানোর জন্য, ড. উমাকান্ত চান শেট্টি এবং মিসেস সঙ্গীতা শাহ দ্বারা, (12.01.2020 তারিখে সংগৃহীত)

৪। https://en.wikipedia.org/wiki/Nai_Talim, (12.01.2020 তারিখেসংগৃহীত)

৫। https://www.mkgandhi.org/edugandhi/basic1.htm, বুনিয়াদি শিক্ষা (বুনিয়াদি শিক্ষা), (12.01.2020 তারিখে সংগৃহীত)

৬। শাহ, পরেশ; বুনিয়াদি শিক্ষাএবংএরবর্তমানপ্রাসঙ্গিকতাসম্পর্কেগান্ধীজীরমতামত; ইংরেজিআর্টসঅ্যান্ডকমার্সকলেজেরসহযোগীঅধ্যাপকবিভাগ, ইদারপি.ও. -ইদারজেলা-সাবরকাঁথা (গুজরাট) ভারত; পুনে গবেষণা; ইংরেজিতে একটি আন্তর্জাতিক জার্নাল; খণ্ড – ৩, সংখ্যা – ৪; ISSN – 2454-3454; UGC অনুমোদিত জার্নাল নং – 48520; ওয়েবসাইট:http://puneresearch.com/media/data/issues/5a07d31f66536.pdf; (13.10.2019 তারিখে সংগৃহীত)

৭। দেশমুখ সীতারাম পি. ; গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা: মূল্যবোধ শিক্ষার একটি মাধ্যম; https://www.mkgandhi.org/articles/basic_edu.htm (13.10.2019 তারিখে সংগৃহীত)

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বাংলা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দা

বিপ্লবকুমার চন্দ্র
গ্রন্থাগারিক, ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যের এক জনপ্রিয় অংশ হল, রহস্য বা গোয়েন্দা গল্প। এর সব থেকে বড় স্বাক্ষী হল, যে কোন গ্রন্থাগারের (বিশেষ গ্রন্থাগার বাদে), গ্রন্থাগারকর্মী। প্রায় সকল গ্রন্থাগার কর্মীকেই, নিজ পাঠকদের চাহিদানুসারে, সাহিত্যিকের কলম সৃষ্ট, গোয়ান্দাদের, গোয়েন্দা গল্পের চাহিদা মেটাতে হয়।

তবে বাংলা সাহিত্যে, গোয়েন্দাদের সংখ্যা, নেহাত কম নয়। অনেকেই মনে করেন, এ ক্ষেত্রে মহিলা গোয়েন্দাদের, হয়ত দূরবীন দিয়ে খুঁজে দেখতে হবে। তবে, এ ধারনা ভুল। বাংলা সাহিত্যে, মহিলা গোয়েন্দার আবির্ভাব হয়, ১৯৫২ সালে। তারপর থেকে, পুরুষ গোয়েন্দাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, মহিলা গোয়েন্দারও, একের পর এক, অপরাধীদের দমন করে চলছি।

তাই, এই মহিলা গোয়েন্দারা, বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে, কখনও মেগা সিরিয়ালের নায়িকা, তো কখনও বা সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিনেত্রী। এমনকি ওয়েবসিরিজের দুনিয়াতেও, এই চরিত্রগুলির জনপ্রীয়তা লক্ষ্য করা যায়। কখনও এরা কেস সলভ করে মগজাত্র দিয়ে, তো কখনও হাতে নেয় আগ্নেয়াস্ত্র। তাই বলা চলে, বাংলা সাহিত্যে যেমন সব রত্নসম গোয়েন্দাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি এ সাহিত্যে, রত্নারও সংখ্যা কম নয়।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে, গোয়েন্দার আভির্ভাব হয়, ১৮০০ সালের একে বারে শেষের দিকে দশকে। জন্মভূমি পত্রিকায়, গিরিশচন্দ্র বসুর লেখা ‘সেকালেরর দারোগা কাহিনী’

প্রকাশিত হয়। ধারাবাহিক ভাবে এ কাহিনী প্রকাশিত হবার পর, ১৮৮৮ সালে, তা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।[১] এখানে বলা উচিত যে, গিরীশ ঘোষ ১৮৫৩-৬০ পর্যন্ত নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর অঞ্চলের দারোগা ছিলেন।[২] ফলে এ হল তাঁর স্মৃতিচারণ রচনা।

অনেকে এই সাহিত্য সম্পদ টিকে গোয়েন্দা কাহিনীর অ্যাখ্যান না দিয়ে, ‘গোয়েন্দা গন্ধ যুক্ত গল্প’ বলে মনে করেন।[৩] তবে এর আগে, বাংলা সাহিত্যে, গোয়েন্দার আগমন ঘটেনি। এরপর ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয়, ‘দারগার দফতর’। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর লেখক। প্রিয়োনাথ নিজেই দারোগা ছিলেন। ধারাবাহিক ভাবে এ গল্প প্রকাশের পর, তা বইয়ের আঁকার নেয়। এটি পন্ডিতরা, গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এর স্থান নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেন না।

মূল আলোচনা

বাংলা সাহিত্যের, প্রথম মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রের জন্ম হয়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী-র কলম দিয়ে। এই চরিত্রটি হল কৃষ্ণা। সময়টা বৈশাখ, ১৩৫৯। মাসিক শুকতারার পাঠকদের নজর কারে এক বিজ্ঞাপন। এদেশে মেয়েদের ‘আডভেঞ্চার’-বইয়ের প্রথম পথ প্রদর্শিকা[৫] প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণা সিরিজ।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের এক নবদিগন্তের সূচনা হয়। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর হাতের কলম দিয়ে দু’টি গোয়েন্দা চরিত্রের আবির্ভাব হয়, কৃষ্ণা ও অগ্নিশিখা। এরা কোন ভাবেই ঘর-কন্যা করা মেয়ে ছিলেন না। এরা ছিল আধুনিকা, ব্যাম করা শরীর (সুগঠিত শরীর), মাতৃভাষা ছাড়াও, আরও পাঁচটি ভাষায় দক্ষ, পিস্তল চালাতে দক্ষ। আর মজাস্ত্রও ছিল শান দেওয়া।

তাই দেখা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে আগত, প্রথম মহিলা দুই গোয়েন্দাই ছিল, দক্ষ ও রণ পটু। তবে পাঠক কুলে এরা ভয়ঙ্কর রূপে, জনপ্রীয়তা লাভ করে। নারী গোয়েন্দা বলে, পাঠক কুল কিন্তু এদের অচ্ছুৎ করে রাখেনি।

দিন যত যায়, বাংলা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। আসে নানান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও রহস্যভেদী নারী গোয়েন্দারা। এবার কিন্তু পুরুষ লেখকরাও, মহিলা গোয়েন্দাদের নিজ কলমে স্থান দেয়। আসে নানান স্বাদের রহস্য

ভেদ কারিণীরা। নীচে এর একটি পরিচিতি দেবার চেষ্টা করা হল।

ক্রমিক সংখ্যা	চরিত্র	সম্পূর্ণ নাম	স্রষ্টা
১	কিটি	ক্যাটরিনা সেন	হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
২	কৃষ্ণা		প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
৩	গার্গী	গার্গী মুখার্জী	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪	গোপা গোয়েন্দা	গোপা গোয়েন্দি	অনিরুদ্ধ সাউ
৫	গোয়েন্দানি নারায়ণী		অদ্রীশ বর্ধন
৬	জগাপিসি		প্রদীপ রায়
৭	তানিয়া চ্যাটার্জী		পুষ্পেন মন্ডল
৮	দময়ন্তী	ময়ন্তী দত্তগুপ্ত	মনোজ সেন
৯	পাখি		প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়
১০	পিসীমণি	নিভারাণী দেবী	অদিতি ভট্টাচার্য
১১	প্রথমা লাহিড়ী		ইন্দ্রনীল সান্যল
১২	মিতিন মাসি	প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জী	সুচিত্রা ভট্টাচার্য
১৩	রূদ্রানী		দেবারতি মুখোপাধ্যায়
১৪	শিখা	অগ্নিশিখা রায়	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
১৫	শতরূপা সান্যাল		তুষারকান্তি ভট্টাচার্য
১৬	শ্রীপর্ণা রায়		ডাঃ পল্লব বসু
১৭	সদুঠাকুমা		প্রতুল গুপ্ত

এই চরিত্র গুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

- ক) একে বারে বাঙালী পরিবারের ঘরোয়া নারী

- খ) উচ্চ শিক্ষিতা ও কর্ম রতা (গোয়েন্দাগিরি কাজটি শখের)
- গ) পেশাগত গোয়েন্দা

একে বারে বাঙালী পরিবারের মেয়েরাও যে, গোয়েন্দা হয়ে উঠতে পারে নিজবুদ্ধির জোরে, তারও প্রমাণ আছে, এই বাংলা সাহিত্যে। লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-এর কলম সৃষ্ট, বিন্দিপিসি, এর প্রকৃষ্ট উদারহণ। সারা জীবন কাঁথা সেলাই করে আর পরের মুখ থেকে নানান খবর সংগ্রহ করে, বিন্দিপিসি। এভাবেই একদিন নিজ বুদ্ধি দিয়ে, অতীতের এক রহস্যের সমাধান করেন।

আবার 'ঠাকুমার গোয়েন্দাগিরি' গল্পে, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত দেখান যে, সদ্য বিধবা এক নারী, কিভাবে নিজ স্বামীর খুনিকে চিহ্নিত করেন, নিজ বুদ্ধি বলে।

এবার ২য় পর্যায়ে আসা যাক। এখানে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিতা, প্রতিষ্ঠিত, চকরি-রতা ক'জন মহিলাকে, যারা রহস্য সমাধানে যথেষ্ট তুখোর। অজিত কৃষ্ণ বসু, নিজকলমে সৃষ্ট করে, নন্দিনী সোমকে। সায়েন্স কলেজ থেকে এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম নন্দিনী সোম। ক্রমশ নিজ বুদ্ধির হাতিয়ারে, কাঁটতে থাকে রহস্যের জাল।

মনোজ সেনের সৃষ্ট, দময়ন্তীর চরিত্রটি অসাধারণ। ইনি বিবাহিতা ও ইতিহাসের অধ্যাপিকা। আর জটিল সব রহস্য জাল ছাড়ান, নিজের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন করে। একই ভাবে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট, গোয়েন্দা গার্গী, চরিত্রেও একই রূপেরই প্রকাশ দেখা যায়। অঙ্কে ভালো এই মেয়েটি পরিস্থিতির চাপে পরে, বিবাহ করে সায়ন চৌধুরী কে। সায়নের কোম্পানীর ডিরেক্টর পদ লাভ করে গার্গী। সংসার, অফিস সামলে, গার্গী মেলাতে থাকে, একের পর এক হত্যার অঙ্ক। এই সব চরিত্রই বলে, যে মেয়ে রাধে, সে চুলও বাঁধে। এই সব কটি গোয়েন্দা চরিতের গল্পে, একই ভাবে তাদের নিজ সংসার, কর্মক্ষেত্রের সফলতা ও গোয়েন্দা রহস্য সমাধানের রূপটি, ফুটে উঠতে দেখা যায়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সৃষ্ট চরিত্র হল, মিতেন মাসি। এই প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি বা মিতেন মাসি কিন্তু পেশাদার গোয়েন্দা। তবে নিজ সংসার ধর্মটিও সমান তালে, চালিয়ে যাচ্ছে। সংসার করেও, গোয়েন্দা পেশায় মেয়েরা থাকতে পারে, সাহিত্যের

নজরে, এ এক নজির বিশেষ।

আবার দলবদ্ধভাবে, বা একজোট হয়েও, মহিলা গোয়য়েন্দারা (বাংলা সাহিত্যে) রহস্য সমাধানে এগিয়ে এসেছে।

এমনই এক উদাহরণ, গোয়েন্দা গন্ডালু। ১৯৬১ সালে নলিনী দাশগুপ্তের কলম থেকে সৃষ্ট হয়, এই চরিত্রটি। চার বন্ধু, কালু, মালু, টুলু আর বলু। এরা বোডিং স্কুলের ছাত্রী। আর এরাই হল, খুঁদে গোয়েন্দা। খুদে পাঠকদের কাছে গন্ডালু-এর গোয়েন্দাগিরি, খুবই জনপ্রিয়তা পায়।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, পান্ডব গোয়েন্দার জন্ম দেয় ১৯৭০ সালে, মাসিক শুকতারা পত্রিকায়। এখানে বাচ্চু ও বিচ্ছু (দু'বোন) চরিত্র দুটি কিশোরীর। অপর তিন বন্ধু ও সাথে পঞ্চু (তাদের প্রিয় কুকুর) কে নিয়ে চলে, গোয়েন্দাগিরি।

এভাবে বাংলা সাহিত্যে একের পর এক নারী গোয়েন্দা চরিত্রের, আবির্ভাব ঘটে চলেছে।

ফলাফল : এই আলোচনা থেকে, বেশ কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে।

* আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে, গোয়েন্দা চরিত্রের আবির্ভাব হয়, এডগার অ্যালান পো কলম থেকে। ১৮৪১ সালে রচিত হয় দ্য মার্ডারস অ্যাট দ্য রু মর্গ *(The Murders in Rue Morgur)*। গোয়েন্দা সাহিত্যে অগাস্তে দুপ্যাঁ, মহাশয়ের আবির্ভাব হয়। আর বাংলা সাহিত্যে ১৮৮৮ সালে, গোয়েন্দা কাহিনীর আগমন ঘটে।

* বাংলা সাহিত্যে যখন প্রথম গোয়েন্দা কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে, তখন বিশ্ব গোয়েন্দা সাহিত্যে, মহিলা গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটে গিয়েছিল।

১৭৯৪ সালে প্রকাশিত হয়, অ্যান রাডক্লিফের লেখা, 'দ্য মিট্রিস অফ উডলফো'। এর নায়িকা, এমিলি সেন্ট অবার্ট কে, প্রথম মহিলা গোয়েন্দার প্রাথমিক প্রতিলিপি বলে অনেকে ধরেন। পরে, ১৮৬৪ সালে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়, অ্যান্ড্রু ফরেস্টার জুনিয়ার- এর লেখা বই- 'দ্য ফিমেল ডিটেকটিভ'। একই বছরে, ডব্লু.এস. হেওয়ার্ড লেখেন, রেভেলেশন অফ এ লেডি ডিটেকটিভ।[৬]

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এর ঠিক ২০ বছর পর, ২২১ বেকার স্ট্রীট-এর বাড়িতে

(সাহিত্যে), শার্লক হোমস-এর আবির্ভাব হয়।

* বাংলা সাহিত্যে, মহিলা গোয়েন্দার আগমণের অনেক আগে থেকেই, মহিলা আপরাধীদের আবির্ভাব ঘটে গিয়েছিল। তারা যথেষ্ট্য জাঁদরেলও ছিল। এখানে তাদের কথা বলে, আর পুঁথি আকার বৃদ্ধি প্রয়োজন কি।

* ১৯৫২ সালে যখন, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বাংলা সাহিত্যে, প্রথম মহিলা গোয়েন্দা আনেন, তখন বিশ্ব গোয়েন্দা সাহিত্যে, চলে এসেছে বহু মহিলা গোয়েন্দা।

* বাংলায় এক মহিলার সাহিত্যিকের কলম থেকেই, (প্রভাবতী দেবী সরস্বতী) মহিলা গোয়েন্দার জন্ম হয়।

* বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজ কিন্তু, প্রথম থেকেই, মহিলা গোয়েন্দাদের, গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর প্রমাণ কৃষ্ণা ও শিখা সিরজ থেকেই পাওয়া যায়।

পরিশেষে : এটা ঠিক যে বাংলা সাহিত্যে, মহিলা গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটেছে, বেশ কিছুকাল পরে। তবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, পাঠক কুলে, প্রথম থেকেই। আর তা বেরেছে, বই কমেনি, কোন অংশে। ক্রমশ মহিলা গোয়েন্দাদের সংখ্যা বেরেছে, বাংলা সাহিত্যে। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের, মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে। ঘরোয়া, শখের, পেশাদারি- এ সব চরিত্রের গোয়েন্দাই, বাংলা সাহিত্যের, মহিলা গোয়েন্দাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

এই চরিতগুলি আজ, রূপালি পর্দার চমক। তাই আকাশ ৮ - এ গোয়েন্দা গার্গী, দর্শকদের মন মাতায়।[৭] মিতেন মাসি আজ বড় পর্দায়।[৮] এ রকম বহু, মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র, গল্পের বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে, আজ ছোট পর্দা - বড় পর্দা, এমনকি, ওয়েব সিরিজেও অভিনিত হয়ে চলেছে।

সুতরাং, এ কথা কোনভাবেই বলা যাবে না, বাংলা সাহিত্যে, নারী গোয়েন্দাদের আজ, দুরবীন দিয়ে খুঁজতে হবে। একইভাবে, বাংলা সাহিত্যের পাঠকরাও, মহিলা গোয়েন্দা গল্পের কদর দিচ্ছে। ছোট পর্দায় গোয়েন্দা গিন্নীর সফলতা, এই দু'য়েই প্রমাণ বহন করে। ক্রমশ বাংলা পুরুষ গোয়েন্দার সাথে, পা মেলাতে শুরু করেছে, বাংলা সাহিত্যের মহিলা গোয়েন্দারা। তারাও নিজে স্ব পরিচয় বহন করে। এটা কিন্তু বাংলা সাহিত্যের গর্বের বিষয়।

তথ্যঋণ :

১. বসু, গিরিশচন্দ্র, সেকালের দারোগাকাহিনী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২য় সং., ১৯৫৮, পৃ ৩-৪

২. তদেব

৩. বিশ্বাস, অরুণ কুমার, বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প, যুগান্তর, ৩১ জাননুয়ারি ২০২০ https://www.jugantor.com/todays-paper/literature-magazine/273290/বাংলাসাহিত্যে-গোয়েন্দা-গল্প

৪. চট্টোপাধ্যায়, রণিতা, গোয়েন্দা যখন বাঙালি মেয়েরা, নিবন্ধ, ২৯ মে ২০২১

https://sillypoint.co.in/post/গোয়েন্দা-যখন-বাঙালি মেয়েরা /id/c9ExCg1CdABokfv28qnW

৫. চট্টোপাধ্যায়, রণিতা, বাংলা সাহিত্যের প্রথম মেয়ে গোয়েন্দার জন্ম দিয়েছিলেন শিকল ভাঙতে চাওয়া এক নারীই, বঙ্গদর্শন, ১৪ নভেবর ২০১৯ https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/first-female-detective-and-pravabati-devi-saraswati

৬. দাশগুপ্ত, শমীতা দাশ, ইংরেজি ডিটেকটিভ সাহিত্যে নারী গোয়েন্দা, অবসর : তথ্য ও বিনোদন ওয়েবসাইট, বিশেষ গোয়েন্দা সংখ্যা - জানুয়ারি, ১৫, ২০১৭ https://abasar.net/abasarold/abasar/goyenda_shamita.htm

৭. কর্মকার, রজত, ব্যোমকেশ-ফেলুদা-শবরের পর এবার আসছেন গোয়েন্দা গার্গী, সময়, ২৯সে ডিসেম্বর, ২০১৭

https://eisamay.com/entertainment/tv-news/ek-masher-sahitya-goyenda-gargi-at-akash-aath/articleshow/62297498.cms

৮. মিতিন মাসি | Official Trailer, Sep 10, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=FzpDBQ4HzCE

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে : যোগদর্শন

বিশ্বজিৎ রায়

এম.ফিল, দর্শন বিভাগ, রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যামন্দির কলেজ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ

মানবজীবনে আধ্যাত্মিকতা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য হল 'কৈবল্য'। সাধারণত 'কৈবল্য' বলতে বোঝানো হয় ''নিজের প্রকৃত স্বরূপকে জানা''। এখন প্রশ্ন হল যে, আমরা কি নিজেদের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞাত? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যে, বিবেক জ্ঞানের অভাববশত আমরা নিজের নিত্যস্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞাত, যার ফলে জন্ম-জন্মান্তর চক্রে আবর্তিত হতে থাকি। তাই এই জন্ম-জন্মান্তরচক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে একমাত্র উপায় হল ''নিজেকে জানা''। এই প্রবন্ধে আমি যোগদর্শনের ভিত্তিতে নিজেকে জানার নির্ধারিত মার্গ ও মার্গের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যোগদর্শনে নিজেকে জানা অর্থাৎ নিজেকে উপলব্ধি করাকে 'বিবেকজ্ঞান' হিসাবে গণ্য করা হয়। এই নিজেকে জানা অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ যোগদর্শনে অষ্টাঙ্গযোগের উল্লেখ করা হয়েছে। আর অষ্টাঙ্গযোগের নিত্য অনুশীলনের মাধ্যমে বিবেকজ্ঞানের উদয় হয়, যার ফলস্বরূপ যোগী নিজের নিত্যস্বরূপে ব্যবস্থিত হয়। অর্থাৎ যোগী কৈবল্য লাভ করে। এই কৈবল্যই যোগীর পরমপ্রাপ্তি, যদিও কৈবল্য কোনো প্রাপ্তি নয় তা হল একধরনের উপলব্ধি।

মূল শব্দ

চিত্ত, পুরুষ, প্রকৃতি, ধ্যান, কৈবল্য।

মূল আলোচনা

ভারতীয় দর্শনের একটি অন্যতম ধারণা হল মুক্তির ধারণা। এই মুক্তির বুৎপত্তিগত দিক লক্ষ করলে দেখা যায় যে, 'মুক্তি' শব্দটি 'মুচ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ 'মুক্ত করা', 'ছেড়ে দেওয়া' ও 'মুক্তি দেওয়া' ইত্যাদি। ভারতীয় দর্শনে মুক্তিকে 'নির্বাণ', 'নিঃশ্রেয়স', 'অপর্বগ', 'মোক্ষ' ও 'কৈবল্য' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যোগদর্শনে মুক্তিকে যে নামে অভিহিত করা হয় তা হল 'কৈবল্য'। যোগদর্শন হল হিন্দুদর্শন গুলির মধ্যে অন্যতম এক আস্তিক দর্শন। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। যোগদর্শনের মূলগ্রন্থ হল মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র'। পতঞ্জলির নামানুসারে যোগদর্শনকে পাতঞ্জলদর্শনও বলা হয়। আবার পাতঞ্জলদর্শনকে সাংখ্য-প্রবচন নামেও অভিহিত করা হয়। কেননা মহর্ষি পতঞ্জলি, কপিল মুনি প্রবর্তিত সাংখ্যমত স্বীকার করে সাংখ্য-প্রবর্তিত পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব স্বীকার করেছেন। এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব ছাড়া ও আরও একটি তত্ত্ব পাতঞ্জল-দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। এই স্বীকৃত মূলকতত্ত্বটি হল ঈশ্বরতত্ত্ব। এই কারণে পাতঞ্জল-দর্শনের অপর এক নাম 'সেশ্বর-সাংখ্য'। তবে এই যোগদর্শনের ঈশ্বরতত্ত্ব সাংখ্যদর্শনের পুরুষ অতিরিক্ত পৃথক কোনো তত্ত্ব নয়।

মহর্ষি পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' চারটি পাদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই চারটি পাদ বা পরিচ্ছেদে মোট ১৯৫টি সূত্র আছে। এই পাদ বা পরিচ্ছেদগুলি হল—

১) সমাধিপাদ : এই পরিচ্ছেদে যোগের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য আলোচিত হয়েছে।

২) সাধনপাদ : এই পরিচ্ছেদে যোগের লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় আলোচিত হয়েছে।

৩) বিভূতিপাদ : এই পরিচ্ছেদে যোগ-প্রক্রিয়ার দ্বারা লব্ধ অলৌকিকশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) কৈবল্যপাদ: এই পরিচ্ছেদে মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে।

'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থ হল 'যুক্ত হওয়া'। মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগ' শব্দটিকে

সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেননি। মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করলেও, যোগসূত্রে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে 'যোগ' বলেননি। যোগসূত্রে 'যোগ' শব্দটিকে মহর্ষি পতঞ্জলি বিশেষ অর্থে, 'সমাধি-যোগ' অর্থে, ব্যবহার করেছেন। যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"[১] অর্থাৎ 'যোগ' হল চিত্তবৃত্তির নিরোধ। যোগশাস্ত্রমতে, যোগসাধনা অতি দুষ্কর। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ যোগসম্ভব। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণাভাব বা নির্লিপ্তভাবকেই 'বৈরাগ্য' বলে। এই বৈরাগ্যের ফলেই চিত্তের বিষয়মুখিতা অপসৃত হয় এবং চিত্ত অন্তর্মুখী হওয়ার ফলে পুরুষ বা আত্মার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়। আত্মার প্রতি এই চিত্ত-নিবেশকে সুদৃঢ় করার জন্যই অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত এভাবে আত্মমুখী হলে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্তবিশুদ্ধ হলে বিবেক খ্যাতি বা বিবেকজ্ঞানের উদয় হয়। বিবেকজ্ঞান হল প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদমূলক জ্ঞান, যা দুঃখমুক্তি ও কৈবল্যলাভের উপায়। বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য সর্বপ্রথমে চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন অষ্টবিধ অনুশীলন বা যোগানুষ্ঠান। এই অষ্টবিধ অনুশীলন বা যোগানুষ্ঠানকেই যোগদর্শনে 'অষ্টযোগাঙ্গ' বলা হয়েছে। এই অষ্টযোগাঙ্গ হল—"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি"[২] অর্থাৎ (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি।

যোগদর্শনে বিবেকজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ যে অষ্টযোগাঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে সেই অষ্টযোগাঙ্গ অর্থাৎ অষ্টবিধ সাধনগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

১. যম: অষ্টযোগাঙ্গের প্রথম সাধনকে বলা হয় 'যম'। এই যমের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "অহিংসাসত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাযমাঃ"[৩] অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি সাধনাকে একত্রে বলা হয় 'যম'।

অহিংসা হল প্রথম যম। 'অহিংসা' বলতে বোঝায় কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা অপরকে আঘাত না করা। অর্থাৎ অহিংসা হল সর্ববিধ হিংসাজনক ক্রিয়া থেকে বিরত থাকা। জীবহত্যা (কায়িক), কটুবাক্যে অপরকে আঘাত করা

(বাচিক), অপরের ক্ষতি-চিন্তা(মানসিক) এই সবই হিংসার অন্তর্গত। জীবহিংসা যেমন বর্জনীয়, তেমনি কথার দ্বারা অপরকে আঘাত করা, এমনকি অপরের ক্ষতি-চিন্তাও বর্জনীয়। অহিংসা কেবল নেতিমূলক সাধন নয়, অহিংসার একটি ইতিমূলক দিকও আছে এবং তা হল মৈত্রী। মৈত্রী অহিংসারই অন্তর্গত। হিংসা না করা 'অহিংসার' নেতিবাচক দিক আর মিত্রসুলভ আচরণ করা, প্রেম-ভালবাসা বিতরণ করা, 'অহিংসার' ইতিবাচক দিক। যোগী অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর সান্নিধ্যে সমস্ত প্রাণীর বৈরি-ভাব দূর হয়ে যায়—

"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াংতৎসন্নিধৌবৈরত্যাগঃ"[৪]।

সত্য হল দ্বিতীয় যম। 'সত্য' বলতে বোঝায়, যথাযথকথন ও চিন্তন এবং মিথ্যাকথন ও চিন্তনবর্জন। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও অসত্যকথন বর্জনীয়। সত্য অপ্রিয় হলে মৌনতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। স্বল্পভাষিতাও সত্যসাধনের একটি অঙ্গ। যোগীকে অসত্যভাষণ, অপ্রিয়ভাষণ এবং অতি-ভাষণ থেকে বিরত থাকতে হবে। যোগী সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর বাক্যজনিত ক্রিয়া কার্যে পরিণাম প্রাপ্ত হয়—

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াংক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্"[৫]।

অস্তেয় হল তৃতীয় যম। 'অস্তেয়' বলতে বোঝায়, পরদ্রব্য অ-গ্রহণ। নিজস্ব নয়, এমন দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকাই অস্তেয়। যোগী যেমন অপরের দ্রব্য গ্রহণ করবেন না, তেমনি অপরের দ্রব্যের প্রতি তার কোনো স্পৃহাও থাকবে না। যোগী অস্তেয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্ত ধনরত্নের প্রাপ্তি হয়—

"অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াংসর্বরত্নোপস্থানম্"[৬]।

ব্রহ্মচর্য হল চতুর্থ যম। 'ব্রহ্মচর্য' হল জননেন্দ্রিয়ের সংযম। জননেন্দ্রিয়কে সংযত রাখার জন্য প্রয়োজন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও সংযত করা ও সর্বপ্রকার কামচিন্তা বর্জন। এপ্রকার ব্রহ্মচর্য অনুশীলনে যোগী বীর্য লাভ করেন। অর্থাৎ যোগী ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হলে বীর্য লাভ করে—

"ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াংবীর্যলাভঃ"[৭]।

অপরিগ্রহ হল পঞ্চম যম। 'অপরিগ্রহ' হল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপরের দান গ্রহণ না করে কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন, তাই গ্রহণ করা। ফলে

চিত্তে এক স্বাভাবিক শক্তির উৎপন্ন হয়। আর এই শক্তির ফলে যোগীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে—

"অপরিগ্রহস্থৈর্যেজন্মকথন্তাসংবোধঃ"[৮]।

এভাবে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমেই যম-সাধনা প্রয়োজন। যম-সাধনা ব্যতীত চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হতে পারে না।

২. নিয়ম : অষ্টযোগাঙ্গের দ্বিতীয় সাধনকে বলা হয় 'নিয়ম'। এই নিয়ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—"শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানিনিয়মাঃ"[৯]। অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান— এই পাঁচটি সাধনা হল 'নিয়ম'।

শৌচ হল প্রথম নিয়ম। শৌচ বা শুচিতা দুই প্রকার- বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ। নির্মল সলিলে প্রত্যহ স্নান করা, গৃহাদি নির্মল রাখা, সাত্ত্বিক আহার ইত্যাদি বাহ্য-শৌচ বা শুচিতার অন্তর্গত। এই বাহ্যশৌচের আনুশীলন করতে থাকলে নিজ-শরীরে ঘৃণা ও অপরের সঙ্গে অমিলনের বা মেলামেশা না করার ইচ্ছা জন্মে—

"শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সাপরৈরসংসর্গঃ"[১০]।

আর অভ্যন্তরীণ শুচিতা হল কুচিন্তাবর্জন ও সুচিন্তার অনুশীলন। অহংকার ও অভিমান প্রভৃতি কুচিন্তা থেকে মনকে মুক্ত করে শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম, প্রভৃতি সুচিন্তার অনুশীলন। এই অভ্যন্তরীণ শুচিতা অনুশীলন করতে থাকলে চিত্তে শুদ্ধি, নির্মলতা ও স্থিরতা জন্মে, তা থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ-আয়ত্বে আনা যায়, তাতে স্বরূপ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা জন্মে—

"সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি"[১১]।

সন্তোষ দ্বিতীয় নিয়ম। সন্তোষ হল স্বল্পে তুষ্টি। যা পাইনি তারজন্য খেদ না করে যা পেয়েছি তাতে সন্তুষ্ট থাকাই সন্তোষ। অহেতুক আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত অস্থির ও চঞ্চল হয়। সন্তোষের দ্বারাই চিত্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়—

"সন্তোষাদনুত্তমঃসুখলাভঃ"[১২]।

তপঃ হল তৃতীয় নিয়ম। তপঃ বা তপস্যা হল ব্রতাচার অনুশীলন ও সহনশীলতার অভ্যাস। সংকল্প-সাধনে কষ্টসহন অভ্যাসই তপঃ বা তপস্যা। স্বল্পাহার, কখনও উপবাস, কোমল-শয্যাবর্জনপূর্বক কঠিন-শয্যাগ্রহণ, শীত-উষ্ণসহন

ইত্যাদি তপস্যার অন্তর্গত। তপস্যার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি জন্মে—

"কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ"[১৩]।

স্বাধ্যায় হল চতুর্থ নিয়ম। স্বাধ্যায় হল মোক্ষশাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন। উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে বিষয়চিন্তা ক্ষীণ হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভের বাসনা দেখা দেয়। তার ফলে ইষ্টদেবতার অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত দেবতার সাক্ষাৎকার হয়—

"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ"[১৪]।

ঈশ্বর-প্রণিধান হল পঞ্চম নিয়ম। এই নিয়মে ঈশ্বরের নিরন্তর চিন্তা বা ধ্যান এবং ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ। ঈশ্বর-প্রণিধানের মাধ্যমে সাধকের চিত্তমালিন্য দূরীভূত হয়। ঈশ্বরে প্রণিধান বা আত্মসমর্পণ করলে ঈশ্বর করুণাবশে যোগীর সাধন-পথের সকল বাধা অপসৃত করে সমাধিলাভকে সম্ভব করেন—

"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ"[১৫]।

৩. আসন: অষ্টযোগাঙ্গের তৃতীয় সাধনকে বলা হয় আসন। আসন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—"স্থিরসুখমাসনম্"[১৬]। অর্থাৎ নিশ্চল ও সুখজনক উপবেশনই আসন। যোগ-সাধনার জন্য আসন অত্যাবশ্যক। শরীর নিরোগ ও সুস্থ না হলে যোগ-সাধনা সম্ভব হয় না। শারীরিক সুস্থতার জন্যই আসন আবশ্যক। মনকে সুস্থ রাখার জন্য নিরোগ ও স্বাস্থ্যবান শরীরের প্রয়োজন। সুস্থদেহ-মনই চিত্তসংযমের অনুকূল। উপযুক্ত গুরুর নির্দেশ অনুসারে আসন অনুশীলন করতে হয়। বিভিন্ন প্রকারের আসন আছে। যথা—পদ্মাসন, বীরাসন, শীর্ষাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি।

৪. প্রাণায়াম: অষ্টযোগাঙ্গের চতুর্থ সাধনকে বলা হয় প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—"তস্মিন্সতিশ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃপ্রাণায়ামঃ"[১৭]। অর্থাৎ বায়ুর শ্বাসরূপ অভ্যন্তরীণ গতি ও প্রশ্বাস রূপ বহির্গতির বিচ্ছেদই হল প্রাণায়াম। বলা যায় যে, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ-ক্রিয়াই প্রাণায়াম। শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে কিছুক্ষণ প্রশ্বাস ত্যাগ না করে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস গতির মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় তা একপ্রকার প্রাণায়াম, তেমনি প্রশ্বাস ত্যাগ করে কিছুক্ষণ শ্বাসবায়ু গ্রহণ না করে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস গতির মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় তাও এক প্রকার

প্রাণায়াম। এভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে গতিবিচ্ছেদ তিনধরনের হতে পারে—পূরক, রেচক ও কুম্ভক। শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে কিছুক্ষণ প্রশ্বাস ত্যাগ না করাকে বলে 'পূরক'। শ্বাসবায়ু ত্যাগ করে কিছুক্ষণ শ্বাসগ্রহণ না করাকে বলে 'রেচক'। শ্বাসগ্রহণ না করে বা প্রশ্বাস ত্যাগ না করে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থান করাকে বলে 'কুম্ভক'। এই প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে চিত্ত স্থির হয় এবং যে কোনো বিষয়ে চিত্তনিবেশ সম্ভব হয়। ফলে যোগীর ইষ্টদেবতার অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত দেব তার প্রতি ধ্যান করা সহজ হয়।

৫. প্রত্যাহার: অষ্টযোগাঙ্গের পঞ্চম সাধনকে বলা হয় প্রত্যাহার। প্রত্যাহার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—"স্ববিষয়াসম্প্রয়োগেচিত্তস্যস্বরূপানুকারইবেন্দ্রিয়াণাংপ্রত্যাহারঃ"[১৮] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্যবিষয় থেকে বিযুক্ত করে চিত্তের অনুগত করাই প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী হলে চিত্ত চঞ্চল হয় এবং তার ফলে কোনো বিষয়ে চিত্তনিবিষ্ট হতে পারেনা। ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখী হলে চিত্তের বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হয় এবং তখন চিত্ত স্থিরভাবে ধ্যেয় বস্তুতে নিবিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি চরম বশ্যতা লাভ করে—"ততঃপরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্"[১৯]।

৬. ধারণা: অষ্টযোগাঙ্গের ষষ্ঠসাধনকে বলা হয় ধারণা। এই ধারণা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্যধারণা"[২০]। অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত নিবেশ হল ধারণা। ধ্যেয় বস্তু বাহ্য হতে পারে, আবার অভ্যন্তরীণ হতে পারে। দেবমূর্তিতে চিত্তনিবেশের ক্ষেত্রে ধ্যেয় বস্তুটি বাহ্য বিষয়। নাভিমূলে অথবা নাসাগ্রে অথবা নাড়ী চক্রে চিত্ত নিবেশের ক্ষেত্রে ধ্যেয় বস্তুটি অভ্যন্তরীণ।

৭. ধ্যান: অষ্টযোগাঙ্গের সপ্তম সাধনকে বলা হয় ধ্যান। এই ধ্যান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—"তত্রপ্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্"[২১]। অর্থাৎ ধারণার পরিণতিই হল ধ্যান। ধারণা গভীরতর ও দীর্ঘকালীন হলে তা ধ্যানে উন্নীত হয়। ধারণার ক্ষেত্রে যোগীর চিন্তা প্রবাহের মধ্যে একতানতা বা নিরবচ্ছিন্নতা থাকে না, কিন্তু ধ্যান এক অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহ। ধ্যানে যোগীর চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে কোনো ছেদ বা বিরতি থাকে না। ধারণার চিন্তাপ্রবাহ বিন্দু বিন্দু জলকণার মতো ছেদ সমন্বিত কিন্তু ধ্যানের চিন্তা প্রবাহ তৈলধারার মত ছেদ রহিত।

৮. সমাধি: অষ্টযোগাঙ্গের অন্তিম সাধনকে বলা হয় সমাধি। সমাধি সম্পর্কে বলা

হয়েছে যে—"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসংস্বরূপশূন্যমিবসমাধিঃ"[২২]। অর্থাৎ ধ্যানের চরম উৎকর্ষই সমাধি। এই অবস্থায় যোগী ধ্যানের বিষয়কে ভিন্নরূপে অনুভব করে না। অর্থাৎ নিজের সঙ্গে ধ্যেয় বিষয়ের পার্থক্য জ্ঞানগোচর হয় না। যোগীর ধ্যেয় বিষয়ের প্রতি চিত্তের এই প্রকার অবস্থাকে সমাধি বলা হয়। ধ্যেয় বিষয়ের ভিত্তিতে এই সমাধি আবার দু'প্রকার— সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল সেই ধরনের সমাধি, যেখানে ধ্যেয় বিষয় স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল অবলম্বনযুক্ত সামাধি। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হল সেই ধরনের সমাধি, যেখানে ধ্যেয় কোনো বিষয় নেই, যেখানে চিত্তের কোনো অবলম্বন নেই। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিহীন অবস্থায় বিরাজ করতে থাকায় যোগী এই অবস্থায় তাঁর নিজস্বরূপে অবস্থান করে তদাদ্রষ্টুঃস্বরূপেহবস্থানম্"[২৩]।

তাই বলা যায় যে, মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল নিজেকে জানা অর্থাৎ আমিকে? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা। এই আমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন ভাবে অন্বেষণ কারার মার্গ প্রদান করেন। যোগদর্শন নিজেকে জানার অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য যে মার্গ প্রদান করেন তা হল, 'অষ্টাঙ্গযোগ'। অর্থাৎ অষ্টবিধ অনুশীলন। এই অষ্টবিধ অনুশীলনের প্রত্যেকটি অনুশীলন একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, এমনকি একে অপরের সাহার্য্য ব্যতীত কখনোই যোগদর্শনের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তা চরিতার্থ হতে পারে না। এই অষ্টবিধ অনুশীলন পর্যায়ক্রমে দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন করতে থাকলে যোগী সমাধির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়, যেখানে যোগী নিজেকে প্রকৃতি থেকে ভিন্নভাবে উপলব্ধি করে অর্থাৎ নিজের সাক্ষিত্ব অর্থাৎ সাক্ষিভাব, কৈবল্য অর্থাৎ কেবলেরভাব, মাধ্যস্থ অর্থাৎ মধ্যস্থেরভাব, দ্রষ্টত্ব অর্থাৎ দ্রষ্টারভাব এবং অকর্তৃত্ব অর্থাৎ অকর্তৃত্বভাব ইত্যাদি উপলব্ধি করে। আর এই উপলব্ধিই হল যোগীর পরম উপলব্ধি। তাই পরিশেষে বলা যায় যে, এই পরম উপলব্ধির ক্ষেত্রে যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গযোগ অর্থাৎ অষ্টবিধ অনুশীলন আধ্যাত্মিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী., ভ.(২০২০). পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সমাধিপাদ,

সূত্র সংখ্যা:২, পৃ:৪

২. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা: ২৯, পৃ:১৪৪

৩. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা: ৩০, পৃ:১৪৫

৪. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৩৫, পৃ: ১৫৫

৫. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৩৬, পৃ:১৫৫

৬. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা: ৩৭, পৃ: ১৫৬

৭. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৩৮, পৃ:১৫৭

৮. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৩৯, পৃ:১৫৭

৯. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৩২, পৃ: ১৪৯

১০. স্বামী., ভ.(২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ,সূত্র সংখ্যা:৪০,পৃ:১৫৮

১১. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৪১, পৃ:১৫৯

১২. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়,সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৪০, পৃ:১৬০

১৩. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৪৩, পৃ:১৬১

১৪. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৪৪, পৃ:১৬২

১৫. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৪৫, পৃ:১৬২

১৬. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৪৬, পৃ:১৬৩

১৭. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৪৯,পৃ:১৬৬

১৮. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৫৪, পৃ:১৭২

১৯. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সাধনপাদ, সূত্র সংখ্যা:৫৫, পৃ:১৭৩

২০. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, বিভূতিপাদ, সূত্র সংখ্যা:১, পৃ:১৭৫

২১. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, বিভূতিপাদ, সূত্র সংখ্যা:২, পৃ:১৭৬

২২. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, বিভূতিপাদ, সূত্র সংখ্যা:৩, পৃ:১৭৭

২৩. স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, সমাধিপাদ, সূত্র সংখ্যা:৩, পৃ:৭

গ্রন্থপঞ্জি :

(১) আচার্য., ক. (২০০৯). যোগ দর্শন, গুজরাত: দর্শন য়োগ ধর্মার্থট্রস্ট, প্রথম সংস্করণ

(২) বন্দ্যোপাধ্যায়., ক. (১৯৮৪). সাংখ্য-পাতঞ্জলদর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ

(৩) বসু., সু. (২০১১). ভারতীয় দর্শনসমীক্ষা, কলকাতা: সদেশ, প্রথম প্রকাশ

(৪) মণ্ডল., নী. (২০১১). ভারতীয় দর্শন পরিচয়, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,

(৫) শর্ম্মা., পূ. (২০০৫).পাতঞ্জলদর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তকপর্ষৎ, দ্বিতীয় মুদ্রণ

(৬) সান্যাল., জ. (১৯৮৭). ভারতীয়দর্শন, ৩য় সং. কলকাতা: শ্রীভূমিপাবলিশিংকোম্পানী,

(৭) সেন., দে. (১৯৫৫). ভারতীয়দর্শন, কলিকাতা: ব্যানার্জী পারলিশার্স, প্রথম প্রকাশ

(৮) সেনগুপ্ত., প্র. ও মুখোপাধ্যায়., ম. (১৯৬২). ভারতীয় দর্শন, কলিকাতা: ব্যানার্জী পারলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ

(৯) স্বামী., প্রে. (২০১৮).পাতঞ্জল যোগসূত্র, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ পুনমুদ্রণ

(১০) স্বামী., ভ. (২০২০).পাতঞ্জল যোগদর্শন, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ষষ্ঠ পুনমুদ্রণ

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

হারানের নাতজামাই : একটি বিদ্রোহের আখ্যান

ড. মথুর গুপ্ত

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কবি নজরুল কলেজ, বীরভূম।

সারসংক্ষেপ

মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী একজন লেখক তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হারানের নাতজামাই নামে একটি আখ্যান রচনা করেছেন। আন্দোলনের বীভৎস রূপ যেমন তাঁর রচনায় লক্ষ করা গেছে ঠিক তেমনই আবার দেখতে পাই গ্রামের গরীব কৃষক সংঘবদ্ধ হয়েছে। আরো একটি দিক আমরা লক্ষ করতে পারি তা হল নারীর মুখে ভাষা দান। সংগ্রামে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের চিত্রও আমরা প্রতিবেদনে দেখতে পাই। একদিকে নারীর বিদ্রোহী রূপ অন্য দিকে নারীর মাতৃময়ী কোমল রূপ আখ্যানের পরতে পরতে লক্ষ করা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে বারে বারে প্রতিবাদের স্বরূপ উন্মোচন করতে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা প্রভৃতি অমানুষিক আচরণের প্রতিবাদ তাঁর আখ্যান কল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে নিরন্তর। তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর রচনা। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তিনি লেখক হিসেবে পাঠককে তাঁর অভিজ্ঞতার পাঠ দিতে সাহিত্য রচনা করেন। 'হারানের নাতজামাই' গল্পের নামকরণ পুরুষতান্ত্রিক হলেও সম্পূর্ণ কাহিনি জুড়ে বিচরণ করেছে একটিই নারী চরিত্র যার কোনো নাম নেই শুধু একটি সম্পর্কের পরিচয়বাহী হয়েই থেকেছে।

কি-ওয়ার্ড

নারীর পরিচয় তার ভাগ্যে নয়, তার কর্মে।

মূল প্রবন্ধ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের জবানীতে সাহিত্য সূচনা করার পূর্বে তাঁর অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা এবং অনুভূতির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর "সাহিত্য করার আগে লেখকের কথা" রচনায়। তারই কিছুটা অংশ আমরা উদ্ধৃত করতে পারি,- "শরৎচন্দ্রের কাহিনিতে পতিতা ও অসতীরা চরিত্র হয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম। তখনকার অন্য কোন লেখক এটি পারেন নি। শরৎচন্দ্রের বই পড়ে মনে হতো তিনি অন্যায় আর গোঁড়ামিকে আঘাত করেছেন কিন্তু অন্য কোন লেখক সম্পর্কেই এরকম ভাবা সম্ভব হতো না। মনে হতো তারা যেন অনুচিত জেনেও গায়ের জোরে সেটা উচিত বলে সমর্থন করেছেন।

ছোট বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরো স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন? মানুষ হয় ভালো হয় নয় মন্দ হয়, ভালো মন্দ মেশানো হয় না কেন? শরৎচন্দ্রের চরিত্র গুলিও হৃদয় সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব-কিছু নিয়ন্ত্রন করে মধ্যবিত্তের হৃদয়।

ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভন্ডামী, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকার গ্রস্থতা, সংস্কারপ্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ? ভদ্র সমাজের কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগদীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে– সাহিত্যে স্থান পায় না? ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা, বাস্তব জীবন ও সাধারণ বাস্তব মানুষের অভাব বড়ই পীড়ন করতো। সংঘাতে পীড়ন...।

ভদ্র পরিবারে জন্ম পেয়েছি তদনুরূপ হৃদয় আর মন। অথচ ভদ্র জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিক ভাবপ্রবনতা ইত্যাদি অনেক কিছুর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে বিদ্রোহ মাথা তুলেছে আমারই মধ্যে। আমি নিজে ভাবপ্রবণ অথচ ভাবপ্রবণতার নানা

অভিব্যক্তিকে ন্যাকামি বলে চিনে ঘৃনা করতে আরম্ভ করেছি। ভদ্রজীবনকে ভালোবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্খা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি। অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা প্রকাশ্য মুখোশ পরা হীনতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে। ...লিখতে আরম্ভ করার পর বাস্তবকে স্বীকৃতি দানের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে এই সংঘাতের তীব্রতা কমে আসে"।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে বারে বারে প্রতিবাদের স্বরূপ উন্মোচন করতে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছেন। মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা প্রভৃতি অমানুষিক আচরনের প্রতিবাদ তাঁর আখ্যান কল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে নিরন্তর। আমরা এই নির্দিষ্ট বয়ান অর্থাৎ 'হারানের নাতজামাই' গল্পের বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করবো এই প্রতিবাদ ভাষ্য গল্পের আখ্যানকে কতটা প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে নারী প্রতিবাদী কণ্ঠের যে উচ্চারণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাতে চেয়েছেন তা কতটা উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। মূলত মার্ক্সবাদী ধারণায় বিশ্বাসী একজন লেখক তাঁর বয়ানে নারীকে কতটা আন্দোলনের বা প্রতিবাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পেরেছেন এবং তা আখ্যানের সঙ্গে কতটা সম্পৃক্ত হতে পেরেছে তারই বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই আমরা এই আখ্যানের প্রেক্ষাপটটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো। একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে উক্ত রচনাটিতে। একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ ঘটনার প্রতিফলন আখ্যানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অবিভক্ত বাংলার বুকে যতগুলি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হল 'তেভাগা আন্দোলন'। দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর পার করে বাংলার কৃষক শ্রেণী তাদের অধিকার রক্ষায় যে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল তা 'তেভাগা আন্দোলন' নামে বহুল পরিচিত। কৃষিজাত পণ্যের উপর কৃষকের অধিকার রক্ষার লড়াই। মোট ফসলের চার ভাগের তিন ভাগ চাষীকে দিতে হবে, এই বিষয়কে সামনে রেখে আন্দোলনের সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত আন্দোলন সশস্ত্র

আন্দোলনের চেহারা নেয়। কারণ বিপক্ষে যারা ছিলেন তারা এই অন্যায় আবদার কোনো অবস্থাতেই মেনে নেবে না। আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করতে যত রকম পন্থা অবলম্বন করা যায় তাই তারা করেছেন। এর জন্য মজুতদার এবং জমিদারগণ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন– পুলিশ লাঠিয়াল এবং আক্ষরিক অর্থে গুণ্ডা। গল্পের সূচনায় আমরা দেখি জোতদার চণ্ডী ঘোষাল গ্রামে প্রবেশ করছেন শীতকালের মাঝ রাতে, সঙ্গে রয়েছে পুলিশ, তাঁর পোষা কানাই এবং শ্রীপতি আর কয়েকজন লেঠেল- "মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল"। আন্দোলনকারী দের অর্থাৎ চাষীদের একমাত্র সম্বল ছিল তাদের একজোট হওয়া কারণ সংখ্যায় বেশি হয়েও তারা ছিল নির্যাতিত শোষিত। একজোট হতে না পারলে শাসক শ্রেণীর মনে ভয় ধরানো সম্ভব নয়। তাহলে নির্যাতনের হাত থেকেও রেহাই মেলা মুশকিল। এই চরম সত্যটা চাষীরা বুঝতে পেরেছিল তাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত নির্যাতিত শোষিত মানুষ একজোট হয়ে একটি মাত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল তা হল 'নির্যাতিত কৃষক সম্প্রদায়'। গল্পে আমরা দেখি– "দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালী বলে, দেইখ্যা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখ্যা লমু"।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য সেটা শুধু প্রতিবাদের ভাষ্য হয়ে উঠেছে এই কারণে নয়। এর অন্য একটি দিক আছে যা গল্পটিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে তা হল, মহিলা চেতনায় প্রতিবাদের বীজ বোনা। গ্রামের অশিক্ষিত গরিব মহিলাদের আন্দোলননে সক্রিয় অংশগ্রহণের যে গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'হারানের নাতজামাই' গল্পে নির্মাণ করেছেন তা এক কথায় সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক। পাড়াগায়ের মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের গল্প এত অবলীলায় বলতে পারা তাঁর মতো সচেতন মনের লেখকের পক্ষেই সম্ভব বলে মনে হয়। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি, একটানা অনেকদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যখন গোটা গ্রাম ক্লান্ত-অবসন্ন, শীতের রাতে গোটা পুরুষ সমাজ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন গ্রাম পাহারার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে গ্রামের মহিলারা। তাদের চোখে ঘুম নেই। লেখকের বয়ানে আমরা পাই,– "কনকনে শীতের রাত।

বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা''। এখান থেকে আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি লেখকের 'ঘাঁটি' শব্দের প্রয়োগ। মূলত যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ লেখক মহিলাদের শুধু মাত্র গ্রামের পাহারাদার করে না রেখে তাদের যোগ্য মর্যাদা দিয়ে সৈনিক বানিয়ে ছেড়েছেন। এদের দলপতি হিসেবে যে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন লেখক তার নাম দিয়েছেন 'ময়নার মা'।

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখেছি জোতদারের সশস্ত্র লোকজন পুলিশ লেঠেল নিয়ে গ্রাম ঘিরে ফেলেছে আন্দোলনের নেতা ভুবন নামক ব্যক্তিটিকে ধরার জন্য। অপরদিকে সেই ভুবন আশ্রয় নিয়েছে হারানের বাড়িতে। বৃদ্ধ হারান বয়সের ভারে জীবনের অভিজ্ঞতায় রুগ্ন। চোখেও দেখে কম কানেও শোনে না বললেই চলে। পুত্রের শোকে পাথর হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তি। অপরদিকে তারই পুত্রবধূ অর্থাৎ তার নাতনি ময়নার মা গল্পের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে চলেছে। তার নিজের কোনো নাম লেখক দেন নি ঠিকই তবে সম্পর্ক নাম নিয়েই ময়নার মা গল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। আন্দোলনের নেতা ভুবনকে কিছু রক্ত পিপাশু ক্ষমতা দাম্ভিক ব্যক্তি গুলির হাত থেকে বাঁচাতে নিজের মেয়ের সম্ভ্রম ও সকলের সামনে বন্ধক রেখেছে বলতে পারি। উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস, দৃঢ়চেতা নারী হিসেবে ময়নার মা কে লেখক পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। যখন দু পক্ষই প্রায় লাঠালাঠির পর্যায়ে চলে এসেছে ঠিক তখনই ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ময়নার মা,- ''গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তল্লাশি করতি দিমু না।'' প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, দিমু না!

এমনই যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখ্যানে তীক্ষ্ণগলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না...। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে শোয়াইছি মাইয়া জামায়েরে। দারোগাবাবু তল্লাশ করতে চান, তল্লাশ করেন''।

গ্রামকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে বাঁচাতে ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছে হারানের পুত্রবধূ। দারোগার মতো ওরকম দাম্ভিক লোকের সামনে গ্রামের এক অশিক্ষিত গৃহবধূ দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। আমরা অর্থাৎ পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারি এই জামাই আর কেউ নয়, তাদেরই প্রতিবাদের নায়ক ভূবন। আমরা যদি একজন মায়ের দৃষ্টিকোন থেকে দেখি তাহলে সেই সময় এবং পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। নিজের বিবাহিত মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে অন্য পুরুষের শয্যা সঙ্গিনী হিসেবে সবার সামনে দেখানোটাও বেশ শক্ত ব্যাপার। ময়নার মা তার মাতৃসত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে একজন প্রতিবাদিনী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ভুবনের মতো নেতার আত্মগোপনের পন্থা বাতলে দিচ্ছেন, জামায়ের নামে নামকরণ করছেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে নিখুঁত চিত্রনাট্য রচনা করছেন। ময়নাকে দেওয়া বিবরণে আমরা তার প্রমাণ পাই,–''ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস''। ভুবনকেও তার নাম মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি,– ''আপনার নাম হইল জগমোহন''।

গল্পের আরো একটি দিক আছে এবং ময়নার মার আরো একটি রূপ আছে। পূর্বে আমরা দেখেছি ময়নার মা ভুবনকে পুলিশের এবং চণ্ডী ঘোষালের লোকজনের হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু যখন আসল জামাই এসে উপস্থিত হয়েছে অর্থাৎ ময়নার স্বামী জগমোহন উক্ত ঘটনার কথা শুনে তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে তখন ময়নার মার সেই বিদ্রোহী সত্তা যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে। এখানে তার মাতৃসত্তা প্রকট হয়ে পড়েছে। সত্যিকারের মানুষের জীবনও তো তাই। সমগ্র জীবনের বিভিন্ন অংশে মানুষ বিভিন্ন আচরণ করে থাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিকারের মানুষ আঁকতেই চেয়েছেন মায়নার মাকে। যে ময়নার মা গোটা গ্রামের সামনে নিজের বুদ্ধি এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছে সেই আবার মেয়ের মুখ চেয়ে জামাইয়ের সামনে ম্লান হয়ে পড়েছে। ''পুরুষকেন্দ্রীকতার দাপটে নারীর না আছে কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস, না আছে স্বাভাবিক সংহতি। সমাজের অন্য সমস্ত নিপীড়িত বর্গের মতো নারী সহজে কোনো সংঘ গড়তে পারে না। তার কারণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিন্নতা লৈঙ্গিক পীড়নের সত্যকেও ঝাপসা

করে দেয়। পুরুষের প্রাধান্যকে প্রত্যাহ্বান জানানোর মতো ভাবাদর্শগত ভিত্তি নারীর কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। এই জন্য যুগযুগ ধরে পুরুষের প্রাধান্য এবং নারীর অবদমন স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহিত হয়ে এসেছে এবং নারীর মনেও ইতিহাসের নতুন পাঠ তৈরির জন্যে কোনো বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। নারীর তুলনামূলক হীনতা প্রকৃতি নির্দিষ্ট বলে সবাই মেনে নিয়েছে। সাম্য স্বাধিকারের প্রশ্ন উঠলেও তা সমবেদনা-প্রবণ পুরুষের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল থেকেছে এবং নারীসত্তার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো প্রকৃত প্রতিবেদন গড়ে ওঠেনি''। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন পাঠ তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছন। পুরুষতন্ত্রের হাত থেকে রাস কেড়ে নিয়ে অতি সাধারণ এক নারীর হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন পুরুষকে বাঁচানোর। ''পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগদিগন্তে, দুপুরের আগে হাতিপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে! এমন তামাশা কেউ কখনো করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে''। যে কিনা পুলিশকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে সে জগমোহনের কাছে হার মেনে যাবে? প্রথমে সে খুব ঠাণ্ডা মাথায় জামাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু তার জেদের কাছে পরাস্ত হয়ে নিজ মূর্তি ধারণ করতে অপেক্ষা রাখেনি। শেষ পর্যন্ত জামাইকে বলে বসে,– ''তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাবো''। লেখক অত্যন্ত নিপুণ দক্ষতায় পাঠকৃতি তৈরি করেছেন। নারীর বিদ্রোহী এবং কোমল রূপকে পাশাপাশি রেখে একটা জ্যান্ত ময়নার মা তৈরি করেছেন। '' বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা সারাদিন পরে এখন তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারে সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই!''

গ্রন্থপঞ্জী :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক: 'লেখকের কথা', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-১৯৫৭

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক: 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র ৬', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা

৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর : 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সংস্করণ-২০০৬

৪. সেন, সুকুমার: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত- ৫' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫

৫. দাস, বেলা ও চৌধুরী, বিশ্বতোষ : 'বাংলা আখ্যানঃ বহুমাত্রিক পাঠ', রত্নাবলী, কলকাতা।

৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর : 'সময় সমাজ সাহিত্য', এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, ২০১০

৭. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন : 'সাহিত্য প্রকরণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৩

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত : 'গল্প নিয়ে উপন্যস নিয়ে' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

‘আগুনপাখি’: দেশভাগের কালে দেশভাগের মন

ড. মনুয়া পাঁজা
সহকারী অধ্যাপিকা, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, কেশিয়াড়ী

সারসংক্ষেপ

দেশভাগের মতো মানুষের হাতে তৈরি এত বড় মানবিক ট্র্যাজেডি আর ঘটেনি। দেশভাগ তো শুধু স্থানিক কিংবা আঞ্চলিক ভাগ নয়, ভাগ হয়েছিল লক্ষ মানুষের মন। হাসান আজিজুল হকের লেখা উপন্যাস ‘আগুনপাখি’ সেই দেশভাগের কালের মনের কথা। বিশশতকের প্রথমদিকের সময় থেকে ১৯৪৭ পেরিয়ে প্রসারিত ‘আগুনপাখি’র গ্রামীণ প্রেক্ষাপট। ইতিহাসের তথ্য কিংবা তত্ত্ব ভার নেই। দেশভাগের কালে পালিয়ে বেড়ানোর ভিড়ে, মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা নারী মনের কথা আছে স্মৃতির ঘনিষ্ঠ নিবিড়তায়। আর তার সাথে জড়ানো লেখক হাসান আজিজুল হকের ব্যক্তি জীবন-অনুসঙ্গ। উপন্যাসের কথক বা প্রটাগনিস্ট চরিত্র লেখকের মায়ের আদোলে। তাঁর মুখের ভাষাতেই উপন্যাসের নির্মাণ। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে মা ও তাঁর মতো হাজার নারীর অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁদের যে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের নারীতে সেই নির্মাণ। গ্রামের সম্পন্ন মুসলমান ঘরের মেয়ে এবং আরও সম্পন্ন ঘরের বউ হয়ে সংসারের এককোণে থেকেও আত্মবিকাশের পথ পেয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সোপান কিন্তু তার স্বামী। অথচ অজস্র সম্ভবনা নিয়েও সেই মানুষটা নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাতে পারেনি। মুসলমানের জন্য নতুন রাষ্ট্রে যাওয়ার স্রোতে ভিড়েছেন। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমানের আলাদা দেশের কথা মানতে পারেনি সেই মানুষটা। দেশভাগের মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে তার কাছে। স্বামী, সন্তান সকলে তাকে ছেড়ে গেছে পাকিস্তানে। এদেশের মাটি আঁকড়ে একা থেকেছে মানুষটা। একা

হয়েও নতুন করে জেগে থাকার দৃঢ় প্রতিরোধ তার চেতনায়, বিচ্ছেদ পেরিয়ে আকাঙ্ক্ষা-মিলনের।

মূলশব্দ

দেশ, দেশভাগ, মানুষ, মন, অস্তিত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রতিরোধ।

মূল আলোচনা

দেশভাগ; ‘‘ইতিহাস যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে এই বিশাল মানবিক দুর্ঘটনের সামাল দিতে না পেরে। ..... দেশভাগ, বিশেষত বাংলাভাগ, আমাদের কাছে এখনও ‘পালানোর, পালানোর, আরো পালানোর’ স্মৃতিই রয়ে গিয়েছে। .....এই উপমহাদেশের বুকে মানুষের হাতে তৈরি এত বড় মানবিক ট্র্যাজেডি আর ঘটেনি, সীমান্তের দুই দিকেই উনিশশো সাতচল্লিশের অভিঘাত আমরা সমাজ-রাজনীতিতে প্রত্যহ বয়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও ধ্বংসের মধ্যদিয়ে, কোথাও নির্মাণের মধ্যেই, তবু আজও দেশভাগের বিষয়ে বিশদ কিংবা গভীরভাবে জানতে চাইলে সহায়তা মিলবে আশ্চর্য রকম কম।’’[১] আসলে দীর্ঘ সময় দেশভাগের ইতিহাস স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা এসবের সাথে জড়ানো ‘হাই পলিটিক্সের’ আলোচনা ছিল। কিন্তু দেশভাগ তো শুধু স্থানিক কিংবা আঞ্চলিক ভাগ নয়, ভাগ হয়েছিল লক্ষ মানুষের মন। তাই প্রয়োজন ছিল ‘পিপল’স হিস্টরি’। নব্বই-এর দশক থেকে সাবল্টার্ন স্টাডিজ চর্চার অভিমুখ বদলালো। মানুষের ভাবনা, স্মৃতিতে খোঁজ চলল। যদিও এসব কিছু ব্যক্তিনির্ভর, নিরপেক্ষনয়, তবু চেতনার নির্মাণ তো ঘটেই। সিনেমা, সাহিত্যও স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পায়। সেদিনের সেই সব–হারানোর, লাঞ্ছনার, অবমাননার কাহিনি ছড়িয়ে থাকে এসবের মধ্যে।

হাসান আজিজুল হকের লেখা উপন্যাস ‘আগুনপাখি’র গুরুত্ব এখানেই। ইতিহাসের তথ্য কিংবা তত্ত্বভার নেই। দেশভাগের কালে পালিয়ে বেড়ানোর ভিড়ে, মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা নারী মনের কথাগুনি এখানে স্মৃতির ঘনিষ্ঠ নিবিড়তায়। উপরন্তু তার সাথে জড়িয়ে থাকে লেখক হাসান আজিজুল হকের ব্যক্তি জীবন-অনুসঙ্গ। তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহুকুমার যবগ্রামে। ১৯৩৯-এ। স্কুল ফাইনালের পর তিনি চলে যান তাঁর দিদির কাছে খুলনা জেলা শহরে। তখন থেকেই

তিনি ওপার বাংলার বাসিন্দা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। থাকেন রাজশাহীতেই। এই ব্যক্তিজীবন 'আগুনপাখি'র ভিত্তি এবং প্রেরণা। "আমার যে ফেলে আসা বসতবাড়ি, শৈশব-তারুণ্যের স্মৃতি, পারিবারিক-সাংসারিক চালচিত্র, রাঢ়ের গ্রাম্যমুসলমান গৃহস্থপরিবারের উত্থান-পতন, মা-বাবার কথা, দেশভাগের নির্মমতা, সাধারণ মানুষের ওপর এর অভিঘাত – এইসব কিছু প্রেক্ষাপটে রেখে একটি উপন্যাস আমার লেখা উচিত। এভাবেই আগুনপাখি লেখার শুরু।"[২]

উপন্যাসের কথক বা প্রটাগনিস্ট চরিত্র লেখকের মায়ের আদোলে। তাঁর মুখের ভাষাতেই উপন্যাসের নির্মাণ। লেখকের মতে, ভাষাটা শুধুই রাঢ় বাংলার আঞ্চলিক ভাষানয়। "এটা আদতে আমার মায়ের মুখনিঃসৃত ভাষা।.....তিনি যেভাবে কথা বলতেন, সেই বাকভঙ্গিতে আমি লিখেছি। তাঁর দেহভাষা, তাঁর ব্যবহৃত বুলি – এইসব ধরার একটা প্রচেষ্টা ছিল।"[৩] বলেন, "মা ছাড়া আমি তো নই। কিন্তু রাঢ়বঙ্গের একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে ছেলেমেয়েদের কাছে মা ছিলেন নেহাতই একজন মিসিং পারসন। .....এইরকম প্রেক্ষাপটে, দেশ-কালের বাঁধনগুলো ঝোড়ো হাওয়ার মুখে যখন ভেঙে পড়ছে, তখন একজন নিঃসঙ্গ নারীর - যিনি বিরাট এক সংসারের মধ্যে থেকেও একা – তাঁর মনে কী ঘটে যাচ্ছে, তা আমরা কেউ জানতে চাইনি। আগুনপাখির মাধ্যমে আমি দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মা ও তাঁর মতো হাজারো নারীর অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। তাঁদের যে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি।"[৪]

'আগুনপাখি'র প্রকাশ ২০০৬ সালে, 'একটি নির্জলা কথা' নামের একটা ছোটগল্পে এই উপন্যাস ভাবনার বীজ ছিল। ২০০৫-এ উপন্যাসের অর্ধেক অংশ 'অপরূপ কথা' নামে 'প্রথম আলো' পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বছর সন্ধানী প্রকাশনী থেকে 'আগুনপাখি' নামে সম্পূর্ণ উপন্যাস। দৈনিক 'প্রথম আলো' এইউপন্যাসকে১৪১২-র বর্ষসেরা বইয়ের স্বীকৃতি দেয়। ২০০৮-এ এই উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার পান হাসান আজিজুল হক।

দেশভাগের ফলে নারী সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। ঘর ঘরস্থালির ধরন -ধারণ বদলায়, ঘরমুখী নারী বাইরের জীবনে পা রাখে, উপার্জনক্ষম হতে চায়।

পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্কের সমীকরণ বদলায়। খুব মনে পড়ে 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা কিংবা 'মহানগর'-এর আরতিকে।তবেএগুলো মূলত শহরের ছবি।কিন্তু কলকাতা থেকে দূরের গ্রামগুলোতেও বদলের প্রক্রিয়া ছিল। সেখানেও প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে ছায়া ফেলেছিল দেশভাগ। সেই জীবনটাও বিপর্যস্ত, বিপন্ন হয়েছিল। সেইকথা 'আগুনপাখি'-তে।

বিশশতকের প্রথমদিকের সময় থেকে ১৯৪৭ পেরিয়ে প্রসারিত 'আগুনপাখি'র গ্রামীণ প্রেক্ষাপট। দেশভাগের মতো একটা মহাবিপর্যয়ের ঘটনাকে 'সিগনিফায়েড' করে এমন একটা মানুষ লেখক তৈরি করলেন যে, কখনও হারে না। প্রতিকূলতা থেকেও জাগতে পারে। গ্রীক পুরাণের ফিনিক্স পাখি যেমন নিজেকে পুড়িয়ে মারে আগুনে, তারপর আবার তার নতুন জন্ম হয়। 'আগুনপাখি'র নারী কিন্তু নিম্নবর্গের নারী নয়। গ্রামের সম্পন্ন মুসলমান ঘরের মেয়ে এবং আরও সম্পন্ন ঘরের বউ। যদিও নারীর বয়ান হিসেবে তার কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষেরই। নামহীন সেই নারী তার জীবনের গল্প শোনায়। পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে, দেশ-কালের কথা মিশে যায়তার জীবনের সাথে। একটা ভাঙনের কালে একা জেগে থাকা নারীর গল্প শুনি উপন্যাসে।

মেয়েবেলার কথায় শুরু হয়মেয়ে জীবনের গল্প। অজানা রোগে মা মারা যায়। বাবা আবার বিয়ে করে। একমাত্র ছোট ভাই সারাক্ষণ 'কাঁকালে পুঁটুলি'র মতো থাকে। এক দাদি খুব ভালোবাসত। নতুন মায়ের খোকা হওয়ার পর মামারা এসে ভাইকে নিয়ে গেল মানুষ করবে বলে।সে রইল বাপের সংসারেই। তারপর কখন নিজের অজান্তেই হঠাৎ বড় হয়ে গেল। পাঠশালা তো কোনদিনই যায়নি। "বাপজি যেতে দেয় নাই। মেয়ে আবার পাঠশালা যেয়ে ল্যাখাপড়া শিখে কি করবে?"[৫] চোদ্দ পনেরো বছরে বিয়ে হল দ্বিগুণ বয়সের ছেলের সাথে। সেকালে এই 'পরম ভাগ্য!'

'আগুনপাখি'র নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সোপান কিন্তু তার স্বামী। অথচ অজস্র সম্ভবনা নিয়েও সেই মানুষটা কিন্তু নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাতে পারেনি। মুসলমানের জন্য নতুন রাষ্ট্রে যাওয়ার স্রোতে ভিড়েছে। পুরুষতন্ত্রকে পরিশীলিত, সংশোধন করেও শেষপর্যন্ত পুরুষতন্ত্রের গন্ডির বাইরে বেরোতে পারেনা। আর সংসারের এক

কোণে থেকেও নারীটি আত্মবিকাশের পথ পেয়ে যায়। তার অক্ষর পরিচয় হয়েছিল স্বামীর চেষ্টাতেই। স্বামীকে ঘিরে অদ্ভুত মুগ্ধতা ছিল!সংসারের কর্তা স্বামী। গিন্নি শাশুড়ি। বড় সংসার, বড় বংশ। স্বামী, সংসার নিয়ে মনে মনে তার বেশ গর্ব। সংসারে তার আদরও ছিল। এ সংসারে বউ হয়ে আসার পর থেকে সংসারেরবাড়-বাড়ন্ত হয়েছে। সেইসংসারের ঘানিতে জুড়ে গেল মেজ বউ। "হ্যাঁ সেই যি ঘানি টানতে লাগলাম, সারা জেবন একবারও আর থামতে পারলম না। ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। শুদুই হুকুম তামিল করা। অ্যাকন মনে হয়, জেবনের কুনো কাজ নিজে করি নাই, নিজের ইচ্ছা কেমন করে খাটাতে হয় কুনোদিন জানি নাই। আমি কি মানুষ, না মানুষের ছেঁয়া? তা-ও কি আমার নিজের ছেঁয়া?"[৬] সংসারের সুখ ভালো লাগে আবার নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নও জাগে।

উপন্যাসের প্রথম দিকের পারিবারিক গল্প ক্রমশ পৌঁছে গেল দেশ, সমাজের কথায়। দেশ-কালের কথা মিশে যায় মেজ বউয়ের জীবনের গল্পের সাথে।

হিন্দু–মুসলমানের দাঙ্গা লাগে। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নেমেছিল, কিন্তু তারা নিজের নিজের দাবি নিয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি-কাটাকাটি করেছে। আর তাতে ব্রিটিশদেরই পোয়াবারো। মেজ বউয়ের মনে হয় হিন্দু-সলমানের ধর্মে ধর্মে তো অনেক তফাত আছেই, কিন্তু বিভেদ কেন? উপন্যাসে ধর্ম আচরণের তেমন কোনো ছবি নেই। শুধুই মুসলমান পরিবারের জীবনের ছবি। ধর্মীয় বিভেদের চেতনা নেই। বিয়ের পর হিন্দু কত্তামা এক গা গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু একবারও তার গায়ে হাত দেননি।তখন চোদ্দ বছর বয়সেও নেহাত মজার ঘটনাই মনে হয়েছিল, আর কিছু নয়। সেই ভাবনাই ক্রমপ্রসারিত হয়েছিল পরবর্তীতেও।

স্বাধীনতার জন্য হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে জেল, জরিমানা, ফাঁসিসব কিছুকে উপেক্ষা করে। ইংরেজ না তাড়িয়ে তারা ফিরবে না। সেই খবর কাগজে-কাগজে। তার খোকার বয়সী একটা মেয়ে বন্দুক চালিয়ে ইংরেজ মেরেছে, তারপর ধরা পড়ে যাবে ভেবে বিষ খেয়ে মরেছে। তার খোকাও শহরে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। স্কুলের ছেলেদের সাথে আইন অমান্য করতে রাস্তায় নেমেছিল সে।

বাড়িতে একদিন মোটা কাপড় এল পরার জন্য। কত্তাদের জন্য মোটা খদ্দর। কেউ আর বিদেশের কোন জিনিস ব্যবহার করবে না। ব্রিটিশদের জিনিস সব ডাঁই করে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। সকলের জন্য মোটা ভাত, কাপড়।

'আগুনপাখি' গ্রাম বাংলার দৈনন্দিনের গল্প। তাই প্রতি দিনের অসুখ-বিসুখ, মৃত্যুতার পর আবার জীবনের চলমানতার ছবি থাকে। গ্রামে হাজার রকমের অসুখ-বিসুখে কত লোক মরত প্রতিদিন। কত রকমের অসুখ – ঝি-বউদের সূতিকা রোগ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পুঁয়ে লাগা রোগ, তাছাড়া হুপিং কাশি, হাঁপানি, বাতাস লাগা, বাণ মারা, কুট রোগ, ক্ষয় কাশি। কলেরা আর বসন্তে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। একটার নাম মা-শেতলা, আরেকটা ওলা বিবি। রোগ-বালাই-মৃত্যু থেকে মেজ বউ এর পরিবারও বাদ পড়েনি। অনেকেই অকালে গেছে। তবে সান্নিপাতিক জ্বরে বড় খোকার চলে যাওয়াটা শূন্যতায় ভরে দিয়েছিল। তবু জীবন থেমে থাকে কই?

একটা সংহত সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন থাকে উপন্যাসে। কত্তা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। হিন্দু-মুসলমান 'সক্কলেরই নয়নের মণি'। কত লোকের কত বিচার, কত বিধান করে কত্তা। গ্রাম থেকে স্টেশনে যাবার রাস্তা করল। হিন্দু পাড়ায় আগুন লেগে আদ্দেক গাঁ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কত্তা হাত জোড় করে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে অবস্থাপন্ন চাষি গেরস্তদের কাছে বাঁশ-খড়-কাঠ চাইল। চারিদিকে ধন্য ধন্য হল। 'একটো মানুষের মতুন মানুষ বটে!'

চল্লিশের দশকের আগুন সময়কে দেখাল 'আগুনপাখি'। যে সমাজ গড়ার স্বপ্ন ছিল, তার ভাঙনের কাল এল। সারা দুনিয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজে 'বিটিশ' আর 'জারমেনি' নাম দুটো চোখে পড়ত। উড়োজাহাজ, বোমা, বন্দুক, মানুষের মৃত্যুর খবর থাকত। 'তামাম দুনিয়ার সব্বোনাশ' হচ্ছে। বছর তিনেক পেরিয়ে যুদ্ধের ফল শুরু হল গ্রামে। আকাল এল। তাঁত বন্ধ। সুতো নেই। তাঁতিরা সব 'পেটে কাপড় বেঁধে' বসে আছে। চারিদিকে হাহাকার। কাপড় নেই। মেয়েরা 'ন্যাংটো' থাকছে। ঘরের বাইরে বেরোচ্ছে না। কাপড় চুরি হচ্ছে। কাপড় নিয়ে ঝগড়া-মারামারি-তুলকালাম। একদিন শোনা গেল, "ছায়রাতুন বিবির লাতিনি মেয়েটি

– এখনো বিয়ে হয় নাই, সোমত্ত মেয়ে – সেই মেয়ে ন্যাংটো হয়ে ঘরে বসে আছে। …বুড়ি লিকিনি বলেছে, নিজের শাড়িটি লাতিনিকে দিয়ে…সে ন্যাংটোই ঘুরবে।''[৭] যুদ্ধ বাড়ির মধ্যে ঢুকল। গ্রামে মিলিটারিদের অ্যারোডম, রাস্তায় তাদের জিপ, অনবরত সাইরেন। ছারখার করে দিচ্ছে এলাকা। যেমন খুশি খাচ্ছে, ভাঙছে, মারছে, মেয়েদের সাথে লাম্পট্য করছে! যুদ্ধ-আকালের জুড়িদার হয়েও লাউটো কলেরার মহামারী এল। অনেক লোক মরল। তারপর কেরোসিন, কয়লা, নুন, ট্যানাকাঠি, চিনি সব অমিল। সব জিনিস দুর্মূল্য। গ্রামের দোকান বন্ধ। গ্রামের মানুষের কিনে খাবার পয়সা তো কোনদিনই নেই, ধানটুকু ভরসা। এখন কোন আশাই নেই। ভাতের আকাল শুরু হল! তারমধ্যেই বৃষ্টি-বন্যা। মাঠশূন্য, একদানা ফসল নেই কোথাও। কোথাও কিছুই নেই! মানুষ দলে দলে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়, গ্রামে গেলে নাকি কাজ পাবে। ভিটে মাটি ছেড়ে ভিক্ষে করতে বেরোয়। ন্যাংটো মেয়ে-পুরুষ অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, ''সব ভূতের মতুন, সব ছেঁয়া ছেঁয়া। ভাত নাই, কাপড় নাই – জেবনটা এসে ঢুকেছে পেটের চুলায়।''[৮]

ভাঙনের খেলা সর্বত্র। ''সংসারের ভেতরটা এইবার তাকিয়ে দেখতে প্যালম আর সংসারের মধ্যে মানুষ কি, তাও দেখলম। কুকুর-বেড়ালের ছেঁড়াছেঁড়ি দেখে রাগ করি কিন্তুক মানুষ কুকুর– বেড়ালের চাইতে কিসে ভালো? মূলে টান পড়লে সবাই সমান। সেই মূল হচে প্যাট।..... এই দ্যাশে সেই মূলের নাম হচে ধান।.....ঐ জিনিসটার অভাবেই সব ছত্রখান হয়ে গেল।''[৯] মেজবৌয়ের পরিবারও ভাঙল। শাশুড়ি মারা গেছে। ননদের হাতে ভাঁড়ার। কিন্তু ভাঁড়ার শূন্য। সংসারে লক্ষী নেই, শান্তি নেই। ভাইয়ে-ভাইয়ে, বউ-বউয়ে অশান্তি, ঝগড়া, মারামারি। 'ভাইভাই, ঠাঁইঠাঁই, সবাই পেথগন্ন হলো।' কত্তা সব বিলি ব্যবস্থা করে দিল।

'এত খুন, এত লউ, মানুষ মানুষের কাছে আসছে খুন করার লেগে।' যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে কিন্তু মুসলমানদের জন্য আলাদা একটা দেশের কথা চলছে কয়েক বছর থেকে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা লেগেছে আবার। খবরের কাগজের পাতায় শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে, ফজলুল হকের নাম। জিন্না, নেহেরু, গান্ধী, প্যাটেল এই নাম

গুলোও থাকে, শোনাও যায়। এছাড়াও নাজিমুদ্দিন, লেয়াকত আলী, সোরবর্দী, আবুল হাশিম এইসব নেতাদের নাম। মেজ বউ জানতে চায়, মুসলমানের 'আলেদা দ্যাশ ঠিক কী কথা?' ''সেই দ্যাশ হলে সব মোসলমান সিখানে বাস করবে? কেউ তার বাইরে থাকবে না?''[১০] কত্তা বলে এক দেশে সব মুসলমানকে রাখা যায় না। ''তবে? আলেদা দ্যাশের কথা ক্যানে? আমাদের এই দ্যাশের মোসলমানকেই যেদি একটা দ্যাশের মদ্যে রাখতে না পারে তাইলে উকথা হচে ক্যানে?''[১১] এ প্রশ্নে কত্তাও নিরুত্তর। ''.....খালি মনে হতে লাগল মোসলমানদের দ্যাশ হবে অথচ সব মোসলমান সিখানে থাকবে না, এমনও হতে পারে যি আমি থাকব কিন্তুক আমার সোয়ামি ছেলেমেয়ে থাকবে না। তাই যদি হয় তাইলে ই কাজ করতে যেয়ে হিঁদু-মুসুলমান সম্পক্ককে বিষ বিষ করতে হবে ক্যানে?''[১২]

ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে পেরিয়ে যেতে চায় মানুষটা। কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের হিড়িকে কাটা পড়ে রায়েদের বড় ছেলে সত্য। রায় গিন্নির কাছে যায় মেজ বউ। ''আমার এমন ইচ্ছে হলো যেন সব ভুলে এই মানুষটাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। মনে হলো সে-ও যেন হাত বাড়িয়ে আছে। এত ইচ্ছে, তবু যেতে কি পারলম? তখনি মনে হলো, যেতে যি পারছি না, তার কারণ তো আমি মোসলমান আর রায়গিন্নি হিঁদু! এক হিদুঁ মায়ের পুতকে মারছে একজনা মোসলমান আবার এক মোসলমান মায়ের পুতকে মারছে একজনা হিদুঁ। আঃ হায়রে! মানুষ লিকিন বুদ্ধিমান পেরানি।''[১৩] মাতৃত্ব দিয়ে কাঁটাতার পেরোতে চায় মানুষটা।

বিভেদের নারকীয় উল্লাস চারদিকে। 'পাকিস্তান হাশিল করতেই হবে।' সব গোলমাল হয়ে যেতে থাকে মানুষটার। টানাপড়েন চলে মনের মধ্যে। তাহলে কি এতদিন সব মিথ্যে ছিল? হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কি লোকদেখানো আদিখ্যেতা ছিল? কত্তামা যে গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল, বলেছিল কত্তা তার বড় ছেলে, বড় খোকা মারা যাওয়ার পর ভচ্চায্যি কত্তার গলা জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছিল এসব কি মিথ্যে? হিন্দুরা মুসলমানকে কাটছে, মুসলমানরা হিন্দুকে। দিন-রাতের মতো যেন ভাগ হয়ে গেছে হিন্দু-মুসলমান। কত্তা যে এত জ্ঞানী, সেও চুপ। কত্তাকে মারবার জন্যও ব্যবস্থা হয়েছে। চারদিকে দাঙ্গার খবর। মউকুমা টাউনের চামড়া ব্যবসায়ী

ইসুফ মিয়ে, ছাত্র আজরাইল এদের সব কেটে কুচি কুচি করা হয়েছে! মুসলমানরা সেজেছে গ্রামের হিন্দুদের কেটে সাফ করার জন্য। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানমরছে।কলকাতার রাস্তার ড্রেনে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত। মানুষের রক্ত। এক রক্ত।

ইংরেজরা যা চেয়েছিল তাই হলো। হিন্দু-মুসলমান দুই জাতকে চিরদিনের মতো একে-অপরের শত্রু করে দিল। জিন্না, নেহেরু ক্ষমতার লোভে ইংরাজদের কাজ হাসিল করল। প্যাটেল, শ্যামা মুখুজ্যের ইচ্ছাও তাই ছিল। গান্ধী একঘরে। কত্তাই এসব কথা জানাল। দাঙ্গা কমল আস্তে আস্তে। "দাঙ্গা তো জেবনের লিয়ম নয়, শান্তিই জেবনের লিয়ম।"[১৪] দেশ স্বাধীন হল। দুশো বছর পর ব্রিটিশ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে দেশটাকে দুভাগ নয়, তিনভাগ করে। যেখানে হিন্দু বেশি সেইসব জায়গা নিয়ে হিন্দুস্তান, বেশি মুসলমানদের জায়গা নিয়ে পাকিস্তান। আর বাঙালি মুসলমানদের জন্য পুব-পাকিস্তান। কত্তা বলে, "তুমি যদি মুসলমানের হিশেব করো, তাহলে তোমাকে এই দেশ ছেড়ে দিতে হবে– এ দেশ আর তোমার নয়, তোমাকে যেতে হবে পুব পাকিস্তান। পুব পাকিস্তানের হিন্দুদেরও চলে আসতে হবে এখানে। হয়তো তোমার এই বাড়িতে আসবে কোন হিন্দু গেরস্থ।"[১৫] – "কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।"[১৬]

প্রাথমিকভাবে দুটো দেশের হওয়া না-হওয়াতে তেমন কিছু বোঝা যায়নি গ্রামের দিকে। মনে হয়েছিল অকারণ এত রক্তগঙ্গা বইল! কিন্তু বছর দুই-তিনেকের মধ্যেই আবার ভয়ানক মারামারি-কাটাকাটি শুরু হল। বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি-সোনাদানা সব লুটপাট করে মানুষকে ভিটেছাড়া করা হচ্ছে। শহরে-গঞ্জে-ট্রেনে-স্টিমারে মানুষ মেরে গাদা করা হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ এদেশ থেকে ওদেশ যাচ্ছে আর ওদেশ থেকে এদেশে আসছে। এদেশ থেকে কতজন যাচ্ছে সেটা বোঝা না গেলেও ওদেশ থেকে সর্বস্ব হারিয়ে বহুমানুষ এদেশে চলে আসছে। কলকাতা স্টেশনে মানুষের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই। তারপর দুইদেশের মধ্যে যাতায়াতও আর আগের মতো সহজ থাকল না। সরকারি পাসপোর্ট ছাড়া যাওয়া-আসা হয় না। 'দুটি আলাদা দ্যাশ হয়েছে বটে!'

এদেশের মুসলমানরা পাকিস্তানে যাচ্ছে, তেমন মানুষটা দেখেনি। কিন্তু বড়লোক অবস্থাপন্ন মুসলমানদের মধ্যে একটা ঢল নামল পাকিস্তানে যাওয়ার। বড়খোকার চাকরি পাকিস্তানে। জামাইয়ের চাকরিও ওখানে। তাই মেয়েও সেখানে। মেজখোকাও গেল বোনের কাছে, ছোটখোকা বড়খোকার কাছে। "ভালো হলো কি মন্দ হলো, সিকথা আমি বলতে পারব না, শুদু জানলম আমার সবখালি হলো, সাথে আর কাউকে পাব না। এই খালি সংসারে একা বসে থাকব। কথাটো কি ভুল হলো আমার? কত্তা তো আছে এখনো! তবে খুব ভুল বোধায় লয়। কত্তা কি আছে আমার? ভেতরে ভেতরে তা মনে হয় না!"[১৭]

না, মেজবউয়ের ভুল হয়নি। কত্তা একদিন বলল, হিন্দুর দেশ, মুসলমানের দেশ এমন কথা আর নেই। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান সবাই মেনে নিয়েছে। ছেলেমেয়েরা সবাই ওদেশে থিতু হয়েছে। 'আমরাও তাহলে ওদের কাছে চলে যাই।'

"মাথায় আমার বাজ পড়ল। ...আমি কোথা যাব? ...মরে গেলে কোথা যাব তা জানি, কবরে যাব, ...কিন্তুক ইদ্যাশ ছেড়ে কোথা যাব আমি কিছুতেই ভাবতে পারলম না। ...বুঝিয়ে দিলেই আমি যাব, যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাব। ওটা মোসলমানের দ্যাশ আর এটো হিঁদুদের দ্যাশই কথা বলে আর কেউ আমার কাছে পার পাবে না। উযি মিছে কথা, উযি শয়তানদের কাজ তা অ্যাকন মনে মনে সবাই জানছে।"[১৮]

কত্তা ওদেশে ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিদের সাথে থাকার কথা বলে। মেজবউ নিজের কথা বলে। তারা সেখানে গেছে নিজেদের জীবনের জন্য। 'আমরা সিখানে যেয়ে কিছুতেই জোড় মিলব না।' চারাগাছ একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় লাগালে হতে পারে কিন্তু 'বুড়িয়ে যাওয়া গাছ ভিনমাটিতে বাঁচেনা'। কত্তার কর্তৃত্ব, পৌরুষ, আস্ফালন, ছেলেমেয়ের অনুরোধ, চাপ কোনকিছুই মানুষটাকে টলাতে পারে না। নিজের কথা বলার জোর সে পেয়েছে, নিজের কথা শিখতে পেরেছে এতদিনে। কেন সে দেশান্তরী হবে কেউ তাকে বোঝাতে পারেনি। একসময় সবাই চলে গেছে। 'আর কেউ নাই, এইবার আমি একা।' শুধু কবরের ভেতর ঘুমিয়ে আছে তার সেই

খোকা। সে কোনদিন যাবে না। একদিন মেজবউ তার পাশে গিয়ে ঘুমোবে চিরকালের জন্য।

মানুষটা উপলব্ধি করেছে, "আমি আমাকে পাবার লেগেই এতকিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। আমি সবকিছু শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি।"[১৯] কেউ তাকে বোঝাতে পারেনি কেন গোঁজামিল দিয়ে আলাদা দেশ করা হয়েছে? মুসলমানের দেশে যদি হিন্দু খিস্টান থাকতে পারে তাহলে আলাদা কীসে? মুসলমান বলেই সে দেশটা তার, আর এদেশটা তার নয় কেন? কেন তাকে ছেলেমেয়েদের সাথে অন্যদেশে যেতে হবে? তার স্বামী গেলেই বা সে কী করতে পারে? তার স্বামী আর সেতো 'একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ।' আপন হলেও আলাদা। তার বিশ্বাস নতুন সকালে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সে ঠিক উঠে দাঁড়াতে পারবে। "আমি একা। তা হোক, সবাইকে বুকে টানতেও পারব আমি। একা।"[২০]

দেশভাগের কালে একা মানুষের, একা নারীর এই জেগে ওঠা দৃঢ় প্রতিবাদী মনের কথাই তো শোনাতে চেয়েছিলেন হাসান হাজিজুল হক! সে মনবিভেদ পেরিয়ে মিলন-পিয়াসী।

তথ্যসূত্র:

১। ঘোষ সে., (আগস্ট২০১৪) দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা, কলকাতা,গাঙচিল, পৃ ৯-১০
২।https://www.prothomalo.com
৩।https://www.prothomalo.com
৪।https://www.prothomalo.com
৫। হক হা., (ডিসেম্বর ২০২১) আগুনপাখি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ ২০
৬। ঐ, পৃ ২৯
৭। ঐ, পৃ ১৩৬
৮। ঐ, পৃ ১৮২
৯। ঐ, পৃ ১৯১
১০। ঐ, পৃ ২১৪
১১। ঐ, পৃ ২১৫

১২। ঐ, পৃ ২১৫-২১৬
১৩। ঐ, পৃ ২১৯
১৪। ঐ, পৃ ২৩১
১৫। ঐ, পৃ ২৩২
১৬। ঐ, পৃ ২৩৩
১৭। ঐ, পৃ ২৪০
১৮। ঐ, পৃ ২৪৩
১৯। ঐ, পৃ ২৫২
২০। ঐ, পৃ ২৫২

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

প্রাচীন বঙ্গের লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি

মাধব বর্মন

সহাকারী অধ্যাপক, ম্যানেজমেণ্ট বিভাগ, জে আই এস কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, কল্যাণী

প্রবন্ধসার

চর্যাপদ বাঙালী জীবনের প্রথম সার্থক রুপচিত্রন। লোক সংস্কৃতি মুল আদিম সমাজে এবং তার বিস্তার আধুনিক সমাজ পর্যন্ত। এ যেন এক প্রাচীন অক্ষয় বট। 'চর্যাপদ থেকে ভারত চন্দ্র' এই কাল সীমায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রথা-আচার-বিশ্বাসের অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। সমস্ত আচার-বিশ্বাস নিছক কবি প্রক্ষিপ্ত নয় বা তাৎক্ষনিকও নয়। বাংলা সাহিত্য শুধু নয়, সাংস্কৃতিক জীবনেপ্রথা- আচার -বিশ্বাসের পূর্বসূরীদের সন্ধান এবং মতামত এই রচনায় পেয়ে যায়। ফলে আমাদের বাঙালী সমাজে প্রচলিত প্রথা-আচারের এই আলোচনায় সাহিত্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় ও সহায়ক হবে।

শব্দ সঙ্কেত

লোকাচার, লোক সংস্কৃতি, চর্যাপদ।

মূল আলোচনা

সুপ্রাচীন আর্য ধর্ম চিন্তার আলোকে মহিম্বাবিত প্রাচীন ও মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অনার্য সম্প্রদায়ের অবদান যে কতখানি, এ প্রসঙ্গে যশস্বী পণ্ডিতেরাই একমত। শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন– "এ তথ্য সর্বজন স্বীকৃত যে আর্য-ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্ম কর্ম, শ্রাদ্ধ বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেব দেবীর রূপ কল্পনা, আহার বিহারের ছোয়াছুয়ি অনেক কিছুই– আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতেই

আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান।" এই একই যুক্তি ধারায় অনুসরণে এবারে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোক বিশ্বাসের আলোচনার সূচনাতে প্রথা ও আচার বিশ্বাসের স্বরূপকে বোঝা দরকার। আর সেই জন্যে প্রথমে দেখে নেওয়া যাক প্রথা বলতে কি বোঝায়? সমাজের বাইরের সত্তা যুগ থেকে যুগে নিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজের বাইরের সত্ত্বার এই নিয়ত পরিবর্তনের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে সমাজের আন্তর-সত্তার মূলগত একটি ঐক্য। সমাজ দেহে সঞ্চালিত মানব আচরণের একটি প্রায় স্থায়ী আদর্শের জন্য এই ঐক্য সৃষ্টি হয়। মানব আচরণের এই ঐক্যও সৃষ্টিকারী আদর্শটি হল প্রথা।

প্রাচীনকালে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার আগে ও প্রথাই মানবজীবনের শৃঙ্খলা পরায়ণতার একমাত্র নিয়ন্ত্রক ছিল। সমাজে প্রচলিত প্রথা গুলোকে বিচার করে বলা যেতে পারে একাধারে, ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা, ব্যক্তিগত এবং সেই সঙ্গে গোষ্ঠীগত মঙ্গলকারক। অন্যধারে ঐতিহ্যানুগ হলেও অব নমনীয় নয়, ব্যক্তি নির্ভর নয়, গোষ্ঠী বা আঞ্চলিকতা নির্ভর, মানুষের সার্বিক জীবনেই প্রভাব সৃষ্টি কারক।

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্য বাহিত আনুষ্ঠানিক সার্বিক আচরণ ক্রমই হল লোকাচার। অর্থাৎ যে সমস্ত প্রথা সামাজিক কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সেগুলো কেবল লোকাচার। লোকাচারও এক শ্রেণীর প্রথা। প্রথা, লোকাচার কিংবা সামাজিক অনুশাসন প্রতিটি এক একটি ধারণা। বাস্তবায়িত হওয়ার উপরেই এই ধারণাগুলোর সার্থকতা নির্ভরশীল। কিন্ত যে পদ্ধতিতে উল্লিখিত ধারণা গুলো বাস্তবায়িত হয় তাকে 'কৃত্য' বলে। মানুষের জীবন চক্রের নানা পর্যায়ে কৃত্যের সাহায্যে প্রথা কিংবা লোকাচার মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌনঃপুনিক এবং সুশৃঙ্খল ভাবে ক্রমান্বয়ে ছন্দোবদ্ধ প্রয়োগ রীতিতে কৃত্য মানুষের আচার বিশ্বাসকে মূর্ত করে তোলে।

শুভাশুভ বোধ দ্বারা পরিচালিত মনুষ্য কৃত্য ঘটনায় অনুষ্ঠান। বাঙালী সমাজে উৎসব এবং অনুষ্ঠান কথা দুটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমার্থক হিসাবেই পরিগণিত হয়। কিন্তু সমাজ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এরা কদাচ সমার্থক নয়। অনুষ্ঠানের মত উৎসবেও নানাবিধ লোকাচার কৃত্য যোগে মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সহধর্মিতা সত্ত্বেও গুণগত তাৎপর্য অনুসারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উৎসবের সর্বজনীনতা আবশ্যিক। অনুষ্ঠান অপেক্ষা উৎসবের আয়োজন এবং ব্যাপ্তি ব্যাপকতর। দুর্গাপূজা, নবান্ন, রবীন্দ্র জয়ন্তী ইত্যাদি উৎসব। কিন্তু বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান।

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্য গত বিশ্বাসই হল লোক বিশ্বাস। বিশ্বাস শব্দটির প্রধান কথাই হল প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের পিছনে চুলচেরা যুক্তি ক্ষেপণের সুযোগ্য সীমিত। তাই ঐতিহ্যের ধারায় স্নাত পূর্বসূরীদের অনুসৃত মানস প্রক্রিয়ার অন্ধ অনুসরণ ক্রিয়াকেই আমরা বলি লোক বিশ্বাস। আজও মানুষের জীবনে সীমাহীন অসহায়তা বর্তমান। আর সেই জন্যই এখন ও আমারা কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান না করে ও পূর্বসূরীদের অনুসৃত বিশ্বাস দ্বিধাহীন চিত্তে সত্য বলে মেনে নিই। বিশ্বাস কথাটি ব্যক্তিগত মানসিক প্রক্রিয়ার উপর স্থিতিশীল। ব্যক্তিগত বিশ্বাস সামাজিক নৃতত্ত্বের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই জন্য লোক বিশ্বাস বলতে ঐতিহ্যানুগ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের যুক্তি নির্ভরতাহীন বিশ্বাসকে আমরা বুঝি।

অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চর্যা' সম্বন্ধে যে অভিমতটি দিয়েছেন- "এই পদ গুলিতে সমাজ ও গার্হস্থ জীবনের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে সেকালের ভদ্রেতর সমাজের একটা ছায়া মূর্তি লক্ষ করা যাবে। সে সমাজ ঈষৎ হীন বৃত্তিজীবী অন্ত্যজ সমাজ.....কৌমের জন সাধারণ জীবনায়ন।" প্রাচ্য বিদ্যায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাণ্ডারি ও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই যুগান্তকারী চর্যাপদ সমূহের আবিষ্কার করেন। মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গোষ্ঠীগত অধ্যাত্ম ভাবনার প্রকাশ ছিল চর্যার মূলে। তবু ধর্মের কথাকে অতিক্রম করে, সান্ধ্য ভাষার জটা জলকে ভেদ করে, চলমান জীবনের টুকরো টুকরো ছবি চর্যায় ফুটে উঠেছে। ধরে নেওয়াই যাই চর্যার কবিরা সেকালে বঞ্চিত মানুষদের সাথে জলে মাছের মত মিশে থাকতেন, তাই তাদের জীবন যাত্রার এত নিখুঁত ছবি কবিরা

দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

জীব মাত্রেই পরম কামনা সন্তান লাভ। সন্তান লাভের জন্য প্রাণী চিরকাল সংগ্রাম করে আসছে। সন্তান ধারণ ও লালন পালন জৈব প্রবৃত্তির মত অপরিহার্য মনোবাসনা নয়, তবে প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। নবজন্মের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি ধারা অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্নরূপে চলে আসছে। জীব শ্রেষ্ঠ মানুষ এ ব্যাপারে নানা স্বার্থের সহিত জড়িত। কেবলমাত্র আত্ম রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি নয়, ধন রক্ষা ও মান বৃদ্ধির জন্য ও সে সন্তান কামনা করে। মানব জীবনের সঙ্গে অনেক আচার বিচার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। শিশু যখন প্রথম এই পৃথিবীর আলো দেখে তার আগে থেকেই পৃথিবীর প্রতিকূলেপ্রাকৃতিক পরিবেশে যাতে সুস্থ এবং সবল দেহ নিয়ে লড়াই করতে পারে সেই জন্য তাকে পাথেয় জোগাড় করে দেওয়ার বিষয়ে আমাদের চেষ্টা অন্ত নেই। পৃথিবীতে যে শিশু আসছে তার জন্য আয়োজন, তারপর পৃথিবীতে আলো দেখার অব্যবহিত পরবর্তী কালীন অবস্থা এবং সবশেষে শিশুর কিশোর অবস্থা - এই তিন পর্যায়ে শিশু সংক্রান্ত প্রথা আচারের পরিচয় রাখছি।

পঞ্চামৃত সেবন : পৃথিবীতে শিশুর প্রকৃত আবির্ভাবের আগে যার গর্ভে তার পদ ধ্বনি অনুভূত হয় সেই গর্ভিণীকে ঘিরে পঞ্চামৃত খাওয়ানোর রীতি পালিত হয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকে বঙ্গ দেশে। পঞ্চামৃত খাওয়ানোর দৃষ্টান্ত চোখে পরে-

মঙ্গল চণ্ডীতে : 'পঞ্চামৃত করি সাধু দিলেন তখন।'
পদ্মপুরাণে : 'পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত দিল সখীগণে।।'
মনসা পুরাণে : 'পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত খায় বানিয়ানী।।'
অভয়ামঙ্গলে : 'প্রথমেতে পঞ্চামৃত করিল ভোজন।'
ধর্মমঙ্গলে : 'পাঁচমাসে পঞ্চামৃত সোম ঘোষ দিল।'
ধর্মমঙ্গলে : 'পাঁচ মাসে পৃথ্বী পতি দিলা পঞ্চামৃত।'

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যে দৃষ্টান্ত সযত্নে বুকে ধারণ করে রেখেছে একটু দেখলে নজরে আসে, দই, দুধ, ঘি, মধু এবং চিনি এই পাঁচটি সুখাদ্য ভাবি শিশুর গর্ভ ধারিণীকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে আমরা এই লোকাচারটি পালন করি। তবেএর মধ্যে বিজ্ঞানের আদিম চিন্তা লুকিয়ে নেই তা কি করে বলি? এই বিষয়ে শ্রীধর্মমঙ্গলে

উল্লেখ্য *'পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খেতে হৈল মনস্থির। জন্মিল ছ'মাসে পূর্ণ শিশুর শরীর।।'* লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ঘনরাম এই শ্রীধর্মমঙ্গলে বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তির উপস্থাপনা করেছেন। লক্ষণীয় শিশুর জন্মের ছ'মাসে শিশুকে শক্ত খাবার দেওয়ার আনুষ্ঠানিক রীতি 'অন্নপ্রাশন' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। পঞ্চামৃত সেই অনুষ্ঠানের ভূমিকা স্বরূপ।

সাধ ভক্ষণ : মাতৃগর্ভে শিশুর পূর্ণ কলেবরের অস্তিত্ব– স্পন্দন যখন অনুভূত হয় তখন খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত একটি লোকাচার যা বঙ্গদেশে 'সাধ ভক্ষণ' নামে পরিচিত। জনপ্রিয়তার সাহিত্য সাক্ষ্য বহন করে চলেছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য–

বিজয় গুপ্ত : নানা অলঙ্কার পৈরে গলায়ে হাসলি।
সাধভাত সোনকা খাইল তক্ষনি।।
বিপ্রদাস : পঞ্চ মাসে যখন সনকা গর্ভবতী
হেনকালে পাতনে চলিলা নরপতি।
ছয় সাত অষ্টমাসে আসিয়া প্রবেশে
নয় মাসে ভক্ষ্যদ্রব্য দেই ত হরিষে।
দুগ্ধ গুড় নারিকেল শর্করা নবাত
বিবিধ পিষ্টক সজ্জা করে নান মত।
উত্তম তণ্ডুল গুড়ি দুগ্ধ চিনি দিয়া
দুগ্ধ ফেলি সজ্জ কৈল প্রচুর করিয়া।

সাধ ভক্ষণ অনুষ্ঠানটি আমাদের লৌকিক জীবনের কত মর্মমূলে প্রবেশ করেছে তার একটি দৃষ্টান্ত, "বাংলার বহু অঞ্চলে আশ্বিন সংক্রান্তিতে নানা উপকরণে পূর্ণগর্ভা ধান গাছকে ও সাধ দিবার প্রথা আছে।" লক্ষনীয় বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত হয় চাল থেকে, চাল হয় ধান থেকে। তাই স্বামী যখন স্ত্রীকে সাধ দেওয়ার কথা ভাবে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তাঁদের আপন জনকে গর্ভকালে সাধ দেয়, তেমনি বাঙালী কৃষকরাও তাদের একান্ত আদরণীয় ধান গাছকে পূর্ণগর্ভা হলে সাধ দেয়।

আঁতুড় ঘর : সাধ ভক্ষণের অল্পদিনের মধ্যেই প্রসূতির প্রসবের সময় উপস্থিত হয়। প্রসবকালে প্রসূতিকে শান্তিতে রাখার জন্য একটি নিরিবিলি পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘরকে আঁতুড় ঘর বলে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই প্রসূতি সদনের পর্যাপ্ত উল্লেখ পাচ্ছি।

চর্যাপদ : ফেটলিউ গো মাএ অন্ত উড়ি চাহি।
বিপ্রদাস: কুমারিকা লতায় সুতিকা ঘর বেড়ী
নানা মহোষধিতে গুমুড়ুদ্বারে এড়ি।
মুকুন্দরাম: চাল ফাঁড়ি অগ্নিজালে সূতিকা ভবনে।

সুপথ্যি পাচন : শিশুর জন্মের তৃতীয় দিনে পালনীয় একটি প্রথার পরিচয় জানা যায়। এটির নাম সুপথ্যি পাচন। প্রসূতিকে প্রসবের তিন প্রথম দুই দিন উল্লেখযোগ্য খাদ্য দেওয়া হয় না। তৃতীয় দিনে তাকে সুপথ্য সরবরাহ করা হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মুকুন্দ রাম ছাড়া আর কেউ উল্লেখ করেননি।

মুকুন্দরাম : তিনদিনে নিদয়ার সুপথ্যিপাচন।
ছয়দিনে ষাটিয়ারা কৈল জাগরণ।

প্যাঁচুটা : অনেক ক্ষেত্রে পাঁচ দিনে প্রসূতিকে উঠানে তৈয়ারী আঁতুড় ঘর হইতে বসত ঘরে আনা হইত। এই উপলক্ষে নাপিত নখ কাটিয়া দিত– ধোপাবৌ ক্ষার দিয়া স্নান করাইয়া দিত। শিশুর জন্মের পাঁচদিনের অনুষ্ঠান 'প্যাঁচুটা'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সাক্ষ্য তুলি–

কৃত্তিবাস ওঝা : 'পাঁচ দিনে পাঁচুটি করিল সুপ্রবীণ'
বিপ্রদাস : 'এক দুই তিন চারি পঞ্চম দিবসে নারী
পাঁচটী করি যথা আশে.....'

ষেটেরা : ডঃ কামিনীকুমার রায় বলেছেন– "সন্তান জন্মের ষষ্ঠদিনে রাত্রিতে সূতিকা ষষ্ঠী বা জন্ম ষষ্ঠীর পূজা ইত্যাদির আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়।" ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন- "শিশুর জন্মের ছদিনের রাতে আঁচি ঘরে তালপাতা / কাগজ, কঞ্চির কলম / সাধারণ কলম, কালী, ইঁদুরের মাটি, সাপের খোলস, জল ভরা ঘটি,

বসবার পিঁড়ি, সরষের তেলে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয়।" বিশ্বাস করা হয় বিধাতা পুরুষ নবজাতকের ভাগ্যলিপি লিখবেন। এবারে প্রাচীন কবিরা কি বলছেন–

কৃত্তিবাস : ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।
বিজয় গুপ্ত : ছয় দিনে ষষ্টি পূজা করিল জাগরণ।
ক্ষেমানন্দ : সনকা সুন্দরী ষষ্ঠী পূজা করি
যাহার যে নীত আছে।
হাতে খড়্গ লইয়া রহিল জাগিয়া।
মসী পত্র থুয়্যা কাছে ।।
অর্ধ রাত্রি গেল বিধি হেনকালে
লিখিত আইন ভালে।

উঠানি : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একমাত্র বিজয় গুপ্ত সাত উঠানির কথা বলেছেন। মুকুন্দরাম সাতদিনের লোকাচারটি নাম দিয়েছেন সপ্তরিশি বন্দনা ।

বিজয়গুপ্ত : সাতদিনে উঠানি করে শাস্ত্রের বিহিত।
মুকুন্দরাম : সপ্তদিনে সপ্তরিসি বন্দনা করিয়া।

ষেটেরা বয়া সপ্ত রিসি শিশুর মঙ্গল কামনার লোকাচারের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান।

আট কলাই বা আটকৌড়ে : শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখেছেন– "আটদিনের সন্ধ্যায় আটকৌড়ে উৎসব। এই উৎসবে বাড়ির বা ছোটরা কুলা বাজাইয়া ছড়া গাহিয়া শিশুর মঙ্গল কামনা করে।" প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আট কলায় বা আটকৌড়ে এর বিস্তার লক্ষ্য দেখা যায়–

কৃত্তিবাস: ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।
দিল অষ্ট কলাই অষ্টাঙ্গে শিশুগণে ।।
ডাক দিয়ে আনে রাজা বালকগনেরে ।
কাপড় পুরিয়া সোনা দিল সবাকারে।।

নত্তা : নত্তা প্রসূতিকে শুদ্ধ করার লোকাচার। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও নত্তা নিদর্শন অপ্রতুল নয়–

বিপ্রদাস : নবম বাসরে নত্তা করিল হরিষে।
মানিকরাম : নয় দিনে করিল নত্তা লইয়া বন্ধুজনে।

একুশ্যা: একুশ দিনে পূর্ণ শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের নাম 'একুশ্যা'।

ক্ষেমানন্দ : একুশ্যা পূজিল তবে বানের গৃহিণী।
মুকুন্দরাম : একুশা করিল তার একুশ দিবসে।
বিপ্রদাস : একত্রিশ দিনে করে ষষ্ঠীর পূজন
নানা পরকারে - কৈল নানা আয়োজন।

শিশুর জন্মের আগে থেকে জন্মের পড় একমাস পর্যন্ত যে সমস্ত শিশু কেন্দ্রিক লোকাচারের নেপথ্যে আমরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দলিল উপস্থাপন করলাম সেগুলি প্রাচীন বঙ্গ দেশে খুব জনপ্রিয় ছিল।

নামকরণ: লোকাচারের প্রথমে আসে নামকরণ। শাস্ত্রীয় শৃঙ্খল ভেঙে লোকাচারকে বরণ করার দৃষ্টান্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যও সযত্নে বহন করছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠা তুলে ধরলে সে কথা প্রমাণ হয়।

মুকুন্দরাম : চারি পাঁচ মাস গেল ছয়ে পরবেশ।
ওদন করাল্য বলি দিয়া ছাগ মেষ।
বিজয় গুপ্ত : নান্দীমুখ যজ্ঞ আদি করিলেক সুখে ।
লক্ষিন্দর নাম রাখে রাজার বিধানে।।

অন্নপ্রাশন ও হাতে খড়ি প্রসঙ্গ আছে এন্মন কিছু দৃষ্টান্ত–

অন্নপ্রাশন:

কৃত্তিবাস : দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর।
ছয়মাস মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর।।
মালাধর : ছয় সাত মাসে হয় পুর্ন্ন কলেবর ।
জননী আহার যত কর এ তাহার।।

হাতে খড়ি:

কৃত্তিবাস : পাঁচ বৎসরের হৈতে হাতে খড়ি দিল।
পড়িবারে বশিষ্টের বাড়ি পাঠাইল।

লোচনদাস : শুভ দিনে শুভক্ষণে তিথি সুনজর।
হাতে খড়ি দিল তার সময় বিচিত্র।
কৃষ্ণদাস : কথে দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল ।
অল্প দিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল।
আলাওল : পঞ্চম বৎসরে যদি হৈল রাজবালা।
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্র শালা।।

চূড়াকরণ : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মালাধর বসু চূড়াকরণ এবং কর্ণবেধ উল্লেখে কৃপণ হয় নি।

মালাধর বসু : জাতকর্ম্মবিধানে কৈল চূড়াকরণ।
সাস্ত্রবিধি কৈ ল জত পবিত্র ধারণ।
রামেশ্বর : পর্ব্বত পুণ্যাহ পাইয়া পাঁচ মাস কালে।
কর্ণ ভেদ কন্যার করিল কুতুহলে।

উপনয়ন: 'বৈদিক যুগে উপনয়ন আচারটি পালনের মধ্য দিয়ে বালক অধ্যয়নের জন্য গুরু সমীপে নীত হইত।' বাঙালী জীবনে প্রায় অবলুপ্ত এই সংস্কারটি বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে চোখে পরে–

"যজ্ঞ সূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধু বর্গ ডাকিয়া আনিয়া নিজ ঘর।।
শুভ মাসে শুভ দিনে শুভ ক্ষণে ধরি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র শ্রী গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।
হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সরব্ব সেবকের ঘর।।"

প্রাচীন বাঙালীর লৌকিক জীবন প্রকৃত পক্ষে এই শাস্ত্রীয় বিধিকে আগ্রহ ভরে গ্রহণ করেনি। প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদের এই সংস্কারটি অনুল্লেখ এরূপ প্রকল্প করা অন্যায় নয়।

উপসংহার: 'গরুর উপরের দিকে তাকানো, সাপের গাছে চড়া। ডিম মুখে করে

পিঁপড়ের বাইরে বেড়িয়ে পড়া আসন্ন বৃষ্টির সূচক'। উদ্ধৃত লোকবিশ্বাস দেখে অনুমান করা যায় যে এই সমস্ত জীব আগে থেকে কিছু অনুভব করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া এগুলোকে কুসংস্কার বলা আদৌ ঠিক নয়।এগুলি লোকবিশ্বাসের অভিধায় যুক্তিযুক্ত। বাস্তব যুক্তি বুদ্ধির বাইরে সামাজিক মানুষের পরম্পরাগত কর্ম ধারার সঙ্গে এগুলো যুক্ত। এর ব্যবহার মানুষের জীবনের সর্বস্তরে। যুক্তি বুদ্ধির স্তরে এগুলোর মূল্যকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা জাগলে ও আবেগের স্তরে এগুলি স্বীকৃত হয়ে আসছে পৃথিবীর সর্বত্র যুগ যুগ ধরে।

উল্লেখপঞ্জী:

- ডঃ নীহারঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ১৬৮।
- পাপিয়া মাণ্ডী, চর্যায় অন্ত্যেবাসিঃ আর্য হয়ে ওঠার প্রাক কাহিনী,Banghabharati Journal, Vol-1, 2021, Pg 50 ।
- Maclver& Page, Society of London, 1957,Page 150 ।
- কলহন, রাজ তরঙ্গিণী, অষ্টম তরঙ্গ।
- মঙ্গল চণ্ডীর গীতঃ দ্বিজমাধব, সম্পাদনাঃ শ্রী সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, ক বি, ১৯৬৫ ,পৃষ্ঠা ২১৬।
- পদ্মপুরাণঃ বংশীদাস, সম্পাদনাঃ শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, কলিকাতা , ১৩১৮, পৃষ্ঠা ৬৯ ।
- মনসা পুরাণঃ তন্ত্র বিভূতি, সম্পাদনাঃ আশুতোষ দাশ, ক বি ১৯৮০, পৃষ্ঠা ২৩৩।
- অভয়ামঙ্গলঃ দ্বিজ রামদেব, সম্পাদনাঃ আশুতোষ দাশ, ক বি ১৯৫৭, পৃষ্ঠা ১১৬।
- ধর্মমঙ্গলঃ রূপ রাম, সম্পাদনাঃ শ্রী সুকুমার সেন ও শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল, বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৯৫১, পৃষ্ঠা ৪১ ।
- ধর্মমঙ্গলঃ মানিকরাম, সম্পাদনাঃ শ্রী বিজিত কুমার দত্ত ও শ্রী সুনন্দা দত্ত, ক বি, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৫৭।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

গান্ধিজী ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

মোহিত কুমার নন্দী
সহশিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শ্রীধরপুর অবিনাশ ইনস্টিটিউশন

সারসংক্ষেপ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলিকে গণচরিত্রের রূপ দিতে ব্যর্থ সেই পরিস্থিতিতে ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে গান্ধিজীর আবির্ভাব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ভারতবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়কে আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করে আন্দোলনগুলিকে জাতীয় চরিত্র দান করেছিলেন। এই অর্থে গান্ধিজী ছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী। তিনি এমন জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন যা কোনো ব্যক্তি বা দেশকে পরিত্যাগ করে নয় বরং সকলকে নিয়ে চলার পক্ষপাতী। এখান থেকেই তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিকতাবাদ হল সমগ্র পৃথিবীকে একটি পরিবার হিসাবে দেখা এবং প্রতিটি মানবজাতি হল এই পরিবারের অংশ। গান্ধিজী বিশ্বাস করতেন জাতীয়তাবাদ কখনো আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী হতে পারে না বরং জাতীয়তাবাদ হল আন্তর্জাতিকতাবাদের পূর্বশর্ত। গান্ধিজীর কাছে আন্তর্জাতিকতাবাদ বিকশিত হতে পারে জাতীয়তাবাদের মধ্য থেকে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারিত রূপ হল আন্তর্জাতিকতাবাদ। আমার এই প্রবন্ধে গান্ধিজীর আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাটি আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ

জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, স্বাধীনতা।

মূল আলোচনা

গান্ধিজী পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলির মূল ভিত্তি ছিল অহিংসা ও সত্যাগ্রহ। এই দুটি ছিল গান্ধিজীর আন্দোলনের অভিনব বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। গান্ধিজীর পূর্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো গণচরিত্র ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়কে আন্দোলনের অংশ করে তোলার মাধ্যমে আন্দোলনগুলিকে জাতীয় চরিত্র দান করেছিলেন। এই অর্থে গান্ধিজী ছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী। গান্ধিজীর জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে কোনো জাতিগত ঘৃণার স্থান ছিল না। তার পরিবর্তে তিনি মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য নিজ দেশের গণ্ডী অতিক্রম করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "দেশপ্রেমের ধর্ম আমাদের শেখায় যে একজন ব্যক্তি নিজেকে পরিবারের জন্য উৎসর্গ করে, পরিবার নিজেকে উৎসর্গ করে গ্রামের জন্য, গ্রাম জেলার জন্য, জেলা প্রদেশ ও প্রদেশ দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। এমনকি বিশ্ব তথা মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হলে দেশকেও উৎসর্গ করা যেতে পারে।"[১] তিনি আরও বলেছেন যে, "আমার কাছে দেশের স্বাধীনতা কাঙ্খিত যাতে অন্যান্য দেশ আমার স্বাধীন দেশ থেকে কিছু শিখতে পারে, যাতে আমার দেশের সম্পদকে অন্য দেশের উন্নতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।"[২]

গান্ধিজীর জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধারণা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনা নিহিত ছিল। তাঁর নিজের ভাষায়– "আমার জাতীয়তাবাদ হল সুতীব্র আন্তর্জাতিকতাবাদ।"[৩] আন্তর্জাতিকতাবাদ হল সমগ্র পৃথিবীকে একটি পরিবার হিসাবে উপলব্ধি করা এবং প্রতিটি মানবজাতি হল এই পরিবারের অংশ। গান্ধিজী মনে করতেন জাতীয়তাবাদ কখনোই আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী হতে পারে না বরং জাতীয়তাবাদ হল আন্তর্জাতিকতাবাদের পূর্বশর্ত।

গান্ধিজী সুনির্দিষ্ট ভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে কোনো ধারণা প্রতিষ্ঠা করে যাননি। বরং তিনি নিজের মতো করে একে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী না হতে পারলে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া যায় না। তাঁর নিজের ভাষায়, "জাতীয়তাবাদী হওয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষে আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে ওঠা অসম্ভব। একমাত্র জাতীয়তাবাদের মধ্য থেকেই আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশ ঘটা সম্ভব, যখন বিভিন্ন দেশের মানুষ নিজেদেরকে সংগঠিত করে একটি পরিবার হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি যেটিকে জাতীয়তাবাদ বলে মনে করে সেটি কোন জাতীয়তাবাদ নয় বরং সেটি হল আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রতি একটি অভিশাপ যা অশুভ, সংকীর্ণ, স্বার্থপর ও বিভাজনকারী। প্রত্যেকে লাভবান হতে চায় অন্যকে ধ্বংস করে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ পৃথক পথ অবলম্বন করেছে বা সমগ্র মানবজাতিকে সাথে নিয়ে চলার জন্য সংগঠিত হয়েছে। ঈশ্বর আমাকে ভারতবাসীর মাঝে স্থান দিয়েছেন। যদি আমি তাদের সেবা করতে ব্যর্থ হই তার অর্থ হল স্রষ্টার প্রতি অবিচার করা। যদি আমি তাদের সেবা করার উপায় না জানি তাহলে আমি কখনো মানবতাকে সেবা করতে পারব না। তাই আমি নিজ দেশের প্রতি সেবা করতে গিয়ে অন্য দেশের ক্ষতিসাধন করার মতো ভুল করতে পারব না।"[৪]

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলি পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করার পর গান্ধিজী শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেন। সকলকে সাথে নিয়ে চলার এই মানসিকতা দেখে আমাদের বুঝতে ভুল হয় না যে তিনি ভারতবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের ভাবধারা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ভারতীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটানোই নয়, সেই সঙ্গে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, "আমার লক্ষ্য নিছক ভারতবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা নয়, আমার লক্ষ্য নিছক ভারতের স্বাধীনতা নয়। যদিও দেশকে স্বাধীন করার বাসনা নিঃসন্দেহে আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি আশা রাখি যে ভারতের স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করার দ্বারা আমি ভ্রাতৃত্ববোধের লক্ষ্যটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমার জাতীয়তাবাদ বিভাজনকারী

নয়। এটি হল সর্বজনগ্রাহ্য। আমি সেই জাতীয়তাবাদকে বর্জন করব যা অন্যান্য জাতির অসহায়তার, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লাভবান হতে চায়। যদি আমার দেশপ্রেমের ধারণা বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানবজাতির উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে তা ব্যর্থ। শুধু তাই নয় আমি জীবনে ধর্ম (জীব সেবা) ও ধর্ম থেকে সৃষ্ট দেশপ্রেমের দ্বারা পরিচালিত হয়েছি। আমি শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই নয় পৃথিবীর উপর গতিশীল সকল প্রাণীর মধ্যেই ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা ও পরিচিতি উপলব্ধি করতে চাই। কারণ আমরা দাবী করি যে আমরা সবাই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই যে রূপেই হোক না কেন আমাদের জীবন এক সুতোয় বাঁধা।"[৫]

গান্ধিজীর আন্তর্জাতিকতাবাদ পৃথক কোনো ধারণা ছিল না। তাঁর আন্তর্জাতিকতা-বাদ ছিল জাতীয়তাবাদের গর্ভজাত । প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি মজবুত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবাদের ক্ষেত্রভূমি প্রস্তুত করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়। তিনি বলেছেন, "আমি ভারতের একজন বিনম্র সেবক এবং ভারতকে সেবা করার ব্রত কখনো মানবতাকে সেবা করার পথে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারে না। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমি দেখেছি যে আমার অনুমান সঠিক ছিল এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে অতিবাহিত করার পর আমি বলতে পারি যে দেশসেবা কখনোই জগৎ সেবার পথে অন্তরায় হতে পারে না এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হয়েছে। এটি হল এক মহৎ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটি পৃথিবীতে শান্তি আনবে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যেকার পারস্পরিক ঈর্ষা দূর করবে।"[৬]

গান্ধিজীর আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা। যুদ্ধকে তিনি কখনোই আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনের বিকল্প উপায় বলে মনে করেননি। যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি নির্দিষ্ট একটি ধারণার মধ্যে কখনোই সীমাবদ্ধ থাকেননি। যুদ্ধের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ও শান্তির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল গান্ধিজীর। তিনি বিশ্বাস করতেন যুদ্ধ কোনো কিছুর জন্ম দিতে পারে না। ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সাল

পর্যন্ত বিভিন্ন লেখায় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর এই চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, "আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা কখনোই অহিংসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু এটা সবসময় সঠিক নয়। অহিংসার একজন সমর্থক অনেক সময় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।"[৭] তবে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী কখনোই চূড়ান্ত ছিল না। যুদ্ধ প্রসঙ্গে গান্ধিজীর সাথে পাশ্চাত্য শান্তিকামী দার্শনিকদের যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মনে করতেন ন্যায়ের অনুপস্থিতি যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। কিন্তু গান্ধিজী সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল, "একজন যুদ্ধ বিরোধী ব্যক্তি দুইজন যুদ্ধোদ্যত ব্যক্তিকে নিজের চিন্তাধারা দিয়ে বিচার করবেন। কিন্তু তিনি যে ন্যায়ের পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে তাকে সমর্থন করবেন।"[৮] তাই তিনি জাপানের বিরুদ্ধে চীনের লড়াইকে, জার্মানীর বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের লড়াইকে, স্পেনের স্বৈরাচারী শাসক ফ্র্যাঙ্কোর বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইকে সমর্থন করেছিলেন। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় তিনি যুদ্ধের একনিষ্ঠ বিরোধী সবসময় ছিলেন না। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বা স্বৈরাচার বিরোধী লড়াইগুলিকে তিনি সমর্থন করেছিলেন।

আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে গান্ধিজীর ধারণার নেতিবাচক দিকটি হল আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির প্রতি আস্থা না রাখা। ব্রিটিশ কমনওয়েলথে ভারতের যোগ দেওয়া উচিৎ কিনা, সেই প্রশ্নে গান্ধিজী দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কারণ তৎকালীন সময়ে মনে করা হত যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে যোগ দেওয়ার অর্থ হল পুনরায় ব্রিটেনের অধীনতা স্বীকার করে নেওয়া। অপরদিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ওপরেও গান্ধিজী আস্থা রাখতে পারেননি। কারণ বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতটা ভূমিকা পালন করতে পারবে সে সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সেইজন্য পল পাওয়ার গান্ধিজীকে একজন 'দুর্বল আন্তর্জাতিকতাবাদী'[৯] বলে অভিহিত করেছেন।

তথ্যসূত্র :

1. Desai Mahadev, Gandhiji in Idnian Villages, S. Ganesan, Madras, 1927, p. 171
2. Ibid, p. 171
3. Gandhian Outlook and Techniques, Ministry of Education, Government of India, 1953, p. 123
4. Gandhi, Young India, 18-6-1925, p. 211
5. Ibid, 4-4-1929, p. 107
6. Gandhi, Harijan, 17-11-1933, pp. 5-6
7. Gandhi, The Story of My Experiment with Truth, Navjiban, Ahamedabad, 1959, p. 257
8. Gandhi, Non-violence in Peace & War, Vol. 1, p. 258
9. Paul F. Power, Gandhi on World Affairs, George Allen and Unwin, London, 1962, p. 79

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কথাসাহিত্য: একটি অন্বেষণ

রাহুল মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (১৮৯৬-১৯৬৯) ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত সচিব (Personal Secretary)। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সাহচর্যেই কেটেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রধান সেবক হিসেবেই তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। তবে এসব ছাড়াও তাঁর যে ছিল অসাধারণ এক লেখকসত্তা—তা আমাদের অগোচরেই থেকে গেছে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ছিলেন একাধারে একজন কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক অন্যদিকে একজন অভিজ্ঞ অনুবাদক। অথচ তাঁর সাহিত্য কখনোই আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। আসলে অল্প কয়েকটি রচনা ছাড়া গ্রন্থাকারে সুধাকান্তের লেখা খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। সমকালের পত্র-পত্রিকাতেই তাঁর অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলো এখনও অগ্রন্থিতভাবেই থেকে গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এই বিস্মৃত প্রায় সাহিত্যিকের কথাসাহিত্যের দিকটি নিয়ে আলোচনা করব।

'ভারতবর্ষ', 'মোসলেম ভারত', 'খ্রীষ্টীয় ভারত', 'সহচর' প্রভৃতি পত্রিকায় সুধাকান্তের অনেক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলো এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ হল— 'সুনীলা'। এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে সমাজের প্রথাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি যেমন চাবুক মেরেছেন তেমনই গল্পগুলিতে নারীচরিত্রের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'কাঁটার ফুল'(১৯২১)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালেই সুধাকান্ত রায়চৌধুরী গল্প, উপন্যাস লিখছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় জলধর সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুনীতি দেবী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রমুখ গল্পকারদের সঙ্গে একই সংখ্যায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হলেও সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর নামটা আলোচনার বাইরেই থেকে গেছে। অথচ বিশশতকের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি আলোচনার যথেষ্ট দাবিরাখে।

সূচকশব্দ

রবীন্দ্রনাথ, বিস্মৃতপ্রায়, পত্রিকা, সংস্কার, নারী।

মূল আলোচনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্মৃতপ্রায় একজন সাহিত্যিক সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীর্ঘদিনের সঙ্গী ও একান্ত সচিব। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সাহচর্যেই কেটেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কিত স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থগুলিতে সুধাকান্তের নানাবিচিত্র কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। এহেন মানুষটি শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রধান সেবক হিসেবেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। এসব ছাড়াও তাঁর যে ছিল অসাধারণ এক লেখকসত্তা—তা আমাদের অগোচরেই থেকে গেছে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (১৮৯৬-১৯৬৯) ছিলেন একাধারে একজন কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক অন্যদিকে একজন অনুবাদক। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তবে তাঁর রচিত সাহিত্য কখনোই আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। আসলে অল্প কয়েকটি রচনা ছাড়া গ্রন্থাকারে সুধাকান্তের লেখা খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। তবে সমকালের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শান্তিনিকেতন', 'দেশ', 'মালঞ্চ', 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলো এখনও অগ্রন্থিত ভাবেই থেকে গেছে। নিম্নে আমরা সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কথাসাহিত্যের উপর বিশেষ আলোকপাত করব।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর একটিমাত্র গল্পগ্রন্থই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বেশির

ভাগ গল্প পত্রিকার পাতাতেই থেকে গেছে। 'ভারতবর্ষ', 'মোসলেম ভারত', 'খ্রীষ্টীয় ভারত', 'সম্মিলনী', 'সহচর' প্রভৃতি পত্রিকায় সুধাকান্তের অনেক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থটির নাম 'সুনীলা' যা ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে মোট তিনটি গল্প আছে। গল্পগুলি হল—'সুনীলা', 'সুরেশের মা' ও 'হতভাগ্যের স্মৃতি'। সংখ্যায় কম হলেও প্রত্যেকটি গল্প আকারে অনেক বড়ো। অগ্রন্থিত গল্পগুলির মধ্যে বলা যায় 'মালতী', 'অবসান', 'রসরাজ' প্রভৃতি গল্পের কথা। ''মালতী'' গল্পটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ''অবসান'' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। ''সহচর'' পত্রিকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় সুধাকান্তের 'রসরাজ' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই আকারে বেশ বড়ো। প্রত্যেকটি গল্পে গল্পকার নারীচরিত্রের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধিকাংশ গল্পে সমাজের প্রথাগত নানা সংস্কার ও শাস্ত্রের নানাবিধ নিয়ম-রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর 'মালতী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল মালতী। যার আট বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল এবং নয় বছর বয়সেই সে বিধবা হয়ে যায়। তার পিতা রাইচরণ সাহা ছিলেন রামপুর গ্রামের একজন স্বনামধন্য জমিদার। সাহা পরিবার সাহেবিয়ানা অনেকটা অধিকার করলেও হিন্দুত্বের প্রচলিত রীতি-নীতি বর্জন করেনি। এই রকম কিছুটা সংস্কারাচ্ছন্ন এবং কিছুটা আধুনিক পরিবারের এক বাল্য-বিধবা মেয়ে মালতীর জীবনের নানা যন্ত্রণা, ওঠা-পড়ার কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে।

মালতীর যখন বিবাহ হয় তখন সে বিবাহ সম্পর্কে কিছুই জানত না। বৈধব্য সম্পর্কে তো নয়ই। বিবাহ সম্পর্কে মালতীর অভিজ্ঞতা— 'স্বামী কে মালতী বিবাহের সময় একবার এবং বিবাহের পর মাত্র কয়েক দিন দেখিয়াছে। সেই দেখার মধ্যে সে কোন আনন্দ পায় নাই; সে পাইয়াছিল— ভয় ও বেদনা; ...স্বামী তাহার কাছে একটি অপরিচিত কঠোর পুরুষ বলিয়া বোধ হইত।'[১] বিধবা হওয়ার পর মায়ের কান্না দেখে তার প্রতিক্রিয়া—''মা,— তুমি কাঁদ কেন, তোমার কান্না দেখে আমার কান্না পায়। বর

মরে' গেলে কেন এত কাঁদ! কেঁদ না।''[২]

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কামনা-বাসনা সবই বৃদ্ধি পায়। মালতীও যখন নবযৌবনের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন ওর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যৌবনের তারুণ্য ফুঠে উঠল। তাদের বাড়ির দেওয়ানের পুত্র রামপদের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়তে থাকল। মালতী সর্বনাশের পথ থেকে নিজেকে ধরে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষমেষ পারল না। ইতিমধ্যে সারা গ্রামে মালতীর নামে কুৎসা রটে যায়। তখনই মালতী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সুধাকান্তের গল্পে নারী চরিত্রদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য সবসময় লক্ষ করা যায়। জীবনের কঠিন সময়ে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করতে জানে। এই গল্পেও আমরা সমাজের নিয়ম, শাসন ও সংস্কারকে তুচ্ছ করে মালতীকে পথে নেমে আসতে দেখি। মালতী মনে করে, ''কলঙ্কের ছিটা যখন আমার উপরে বিনা-অপরাধে আসিয়া পড়িয়াছে, না হয়—সে কলঙ্ককে সত্যসত্যই একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই।''[৩] সমাজের কলঙ্ককে ভালো করে নেবে বলেই সে ভ্রষ্টা হবার পথে এগিয়ে ছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত তা পারেনি। তার হৃদয়ের নারীসত্তা তাকে বাধা দেয়। সে বুঝতে পারে সমাজ তাকে যাই বলুক না কেনো সে এখনও পবিত্রই আছে।

এই গল্পের প্রথম থেকেই দেখা যায় প্রথাগত নানা সংস্কারের আধিক্য। যেসব সংস্কার পালন করতে মালতী অস্বীকার করেছে। গৃহত্যাগ করে সে সমাজের প্রথাগত নিয়ম ও সংস্কারের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। গল্পের শেষে মালতী যখন কমলিনীর কোলে মাথা রেখে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে তখন কমলিনী তাকে 'দেবী' বলে সম্বোধন করেছে। কমলিনী বলেছে, ''..তোকে আর যার ইচ্ছা সে পতিতা বলুক, আমি তোকে দেবি বলব;—তুই প্রলোভনকে পরাজয় করতে পেরেছিস্। তুই—''[৪]

সমগ্র কাহিনিটি লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবৃত করেছেন। গল্পে লেখক দেখিয়েছেন সমাজে নিয়মের চাপে পড়ে নারীদের কি কঠিন দুরবস্থার স্বীকার হতে হয়। অনেক নারীই সমাজের এই সব সংস্কারকে মুখ বুজে সহ্য করে নেয়। কিন্তু মালতী তা করেনি। সে শেষদিন পর্যন্ত তার প্রতিবাদ করে গেছে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর 'অবসান' গল্পটিও একটি সামাজিক গল্প। প্রথাগত সংস্কার এই গল্পটিকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রও একজন নারী। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকেই গল্পটি বিবৃত হয়েছে।

খগেন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা ছায়া। আট বছর বয়স থেকেই সে মেমসাহেবের কাছে ইংরেজি পড়ত। একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলার কাছে গান-বাজনা শিখত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে বিলাসের মাদকতা যেমন বাড়তে থাকে তেমনই বহিরাঙ্গের ল্যাবণ্যও নানা রঙে রঞ্জিত হতে থাকে। সতীশ ছায়ার বন্ধুসম। বন্ধুত্বের সূত্রধরেই সতীশের সঙ্গে ছায়ার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। কিন্তু ছায়া জাতিতে কায়স্থ আর সতীশ ব্রাহ্মণ। বিবাহ-সূত্রে মিলনের পক্ষে যা ছিল সবচেয়ে বড়ো বাধা। বিনোদচন্দ্র বোস নামে এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ছায়ার বিবাহ হয়ে যায়।

বিনোদচন্দ্র ব্রহ্মচর্য পালন করে, নিয়মিত গীতা পড়ে। কাম ও ক্রোধকে বশ করার জন্য সে রীতিমতো সাধনা করে। কিন্তু ছায়ার অন্তরে এবং বাহিরে যে যৌবনের তরঙ্গ ছুটছে— তার কী হবে? স্বামীর গৃহে থাকলেও স্বামীসুখ কোনোদিন সে পেল না। শেষপর্যন্ত কামনার আগুন নিয়েই স্বামীর গৃহত্যাগ করল।

পিত্রালয়ে ফিরে সতীশের সঙ্গে পুনরায় মালতীর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। ঘরে ও বাইরের তোয়াক্কা না করে সতীশকে নিয়ে সে বৃন্দাবনে পালিয়ে যায়। সুধাকান্তের গল্পের protagonist-রা প্রথাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে এইরকম প্রতিবাদ জানাতে জানে। তাতে তারা সফল হোক বা না হোক।

বৃন্দাবনে সতীশ তার বন্ধু ধীরেন্দ্রর বাড়িতে ওঠে। ধীরেন্দ্রর অসৎ মনোবৃত্তির জন্যই সতীশের চোখে ছায়া ভুল প্রমাণিত হয়। সতীশ ছায়াকে ভুল বুঝে একেবারে অথৈ জলে ফেলে দিয়ে চলে যায়। ধীরেন্দ্রর ঘর থেকে বেরিয়ে ছায়া পথে এসে দাঁড়ায়। পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে।

ঘটনাচক্রে এই বৃন্দাবনেই এসে পৌঁছায় তার স্বামী বিনোদচন্দ্র। নানা ঘনঘটার মধ্য দিয়ে বিনোদ ছায়ার ঘরে এসে পৌঁছায়। ছায়াকে সে হত্যা করে। যে মানুষটা নিজের কাম, ক্রোধকে বশ করার জন্য এত তপস্যা করল, তার এইরকম প্রতিক্রিয়া দেখে পাঠককে বিস্মিত হতেই হয়। অন্যদিকে ছায়াও জীবনের সঙ্গে লড়াই করতে

করতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সেও যেন এমনই একটি মৃত্যু চেয়েছিল। তাই বিনোদ যখন ছুরি দিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হয় তখন সে নিজের মাথা বিনোদের বুকে পেতে দিয়ে বলে— "এই চাই। শাস্তি পূর্ণ হোক।"[৫] খুনের অপরাধে বিনোদের ফাঁসি হয়। সমগ্র গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন জীবন পথে নারীকে একের পর এক বাঁক পার হতে হয়। শত বাঁক পেরিয়ে সোজা পথে তারা পৌঁছাতে পারে না। সোজা পথে দাঁড়ালেই সেই পথ ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। শত অন্যায়ের বোঝা শেষপর্যন্ত নারীকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর 'সুনীলা' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'সুনীলা'। 'সুনীলা' গল্পটিকে লেখক বলেছেন গল্পোপন্যাস। প্রচলিত গল্পের থেকে এটা আকারে অনেক বড়ো। তবে উপন্যাসের মতো অতটা বিস্তৃত নয়। আটটি পর্বে গল্পটি বিভক্ত। কোনো উপকাহিনি এখানে নেই। পূর্বেই বলেছি সুধাকান্তের অধিকাংশ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনো এক নারী। গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি সেই চরিত্রকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজেই সুধাকান্তের অধিকাংশ গল্পের নাম চরিত্র কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। তবে 'সুনীলা' গল্পে সুনীলাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায় না। সমগ্র গল্পটির কেন্দ্রে যিনি আছেন তিনি হলেন রাখেশ। রাখেশ বাইশ বছরের একজন যুবক। বি. এ পাশ। সে যে আবহাওয়া ও শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বড়ো হয়েছে তাতে তার মনে ধারণা ছিল যে, সে কখনোই প্রেমে পড়বে না এবং রমণী মুখদর্শন করবে না। কলেজ পাশ করে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো আর পরোপকার করাই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত। কাজেই বিয়ে করার কোনো লক্ষণ তার মধ্যে ছিল না। ঘরে বিয়ের কথা উঠলেই সে বলত, ' "ব্রহ্মচর্য্যই আমার জীবনের ব্রত, এ ব্রত আমি ছাড়ব না"[৬] কিন্তু এই রাখেশই শেষপর্যন্ত একজন বারাঙ্গনার প্রেমে এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে শেষমেষ তাকেই জীবনসঙ্গিনী করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই গল্পে লেখক যেটা দেখিয়েছেন তা হল— একজন ভবঘুরের জীবনযাত্রা শেষপর্যন্ত একজন নারীর কাছেই এসে শান্ত হয়েছে। যে নারীর জীবনও অত্যন্ত বৈচিত্রময়। তার জীবনেও রয়েছে অনেক ওঠা-পড়া। দুটি চঞ্চল প্রাণ শেষপর্যন্ত একটি বাসায় এসে মিলিত হয়েছে। আর এই মিলনের কাহিনি গল্পকার অত্যন্ত সূক্ষ্ম

ভাবে রচনা করেছেন। এটা শুধু একটা নিটোল প্রেমের কাহিনি নয়। গল্পের পরতে পরতেই রয়েছে প্রকৃতির ছোঁয়া। সম্পূর্ণ গল্পটি রাখেশের আত্মকথনেই উপস্থাপিত হয়েছে। রাখেশই এই গল্পের বক্তা পক্ষের কথক অর্থাৎ first person narrator। তার চোখ দিয়েই গল্পের সমগ্র ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে।

'সুনীলা' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প হল 'সুরেশের মা'। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে গল্পটি কালীমোহন বসুর 'সম্মিলনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পেও লেখক সুরেশের মা অর্থাৎ নারী চরিত্রের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। গল্পটির মধ্যে যে মূল বিষয়টি দেখানো হয়েছে তা হল— স্নেহ ও কর্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব। মৃণালিনী দেবী ছিলেন সুরেশের নিজের মা এবং সতীশের সৎ মা। নিজের সন্তান এবং সতীনের সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য, স্নেহ-ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে চরম দোলাচলের সৃষ্টি হয়। মাতৃহৃদয়ের এই দ্বন্দ্বই গল্পটির পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। পাঁচটি পর্বে গল্পটি বিভক্ত। সমগ্র গল্পটি লেখক সাধু ভাষাতেই রচনা করেছেন। কথকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকেই সমগ্র কাহিনি বিবৃত হয়েছে। পারিবারিক সমস্যাজনিত এই গল্পটিতে লেখকের বাস্তব দৃষ্টিকোণই প্রতিফলিত হয়েছে।

'সুনীলা' গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'হতভাগ্যের স্মৃতি'। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পঞ্চাশ বছরের এক বৃদ্ধ রামচরণ। তাঁর জীবনের এক করুণ অধ্যায়ের কাহিনি তথা তাঁর যৌবনকালের প্রেমের স্মৃতিই এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। গল্পকথকের দীর্ঘদিনের তলবে রামচরণ বলতে বাধ্য হয়েছিল তাঁর যৌবনের জীর্ণ হৃদয়ের বিষাদময় স্মৃতিকথা। তিনি শুরুতেই বলেছেন, "সে বড় দারুণ ব্যথা, যখনই মনে হয় সমস্ত বুক ভেঙ্গে পড়ে, জীবনটাকে নিতান্তই স্বপ্ন বলে মনে হয়। আমার সে নিদারুণ মর্ম্মব্যথার ইতিহাস বড় করুণ—বড় জ্বালাময়।... আমার বুকের মধ্যে পঞ্জরের তলে তলে দারুণ ব্যথার মেঘ থরে থরে পুঞ্জিত হয়ে আছে,"[৭] সেই প্রেমের স্মৃতি মন্থন করতে গিয়েই সে তার বাল্যকালের কথা, তাদের গ্রামের কথা, তার প্রেমিকার বাল্যকালের কথা তুলে ধরেছে। কীভাবে প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ হল সেই স্মৃতিকথাই ছিল এই গল্পের মূল আকর্ষণ।

'সুনীলা' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছেন, "...সুনীলা, সুরেশের মা এবং হতভাগ্যের স্মৃতি— এই তিনটি ছোটগল্প এই গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে। গল্প তিনটি বিশেষত্ব বর্জ্জিত। সুনীলা গল্পটিতে গল্পের মশলা কিছু ছিল— জমিবার উপক্রম করিতেছিল— কিন্তু শেষেরদিকে প্লটটি মাটী হইয়া গিয়েছে। 'সুরেশের মা' ও 'হতভাগ্যের স্মৃতি' নিতান্তই অক্ষম রচনা।"[৮] সত্যব্রত শর্ম্মার এই মন্তব্য আমরা সম্পূর্ণভাবে মানতে পারি না। গল্পগুলির প্লট হয়তো খুব একটা উন্নত নয়। তবে নিতান্ত অক্ষম রচনা বলা যায় না। কারণ পাঠককে আকর্ষণ করার মতো যথেষ্টই মশলা গল্পগুলির আছে। কাহিনি উপস্থাপন হয়তো আরও একটু ভালোভাবে করা যেতে পারত এবং কাহিনির বাঁধন আরও একটু শক্ত হলে ভালো লাগত। তবে কাহিনিগুলির মধ্যে গল্প হয়ে ওঠার যথেষ্টই উপকরণ আছে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর 'রসরাজ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাধুরীর বারো বছর বয়সেই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। যে ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল তাঁর পূর্বপক্ষের দুই স্ত্রী তখনও জীবিতা। কাজেই বৈবাহিক জীবন তার মোটেই সুখকর হয়নি। বিবাহের কিছুদিন পরেই সে পিত্রালয়ে ফিরে আসে। সেখানেই দীর্ঘ বছর কেটে যায়। একসময় সে তার দাদা ও বৌদির সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করে। আর সেখানেই একজন স্বামীজির রূপ-গুণ, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার দেখে সে মুগ্ধ হয়। যে স্বামীজির নাম দেওয়া হয়েছিল 'রসরাজ'। রসরাজও মাধুরীকে কাছে টানার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তবে মাধুরী কোনোভাবেই নিজেকে কুলভ্রষ্টার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়নি। ঘটনাক্রমে রসরাজ একদিন তাঁর ছদ্মবেশ খুলে মাধুরীর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। রসরাজই ছিলেন মাধুরীর সেই বিবাহিত পুরুষ। সেদিন মাধুরী তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করে বলে, "আমায় ক্ষমা কর, আমি রসরাজের কাছে হৃদয় দিয়াছি— তোমার কাছে দিই নাই। তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি স্বামীর ঘর হইতে হৃদয়কে রসরাজের ঘরে সমর্পণ করিয়াছি। আমায় গ্রহণ করিও না— আমি ব্যাভিচারিণী।"[৯] অত্যন্ত নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে লেখক এই গল্পটি শেষ করেছেন।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পোপন্যাস হল 'কাঁটার ফুল'। যা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক এই গল্পোপন্যাসটি আসলে একটি নিটোল প্রেমের কাহিনি। সেখানে আত্মসমর্পণ যেমন আছে তেমনই আছে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। প্রেমের দ্বন্দ্বই গল্পোন্যাসটির মূল বিষয়। মূল কাহিনি অনেকটা এই রকম—

কান্তি ও অমিয়া দুই বোন। যাদের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপেই কাহিনি শুরু হয়েছে। তাদের গ্রামের নাম ময়নাপুর। এই গ্রামেরই এক যুবক নৃপেন্দ্র। এই নৃপেন্দ্রকে কান্তি নিজের অজান্তেই কখন মন দিয়ে ফেলে। অন্যদিকে নৃপেন্দ্রও বুঝতে পারে তার মনের কোণে কান্তি দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করে আছে। নানা অছিলায় তারা একে অপরের কাছে পৌঁছাতে চায় কিন্তু কেউ কারও কাছে ধরা দিতে চায় না। সুধাকান্তের অন্যান্য গল্পে নায়ক ও নায়িকার মিলনের প্রধান অন্তরায় ছিল—প্রথাগত সংস্কার, শাস্ত্রের নানাবিধ নিয়ম। এই গল্পেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কান্তির মা বিমলা দেবী তাদের মিলনে বাধা দেন। সমাজের দীর্ঘদিনের রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েই তিনি বলেন, '…কিন্তু সমাজকে ত আর অগ্রাহ্য কর্ত্তে পারি না।'[১০] অন্যদিকে বিমলাদেবীর মা যাঁর বয়স প্রায় সত্তর বছর; তিনি সেকেলে মানুষ হলেও সমাজের এইসব সংস্কার ও শাস্ত্রের নানাবিধ অহেতুক বিধি-বিধানের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। নাতনির পক্ষ নিয়ে তিনি নিজের মেয়ে বিমলাকে বলেছেন:

> "তোদের শাস্ত্র আর পাঁজীপুঁথি গঙ্গার জলে ফেলে দে—ও বালাই রাখিস্‌নে। গণের মিলের চেয়ে মনের মিল অনেক বড়। ওর সঙ্গেই বিয়ে দে। … … … যেখানে মনের মিল হ'য়ে বিয়ে হয় সেইখানে শাস্ত্রগৌরবের সঙ্গে বিবাহের অনুষ্ঠানের কৃত্যকে সমাধা করে। যেখানে মনের মিল নাই অথচ বিয়ে—সেটা অধিকাংশ সময়েই মনে এক—কাজে আর একের ব্যভিচার ঘটায়।"[১১]

সমাজের নিয়মের কাছে তাঁর এই যুক্তিটি কল না। বিমলাদেবী ও তাঁর স্বামী কেশবলাল নামে এক যুবকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়ে দেন।

বিবাহের পরেও কান্তির মন সর্বদা নৃপেন্দ্রর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কেশব স্ত্রীকে

কাছে পাবার জন্য অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কান্তি কোনোভাবেই স্বামীর কাছে নিজেকে ধরা দিতে চায় না। শেষপর্যন্ত অধৈর্য হয়ে কেশব কান্তিকে বলে, "নয় আমায় গ্রহণ কর— নয় আমায় ছাড়। এ রকম সমস্যার মাঝখানে আর থাক্‌তে পারি না!"[১২] এই কথার পরেই কান্তি বাপের বাড়ি চলে আসে। আবার এখানে এসেও দেবচরিত্র কেশবের জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। গল্পকথক তাই বলেছেন, "নৃপেন্দ্রকে সে যে ভালবাসা দিয়াছিল সেটা ত এখনো বুকের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। অন্যদিকে আবার কেশব নূতন মোহের জাল পাতিতেছে।"[১৩] এই দোলাচলের মধ্যে দিয়েই কাহিনি এগিয়ে চলে। শেষপর্যন্ত নানা ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে কান্তি ও কেশবলালের মিলন হয়। অন্যদিকে এক বড়ো রোগে আক্রান্ত হয়ে নৃপেন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে কান্তি ও কেশবের উদ্দেশে নৃপেন্দ্রর উক্তি উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। নৃপেন্দ্র বলেছে—"বড় খুসী হয়েচি, আজ তোমাদের এমন মিলন দেখে। …এই মিলনের মাঝে অনেকদিন কাঁটা হয়ে ছিলাম।"[১৪] উপন্যাসের কান্তি, অমিয়া, নৃপেন্দ্র, হরেন্দ্র, কান্তির দিদিমা প্রমুখ চরিত্র নির্মাণে সুধাকান্ত বিশেষ মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। তবে উপন্যাসটি একটি মাত্র কাহিনিকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে; কোনো উপকাহিনি এখানে নেই।

সম্পূর্ণ কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই কান্তি, নৃপেন্দ্র ও কেশবলাল প্রত্যেকের জীবনই একসময় কন্টকময় হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত দীর্ঘ ঘনঘটার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের জীবন থেকেই সেই কাঁটা সরে যায় এবং তা পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কাজেই 'কাঁটার ফুল' এই ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ যর্থাথই সার্থক হয়েছে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী গল্পগুলিতে কোথাও সাধুভাষা ও কোথাও চলিতভাষার ব্যবহার করেছেন। ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। মানুষের প্রচলিত মুখের ভাষাকেই তিনি সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি সুধাকান্ত রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালেই গল্প, উপন্যাস লিখছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় জলধর সেন, হেমনলিনী দেবী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুনীতি দেবী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, বিভূতিভূষণ লাহিড়ী প্রমুখ গল্পকারদের সঙ্গে একই সংখ্যায় সুধাকান্তের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অথচ এঁনাদের

সকলের সাহিত্য আলোচিত হলেও সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর নাম আলোচনার বাইরেই থেকে গেছে। অথচ বিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি আলোচনার যথেষ্ট দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়চৌধুরী., সু.(১৩২২,আশ্বিন). মালতী.ভারতবর্ষ.

২. তদেব.

৩. তদেব.

৪. তদেব.

৫.রায়চৌধুরী., সু.(১৩২৭,জ্যৈষ্ঠ). অবসান. মোস্‌লেম ভারত.

৬.রায়চৌধুরী., সু. (১৩২৮).সুনীলা গল্পগ্রন্থ, সুনীলা, বীরভূম: শান্তিনিকেতন প্রেস.

৭. তদেব. হতভাগ্যের স্মৃতি.

৮. শর্ম্মা., স. (১৩২৯, জ্যৈষ্ঠ). সুনীলা. ভারতী.

৯. রায়চৌধুরী., সু. (১৩২৮, মাঘ), রসরাজ. সহচর পত্রিকা.

১০. রায়চৌধুরী., সু. (১৯২১).কাঁটারফুল,এলাহাবাদ: ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড.

১১. তদেব.

১২. তদেব.

১৩. তদেব.

১৪. তদেব.

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

শৈলেন ঘোষের নির্বাচিত গল্পগ্রন্থে বৈচিত্রময়তা

রিয়া পাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সংক্ষিপ্তসার

শৈলেন ঘোষ বাংলা শিশু সাহিত্যের জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন অগুনতি রচনা সৃষ্টির দ্বারা। তাঁর ছোটগল্পগুলি বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে এক নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। শৈলেনের রচিত গল্পগুলির বিশেষত্ব শিশুর পাশাপাশি বড়োদের মনকেও অভিভূত করে এবং গল্পগুলি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায়বোধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ছাড়াও শিশুদের জীবনের চাঞ্চল্যতাকেও তিনি গল্পের পটভূমিতে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সহজ সরল রূপে। গল্পগুলিতে কৌতুক, অবাস্তব বিষয়সমূহ, কৌতূহল, অ্যাডভেঞ্চার যেমন আছে তেমনি রয়েছে প্রতিটি গল্পে শিক্ষণীয় বিষয়। গল্পগুলি রূপকের আবরণে রচিত করলেও, সেখানে আছে বাস্তব জীবন বোধের সূক্ষ্ম ভাবনা। লেখক তার গল্পগুলিতে ব্যবহার করেছেন মজার ছড়া এবং ভালো-মন্দের নৈতিক পাঠদানের প্রসঙ্গটিও সুকৌশলে দান করেছেন তা নিছক শিশু মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য হলেও হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। লেখক রচনাগুলিতে জীবজন্তু ও জড়জগতের মধ্যে এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করেছেন যেখানে শিশুরা গল্পের মাধ্যমে তাদের সাথে একাত্ম অনুভব করবে। তিনি শিশুদের গল্পের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন তার ফলে ভবিষ্যতে তারা একজন যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে। শৈলেনের গল্পগুলিকে আশ্রয় করে শিশুরা তাদের কল্পপ্রবণ মনকে এক রূপকথার জগতে নিয়ে যায় সেখানে তারা তাদের ইচ্ছে মতোন বিচরন করতে পারে। অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই

মানুষটি নিজের অজান্তেই বাংলা শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন এবং তাঁর এই সৃষ্টি আমাদের কাছে মহাবিস্ময়ের।

সূচক শব্দ

রূপকথা, বাস্তবতা, সৃজনশীল সৃষ্টি, মানবিক গুণাবলী।

মূল আলোচনা

> “গল্প বলা একটি গঠনমূলক সৃজনশীল শিল্প, এমনভাবে ছোটদের সামনে এটি উপস্থাপন করতে হয়, শ্রোতার যেন মনে বিশ্বাস জন্মায় গল্পটি যিনি বলছেন তাঁর নিজের।” (ঘোষ, (২০১৮), পৃষ্ঠা নং- ৫২২)

শৈলেন ঘোষ তাঁর ‘গল্প কেন বলব, কেমন করে বলব’ প্রবন্ধে এই কথা লিখেছেন। তিনি দীর্ঘদিন শিশু-কিশোরদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে এক গভীর পর্যালোচনাও করেছেন। এছাড়া তাঁর লেখা প্রতিটি গল্প বাস্তবতার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শৈলেনের গল্পগুলি পাঠকৃতির অন্তঃস্থল থেকে এক পুনর্নির্মাণের কথা ব্যক্ত করে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি রূপকথার ছদ্মবেশে এক অলৌকিক মায়ায় শিশুদের সামনে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। ফলস্বরূপ গল্পগুলি একদিকে যেমন তাদের কল্পনাপ্রবণ মনকে গড়ে তুলবে তেমনি ঘটমান বাস্তবের সাথেও পরিচিত হতে সাহায্য করবে। বাস্তবতা বলতে শৈলেন কখনোই দৈনন্দিন ঘটনার হুবহু প্রতিকৃতি করেননি, তিনি সৃজনশীল সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেখক নিজের ইচ্ছেমতো প্রকৃতির চরিত্রগুলিকে বাগ্ময় করে তুলেছেন সেজন্য কখনো তা হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যে উজ্জ্বলিত, আবার নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর। মূলত তাঁর গল্প রচনার উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করা এবং বলা বাহুল্য এ বিষয়ে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন ও সফলতা প্রাপ্ত করেছেন।

শৈলেন ঘোষ বাল্য বয়সে প্রথম ‘মা’ নামক একটি গল্প রচনা করেন এক দাঙ্গার পটভূমিকে কেন্দ্র করে, এরপর আনন্দমেলায় গল্পটি পাঠানোর কিছুদিন পর তাঁর গল্প ছাপার অক্ষরে বের হয়। আনন্দমেলা বিভাগটির দায়িত্বে তখন ছিলেন খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক বিমল ঘোষ। শৈলেন বিমল ঘোষের নজরে পড়লেন এবং সেই সময় থেকে তাঁর সাহচর্যে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল লেখকের জীবনে। এরপর তিনি

ছোটগল্প রচনা করেছেন প্রায় তিনশোর কাছাকাছি এবং এগুলি বহু বিষয়ে বিচিত্রপূর্ণ। বর্তমানে প্রাপ্ত তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা একশো আশিটির বেশি। তাঁর কতগুলি গল্পগ্রন্থ সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল- 'ছোট্ট সোনার গল্প শোনা' (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৭৬), 'গল্পের ঝিলমিল' (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০), 'গল্পের ভেলকি' (কথা ও কাহিনি, ১৯৯৯), 'ঝলমলে গল্পের চকমকে ছবি' (সাহিত্য তারুন্য, ২০০১), 'এই গল্প সেই গল্প' (সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১), 'কাক্কাবোক্কার নয়ছয় কাণ্ড' (অভিজাত প্রকাশনী, ২০০২), 'গল্প সংগ্রহ' (আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭), 'ছোটদের গল্প' (শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০১০), '২৫ রূপকথা' (পারুল প্রকাশনী, ২০১৫)। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে নির্বাচিত কিছু শৈলেন ঘোষের গল্পগ্রন্থ সংকলনগুলি আলোচনা করব।

ছোটদের গল্প : শৈলেন ঘোষের 'ছোটদের গল্প' গল্পগ্রন্থ সংকলন ১৬ টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এই গল্পগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন সহজ, সরলভাবে এবং শিশু মনের উপযোগী হিসাবে। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গল্পের মাধ্যমে শিশুদের নির্মল আনন্দ দানের। তিনি এই গল্পগুলিকে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত করলেও সমানভাবে বড়োদের মনকেও কল্পনার রঙ্গে জারিত করবে। বাস্তবে শিশুদের মনে থাকে অপরিসীম কৌতূহল, তারা কৃত্রিম বস্তুদের সঙ্গে এক আবেষ্টনে জড়িয়ে থাকতে ভালোবাসে। তাঁর লেখা গল্পগুলি পাঠ করলে শিশুদের যথার্থ বুদ্ধিমত্তার বিকাশ হয় এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কেও মনোযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। এছাড়াও তাঁর প্রতিটি গল্পে রয়েছে বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব, অজানা তথ্যানুসন্ধান সেই সঙ্গে শব্দনির্মাণের নিপুণ কৌশলও লক্ষ করি। গল্পের নামগুলিও অনেক পরিমানে চিত্তাকর্ষক যা শিশুদের মনে কৌতুকের উদ্রেক করে।

প্রথম গল্পটি 'এ খেলার মস্ত মজার'– এখানে তিনি পরিচিত পৃথিবীকে এক অচেনা রূপকথার জগতে নিয়ে গেছেন। প্রথমেই তিনি শিশুদের জানিয়েছেন সাদা বলতে আমাদের মনে আসে শরতের মেঘ, ফুলের পাপড়ি, গোরুর দুধ কিম্বা সাদা ঝলমল হাঁসের পালকের কথা কি আমরা স্মরণ করি ! লেখক হাঁসের বর্ণনায়

বলেছেন– "কে একটা হাঁস, কোথায় থাকে কোন পুকুরে, সাঁতার কাটে সাতসকালে, না দিনেদুপুরে, শামুক খায়, না গুগলি-গেঁড়ি, তাঁর খোঁজ কে আর রাখে?" অর্থাৎ হাঁসকে আমরা প্রতিদিন দেখি বলেই তার সৌন্দর্য নিয়ে আমরা কেউ সেভাবে মাথা ঘামাই না। আবার হাঁসের গলার স্বরটিকে বলেছেন– 'কী বিচ্ছিরি প্যাঁকপেঁকে!'। গল্পের মাঝে মাঝে শব্দ দ্বৈতের ব্যবহার কাহিনিটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে যেমন- 'ছলকে ছলকে', 'দুলতে দুলতে', 'প্যাঁকুল প্যাঁকুল', 'ছুঁবি না, ছুঁবি না', 'ঘ্যাংকু ঘ্যাংকু', 'টাকডুম টাকডুম' প্রভৃতি। ছাগলের সাথে হাঁসের ঝগড়াটিও বেশ মিষ্টি মধুর। ছাগছানার গায়ের রঙ কালো হওয়ায় হাঁসটি তাকে 'কেলটে' বলে ডাকে, সাথে সাথে ছাগছানাও মুখঝামটা দিয়ে বলে- "এই হেঁসো, তুই তো ফ্যাক ফ্যাক ফেঁসো! আমায় কেলটে বলিস কোন সাহসে? হাঁসও কম যায় না ! ঝগড়ুটের একখানি! সে-ও প্যাঁক প্যাঁক, ট্যাঁক ট্যাঁক করে গলা ফ্যাটিয়ে তাড়া মারল, 'এই কেলো, আমায় হেঁসো বললি কেন রে? জানিস আমার নাম হাঁসি!' ছাগছানাও উত্তর দিল, ' এই হাঁসি আমায় কেলো বললি কেন রে? জানিস আমার নাম বাঁশি!' অমনি হাঁসটা ঠোঁট উলটে বলল, 'বাঁশি না ঘোড়ার ডিম! ওই তো গলার সুর- ব্যা- এ্যা এ্যা!" লেখক শিশুদের এই ধরনের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি সচেতনার বার্তাও দিয়েছেন অত্যন্ত কৌশলে, কারণ শিশুদের মনে বর্ণবৈষম্য বিষয়টি যেন গভীরভাবে রেখাপাত করতে না পারে সেইজন্য বলেছেন- "হতেই পারে, কারও গায়ের রং কালো, কিম্বা ধরো নাকটা একটু বোঁচা, কি চোখটা একটু ট্যারা এতে তার তো কোন দোষ নেই। যে যেমন খুঁত নিয়ে জন্মেছে! কাজেই কাউকে তুমি দুষতে পার না।" শিশুদের এমন সহজ সত্যকথা কোন উপদেশ না দিয়ে তিনি জানিয়েছেন। গল্পের পরিশেষে আমরা দেখি ছাগছানা হাঁসের পিঠে চেপে পুকুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমস্ত বিবাদ ভুলে। এই অদ্ভুত দৃশ্যটি শিশুদের কল্পনাপ্রবন মনকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

'চাঁদ ও অলি' দ্বিতীয় গল্পটিতে লেখক রূপকথার মায়াবী স্পর্শে রচিত করেছেন। চাঁদ ও অলি দুই ভাই বোন তাদের নিস্পাপ ভালোবাসার স্পর্শে রাজার অন্ধ মেয়ের চোখে আলো ফিরে আসে। গল্পটির সূচনাতে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের রমরমায় মানুষ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, অন্যদিকে বহুযুগ আগে ছিল মা-

ঠাকুমার মুখে শোনা ‘গল্পবোনা-কল্পনার জাদুকাঠি’ সেখানে শিশুরা অনায়সে কল্প জগতে বিচরণ করত। গল্পের মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন ছড়া ও গান যেগুলি বিষয় পরিবেশনকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়। এই গল্পে অলি রাজকন্যার চোখে আলো ফিরিয়ে দেবার জন্য দাদা চাঁদকে বলে –“এমন যদি সত্যি হত, আমার চোখ দুটি রাজকন্যার চোখে পরিয়ে দিলে রাজকন্যা দেখতে পেত!” লেখক অলির মাধ্যমেই এই মহৎ শিক্ষা দিয়েছেন যা কেবল শিশুদের নয় বড়োদের মনকেও অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করবে। এই গল্পটিতে মানুষের লোভ, হিংসা ও স্বার্থপরকে অন্ধকার এবং ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও মানবিক গুণগুলিকে আলোর সঙ্গে তুলনা করেছেন এখানেই তাঁর গল্পটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

‘নীল পালক’ গল্পটিতে আমরা দেখি এক কাগজের ফুলের অহঙ্কার হয় কারণ সমস্ত মানুষ তাকে ভালোবেসে ঘরের ভেতর নিয়ে এসে সাজিয়ে রাখে। সেইজন্য ঘুঁড়ি, কদম পাতা, নীল পালক প্রত্যেককেই অবজ্ঞতার চোখে দেখে কাগজের ফুল। কদম গাছের ঝরা পাতা তাকে বাস্তবের কথা মনে করিয়ে বলে –“ চিরদিন কেউ বাঁচে না। তুমিও মরবে। এক্ষুনি গুড়ু গুড়ু মেঘ ডেকে যদি ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নামে, তখন দেখব তুমি কোথায় থাক। জলে ভিজে ন্যাতা হয়ে গেলে, তখন আর তোমায় কেউ ফুল বলবে না, বলবে কাগজের ডেলা।” এইরকম চিরন্তন সত্য কথা লেখক কত অনায়াসে সরলভাবে শিশুদের বলেছেন। এর পাশাপাশি কদম পাতা গাছ থেকে খসে পড়ার আগে প্রকৃতির রূপ দেখেছে দু চোখ ভরে – “যতদূর চোখ যেত, কত কী দেখতুম। পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য দেখিনি বটে, কিন্তু দেখেছি সবুজ খেত, ছোট্ট নদী, ফুলের বাগান। বাগানে ফুলের মেলা, কত রকমের রঙ ঝলমলে ফুল বাগানভরতি।” এই রকম বর্ণনায় লেখকের কল্পনাপ্রসূত মনের পরিচয়ও আমরা পেয়ে থাকি। অবশেষে কাগজের ফুলটির দেমাক ভেঙ্গে যায়। একটি ছেলে ঘোড়ায় চেপে আসার সময় নীল পালকটিকে দেখে থমকে দাড়ায় এবং পালকটির পথের ধূলো ঝেড়ে ঘোড়ার মাথার মুকুটে লাগিয়ে দেয়। অন্যদিকে কাগজের ফুলটি ফ্যালফ্যাল করে দেখতে থাকে এবং তার অহংকারের পতন ঘটে।

‘ময়না মায়ের কান্না কেন’ গল্পটিতে এক কাঠবিড়ালী খুড়োর উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে গেঁছো ইঁদুরটিকে জব্দ করেছে ও ময়না মা তার ছানাকে নিয়ে নিরুপদ্রব ভাবে বসবাস করে। এই গল্পটি শিশুদের মনকে আনন্দিত করে তুলবে।

‘ভোকাট্টা’ গল্পটি এক নিরীহ বাঘের। বাঘ পূর্বে কোনদিন মানুষ দেখেনি তাই সে মানুষের মাংস খাবার স্বাদ পায়নি, খাবার হিসাবে সংগ্রহ করত পাখির ডিম। পাখি বাঘকে খুবই অপমান ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে তার সাথে জঙ্গলের পশু-পাখিরাও যোগদান করে। এই ভয়ে বাঘটি দেশত্যাগ করে। লেখকের এই সমস্ত গল্পগুলি আজগুবি ও অবাস্তবের হলেও শিশুদের মনে সযত্নে জায়গা করে নিয়েছে। এই রকমই ‘কানকাটা বাঘ’, ‘বুকুট্টা তা বলে বোকা নয়’, ‘ছোট্ট পাখি টুনটুন’, ‘হঠাৎ পাখি টুনটুন’, ‘হঠাৎ সেদিন’, প্রভৃতি রচিত তার গল্পগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁর এই ধরনের গল্পগুলি নিতান্তই শিশুদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং শিশুমনের বিষয়ক উপযোগী। লেখকের এই সমস্ত রচনাগুলি বিশেষ গুণ সমৃদ্ধ হলেও এতে ছোটদের জন্য সু-শিক্ষার যে সমস্ত বিষয়গুলি অবলম্বন করেছেন ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে সেগুলি যথার্থই আমাদের মুগ্ধ করে।

২৫ রূপকথা : এই গল্পগ্রন্থটি পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ২০১৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পের সংখ্যা বাইশ এবং বাকি তিনটি নাটক রচিত হয়েছে।

প্রথম গল্পের নাম ‘ফাটিস’। নামটির মধ্যেই গল্পটির তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে। মিম আর ম্যাম দুই ছোট্ট বেড়ালছানা তাদেরকে মা হুকুম দিয়েছে- “তোমরা বড়ো হচ্ছ। আর নেচেকুঁদে বেড়ালে চলবে না। এবার থেকে একটু কাজ করতে হবে, বুঝলে!” দুই ভাই চিন্তায় পড়ে, তাদের আবার কি কাজ? মা জানিয়ে দেয় ‘নেংটি ধরতে হবে’। এরপর নেংটির গর্ত তারা খুঁজে পায় ভাঁড়ার ঘরের দেরাজের পেছনে। দুই ভাই কোনো নেংটিরই সন্ধান পেল না মিম বিরক্ত হয়ে চলে যায় খুকুর পড়ার ঘরে সে নাকি শুনেছে নেংটিরা খুকুর বইখাতা কাটতে আসে ম্যামও তার সঙ্গে আসে। হঠাৎ নেংটির লেজ মনে করে দুই ভাই খুকুর খেলনা ভেড়ার লেজকে কামড়ে ধরে। ভেড়াটি খুকুকে পুজোতে উপহার দেবে বলে রঙের বাক্স নিয়ে ছবি আঁকতে

থাকে সেইসময় এই ঘটনা ঘটে। বেড়ালগুলো তাকে চোর ভাবে, কিন্তু ভেড়াটি জানায় সে ছবি আঁকতে এসেছে। মিম বেড়ালকে দেখে বলে তোর নাম তাহলে 'ফাটিস'। ভেড়া ফাটিস নাম শুনে হতভম্বিত হয়ে গেলেও পরে হেসে গড়িয়ে পড়ে। কারণ মিম 'আর্টিস্ট' নামটির বিকৃত উচ্চারণ করে। ভেড়াটি খুকুর পাতায় একটি রঙ্গীন পাখির ছবি আঁকে এবং ওই পাখি দেখতে দেখতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। গাছের ডালে চাঁদের এবং ভোরের আলো মেখে তার রঙ্গীন পাখাকে ছড়িয়ে দেবার পর আনন্দে এক অপরূপ খেলা করে। প্রত্যেকেই এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং ভাবে খুকুকে দেখাতে পারলে এটাই তার মহালয়ার উপহার হতো। অবশেষে বেড়ালগুলো ভাবে ভেড়া সত্যিই অনেক বড়ো ফাটিস নয়, আর্টিস্ট। এখানে আমরা লেখকের প্রকৃতির প্রতি যে নিবিড় আকর্ষণ আছে তা অনুভব করতে পারি। এছাড়াও তিনি শিশুদের মজার ছলে জানিয়েছেন 'ফাটিস' শব্দটি বিদেশি, এবং প্রবাদ বাক্যেরও ব্যবহার করেছেন যেমন-'উল্টা বুঝিলি রাম'। অর্থাৎ তার গল্পগুলি নিছক রূপকথার আবরণে প্রত্যক্ষ করলেও পরোক্ষভাবে রয়েছে শিক্ষণীয় কাহিনি।

'নাচন-নাচন বেড়ালছানা' গল্পটিতে লেখক বাদাম নামের এক অসহায় ছেলে এবং রাস্তার বেড়ালছানার মধ্যে এক নিস্পাপ ভালোবাসার দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। দুজনেই পরিতক্ত্য এবং পরিচয়হীন। বাদাম বেড়ালটির নাম রাখে মিম। বেড়ালছানাটিও পুরস্কার স্বরূপ বাদামকে নাচ দেখায়। বাদাম বাজারে বেড়ালের নাচ দেখিয়ে টাকা রোজগার করে। বেড়ালের নাচের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, রাজকন্যাও জানতে পেরে মা, বাবাকে জানায় রাজপ্রাসাদে বেড়ালের নাচ দেখবে। নাচ শেষে রাজকন্যা বেড়ালটিকে নিজের কাছে রাখতে চায় এই ইচ্ছা জানতে পেরে রাজা বাদামকে জেলে নিক্ষেপ করে। অবশেষে বেড়ালটি রাজকন্যাকে ইশারা করে বাদামের জেলখানায় নিয়ে যায় সেখানে রাজকন্যা হুকুম দেয় বাদামকে মুক্ত করার জন্য। এরপর বাদাম, বেড়াল, রাজকন্যা তিনজনে আনন্দের সঙ্গে সবুজ ঘাসের ওপর ছুটে বেড়াতে থাকলো। এই প্রাণবন্ত দৃশ্য দেখে রাজা ও রানি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ওঠে। লেখকের প্রতিটি রচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি তিনি কতটা পশুপ্রেমি এবং শিশুরা তার প্রতিটি গল্পতেই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছে।

'রাজার ঘরে টিকটিকি' এই গল্পটি নিখুঁত হাসি ও মজার ঘটনা নিয়ে রচিত। গল্পটি পাঠ করলে শিশুরা এক অবাস্তব জগতে পাড়ি দিতে পারবে নিজের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং অনুভূতি প্রবণও হয়ে উঠবে তাদের মন। যা লেখক তাঁর প্রতিটি গল্পতেই এই রকম অত্যাশ্চর্য কাহিনির বুনোট দ্বারা নির্মাণ করেছেন। এই গল্পে রাজার মনে কোন সুখ নেই কারণ তার ঘরের ভেতর একটি টিকটিকি দিব্যি নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও টকটক করে ডেকে চলেছে। টিকটিকি তাড়ানোর কাজ মন্ত্রিকে দেবার পর রাজার মাথায় বুদ্ধি আসে জাদুকরের সাহায্যে যদি মন্ত্রিকে আরশোলা করে যায় তাহলে টিকটিকি আরশোলা খাবার জন্য তার পিছু নেবে এদিকে টিকটিকিও রাজার ঘর থেকে বিদায় নেবে। এই কথা শুনে তো মন্ত্রি হতভম্ব সে কিছুতেই আরশোলা হবে না রাজা ও মন্ত্রী ঘরের ভেতর দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে দিল। এই চিৎকার শুনে রানিমার ধমক খেয়ে মন্ত্রী রাজার কাঁধে চেপে বসে এবং টিকটিকি মন্ত্রীর মাথা থেকে লাফিয়ে রানিমার হাতে বেয়ে বাইরে চলে যায়। এই দৃশ্য দেখে রাজা বেজায় খুশি হয়ে আনন্দে নাচতে শুরু করেন এবং মন্ত্রী বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে চিৎকার করতে থাকে।

'ফক্কাই-ফরফর' গল্পে একটি কাকের জীবনের বিচিত্র ঘটনাকে লেখক বর্ণনা করেছেন। প্রথমেই আমরা কাকের নাম জানতে পারি কাকতু, সে মনের আনন্দে নাচতে থাকে কিন্তু এক ঠাম্মা তাকে দেখতে পেয়েই হ্যাংলা-কেলে, চোরচোট্টা, ছ্যাঁচোড়, বাটপাড় এইসব বিশেষণে ডেকে ওঠে। তার মন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে এই ভেবে যে অন্য পাখিদের মতো তার কেন মানুষের কাছে আদরযত্ন, ভালোবাসা নেই? এরপর এক অশথ গাছে বসে সে তার নিজের দুঃখের কথা অশথদাদুকে বলে। অশথদাদু তাকে বাস্তবের সাথে পরিচিত হতে বলে যে "ভগবান যাকে যেমন করেছে সে তো তেমনই হবে। ভগবান কাক-বংশকে কালো করেছে। এই যে, আমি গাছ, দেখ না, আমার যেমন ডালপালা, তেমনই আমার গা-ভরতি সবুজ পাতা !" কাকতুকে পরামর্শ দিয়ে বলে ফক্কাই-ফরফরের দেশে যাবার জন্য কারণ সে জাদুকর সবার সব দুঃখ হরণ করে। সেই দেশে গিয়ে দেখা পায় এক রোগা পটকা পাগল স্বভাবের লোককে সে কাকতুকে মুহ্যমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরম যত্নে কোলে

তুলে নিয়ে নিজের খাবার তুলে দেয় কাকতুর মুখে। এখানে এক অসহায় কাকের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন বাস্তবের সমস্যাকে যে আমরা মানুষের পাশাপাশি পাখিদের মধ্যেও রঙ নিয়ে বিভাজন করে থাকি। অশথ দাদুর মত মানুষের দেখাও পায় আমাদের আশেপাশে যাদের ভরসা ও ভালোবাসায় মানুষ নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। লেখকের প্রাণিজগতের ওপর শিশুবয়স থেকেই এক অপত্য স্নেহ লক্ষ করি, তারই ছায়া দেখতে পায় প্রতিটি রচনায়।

শৈলেন ঘোষের গল্পগ্রন্থে আমরা ভিন্ন স্বাদের গল্প পেয়েছি কিন্তু তা কখনোই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়নি। গল্পগুলি নিবিড় পাঠে বোঝা যায় এক মানবিক আবেদন রেখেছেন লেখক উহ্য ভাবে, আবার কখনো গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিকে এমন মায়া দ্বারা নির্মাণ করেছেন যেখানে আমরা তাদের সুখ-দুঃখের সাথে একাত্ম অনুভব করি। এখানেই মনে হয় প্রতিটি লেখকের সৃজনধর্মী রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে ওঠে। আমরা জানি, শিশুদের জন্য রচনা সৃষ্টি খুব সহজ কাজ নয় কারণ তারা কোন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনতে চায় না; আবার শুষ্ক রচনাও তাদের মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়। শৈলেন ঘোষ দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায় এই সহজ বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন। সেজন্য তাঁর রচনাগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বয়সের নিরিখে সকলের কাছেই, এবং বাংলা শিশুসাহিত্যেও তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্য।

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ., শৈ.(২০১৮). রচনা সংগ্রহ, বইমেলা, কলকাতা : লালমাটি প্রকাশন.
২. ঘোষ., শৈ.(২০১০). ছোটদের গল্প, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ.
৩. ঘোষ., শৈ.(২০১৫). ২৫ রূপকথা, কলকাতা : পারুল প্রকাশনী.
৪. বসু., বু.(২০০২). সাহিত্য চর্চা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং.
৫. বসু., বা.(১৯৬৫). বাংলা শিশুসাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী, কলকাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ.
৬. সেন., ন.(২০১৮). প্রসঙ্গায়নে বাংলা শিশুসাহিত্য, কলকাতা : সাহিত্য লোক.

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

মহাশ্বেতার দরদী কথনে আদিবাসী জনজীবন

ড. লিলি সরকার
সহ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আনন্দচন্দ্র শিক্ষকশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

মহাশ্বেতা দেবীর মরমী লিখন স্পর্শে ভারতবর্ষের আদিবাসী জনসমাজ তাদের জীবনের প্রকৃত চালচিত্রসহ উপস্থাপিত। সমাজ-রাজনৈতিক অবস্থানে পীড়িত আদিবাসী সমাজ অবলুপ্তির অন্ধকারে ক্রম নিমজ্জমান। ভারতবর্ষের অধিবাসী এই আদিবাসী সমাজ তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা না পেয়ে উদাসীন রাষ্ট্র ব্যবহার স্বীকার। আদিবাসী জনজীবনকে তাদের মর্যাদা ও সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া তাদের জীবনের মান উন্নয়ন সূচক সুনিশ্চিত করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। আমৃত্যু তাদের সঙ্গে ছিলেন সহযোদ্ধা হয়ে সহমর্মী হয়ে। মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সংগ্রাম করেছেন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে।

সূচক শব্দ

আদিবাসী জনসমাজের দৈন্য। ভারতীয় সমাজে তাদের নিষ্পেষণ। রাজনৈতিক লড়াই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। বিলুপ্ত অস্বিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আদিবাসী জনসমাজ।

মূল প্রবন্ধ

আর্যরা ভারতবর্ষে বহিরাগত। এ সিদ্ধান্ত বহু গবেষণালব্ধ তথ্য সমাহারে অধুনা সর্বজন বিদিত। অনার্য গোষ্ঠীর মানুষেরা ভারতের আদিমতম অধিবাসী। মূলত আদিবাসী বলতে এই আদিমতম অনার্য জনজাতিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। উপজাতি মানুষজন আদিমজাতি, আদিবাসী, হরিজন ইত্যাদি নানা অভিধায় পরিচিতি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের সংবিধানে এই উপজাতির মানুষজনকে তফসিলভুক্ত উপজাতি বা সিডিউল ট্রাইব হিসাবে মর্যাদাভুক্ত করা হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই জনজাতি মানুষের বসবাস উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও আসামে এই সাতটি রাজ্যে জনসংখ্যার মোট অনুপাতের হারে জনজাতি মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এছাড়াও রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা রাজ্যে এদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে উপজাতির মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা প্রায় ছয় ভাগ।

শুধুমাত্র জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে উল্লেখযোগ্য অথবা উল্লেখযোগ্য নয় এই বিচারে জনজাতি মানুষজনকে গুরুত্ব দেওয়া বা অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা ঐতিহাসিক ভুল অথবা দর্শনের সীমাবদ্ধতা দুটির পথকেই প্রশস্ত করবে। নানা সমাজ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবজ্ঞা উদাসীনতা দীর্ঘকাল এক বিপুল জনশক্তিকে অজ্ঞানের, দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছে। এই আদিবাসী জনজাতির ধর্ম হিন্দু। হিন্দু সমাজের কর্তাভজা ব্যক্তিগনের বৈষম্যমূলক নানা অমানুষিক পীড়ন আদিবাসী জনজাতির ধর্মীয় পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

> "হিন্দু সমাজের এই অভ্যন্তরীণ সামাজিক শ্রেণী পাথক্য ও বৈষম্যগুলির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ কূটনীতি হিন্দু সমাজকে তিন ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করেছে। 'তফসিল জাতিদের' ভিন্ন করা হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের সম্বন্ধে একটা নতুন ধর্ম আরোপ করার চেষ্টা সফল হয় নি। 'অবনত হিন্দু' নাম দিয়ে তাদের হিন্দুত্বকে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাধ্য হয়েছে; কিন্তু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধর্ম (অ্যানিমিজম বা জড়োপাসনা) আরোপ করে একেবারে পৃথক করার চেষ্টা হয়েছে।"[১]

এতদ্‌সত্ত্বেও ১৮৯১ সালে ভারতের জনগণনার ভিত্তিতে তৎকালীন সেন্সাস কমিশনার জে এ বেইনস একটি মতামত দিয়েছিলেন। সেটি এই রূপ –"বহু উপজাতীয় গোষ্ঠী

(Tribal people) বর্তমানে হিন্দু হয়ে গেছে। এদের ধর্মমত এবং যারা এখনও অহিন্দু উপজাতীয়রূপে আছে, তাদের ধর্মমতের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানতে পারা যায় না।"[২]

ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার সত্ত্বেও জনজাতি জীবনের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে রাষ্ট্র শক্তি। নানাভাবে তারা অবহেলার স্বীকার দীর্ঘযুগব্যাপী। তাদের জাতিসত্তার প্রশ্ন, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি মূল রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডে তাদের প্রয়োজন ও অংশীদারীত্বের প্রশ্ন এ সব কিছুই দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্র শক্তির চরম অবহেলার বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে থেকেছে। ফলত নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা চেতনার শেকড় প্রোথিত থেকে গিয়েছে এই জাতির অবহেলার ক্ষেত্রগুলিতে। রাষ্ট্র শক্তি যাদের প্রাপ্য দেয় নি তারা শেষ পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছে বলপূর্বক প্রাপ্য আদায়ের জন্য। ঝাড়খণ্ডী আন্দোলনের মতো একাধিক রাজনৈতিক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ঐক্য একটি বড় প্রতিস্পর্দ্ধাকে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠতে দেখেছে। ফলত এই উপজাতীয় জনজীবনের মর্যাদার প্রশ্নে তাদের স্ব-ভূমি জঙ্গল অধ্যুষিত জাতীয় পরিমণ্ডলকে রক্ষা করে তাদের মর্যাদা দেবার প্রশ্নে আন্তরিক না হলে ভবিষ্যতের দিন আরো ভয়ানক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি জাতীয় ঐক্যকে দাঁড় করিয়ে দেবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

মহাশ্বেতা দেবীর বিশ্লেষণী লেখা এই জনজাতি জীবনের প্রকৃত অবস্থান ও ভদ্র সমাজের অবহেলার স্বরূপকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছে 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসটিতে। একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অবলম্বন করে রচিত উপন্যাসটির পরিণামের ভয়াবহতা সামাজিক বঞ্চনার ঐতিহ্যগত পারম্পর্যের প্রতি অভিনিক্ষেপ করেছে।

'কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসটির কাহিনী পরিকল্পনা লেখক অসিত গুপ্তের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই উপন্যাসের নামকরণও করেছেন তিনি। ষোড়শ শতকের রাঢ় বাংলার ইতিহাস অবলম্বনে এক অরণ্য চুয়াড় যুবকের দেবী আদেশে অভিজাত শ্রেণির ন্যায় কবি খ্যাতি অর্জনের স্বপ্ন পূরণের ব্যর্থতা ও শেষ পরিণতিতে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তির মতো অমোঘ সমাজ বিধানে যে জীবনের অপচয়

ঘটে; এমনই কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। লেখকের কাছে সেই ইতিহাস সজীব ও প্রাণশক্তিময়। তাঁর নিজস্ব কথনে–"ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে মানুষের অন্তর্মুখী পুরুষার্থকে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংস স্তূপ সরিয়ে সরিয়ে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া।"[৩]

আদিবাসী জনজীবনের সঙ্গে দীর্ঘকাল থেকে বহমান অবহেলার ঐতিহাসিক সত্য প্রামাণিকতা বহন করেছে মহাশ্বেতা রচিত 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসটি। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক বাস্তবতা লেখকের স্ব-কথনে ধরা না পড়লেও উপন্যাসের কাহিনী বয়নে আদিবাসী জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যগতভাবে বেশ কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্র অনুষঙ্গে সুস্পষ্টরূপে কঠোর বাস্তবতা প্রতীয়মান। কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনার স্বপ্ন পূরণের প্রচেষ্টা মধ্যযুগের কবি কঙ্কণ মুকুন্দ রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অনুষঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপর নাম অভয়ামঙ্গল কাব্য। কবি বন্দ্যঘটী গাঞিঁর মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গে স্মরণে আসে মধ্যযুগের পদাবলীকার চণ্ডীদাস যিনি ছিলেন দেবী বাশুলীর সেবক ও রামী রজকিনীর প্রেমাস্পদ তাঁকে হাতির পদদলনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অপরাধ ছিল ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে ধোপা রমণীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়। এই কয়েকটি আদিবাসী জীবনের ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাজা গর্গের রক্ষণশীলতা, মাধবাচার্যের জাতিগত অহমিকার প্রকাশ নগরীর অভিজাতবর্গের কবির প্রতি তীব্র ধিক্কার ঘৃণা নীচজাতির মানুষের প্রতি Main stream - এর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করে। উচ্চ নীচ জাতিগত ভেদাভেদ সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষেরই সৃষ্টি। এই উপন্যাসে আদিবাসী জনজীবনের একাধিক সংস্কারের কথা উঠে এসেছে। বেনে জাতির রমণীর সংসার ও জীবন চিত্র ধরা পড়েছে বেনে বউ-এর কথায়। তাদের স্বামীদের মানসিক দোলাচলতা ও অস্থিরতার চিত্র ফুটে উঠেছে –"বেনে জেতে মেয়্যে ছেলার সুখ নাই গ' ঠাকুরানি। আমাদের পুরুষেরা দেশে দেশে ফিরে ঘাটে ঘাটে যায়। কোন দেশে নাচুনিয়া বুঝি কামরূপের মন্ত্র জানে, কোথাকার মেয়েরা ওষুধ মাদুলি করে, পুরুষের মন কতদিন স্থির থাকে বোল?"[৪]

'বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসটিতে মাতঙ্গী নামে এক বারবনিতার জীবনের অসহায়তার কাহিনী আছে। মাতঙ্গী বিগত যৌবনা। যে নারীদের শরীরসম্বল তাদের শরীর হারিয়ে গেলে সমাজে যে করুণ অবস্থা হয় তার ভয়াবহ রূপ এই উপন্যাসে আছে।

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি ১৯৭৭ সালে করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালে 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় দু'বছর ব্যাপী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস বারবার মুদ্রিত হয়েছে। এই উপন্যাস ১৯৭৯ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। এই উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে যেমন– হিন্দি, অসমিয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালি, ওড়িয়া, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি। লেখক মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের একনিষ্ঠ মনোযোগী পাঠক ছিলেন। ইতিহাস তাঁর প্রিয় বিষয়। সমাজ মানুষের ইতিবৃত্ত যে গ্রন্থের পাতায় পাতায় মুদ্রিত করে রাখে মানুষের যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না সর্বোপরি সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে তাঁর অবস্থান। সেখানে যে মানুষ ইতিহাসের নায়ক হয়ে ওঠেন তা অবশ্যই একক কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সম্মিলিতভাবে মানুষ। ব্যক্তির একক অস্তিত্বে মহাশ্বেতা দেবী খুব বেশি মনোযোগী নন। সামগ্রিকভাবে নির্বিশেষের আলেখ্য রচনাতেই তিনি আগ্রহী। তাঁর নিজের কথাতে তিনি 'গণবৃত্তের' ইতিহাস রচনাতে আগ্রহী। সেই সমাজ যার হাত ধরে বর্তমান জন্ম নেয় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রোথিত করে তাকেই তিনি লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। আদিবাসী মানুষ ও মহাশ্বেতা দেবী যেন সমার্থক। যেখানেই জনজাতি জীবন সমস্যাদীর্ণ সংকটাপন্ন সেখানেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। জনজাতি জীবনের কাহিনী নির্ভর উপন্যাস, গল্প, ডাইরী জাতীয় রচনা লেখাতেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি তাদের জীবনের সমস্যা ও সংকট মোচনে উদ্যোগী হয়েছেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সর্বশক্তি দিয়ে।

মহাশ্বেতা দেবী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে পবিত্র সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এক জায়গায় বলেছেন –'খেড়িয়া-শবর সমিতিই আমার জীবনের শেষ বাস স্টপ।'[৫] সরকারের তৈরি বিভিন্ন আদিবাসী কল্যাণ সমিতি থাকা সত্ত্বেও বাস্তব

ক্ষেত্রে এদের কোন উন্নয়নই হয়নি। মানব কল্যাণ সূচক মাত্রা গুলির কোন কিছুই এদের কাছে পৌঁছায় না। খেড়িয়া-শবর, লোধা প্রভৃতি জনজাতির জন্য তাঁর অন্তর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি, উন্নয়নের অফিসে প্রদত্ত দরখাস্তে। সেই সব কাগজপত্রে লিখিত আকারে বন্দি হয়ে আছে তাদের বঞ্চনার কথাবৃত্ত।

এমনকি এক জায়গা থেকে সামান্য উদ্ধৃত করছি– "আদিবাসী দপ্তরের আপিস পুরুলিয়াতেও আছে।কেন এদের গ্রামের পর গ্রাম জল নেই, পোড়ো নেই, জমি নেই? বহুল প্রচারিত আদিবাসী উন্নয়ন স্কীম কেন কোথাও পৌঁছয় নি? বহুল প্রচারিত পঞ্চায়েত গুলির ভুমিকাই বা কি রকম? টাকা নেই বললে মানতে রাজি নাই। টাকা আসে খরচ হয়, যাদের জন্য আসে, তাঁরা বঞ্চিত থাকেন। খেড়িয়াদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকেছে বলেই এঁরা সমিতি গড়লেন। পুরুলিয়াতে খেড়িয়া শবরদের সর্বদা নির্যাতন করে বন বিভাগও পুলিশের একাংশ।"[৬]

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের বিরসা স্ব-জাতির প্রতি বঞ্চনা ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জীবন পাত করেছেন। বিরসার জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে লেখক একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুতে কোন বিদ্রোহের সমাপ্তি হয় না। তাই লেখক সচেতনভাবে যোগ করেন পরিশিষ্ট অংশ বিদ্রোহ, বিপ্লব হুল এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে উত্তরাধিকার সমর্পণ করতে।

বিরসা বৃহস্পতিবারের জাতক। বিরসার জীবনের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন জন্ম থেকেই বিরসা ব্যতিক্রমী শিশু। কৈশোরে ছিপছিপে কালো চেহারার ছেলেটির অন্যমনস্কতা ও ভাবনার বিষয় ছিল ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন মুণ্ডা তথা আদিবাসী জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। জন্ম থেকে ক্রমাগত উচ্ছেদ হতে হতে মুণ্ডারা দেশ-ঘর ছেড়ে চলে যেতে থাকে– "১৮৬৪-৬৭ সালের মধ্যে মুণ্ডা ৩৯৮৬ ওঁরাও ১০৫৮ ভুঁইয়া ১৫৪৬ সব সুদ্ধ ৬৫৯০ জন এভাবে চলে যায়।"[৭]

উচ্ছেদ হওয়া মুণ্ডারা ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে মানকিডি, সিদামা, সিংভুম প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। নানা স্থানে গ্রাম পত্তন করে বসবাস করতে থাকে। করমি ও সুগানার ছিল তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বিরসা তাদের চতুর্থ সন্তান। বিরসার জন্ম ১৮৭৫ সালে। বিরসা ছিল মুণ্ডাদের মুক্তির বাহক, ভবিষ্যৎ মানব মুক্তির দূত, সকল নিপীড়িত মানুষের প্রতীক। মায়ের গর্ভের অহংকার ছিল বিরসা। বিরসার কাছে অরণ্য মাতৃ স্বরূপা। ব্রিটিশ আদিবাসীদের কাছ থেকে অরণ্যকে কেড়ে নিয়েছে। বড় বড় শহর জন বসতি কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে। বিরসা ব্রিটিশ সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের সংগঠিত করেছিল। বিরসার কাছে জঙ্গল ছিল চেতন সত্তা। জঙ্গল বিরসার সঙ্গে তার প্রাণের কথা, যন্ত্রণার কথা বলে।

বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডা আন্দোলন সংগঠিত হবার পূর্বে ১৭৮৯, ১৭৯৯, ১৮০৭, ১৮১২, ১৮১৯, ১৯০১ সালে মুণ্ডারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। বিরসার জীবনের সঙ্গে অরণ্য জননীর মুক্তি একাকার হয়ে যায়। মুণ্ডারা ইংরাজদের কাছ থেকে সুবিচার পায় না। শিক্ষার আলোক বঞ্চিত মুণ্ডা সমাজকে তাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ শক্তি অপমানিত করে। প্রতারণা করে। বিরসা তাই মনস্থ করে আন্দোলনই হবে তাদের মুক্তির পথ। বিরসা ডাক দেয় উলগুলানের। অরণ্য জননী বিরসার কাছে বৃহৎ মাতৃস্বরূপে আবির্ভূত হয়। মাকে শৃঙ্খল মুক্ত করতে সে এগিয়ে যায়। "বিরসা বোঝে এই বনভূমি তার মুণ্ডা জননী করমির মতোই দুঃখিনী আর অপমানিতা।"[৮]

দারিদ্র্যের অন্ধকার ও প্রকৃতির অন্ধকার বিরসাদের জীবনের সাথে মিশে একাকার হয়ে থাকে। বিরসার মা ঘরের অন্ধকার দূর করতে মহুয়া বিচি উদ্‌খলে কুটে তেল বার করে। সেই তেল দিয়ে বাতি জ্বালানো হবে রাত্রের বেলা। বিরসার মা ও দিদিরা প্রকৃতির অন্ধকার দূর করতে পরিশ্রম করে। বিরসার কাছে ঘাটোর সঙ্গে একটু নুন পাওয়াও স্বপ্ন। মননের সংবেদনে তাদের ভয়াবহ দারিদ্র কোন রেখাপাত করতে সমর্থ হয় কি! বিরসার কাছে নুন স্বপ্ন, বিরসার মা ও দিদির কাছে কেরোসিনের বাতি স্বপ্ন। বিরসার লড়াই - উলগুলান অরণ্যের শৃঙ্খল মুক্তিতেই

সীমাবদ্ধ না। দিদির ও মায়ের কণ্ঠও তো বিরসাকে একই ভাবে ভাবিত করে। বিরসার উলগুলানের ডাকের সাথে তাই তার নারী প্রতিরূপ জড়িয়ে থাকে। বিরসার মা ছেলের ক্রিয়াকলাপ দেখে বিস্মিত হতো। করমি ছেলেকে বোঝায় ধানীর সঙ্গে লড়াই না করতে। করমির বুকের নীচে বিরসার জন্য ভারি ভয়। এ ছেলে যে আর পাঁচটি ছেলের মতো নয়, করমি তা বোঝে। মাতৃ হৃদয় দিয়ে। মা ও ছেলের পরস্পর কথোপকথনে স্পষ্ট হয় তাদের হার্দিক উত্তাপ। বিরসা টুইলা বাজিয়ে হলুদরঙা বেনেবউ পাখিটাকে নামিয়ে আনে ওর মাথার ওপর। বিরসার মাথার উপর ডানা সাপটে পাখিটা উড়ে যায়। করমি দেখে ছেলের টুইলার যাদু শক্তি। এ ছেলে সাধারণ নয় বুঝে করমিও তাকে স্নেহ করে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। বিরসার কাছে প্রকৃতি মাতৃ রূপে আবির্ভূত হয়। বিরসা তার মা করমিকে দেখে প্রকৃতির মধ্যে। সবকিছুর মধ্যে বিরসা ওর মায়ের কথা মনে রাখে। বিরসা লেখাপড়া শিখে কাছারিতে চাকরি করতে চায়। খুটকাট্টি গ্রামের জমি ফেরাতে চায়। অমূল্যের সঙ্গে বিরসা একদিন শহরে বেড়াতে এসে দোকানে নুন দেখে বিস্মিত হয়। বিরসার মনে পড়ে ঘাটোর স্বাদ ভালো করতে তার মা সব নুন তাদের দিয়ে নিজে নুন ছাড়া ঘাটো খায়। বিরসা ভাবে – "বড় হলে আমি মাকে বোরা বোরা নুন কিনে দেব। ওই তেল নিয়ে যাব গ্রামে। মা বাতি জ্বালবে।"[৯]

বিরসা শ্মশানে পুঁতে রাখা চালকির গা থেকে রূপোর আংটি খুলে নেয়। শনিবারের হাটে গিয়ে তা বিক্রি করে চালের জোগাড় করে। করমি ছেলের এই ধরনের কাণ্ড সমর্থন করে নি। অরণ্য বিরসাকে তাঁর সন্তান মনে করে। আরণ্যক জননীকে নগ্নতার হাত থেকে বাঁচাতে বিরসা বদ্ধ পরিকর। মাকে লাঞ্ছনা অপমান থেকে মুক্ত করবার দায়িত্ব সন্তানের। বিরসা অরণ্যের সেই সন্তান যার হাতে মুক্তি পেতে চেয়েছিল অরণ্য মা।

মুণ্ডারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল বিরসা তাদের ভগবান। মুণ্ডাদের মুক্তি নিয়ে আসবে বিরসা। বিরসা নিজেকে 'ধরতি আবা' বলে, করমিকে বলে আমাকে আর তোর কোলে ধরবে না। এই কথা শুনে করমি মাতৃ হৃদয় হাহাকার করে ওঠে। বিরসার অনুভবে সে হাহাকার ধরা পড়ে না। করমি বুক ফাটা হাহাকার মুণ্ডাদের

জয়োল্লাসে চাপা পড়ে যায়। মাতৃ হৃদয়ের অসহায়তা আরো গভীর হতে থাকে। করমি অনুভব করে এবার বিরসার বৃহৎ আহ্বানে বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে। বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডারা একত্রিত হয়। ইংরেজ অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগাতে তারা বদ্ধ পরিকর। "মুণ্ডারা চাষ করছে না, ধার নিচ্ছে না, ভিক্ষে চাইছে না। ঘাসের দানা খাচ্ছে।"[১০] যে কোন প্রকার প্রতিকূলতাও কষ্ট স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত। বিরসা তার ভক্তদের মনে আত্মবিশ্বাসী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে দাবী আদায়ে বদ্ধ পরিকর থাকতে প্রেরণা জোগাতে সমর্থ। সালী যোগ দেয় বিরসার উলগুলানে। সালী ও অন্যান্য মেয়েরা তীর নিয়ে ঝুড়ি বোঝাই করে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। সালী গর্ভবতী মহিলার অভিনয় করে। মুণ্ডা রমণীরা নিজের শরীরের মতোই ভালো করে চেনে বন-জঙ্গল পথ-ঘাট অরণ্য ভূমিকে। বিরসা মুণ্ডাদের সকল উৎসব, পরব, নাচগান আনন্দ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বিরসা বলে মুণ্ডাদের জীবন দুঃখের অন্ধকারে মগ্ন। নতুন দিন আনবার জন্য মুণ্ডাদের নতুন করে জন্ম দিতে হবে।

ইংরেজরা মুণ্ডা বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রবল প্রতিরোধ ও দমন পীড়ন শুরু করে। বিরসা এ জঙ্গল থেকে সে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বিভেদ নীতি গ্রহণ করে সুকৌশলে মুণ্ডা বিদ্রোহে ভাঙন ধরিয়ে দেয়। পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে অর্থের লোভ দেখায়। বিরসাকে ধরতে ব্রিটিশরাই সফল হয়। জেলে রেখেও ব্রিটিশের বিরসাকে নিয়ে ভয় দূর হয় নি। তাই চক্রান্ত করে তাকে মেরে ফেলে।

> "এখনি লেখ, বিরসা মুণ্ডা, সুগানা মুণ্ডার ছেলে, জন্ম ১৮৭৫। বয়স পঁয়ত্রিশ। ডায়েড অফ এশিয়াটিক কলেরা। তারিখ – ৯ জুন ১৯০০ সাল।
> ওয়ার্ডারকে বললেন, 'মেথরকে ডাক। লাশ ঢেকে দাও।'
> ৯ জুন ১৯০০ সাল রাঁচি জেল। সকাল ৯ – টা দশ।"[১১]

বিদেশী শাসকের দ্বারা বিরসার জীবনের নির্মম এই পরিণতিতে স্বজাতি হিসাবে শিউরে উঠা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

বিরসার মৃত্যুতে মুণ্ডা বিদ্রোহের একটি পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। জঙ্গলকে কেন্দ্র করে

যে সকল মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে, সেই জঙ্গল থেকে তাদের উৎখাত করে ভদ্র লোকেদের আগ্রাসী স্বার্থ সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেখানকার মানুষজন তাই স্বাভাবিকভাবেই এক সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই প্রতিবাদে অগ্রসর হয়েছিল। আদিবাসী জনজীবন ব্রিটিশ আমলে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। তাদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছিল। সংগঠিত সেই সব আন্দোলনকে প্রবল দমন পীড়নের মাধ্যমে বিধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডাদের উলগুলান ছিল ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, মহাজনী প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন। সাঁওতালদের খেরওয়ারি হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহের অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। খেরওয়ারি হুল বিস্তৃত ছিল ভাগলপুর জেলার দামিন-ই-কো অঞ্চল থেকে বীরভূমের সাঁওতাল ভাষাভাষী বিস্তীর্ণ কৃষিভিত্তিক অঞ্চল পর্যন্ত।[১২]

'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসটি সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন– "যে উপন্যাস আমার স্বোপার্জিত আদিবাসী অভিজ্ঞতার বাণীরূপ মাত্র, লেখার পিছনে ছিল গভীর যন্ত্রণা।"[১৩] টেরোড্যাকটিল বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণী। টেরোড্যাকটিল মেসোজয়িক সভ্যতার মিথ। একাধারে আদিমতা ও অন্যদিকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণী এই দুই প্রতীককে এখানে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী।

'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' প্রকাশিত হয়েছিল শারদ প্রতিক্ষণ পত্রিকায় ১৯৮৭ সালে। পিরথা শব্দটি পৃথিবীর সমার্থক। টেরোড্যাকটিল (একই সঙ্গে মিথ ও প্রতীক), এক বিবেকী সাংবাদিক (যে কোনো কিছু করতে একেবারে অক্ষম) এবং এই পৃথিবী (অর্থাৎ দুনিয়াজোড়া আদিম জাতিদের জগৎ) এ ভাবলে হয়তো বুঝতে ইচ্ছুক পাঠক কিছু বুঝতে পারবেন। পূরণ সহায় ছিলেন একজন সাংবাদিক। পূরণের বাবা কম্যুনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আজীবন অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী নিজেও।[১৪]

ভারতের আদিবাসী জনসমাজ টেরোড্যাকটিলের মতোই বিলুপ্ত হতে চলেছে মূল স্রোতের মানুষজনের আগ্রাসী থাবায়। আদিবাসী জনজীবন তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে

নিয়ে বিপন্ন অস্তিত্বের মুখে দাঁড়িয়ে। সভ্যজগৎ ও আদিবাসী জনজীবন যেন সমান্তরালে চলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকার অর্জনের আশায় সভ্যজগৎ যে আগ্রাসী মানসিকতাকে জারণ করে চলেছে তাও একরকমের আত্মঘাতী প্রবণতার সাক্ষ্য বাহী। এই উপন্যাসের বাস্তবতা এতটাই ভয়াবহ যে লেখককে মিথ-কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে।এক সুতীব্র যন্ত্রণা ও আত্ম দংশন এই উপন্যাস রচনার মূলে অস্তিত্ববান। এমনকি আদিবাসী জনসমাজের সমাধিক্ষেত্রও এই আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। এই চিত্র আমরা 'আরণ্যক' উপন্যাসে দেখি।

'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' উপন্যাসটিকে মহাশ্বেতা দেবী তার 'প্রিয়তম' লেখা বলে উল্লেখ করে থাকেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবী একথা জানিয়েছিলেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই উপন্যাসটির তর্জমা করেছেন –'Chotti Munda and His Arrow' নামে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০২ সালে।[১৫] এই উপন্যাস বিরসার উলগুলানের উত্তরাধিকার বহন করে। বিরসা মুণ্ডা, ধানী মুণ্ডা, চোট্টি মুণ্ডার হাত ধরে হাঁটতে থাকে হুল থেকে খেরোয়া বিদ্রোহে। বিরসার উলগুলান ছিল মুণ্ডাদের ঘাটো খাবার প্রতিবাদে। মুণ্ডারা ঘাটো খাবে না। কিন্তু মুণ্ডাদের জীবন এখন জমিদার, মহাজনদের অত্যাচারে জর্জরিত। বেঠবেগারি তাদের নিত্যসঙ্গী। শোষণ অন্য আর এক রূপে তাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে।

চোট্টির কর্মকুশলতায় ও অব্যর্থ তীর ছোঁড়ার পারদর্শিতায় সচ্ছল সংসার। আদিবাসীদের সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে প্রচলিত একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে তারা অপরাধ প্রবণ, দুর্ধর্ষ জাতি ইত্যাদি। মুণ্ডাদের জীবনের সঙ্গে এসব অন্যায়ভাবে জড়িয়ে ছিল। আদিবাসীদের অন্ধকারময় জীবনে আলোক শিখা নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে না। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো তাদের কাছে বিলাসিতা বলে মনে হয়। তারা হারিকেন জ্বালে কালেভদ্রে।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বেড়াজালে প্রতিনিয়ত তাদের জীবনের স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত

হতে থাকে। চোট্টি তার তীর সম্বল করে সমাজ বদল করতে এগিয়ে যায়। একটি জাতিকে রক্ষণ করতে চোট্টির এই প্রয়াস মহাকাব্যিক দ্যোতনা বহন করে। চোট্টির ছিল মহাকাব্যের নায়কের মতো অহংবোধ। এই উপন্যাসে চোট্টির আত্মবিশ্বাস অহংবোধের কাহিনীর দৃঢ় উপস্থাপন লক্ষ্য করার মতো।

'জগমোহনের মৃত্যু', 'রূপালি', 'ডাইনি' প্রভৃতি গল্পে আদিবাসী জনজীবনের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। রূপালি গল্পের আকারগত ব্যাপ্তি পাঠকের মনে সাময়িক ক্লান্তি সৃষ্টি করলেও পাঠ শেষে লেখকের দীর্ঘসূত্রিতার অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। ঘোষ সুবোধ, ভারতের আদিবাসী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি, প্রথম সংস্করণ ১৩৫৫, রথযাত্রা, পৃ-২৩।
২। ঐ, পৃ-২৩
৩। দেবী মহাশ্বেতা, রচনা সমগ্র ৬, দে'জ লেখকের কথা, পৃ-২১।
৪। ঐ, পৃ-৬২।
৫। সরকার পবিত্র, অরণ্য সন্তান শবর খেরিয়া, মা মহাশ্বেতা ও আরও কয়েকজন, ক্যাম্প, কলকাতা - ৭৩, পৃ-৭২।
৬। ঐ, পৃ-১৮।
৭। দেবী মহাশ্বেতা, বিরসা মুণ্ডা, প্যাপিরাস, তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারী ২০০৩, পৃ-১২-১৩।
৮। ঐ, পৃ-৩৪।
৯। দেবী মহাশ্বেতা, রচনা সমগ্র ৮, অরণ্যের অধিকার, পৃ-১১১।
১০। ঐ, পৃ-১৩৬।
১১। দেবী মহাশ্বেতা, অরণ্যের অধিকার, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯, পৃ-২১২।
১২। রায় গৌতম(সংকলক),সাঁওতাল বিদ্রোহের একশ পঞ্চাশ বছর, জুন ২০০৫, প্রবন্ধ সাঁওতাল বিদ্রোহ, সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি, পৃ-১৭৭।
১৩। দেবী মহাশ্বেতা, রচনা সমগ্র ১৫, দে'জ, কলকাতা, পৃ-১২৭।
১৪। ঐ, পৃ-২২৭।
১৫। দেবী মহাশ্বেতা, রচনা সমগ্র ৯, পৃ-২২।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বাংলা ভাষায় মহাভারতআলোচনার সূচনা-পর্ব: বঙ্কিম-পূর্বযুগ

শিবনাথ দত্ত
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ

বর্তমান প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় মহাভারত আলোচনা নিয়ে। বাংলা ভাষায় মহাভারত অবলম্বনে বিভিন্ন সৃজনশীল সাহিত্য যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি তন্নিষ্ঠ আলোচনার পরিমাণও প্রচুর। মহাভারত আলোচনার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই মননশীল রচনাগুলি সম্পর্কে চর্চা সাধারণভাবে কম। বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক তন্নিষ্ঠ মহাভারত আলোচনা উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে। কিন্তু তাঁর পূর্বে বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের রচনায় মহাভারত প্রসঙ্গ এসেছে এবং মহাভারত নিয়ে বর্তমানে মননশীল সাহিত্যের যে বিকাশ আমরা দেখতে পাই, এই সমস্ত রচনাগুলিই তার পশ্চাৎপট। এই পর্বে রামমোহন রায়, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু প্রমুখের রচনায় বিক্ষিপ্তভাবে মহাভারত প্রসঙ্গের আলোচনা লক্ষ করা যায়। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে হলেও আলোচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। সমকালীন সামাজিক আন্দোলন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও জ্ঞানচিন্তার বিভিন্ন আলোচনায় মহাভারতের প্রসঙ্গ প্রায়ই উঠে এসেছে। বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মননশীল সাহিত্যে মহাভারত ধীরে ধীরে তার স্থানটি অধিকার করেছে। পরবর্তী সময়ের মহাভারত আলোচনা সম্পর্কে অল্পবিস্তর চর্চা দেখা গেলেও প্রাথমিক পর্যায়ের মহাভারত আলোচনার বিষয়টি প্রায় আড়ালেই থেকে গেছে বলা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা ভাষায় মহাভারত আলোচনার এই সূচনা-পর্বটির প্রতি দৃষ্টিপাত করব।

সূচক শব্দ

মহাভারত, উনিশ শতক, তন্নিষ্ঠ আলোচনা, সূচনা-পর্ব।

মূল আলোচনা

বাংলা ভাষায় মহাভারতের উপর তন্নিষ্ঠ আলোচনার সেই অর্থে সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ (১৮৮৬) গ্রন্থের মধ্য দিয়ে। এর পূর্ববর্তী বাংলা মহাকাব্য, গীতিকবিতা, নাটক ইত্যাদিতে মহাভারতের কাহিনি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাবন্ধিকদের আলোচনাতেও তেমনি অনেক সময় উঠে এসেছে মহাভারতের ছোট ছোট প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুজন ব্যক্তি হলেন রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিভিন্ন রচনা-প্রসঙ্গে মহাভারতের দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া উনিশ শতকে বঙ্কিম-পূর্ববর্তী সময়ে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের রচনাতেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে মহাভারতের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। পরবর্তিকালে বাংলা ভাষায় মহাভারত আলোচনার যে প্রভূত বিকাশ ঘটেছে, এই পর্বকে তার প্রস্তুতিপর্ব বলে মনে করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় মহাভারত আলোচনার এই সূচনা-পর্ব আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়।

বাংলা ভাষায় বঙ্কিম-পূর্ববর্তী সময়ে মহাভারত সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ব্যক্তি ও তাঁদের রচনার একটি নির্বাচিত তালিকা আমরা তৈরি করে নিতে পারি। যেমন— রামমোহন রায়ের ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ’ (১৮১৮) ‘সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ’ (১৮১৯), ‘সহমরণ বিষয়’ (১৮২৯) প্রভৃতি; গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের ‘স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক’ (১৮২২); ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ (১৮৫০), ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব’ (১৮৫৫), ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক’ (১৮৭৩) প্রভৃতি; তারাশঙ্কর তর্করত্নের ‘ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা’ (১৮৫০); নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুর ‘সংস্কৃত প্রস্তাব’ (১৮৫৯); প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা’ (১৮৭৯) প্রভৃতি। তাঁদের এই সমস্ত রচনায়

মহাভারত-প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে, সময়ানুক্রমিক ভাবে সে-বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়ের বিভিন্ন রচনার মধ্যে অনূদিত রচনার পরিমাণই বেশি। মৌলিক বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বিষয় হিসেবে ব্রাহ্মধর্ম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে তাঁর বেশ কিছু মৌলিক রচনা লক্ষ করা যায়, এর মধ্যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ-বিষয়ক রচনাগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিতর্ক-সূত্রে বিভিন্ন প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ', 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' ও 'সহমরণ বিষয়' এই তিনটি রচনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই রচনাগুলিতে মহাভারতের প্রসঙ্গ মোটামুটি দু'রকম ভাবে এসেছে। প্রথমত, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রসমূহ অনুসারে সহমরণ ও অনুমরণ অবৈধ এটি প্রমাণ করতে গিয়ে গীতার বিভিন্ন দার্শনিক যুক্তি তিনি গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, মহাভারত থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদাহরণ হিসেবে নিয়ে বিরোধীরা সহমরণের বৈধতার সপক্ষে মত দিলে তিনি সেই সমস্ত দৃষ্টান্তের আলোচনার দ্বারা তা খণ্ডন করেছেন। উদাহরণ-সহযোগে বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে।

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রবন্ধে বিতর্কসূত্রে বেশ কয়েকবার মহাভারতের প্রসঙ্গ আমরা লক্ষ করতে পারি। প্রবন্ধে প্রবর্তকের একটি যুক্তি হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, "কপোতিকার ইতিহাসচ্ছলে যাহা ব্যাস লিখিয়াছেন তাহাও শুন।। পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং। তব চিত্রাঙ্গদধরং ভর্তারং সান্বপদ্যত।।– পতিব্রতা যে এক কপোতিকা সে পতি মরিলে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল পরে ঐ কপোতিকা স্বর্গে যাইয়া পতিকে পায়।"[১] নিবর্ত্তকের যুক্তি হিসেবে রামমোহন নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন। সহমরণের পিছনে স্বর্গসুখ-ভোগের কামনা থাকে। রামমোহন তাই এর বিরুদ্ধে নিবর্তকের জবানীতে গীতায় উল্লিখিত ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের কথা একাধিকবার বলেছেন। যেমন– "যেসকল মূঢ়েরা বেদের ফলশ্রবণবাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে

ওই ফলশ্রুতি তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহে আর কহে যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা দেবতাস্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরমপুরুষার্থ করিয়া জানে আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগঐশ্বর্যের প্রলোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমন বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহে অতএব ভোগৈশ্বর্যেতে আসক্তচিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না।"[২] অর্থাৎ সহমরণ বিষয়টির পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয়ক্ষেত্রেই রামমোহন তাঁর যুক্তি মহাভারত থেকে নিয়েছেন বলা যায়। গীতাকে তিনি "সকল স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসের সার"[৩] বলে উল্লেখ করেছেন।

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রবন্ধেও রামমোহন গীতার নিষ্কামকর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং সহমরণে যেহেতু স্বর্গসুখের বাসনা থাকে, সেই কারণে তা প্রশংসনীয় নয় বলে মনে করেছেন।[৪] গীতা থেকে প্রাসঙ্গিক শ্লোক উদ্ধৃত করে তা তিনি বাংলায় অনুবাদও করেছেন। এই বিতর্কে তাঁর বিপক্ষ-ব্যক্তি যুক্তি হিসেবে মহাভারতের মৌষলপর্ব থেকে সহমরণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন তার উত্তর স্বরূপ বলেছেন, "শেষ পরিচ্ছেদে আদ্যোপান্তের শিষ্টতা ব্যবহারের প্রদর্শন তিন বচনের দ্বারা দিয়াছেন; প্রথমত এক কপোতিকা স্বামীর সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, দ্বিতীয় কুটীরাগ্নির দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের শরীর দাহকালে গান্ধারী অগ্নিপ্রবেশ করিলেন; আর বসুদেব বলরাম প্রদ্যুম্নাদির স্ত্রী সকল তাঁহারদের শরীরের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিলেন; এ তিন বৃত্তান্ত দ্বাপরের শেষে অল্পকাল পূর্বপশ্চাৎ হইয়াছিল, অতএব আদ্যোপান্ত প্রদর্শন করিবার নিমিত্তে অন্য অন্য উদাহরণ আপনকারে দেওয়া উচিত ছিল; সেই যাহা হউক, আপনকার বিদিত অবশ্য থাকিবেক, যে পূর্ব্বকালেও একালের ন্যায় কথক লোকমোক্ষার্থী কথক স্বর্গার্থী ছিলেন, এবং কথক পুণ্যাত্মা কথক পাপাত্মা কথক আস্তিক কথক নাস্তিক তাহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ যাঁহারা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন তাঁহারদের স্বর্গ ভোগানন্তর পুনঃ পতন হইত, ঐ সকল শাস্ত্রেই তাহার প্রমাণ আছে।"[৫]

'সহমরণ বিষয়' প্রবন্ধেও গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শের প্রসঙ্গ রামমোহন বারবার উল্লেখ করেছেন। বিরোধী পক্ষের কোনো ব্যক্তি এ-প্রসঙ্গে সমালোচনা করে

বলেছিলেন, "...গীতায় যদি ভগবান্ কাম্য কর্ম্মের নিষেধ করিয়াছেন তবে যুধিষ্ঠিরাদি যে কাম্যকর্ম্ম করিয়াছেন তাহার অনুকূল কিরূপে ছিলেন।।"[৬] রামমোহন প্রত্যুত্তরে বলেছেন, "বিধিনিষেধাত্মক ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং অন্যকেও সেই আজ্ঞানুরূপ উপদেশ করা কর্ত্তব্য– "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যমিত্যাদি" ইহাতে যদি বিপ্রনামা ভগবানের বিধিনিষেধবাক্যকে অতিক্রম করিয়া ভগবান্ যে যে কর্ম্ম করিতে অনুকূল ছিলেন তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পাণ্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদযুক্ত হইলেন, তবে ইহার পর অর্জুনের সাক্ষাৎ মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন ভগবানের আনুকূল্যতায় বিবাহ করিয়াছেন এই নিদর্শনে স্বশিষ্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের উপদেশও দিতে সমর্থ হইবেন, এবং পঞ্চ পাণ্ডবের এককন্যা বিবাহ কৃষ্ণানুকূল্যে হইয়াছে ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া ইহার নিদর্শন দেখাইয়া তদনুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে পারিবেন।"[৭] অন্যত্র একই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি মন্তব্য করেছেন, "...গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারা যে বিধি নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অর্জুন প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত ঐক্য হইলেই মান্য হইবেক, কিন্তু মুগ্ধবোধছাত্রের এরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বধর্ম্মের নাশের কারণ হয়, যেহেতু অস্ত্রত্যাগীর প্রতি অস্ত্রাঘাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে কিন্তু গীতা শ্রবণানন্তর অস্ত্রত্যাগী ভীষ্মকে অর্জুন অস্ত্রাঘাত করিয়াছেন। এবং সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা উভয়ের দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদ করিয়াছেন। এবং পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণাচার্য্যকে কৃষ্ণানুকূল্যে মিথ্যাকথা কহিয়া নষ্ট করিয়াছেন, মুগ্ধবোধ ছাত্র বুঝি এইপ্রকার গুরুবধাদি কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত হইবেন, এবং স্বশিষ্যকেও এইসকল নিদর্শন দেখাইয়া প্রবর্ত্তক রহিবেন, যে পাণ্ডবেরা মিথ্যা কহিয়া গুরু বধ করিয়াছেন অতএব মিথ্যা কহিয়া গুরুহত্যা করিতে পারে। এই ব্যবস্থা দিয়া মুগ্ধবোধছাত্র সকল ধর্ম্মনাশ করিতেছেন কিনা তাহা মুগ্ধবোধ ছাত্রদের অধ্যাপক বিবেচনা করিবেন। এবং মাদ্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহমরণ দেখাইয়া মুগ্ধবোধছাত্র আধুনিক স্ত্রীসকলকে সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেছেন, তবে বুঝি মুগ্ধবোধছাত্র সূর্য্যাদি দ্বারা মাদ্রী ও কুন্তীর পুত্রোৎপত্তি নিদর্শন দেখাইয়া অন্য কোন পরাক্রমী ব্যক্তি দ্বারা স্ববর্গের আধুনিক স্ত্রীলোকেরও পুত্রোৎপত্তি করিতে প্রবৃত্তি দিবেন।"[৮] বিরুদ্ধপক্ষের যুক্তির উত্তর প্রদান করতে গিয়ে মহাভারত সম্পর্কে

রামমোহনের মনোভাবও প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে তিনি গ্রহণ করেছেন।

রামমোহনের রচনায় মহাভারতের প্রসঙ্গ এরকম দু'ভাবে আসতে আমরা লক্ষ করেছি। গীতায় কথিত নিষ্কামকর্মের আদর্শের তিনি প্রশংসা করেছেন এবং সেই আদর্শের উপর ভিত্তি করেই সহমরণ ক্রিয়ার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু মহাভারতের বিভিন্ন বিতর্কিত ঘটনা ও প্রসঙ্গ তিনি নিঃসংশয়ে গ্রহণ না করে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। সহমরণ তাঁর মূল আলোচ্য হলেও মহাভারতের সুভদ্রাহরণ, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্ব, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দ্রোণাচার্যকে হত্যা, নিরস্ত্র ভীষ্মের উপর অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাঁর নিরপেক্ষ এবং বিচার বিশ্লেষণ-মূলক মনোভাব আমরা লক্ষ করি। মহাভারতের যে আদর্শ মানবকল্যাণের পক্ষপাতী, তাকে তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলেও যা মানবসমাজের পক্ষে কল্যাণজনক নয়, সে-বিষয়ে তাঁর কঠোর সমালোচনামূলক মনোভাব ও বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে। সময়ের দিক থেকে যে তা অত্যন্ত আধুনিক এবং উল্লেখযোগ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ' শিরোনামে প্রাচীন ভারতবর্ষের নারী-শিক্ষা সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বিদূষী নারী হিসেবে তিনি যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শকুন্তলা, অনসূয়া, দ্রৌপদী, রুক্মিণী প্রমুখ হলেন মহাভারতের চরিত্র। অধীর দে তাঁর 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "প্রাচীন ভারতবর্ষ যে নারীশিক্ষার বিরোধী ছিল না, সেই ঐতিহ্য-চেতনা জাগ্রত করিবার প্রয়াসই গৌরমোহনের রচনার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।"[৯] তাঁর আলোচনার মূল বিষয় নারীশিক্ষা হলেও মহাভারতের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক মনোভাব আমরা অনুভব করতে পারি। উনিশ শতকের বাংলায় সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা এবং রচনাশৈলীর দিক থেকে রামমোহনের প্রভাব তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তবে মহাভারত সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগের বঙ্গানুবাদ যেমন করেছেন, তেমনি তাঁর বিভিন্ন মৌলিক প্রবন্ধেও মহাভারত-প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে। 'বাল্যবিবাহের দোষ' (১৮৫০) প্রবন্ধে মহাভারতের প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও ভারতবর্ষের সেই সময়কালকে তিনি ইঙ্গিত করে বলেছেন, "ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্য্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল এমত নহে, যেহেতু পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয় সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেইসকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।"[১০] বিদ্যাসাগর মনে করেন প্রাচীন ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না বলেই তখনকার মানুষেরা অত্যন্ত বীর্যবত্তা লাভ করেছিলেন— "কেন না, পূর্ব্বকালে প্রায় সর্ব্বজাতিমধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল, এবং এই সমুদয়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না।"[১১] আমরা জানি যে মহাভারতে স্বয়ম্বর-বিবাহের দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে, যেখানে কন্যা স্বনির্বাচিত বীরপুরুষের কণ্ঠে বরমাল্য দিতে পারতেন।

'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে মহাভারতের আলোচনা না থাকলেও, মহাভারত অবলম্বনে রচিত মহাকাব্য ও নাটকগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' (১৮৫৫) প্রবন্ধে মহাভারত-প্রসঙ্গের উল্লেখ লক্ষ করা যায়। বিধবা-বিবাহের বৈধতার বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ হিসেবে তিনি মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে বলেছেন, "কলিযুগে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র যে ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক, মহাভারতেও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঐরাবত নামক নাগরাজের এক কন্যা ছিল, ওই কন্যা বিধবা

হইলে, নাগরাজ অর্জ্জুনের সহিত তাহার বিবাহ দেন। অর্জ্জুনের ঔরসে সেই দ্বিতীয়বার বিবাহিতা কন্যার গর্ভে ইরাবান্ নামে যে পুত্র জন্মে, সেইপুত্র অর্জ্জুনের ঔরসপুত্র বলিয়া স্পষ্ট নির্দেশ আছে।"[১২] বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা মহাভারতের ঋষি দীর্ঘতমার প্রবর্তিত "ইহলোকে স্ত্রীলোকের এক পতি মাত্র" এই নিয়মের উল্লেখ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তা খণ্ডন করতে গিয়ে উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতুর প্রসঙ্গও উল্লেখ করে বলেছেন যে এই সমস্ত নিয়ম শুধুমাত্র ব্যভিচার নিবারণের জন্যই, তা বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধ বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। তাঁর আরও যুক্তি হল— "সুতরাং, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন সামান্য বিধি, ও পরাশরের বিধান বিশেষ বিধি হইতেছে। সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধি, এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান হয়, ইহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন কদাচ কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধপ্রতিপাদক হইতে পারে না।"[১৩] বিধবাবিবাহ প্রথমপুস্তকে বিদ্যাসাগর দেশাচারকে শাস্ত্র অপেক্ষা দুর্বল বলাতে বিরোধী পক্ষীয়রা অসন্তুষ্ট হন, এই রচনায় তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, "এ স্থলে, দেশাচার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ও স্মৃতি দেশাচার অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ; সুতরাং, দেশাচার অবলম্বন করিয়া, তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ স্মৃতির ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করা, বিচার সিদ্ধ হইতে পারে না।"[১৪]

'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক' (১৮৭৩) রচনার 'সামশ্রমিপ্রকরণ' অংশ থেকে জানা যায় সামশ্রমী মহাশয় পুরুষের বহুবিবাহের সমর্থনে বেদের একটি শ্রুতি উল্লেখ করে তার প্রমাণ হিসেবে মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহের প্রস্তাব শুনে দ্রুপদ বলেছিলেন, "এক পুরুষের বহু স্ত্রী বিহিত আছে, এক নারীর বহু পতি কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।"[১৫] বিদ্যাসাগর এর প্রত্যুত্তরে একই কাহিনি থেকে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহের সমর্থনের দিকটিও উল্লেখ করে বলেছেন, "...যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে ব্যক্ত হইতেছে, জটিলা ও বার্ক্ষী এই দুই মুনিকন্যা যথাক্রমে সাত ও দশ পতি

বিবাহ করিয়াছিলেন; স্ত্রীলোকের বহুপতি বিবাহ কোনও মতে অধর্ম্মকর ব্যবহার নহে। এক্ষণে, সামশ্রমী মহাশয় স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহার উল্লিখিত আখ্যানটির যুধিষ্ঠিরোক্তি রূপ অংশ দ্বারা তাঁহার অবলম্বিত বেদবাক্যের সমর্থন হইতেছে কিনা।"[১৬]

এই রচনার 'কবিরত্নপ্রকরণ' অংশে একটি জায়গায় বিদ্যাসাগর কুন্তী ও দ্রৌপদীর বহুপুরুষ সম্ভোগের বিষয়টি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি কৌতুক প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বিপক্ষের যুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "কোনও সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে মহাভারতের কথা হইয়াছিল। কথা সমাপ্ত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরেই, বাটীর কর্তা জানিতে পারিলেন, তাঁহার গৃহিণী ও পুত্রবধূ ব্যভিচার দোষে দূষিতা হইয়াছেন। তিনি, সাতিশয় কুপিত হইয়া, তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, গৃহিণী উত্তর দিলেন, আমি কুন্তী ঠাকুরাণীর, পুত্রবধূ উত্তর দিলেন, আমি দ্রৌপদী ঠাকুরাণীর, দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিয়াছি। যদি বহুপুরুষসম্ভোগে দোষ থাকিত, তাহা হইলে ওই দুই পুণ্যশীলা প্রাতঃস্মরণীয় রাজমহিষী তাহা করিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেকে পঞ্চ পুরুষের উপগতা হইয়াছিলেন; আমরা তাহার অতিরিক্ত করি নাই। বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী ও পুত্রবধূর উত্তরবাক্য শ্রবণ করিয়া, যেমন আপ্যায়িত হইয়াছিলেন; আমরাও, কবিরত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ আপ্যায়িত হইয়াছি।"[১৭] পরবর্তিকালে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনার এই অংশটির সমালোচনা করে বলেছেন, "এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপিকৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণেও নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।"[১৮] তবে মহাভারতের এই দুই নারী চরিত্র সম্পর্কে নয়, মহৎ চরিত্রের খারাপ দিকগুলিকে অনুকরণের প্রবণতাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন বলে আমাদের মনে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় মহাভারত-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর বিচারমূলক মনোভাব আমরা দেখতে পাই। এই বিচারমূলকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— যা তাঁর সময়ে সমাজের পক্ষে হিতকর, তাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। যেমন— অর্জুনের বিধবাবিবাহ। কিন্তু যা তাঁর বিচারে হিতকর নয়,

তা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেননি। এদিক থেকে রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বিদ্যাসাগরের রচনায় মহাভারত-প্রসঙ্গ রামমোহনের তুলনায় বেশি এসেছে এবং তাঁর অধ্যয়ন ও চিন্তাভাবনা আরো গভীর বলা যায়।

তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা', নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুর 'সংস্কৃত প্রস্তাব', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখা যায়। নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু তাঁর 'সংস্কৃত প্রস্তাব' রচনায় একাধিকবার মহাভারতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের পুরুষদের চরিত্র-আদর্শের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, "আমাদিগের দেশে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে সকলে অনায়াসেই তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং তদনুসারে কার্য্য করিতেও সম্পূর্ণ ভক্তি জন্মে। কিন্তু ভিন্নদেশীয় বিরুদ্ধ প্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মাগণের দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিলে সম্পূর্ণরূপে তাহার মর্ম্মবোধ হয় না, সুতরাং তাদৃক্ ভক্তি ও প্রবৃত্তিও হইতে পারে না।"[১৯] যুক্তি নিষ্ঠার তুলনায় আবেগপ্রবণতা আমরা তাঁর রচনায় বেশি লক্ষ করতে পারি।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' গ্রন্থে মহাভারতের সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রুক্মিণী প্রভৃতি নারী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। তাঁদের বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানের দিকটিই প্যারীচাঁদ মিত্র দেখিয়েছেন। যেমন সাবিত্রীর আচরণ পর্যালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "এই সকল কার্য্যেতে দেদীপ্যমান হয় যে, যাঁহারা আত্মজ্ঞ হয়েন, তাঁহারা নশ্বর বস্তু ও ভাব হইতে অতীত— তাঁহারা মনন্মোয়ী অবস্থায় উপরতিতে পূর্ণ হয়েন।"[২০] দময়ন্তীর পাতিব্রত্য, শকুন্তলার সমাজধর্মের জ্ঞান, গান্ধারী ও কুন্তীর ধর্মজ্ঞান, দ্রৌপদীর শাস্ত্রজ্ঞান ইত্যাদি দিকগুলি তিনি উল্লেখ করেছেন। দ্রৌপদী সম্পর্কে তিনি মহাভারতের বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "অনন্তর দ্রুপদ রাজা আলেখ্য রচনা ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্নপূর্বক শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কন্যা দ্রোণ সন্নিধানে অস্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। পরে দ্রুপদ মহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয় কার্য্য সমাধান করিবার নিমিত্তে দ্রুপদ রাজাকে

অনুরোধ করিলেন।"[২১] সুভদ্রার আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং রুক্মিণীর বিদ্যাভ্যাসের উল্লেখও তিনি করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী এইসমস্ত রচনায় মহাভারতের প্রসঙ্গ উঠে এলেও সেই তুলনায় যুক্তিনিষ্ঠা, বিচার-বিশ্লেষণ ও নিরপেক্ষ ভাবনার পরিচয় আমরা পাই না। পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আবেগপ্রবণতা তাঁদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ফলত তাঁদের রচনায় কিছুটা পক্ষপাত দোষ লক্ষ করা যায়, গবেষণার পরিভাষায় যাকে 'Expectancy bias' বলা হয়। এছাড়া, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের রচনায় উৎস-নির্দেশের ক্ষেত্রে যে আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে, তাও আমরা এই সমস্ত রচনায় ততটা পাই না। অর্থাৎ রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মহাভারত আলোচনায় প্রবন্ধের যে আঙ্গিক সচেতনতা আমরা দেখতে পাই, সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের মধ্যে তা ততটা পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় মহাভারতের আলোচনা বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই অর্থে পূর্ণবিকাশ এই পর্বে না ঘটলেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে মহাভারতের আদর্শ ও ঘটনার দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে বাংলা মননধর্মী সাহিত্যে মহাভারত তার জায়গা করে নিয়েছে। তৎকালীন সমাজ-সংস্কার আন্দোলন এবং সামাজিক চিন্তাভাবনার আলোচনার ক্ষেত্রে মহাভারত-প্রসঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয়। পরবর্তিকালে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে মহাভারত-আলোচনার যে বিকাশ আমরা লক্ষ করি, তার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে প্রথমপর্বের রচনাগুলির গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১। রায়., রা.(২০১৫). রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা: রামমোহন মিশন.
২। রায়., রা.(২০১৫). রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা: রামমোহন মিশন.
৩। রায়., রা.(২০১৫). রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা: রামমোহন মিশন.
৪। রায়., রা.(২০১৫). রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা: রামমোহন মিশন.

৫। রায়., রা.(২০১৫). রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা: রামমোহন মিশন.
৬। রায়., রা.(২০১৫). রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা: রামমোহন মিশন.
৭। রায়., রা.(২০১৫). রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা: রামমোহন মিশন.
৮। রায়., রা.(২০১৫). রামমোহন রচনাবলী, কলকাতা: রামমোহন মিশন.
৯। দে., অ.(২০১২). আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির.
১০। বিদ্যাসাগর., ঈ.(২০১৯). বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মেদিনীপুর:বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ.
১১। বিদ্যাসাগর., ঈ.(২০১৯). বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ.
১২। বিদ্যাসাগর., ঈ.(২০১৯). বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ.
১৩। বিদ্যাসাগর., ঈ.(২০১৯). বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ.
১৪। বিদ্যাসাগর., ঈ.(২০১৯). বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ.
১৫। বিদ্যাসাগর., ঈ.(২০১৯). বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ.
১৬। বিদ্যাসাগর., ঈ.(২০১৯). বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ.
১৭। বিদ্যাসাগর., ঈ.(২০১৯). বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), মেদিনীপুর: বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ.
১৮। ভাদুড়ী.,নৃ.(২০১৮). কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.
১৯। ন্যায়চুঞ্চু., ন.(১৮৫৯). সংস্কৃত প্রস্তাব, শিবপুর: ন্যায়রত্ন যন্ত্র.
২০। মিত্র.,প্যা.(১৮৭৮). এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, কলিকাতা: বাল্মীকি যন্ত্র.
২১। মিত্র.,প্যা.(১৮৭৮). এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, কলিকাতা: বাল্মীকি যন্ত্র.

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প : একটি ভাষাশৈলী সন্ধানে

ড. শ্যামল রায়
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস

সারসংক্ষেপ

প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্য জীবনে ছোটগল্পকার হিসেবে বেশি পরিচিত। তাঁর গল্পের বিষয় বস্তুতে বিচিত্ররূপ রয়েছে– দরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র, জীবনের অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, প্রতিহিংসা, বিদ্রোহী মনোভাব, দ্বন্দ্ব-কলহ, যৌনতা, প্রেম ইত্যাদি। সর্বোপরি রচনার নিজস্বতা, ভাষা ব্যবহার, বাক্যরীতি, বর্ণনা, সংলাপ, কথনভঙ্গি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্পে ফুটে উঠেছে ভাষাশৈলীর বিবিধ প্রসঙ্গ। ফলে, তাঁর লেখনীসত্তার নির্মাণকৌশলে দেখা যায় ভাষা ব্যবহারের এমন এক ব্যঞ্জনা, যা গল্পগুলিতে ভাষাশৈলীর অভিনবত্ব স্পষ্ট হয়েছে।

সূচক শব্দ

বিষয়ের গভীরতা বা রূপবিন্যাসের অনন্যতা। নির্মাণ শিল্পের বহুরূপ।

মূল আলোচনা

লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশই হল 'শৈলী'। অনেকে 'শৈলী' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Style' বলে অভিহিত করেছেন। যার আগমন ল্যাটিন শব্দ 'Stilus' থেকে। 'Style' শব্দ থেকেই ইংরেজি 'Stylistics' কথাটি এসেছে। এই 'Stylistics' শব্দটি প্রথম ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি অক্সফোর্ড অভিধানে ব্যবহৃত হয়। যা বর্তমানকালে 'Stylistics' শব্দটি বাংলায় 'শৈলীবিজ্ঞান' হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। অষ্টাদশ শতক, উনিশ শতক ও বিংশ শতকে শৈলী নিয়ে বিশেষ সমালোচনা থাকলেও প্রাচ্যে শৈলীচর্চার ধারণা নিঃসন্দেহে নতুন।

ভাষার একটি প্রধান গুণই হল গতিশীলতা। প্রতিনিয়তই তার বিবর্তন ঘটতে থাকে। ফলত, মানুষের মুখে ব্যবহৃত ভাষারও সময়ের সাথে সাথে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। যার প্রভাব পড়ে লিখিত ভাষা-রূপেও। কথ্য ও লেখ্য উভয়ের সম্মিলিতরূপ কোনো বিশেষ ভাষার যথার্থ অবয়ব, একথা স্বীকার্য। তবে ভাষাগত বিশ্লেষণে মূলত ব্যবহৃত হয় গ্রামীণ মানুষের আঞ্চলিক কথ্যভাষা, আঞ্চলিক সংলাপ, আঞ্চলিক ধ্বনিগত বৈচিত্র্য ইত্যাদি। অন্যদিকে 'সাহিত্যশৈলী' হল লেখকের নিজস্বতা। শৈলীর মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয় বাক্যের গঠন, আন্বয়িক বিচ্যুতি, বাক্যের সমান্তরাল ব্যবহার, রূপতত্ত্ব, যতিচিহ্ন প্রভৃতির বিচার বিশ্লেষণ। এছাড়াও প্রয়োগ ঘটেছে সংলাপ, বিভিন্ন শব্দচয়ন, স্তবক, অনুচ্ছেদ এমনকি লেখক ও চরিত্রের কথনরীতিও।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এক ভিন্ন নাম। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পের শাখাটিকেও তিনি অত্যন্ত সমুজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে দরিদ্র মানুষের জীবনালেখ্য চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, বিদ্রোহী মনোভাব, সাংকেতিকতার পরিচয়, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদিও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আঙ্গিক সচেতন ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ। আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি গল্পের ভাষাশৈলী বিচার বিশ্লেষণ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলিতে 'ভাষাশৈলী' আলোচনায় বেশ কিছু ধ্বনিগত ভাষিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন –

স্কুল > ইস্কুল [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৫] = আদি স্বরাগম
স্টেশন > ইষ্টিশান [লেভেল ক্রসিং, পৃ-২০০] = আদি স্বরাগম
সকল > সক্কল [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩২] = মধ্য ব্যঞ্জনাগম
বড়ো > বড্ডো [পুন্নাম, পৃ-২২] = অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম
লক্ষ্মী > লখ্‌খি [পুন্নাম, পৃ-১৬] = সমীভবন
কখনো > কখ্‌খনো [পুন্নাম, পৃ-১৬] = সমীভবন

বেটা > ব্যাটা [লেভেল ক্রসিং, পৃ-১৯৯] = স্বরসঙ্গতি ইত্যাদি।

ক্রিয়ার বিবিধ বৈচিত্র্য : তাঁর গল্পের অধিকাংশ ক্রিয়াপদে সাধুভাষার বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এই ক্রিয়াগুলি অর্থাৎ অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রত্যয়যুক্ত হয়ে আঞ্চলিকতা বা সাধুভাষার রূপ নিয়েছে। ক্রিয়াগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল -

• 'ইয়া' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া– [এখানে 'ই'-এর ক্ষীণ উচ্চারণ হয়েছে] যেমন– ল^{ই}য়া [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪], হ^{ই}য়া [হয়তো, পৃ-৩৮]

এছাড়াও, বসিয়া [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪], দেখিয়া [হয়তো, পৃ-৩৯], বসিয়া [সাগর সংগম, পৃ-৫৩], ধরিয়া [সাগর সংগম, পৃ-৫৮], উঠিয়া [পুনর্মিলন, পৃ-১৪৫], থামিয়া [শৃঙ্খল, পৃ-১৫৬]।

• 'ইবে' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া - [এখানে 'ই'-এর ক্ষীণ উচ্চারণ হয়েছে] যেমন - হ^{ই}বে [হয়তো, পৃ-৪২],মারিবে [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৬]।

• 'ইত', 'ইতে' প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া - [এখানে 'ই'-এর ক্ষীণ উচ্চারণ হয়েছে] যেমন – হ^{ই}ত [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩], হ^{ই}তে [হয়তো, পৃ-৩৯], যা^{ই}তে [সাগর সংগম, পৃ-৫৮], খা^{ই}তে [সাগর সংগম, পৃ-৬২]

এছাড়াও, পারিত [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৮],করিতে [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪], থাকিতে [হয়তো, পৃ-৪৬], উঠিতে [সাগর সংগম, পৃ-৬২], বলিতে [পুনর্মিলন, পৃ-১৪৪]।

• 'ইল' ও 'ইলে' প্রত্যয় যোগে সমাপিকা ক্রিয়া - [এখানে 'ই'-এর ক্ষীণ উচ্চারণ হয়েছে] যেমন– হ^{ই}ল [হয়তো, পৃ-৩৯], হ^{ই}লে [সাগর সংগম, পৃ-৫৫] এছাড়াও, রাখিল [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫], বসিল [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫], করিল [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫]।

• সমাপিকা ক্রিয়ায় 'ইস' প্রত্যয় গঠিত হয়েছে। যেমন– পারিস [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩০], করিস [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩০]।

• নামপদে 'ঈ' প্রত্যয় দেখা যায়। যেমন – সরকার + ঈ = সরকারী [লেভেল ক্রসিং, পৃ-২০৪], পোশাক + ঈ = পোশাকী [লেভেল ক্রসিং, পৃ-২০৩]।

• সমাপিকা ক্রিয়াপদে 'উক' ও 'উম' প্রত্যয় যোগ হয়েছে গল্পগুলিতে। যেমন – বলুক [সাগর সংগম, পৃ-৬২], দিতুম [সাগর সংগম, পৃ-৬২], দেখছিলুম [হয়তো, পৃ-৪০], যাচ্ছিলুম [হয়তো, পৃ-৪৪], যেতুম [সাগর সংগম, পৃ-৬৭], চাইলুম [সাগর সংগম, পৃ-৫৪], বলেছিলুম [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩৩]।

• গল্পগুলিতে বিশেষ্যপদে নির্দেশক প্রত্যয় দেখা যায়। যেমন – শিখাটি [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৬], কথাগুলো [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫],ঘণ্টাখানেক [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫], হাতখানা [সাগর সংগম, পৃ-৬১], মুখখানি [সাগর সংগম, পৃ-৬৩], ঘরটা [পুনর্মিলন, পৃ-১৩৭], হাতটা [হয়তো, পৃ-৪১], দুইটি [শৃঙ্খল, পৃ-১৫৩]।

• অপিনিহিতি 'ই' ঘটিয়ে সমাপিকা ক্রিয়াগঠিত হয়েছে। যা ভাষাশৈলীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন– নিয়েছিল > ল^{ই}য়াছিল [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৯], পেয়েছিলাম > পা^{ই}য়াছিলাম [হয়তো, পৃ-৪০], দাঁড়িয়েছে > দাঁড়া^{ই}য়াছে [সাগর সংগম, পৃ-৫৩], হচ্ছেন > হ^{ই}তেছেন [পুনর্মিলন, পৃ-১৩৮], যাচ্ছিলেন > যা^{ই}তেছিলেন [শৃঙ্খল, পৃ-১৫৬]।

সমাপিকা ক্রিয়ায় কাল-এর বিবিধ রূপ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের উল্লিখিত গল্পগুলিতে ক্রিয়ার বিবিধ কাল ধরা পড়েছে। যেমন –

• এসেছি > আসিয়াছি [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪] = উত্তম পুরুষে পুরাঘটিত বর্তমানকাল

• দিলাম [হয়তো, পৃ-৩৮] = উত্তম পুরুষে ঘটমান অতীতকাল

• বুঝেছিস [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩৪] = মধ্যম পুরুষে পুরাঘটিত বর্তমানকাল

• দেখেছিস [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩১] = মধ্যম পুরুষে পুরাঘটিত বর্তমানকাল

• করেছে > করিয়াছে [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫] = নাম পুরুষে পুরাঘটিত বর্তমানকাল

• পৌঁছেছে > পৌঁছিয়াছে = নাম পুরুষে পুরাঘটিত বর্তমানকাল

• এল > আসিল = নাম পুরুষে সাধারণ অতীতকাল

• আছেন [সাগর সংগম, পৃ-৫৭] = নাম পুরুষে সম্মানার্থে পুরাঘটিত বর্তমানকাল

• করবেন > করিবেন [সাগর সংগম, পৃ-৬১] = নাম পুরুষে সম্মানার্থে পুরাঘটিত বর্তমানকাল

বেড়িয়েছেন [পুনর্মিলন, পৃ-১৪১] = নাম পুরুষে সম্মানার্থে পুরাঘটিত বর্তমানকাল।

সর্বনামযুক্ত সাধুভাষায় গঠিত শব্দ :

তাহা [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪] = একবচনে

তাহার [হয়তো, পৃ-৩৮] = একবচনে

যাহার [সাগর সংগম, পৃ-৬৬] = একবচনে

যাহাদের [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪] = বহুবচনে

ইয়াদের [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪] = বহুবচনে

উহাদের [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৬] = বহুবচনে

ইয়াদের [হয়তো, পৃ-৪৫] = বহুবচনে

তাহাদের [হয়তো, পৃ-৪৯] = বহুবচনে

তাহারা [সাগর সংগম, পৃ-৫৯] = বহুবচনে।

সন্ধিযুক্ত গঠিত শব্দ :

ধুমোদ্গীরণ [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৬], বৃষ্টিধারাবৃত [হয়তো, পৃ-৩৮], সহানুভূতি [পুনর্মিলন, পৃ-১৪৩], প্রশ্নোত্তর [হয়তো, পৃ-৪৩], আনন্দোজ্জ্বল [পুন্নাম, পৃ-২০]।

সমাসবদ্ধপদ :

বর্ষণধ্বনিমুখর [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪], উদ্দেশ্যবিহীনভাবে [হয়তো, পৃ-৫২], পুত্রপৌত্রাদিক্রমে [পুন্নাম, পৃ-২৩]।

আবার কখনো কখনো গল্পগুলির সংলাপে দেখা দিয়েছে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত। যেমন –

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : ভোঁ-ভোঁ [পুন্নাম, পৃ-১৬], খোঁচা-খোঁচা [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৬], ফুঁ [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৫], হুঁশ [লেভেল ক্রসিং, পৃ-২০৪], ভ্যাবাচ্যাকা [লেভেল ক্রসিং, পৃ-১৯৯]।

অনুকার শব্দ : ওষুধ-টোষুধ [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩৬], সেমিজ-টেমিজ [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩৬], অসুখ বিসুখ [পুনর্মিলন, পৃ-১৪২], রান্না-বান্না [পুন্নাম, পৃ-১৮]।

শব্দদ্বৈত : শুনতে শুনতে [পুন্নাম, পৃ-২২], বড়ো-বড়ো [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৫], কইতে কইতে [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৫], কালো-কালো [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৬], ঢুকতে ঢুকতে [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৯], মাঝে মাঝে [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩৪]।

এছাড়াও, সৃষ্ট চরিত্রের সংলাপে ইংরেজি শব্দ গঠিত হয়ে দীর্ঘ বাক্য তৈরি হয়েছে। যেমন–

- Temporary mud barrack [মৃত্তিকা, পৃ-৭১]
- This will be small boon to them [মৃত্তিকা, পৃ-৭১]
- Have you any idea [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৭]।

বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত শব্দে গঠিত হয়েছে বাক্যও দেখা যায় তাঁর গল্পগুলিতে। যেমন–

- একটু ফ্রেণ্ডলি অ্যাড্‌ভাইস দিলাম, কিছু মনে করবেন না যেন! [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৯]
- আমার কিন্তু মীট অ্যান্ড ডিঙ্ক মশাই। [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩০]
- চোখ, কান ও হাতের সেন্সশান সমস্ত দিয়ে ব্রেন নলেজ্‌টা রিসিভ করে কিনা! [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩১]।

উক্ত গল্পগুলিতে হিন্দি শব্দ যোগে তৈরি হয়েছে বাক্য। ফলে গল্পগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে শৈলী। যেমন–

- হিঁয়া ভিখ নেহি মিলেগা। [মৃত্তিকা, পৃ-৭২]
- কৌন ভাড়া লেগা? তুম [মৃত্তিকা, পৃ-৭৩]
- আভি দেনে হোগা। [মৃত্তিকা, পৃ-৭৩]
- তুমরা নাম কেয়া --- বাৎলাও। [মৃত্তিকা, পৃ-৭৩]।

সংস্কৃত শব্দ, তৎসম শব্দ, বিদেশি শব্দ যোগে হয়েছে গল্পের বাক্য। যেমন -

সংস্কৃত শব্দ : আকস্মিক [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫], সহিত [হয়তো, পৃ-৪১], সহসা [হয়তো, পৃ-৪১], কদাচিৎ [মৃত্তিকা, পৃ-৭৪], অকস্মাৎ [মহানগর, পৃ-৯২] ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ : বৃষ্টি [মৃত্তিকা, পৃ-৯২], আকাশ [মৃত্তিকা, পৃ-৯২], সূর্য [মৃত্তিকা, পৃ-৯২], নদী [মৃত্তিকা, পৃ-৯২]।

আরবি শব্দ : হাকিম [লেভেল ক্রসিং, পৃ-২০২]।

ফারসি শব্দ : কাগজ [লেভেল ক্রসিং, পৃ-২০৩], আইন [লেভেল ক্রসিং, পৃ-২০৩]।

পোর্তুগিজ শব্দ : বারান্দা [পুন্নাম, পৃ-২২] ইত্যাদি।

আলংকারিক অব্যয় 'তো' ঘটেছে বাক্যগুলিতে। যেমন–

- নেশার ঝোঁকে সে তো আর বাদ বিচার করিবে না। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫]
- সে তো তখন ইচ্ছা করিলে চেঁচাইয়া বাড়ির সকলকে জাগাইয়া তুলিতে পারিত। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৮]
- আমি তো পেরথমে ছাড়াতেই নারলুম। [সাগর সংগম, পৃ-৫৮]

সংযোজক অব্যয়ও ঘটেছে বাক্যগুলিতে। যেমন –

- ছিল, কিন্তু অমনি দেখবার পাস ছিল না। [শৃঙ্খল, পৃ-১৬১]
- বিমলা কাছেই থাকে বলিয়া মা ইতিপূর্বে দু-একবার তাহাকে আনাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সফল হয় নাই। [পুনর্মিলন, পৃ-১৪১]
- লক্ষ্মণ এ অভিশাপে শিহরিয়া ওঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার তাহার কিছুই নাই। [সাগর সংগম, পৃ-৫৩]

আবার সন্দেহসূচক অব্যয়ও গল্পের বাক্যে। যেমন–

- কিংবা হয়ত হতাশার শেষ সিমায় সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ---। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪]
- বোধ হয় হ্যাঙ্গামের ভয়েই শুধু পুলিশে দিতে তাহারা বাকি রাখিল। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৯]

- মেজেতে কোনো কালে বোধহয় সিমেন্ট দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহার চিহ্নও নাই। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৬]

তাঁর গল্পের চরিত্রদের দ্রুত উচ্চারণের ফলে 'চ' এর অর্ধস্বর ঘটেছে। যেমন–

[চ < চল]

- চ, তোর ঘরে চ। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫]
- চ, একেবারে দিল্লী আগ্রাই যাব চলে। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩৪]
- চ, তোকে নিয়ে কোথাও পালাই। [হয়তো, পৃ-৪৫]

কখনো কখনো গল্পকার 'কিন্তু' এবং 'হয়তো' শব্দ দিয়ে বাক্যগুলি শুরু করেছেন। যেমন –

'কিন্তু' শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু :

- কিন্তু চুরি যা হইবার রজনীরই হইয়াছে। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৮]
- কিন্তু সচকিত হইয়া সে হাত সরাইয়া লইতেই ভূপতির উচ্চহাসি শনা গেল। [শৃঙ্খল, পৃ-১৫৪]
- কিন্তু দরজার ওদিক হইতে কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেল না। [হয়তো, পৃ-৪৮]
- কিন্তু সকালবেলা তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠেন। [সাগর সংগম, পৃ-৫৭]

'হয়তো' শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু :

- হয়তো এই দুর্যোগের রাত্রেও মাতাল হইয়া কেহ এ পথে আশ্রয়ের সন্ধানে আসিতে পারে! [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫]
- হয়তো চামচিকাই হইবে, কিন্তু লাবণ্যের ভয় যায় নাই। [হয়তো, পৃ-৪৩]
- হয়তো কথাটা সত্য ! কিন্তু লাবণ্যের মনে কেমন একটি সন্দেহ জাগিতে থাকে। [হয়তো, পৃ-৪৪]

দেখা যায় তাঁর গল্পগুলিতে সমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে শেষে 'রহিল' শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলি শেষ করেছেন। যেমন –

- লোকটা 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৭]

- সেইদিকে চাহিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া স্বামী খানিক চুপ করিয়া রহিল। [হয়তো, পৃ-৪৪]
- মুঠাই যাহা ধরিয়াছিলেন, সেটাই তাঁহার আড়ষ্ট হাতে জড়াইয়া রহিল। [সাগর সংগম, পৃ-৫৭]

অতিরিক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ঘটিয়ে বাক্যকে দীর্ঘায়িত করেছেন। ফলে বাক্যগুলি সুমধুর হয়ে উঠেছে। যেমন –

- বাড়িওয়ালীর ধমক খাইয়া ভয় বিহ্বল রজনী তাহাকে আসিয়া তুলিয়া ধরিয়া চেষ্টা করিতে গেলে সে নিজেই কষ্ট করিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে রজনীর কাঁধে ভয় দিয়া তারই ঘরে গেল। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩০]
- এ-কথার উত্তর কী বলিতে হইবে কিছু বুঝিতে না পারিয়া লাবণ্য চুপ করিয়া থাকে। [হয়তো, পৃ-৪৩]
- মুখটা একটু কাছে লইয়া গিয়া ভালো করিয়া নজর করিয়া চাহিতেই সব পরিষ্কার হইয়া গেল। [সাগর সংগম, পৃ-৫৬]
- হঠাৎ বিনতি সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। [শৃঙ্খল, পৃ-১৫৯]

গল্পকার বাক্যের শুরুতে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমন –

- বলিয়া রজনী শেষ পর্যন্ত নিজেই টাকাগুলা তুলিয়া লইয়া গিয়াছ। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩২]
- নিয়ে এলাম বৌটাকে! [লেভেল ক্রসিং, পৃ-২০৫]
- দেখিয়া বুঝি অজ্ঞাতে একটু শিহরিয়া উঠিল। [হয়তো]
- ব'লে লালিত শিশুকে কোলে নেবার চেষ্টা করে। [পুন্নাম, পৃ-১৭]

আবার কোন কোন বাক্যের শেষেও অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন –

- তিনি সব জানিয়া শুনিয়া এ মেয়েটির শুধু মুখখানি দেখিয়া খানিকক্ষণ এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন কেমন করিয়া। [সাগর সংগম, পৃ-৬৩]

গল্পগুলির বাক্যের শেষে সাধুভাষা হিসেবে সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

যেমন –

- ছেঁড়া জুতা দুইটা পা হইতে খুলিয়া উপুড় করিয়া ধরিতেই পোয়াখানেক ময়লা জল তাহা হইতে বাহির হইল। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৭]
- স্বামির হাত ধরিয়া নীরবে চলিতে শুরু করিল। [হয়তো, পৃ-৫২]
- হঠাৎ অনতিদূরে মেয়েটার মাথাটা ভাসিয়া উঠিল। [সাগর সংগম, পৃ-৫৭]

সমাপিকা ক্রিয়াটি চলিতভাষায় রচিত হয়ে বাক্য তৈরি করেছে। যেমন –

- কাদার ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে কে যেন ছুটিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫]
- আরো ঘণ্টাখানেক এই ভাবেই কাটিয়া গেল। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫]
- আবার স্বামী আসিবার পূর্বে মাধুরী তাহাকে ঘরের ভিতর পুড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখে। [হয়তো, পৃ-৪৯]
- বিমলা খানিক চুপ করিয়া থাকে। [পুনর্মিলন, পৃ-১৪৫]

ক্রিয়াহীন বাক্যও লক্ষ করা যায় গল্পগুলিতে। যেমন–

- ভয়ানক গন্ধ স্যার। [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩০]
- তুমি ভারী দুষ্টু। [হয়তো, পৃ-৪৫]
- সেইটুকুই মজা। [পুন্নাম, পৃ-২৪]

অসমাপ্ত বাক্যেরও প্রচুর ব্যবহার রয়েছে গল্পগুলিতে। ফলে পাঠকদের মনে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন –

- আমি পুলিশ ডাকব। আমি ---। [মৃত্তিকা, পৃ-৭৮]
- তুমি মিছি-মিছি ফুলের মালা কেনবার জন্য হেঁটে এসেছ ভেবে ---। [শুধু কেরানী, পৃ-১২]
- ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু ---। [শুধু কেরানী, পৃ-১৪]
- এখানকার নির্জীব স্থবিরতার মাঝে ও-ই যেন একটুখানি সজীব চঞ্চলতা ---। [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-৩১]

তাঁর গল্পগুলিতে যতিচিহ্নের ব্যবহারও ঘটেছে খুব সুন্দর ভাবে। কখনো কমা (,),

কখনো ডেশ (-), কখনো সেমিকোলন (;), কখনো পূর্ণচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। যেমন –

- জলে ডুবিয়া মরিতে মরিতে কোনোরকমে তিনি উদ্ধার পাইয়াছেন, এইটুকুই শুধু বুঝিতে পারেন, কেমন করিয়া এই অপরিচিত নৌকায় স্থান পাইয়াছেন, কে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছে, কিছুই তাঁহার স্মরণ হয় না। [সাগর সংগম, পৃ-৫৭]
- নাগালের অত্যন্ত কাছে কালো হালের কাঠটাও তখনও ভাসিতেছিল, দাক্ষাময়ী হাত বাড়াইয়া সেটা ধরিবার চেষ্টা করিলেন – হাত তাঁহার উঠিল না। [সাগর সংগম, পৃ-৫৭]
- সারাক্ষণ মুগ্ধ হইয়া থিয়েটার দেখিয়াছেন এবং গভীর রাত্রে ছ্যাকরা গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় থিয়েটারের নটীরা সত্যই সুন্দর, না রঙ মাখিয়া এমন রূপবতী হইয়া থাকে ; ঘর পোড়ার দৃশ্যে সত্যই রঙ্গমঞ্চে আগুন লাগিয়াছিল কিনা ইত্যাদি সমস্যার আলোচনায় এমন তন্ময় হইয়াছিলেন, যে আর কিছু লক্ষ্য করিবার সময় পান নাই। [পুনর্মিলন, পৃ-১৩৮]

তাঁর গল্পের কিছু কিছু বাক্য সর্বনাম পদ দিয়ে শুরু হয়েছে। যেমন –

- যাহারা মারিয়াছিল তাহাদের অনেকেই পুলিশের ভয়ে রাগটা তখন রজনীর উপর গিয়া পড়িয়াছে। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩০]
- তাহাদের কথা ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। [হয়তো, পৃ-৪০]
- তাঁহার ব্যবহারে সাহস পাইয়া বাতাসি মুখ খুলিয়া দ্বিধা করে নাই। [সাগর সংগম, পৃ-৬২]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলিতে প্রতিনির্দেশকের ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষিত। তবে প্রতিনির্দেশক ব্যবহার করে একাধিক বাক্যখণ্ডকে সংযুক্তি ঘটিয়েছেন। যেমন –

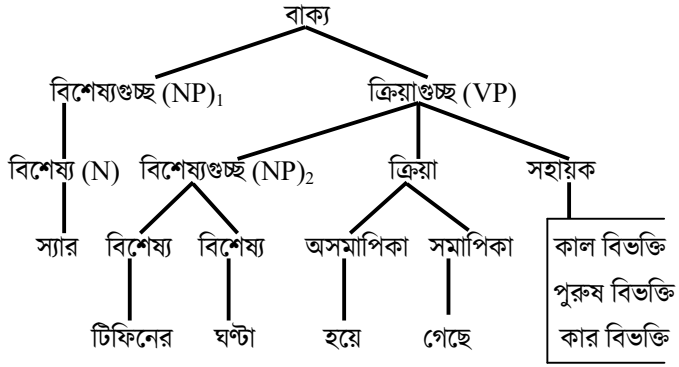
- যেখানটায় পা রাখিয়াছিল সেখানেই কাদা হইয়াছে প্রচর। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৫] যেখানটায় – সেখানেই = প্রতিনির্দেশক
- যেটুকু ছিল বৃষ্টিতে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১২৪] যেটুকু – তাহা = প্রতিনির্দেশক

- কেহ যদি শুধু হাতটা বাড়াইয়া একবারটি তাহাকে ধরে তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়। [হয়ত, পৃ-৪১] যদি – তাহা = প্রতিনির্দেশক

বিচ্যুতিও ঘটেছে তাঁর গল্পগুলিতে। তবে গল্পগুলিতে বাক্যগঠন প্রক্রিয়াটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের বাক্যগঠন প্রক্রিয়ায় কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া রূপটিই সর্বদাই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন -

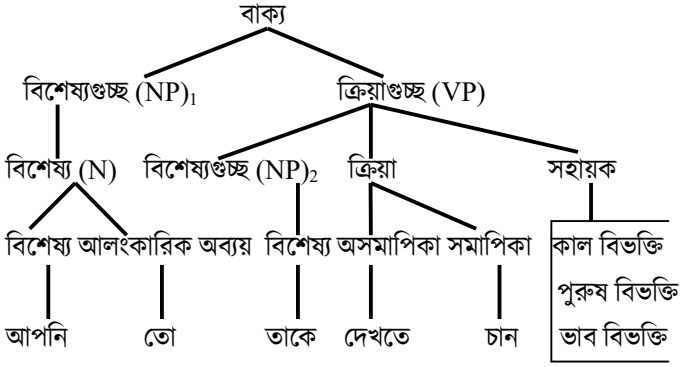
- টিফিনের ঘণ্টা হয়ে গেছে স্যর ! [ভবিষ্যতের ভার, পৃ-২৭]

আদর্শ গঠন – স্যার টিফিনের ঘণ্টা হয়ে গেছে !



- আপনি দেখতে চান তো তাকে ? [সাগর সংগম, পৃ-৬৯]

আদর্শ গঠন – আপনি তো তাকে দেখতে চান ?



এছাড়াও, তাঁর গল্পে সাধুভাষার বাক্যবন্ধনে একটা বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। যা বাক্যটি একই প্রকার বাক্যাংশে ক্রমিক বিন্যাসের ফলে 'সমান্তরাল'-এ পরিণত হয়েছে। যেমন–

- জিজ্ঞাসা করিতে কোর্ট ইনস্পেক্টার গড় গড় করিয়া যাহা বলিয়া গেল তাহার অর্থ এই যে, আসামীর নাম অঘোর দাস, লোকটা দাগী চোর, ইতিপূর্বে বার পাঁচেক জেল খাটিয়াছে। [সংসার সীমান্তে, পৃ-১৩৫]

উক্ত বাক্যে চালক (Operator) হল– জিজ্ঞাসা করিতে কোর্ট ইনস্পেক্টার গড় গড় করিয়া যাহা বলিয়া গেল তাহার অর্থ এই যে,

আর চল (Variable) অংশগুলি হল– আসামীর নাম অঘোর দাস = Parallel $Constraint_1$

লোকটা দাগী চোর = Parallel $Constraint_2$

ইতিপূর্বে বার পাঁচেক জেল খাটিয়াছে = Parallel $Constraint_3$

- হ্যাঁ রে, এখনো প্ল্যান দিয়ে গেল না, কবে স্যাংশন হবে, কবে বাববাড়ির কাজ আরম্ভ হবে? [অনাবশ্যক, পৃ-৯০]

উক্ত বাক্যে চালক (Operator) হল– হ্যাঁ রে, এখনো প্ল্যান দিয়ে গেল না

আর চল (Variable) অংশগুলি হল– কবে স্যাংশন হবে = Parallel $Constraint_1$

কবে বাববাড়ির কাজ আরম্ভ হবে = Parallel $Constraint_2$

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় বিশেষ করে ছোটগল্পের মধ্যে নিজস্বতার পরিচয় আজও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর প্রতিটি গল্পে উঠে এসেছে একটি বিশিষ্ট রচনা। যা কিনা তিনিআত্মিক সহবন্ধনে গেঁথে দিয়েছেন কাহিনীর কথামালার সুরকে। গল্পের একদিকে যেমন দেখা গিয়েছেগ্রামীণ মানুষের প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে তেমনি তুলে এনেছেন জীবনের মর্মান্তিক সুরকে। যারপ্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে এই গল্পগুলিতে। ভাষাশৈলীর বিশ্লেষণে এটি একটি নতুন রচনারীতি। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ। যা উক্ত আলোচনায় আমরা সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। চক্রবর্তী, উদয়কুমার : 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২, কলকাতা।

২। দে, আশিস কুমার : 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান', পুস্তক বিপনি, ১৯৯২, কলকাতা।

৩। মাইতি, ড. প্রকাশকুমার : 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা : শৈলীবিচার ও পাঠ বিশ্লেষণ', সাহিত্য সঙ্গী, ২০১১, কলকাতা।

৪। চক্রবর্তী, সুমিতা : 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, ২০০৪, কলকাতা।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ; দাম্পত্যসংকট ও সমাজবিগর্হিত প্রেমের পত্রগাথা

শ্রুতকীর্তি সরকার
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

'দম্পতি' এই সম্পর্কের মূলভিত্তি প্রেম, বিশ্বাস ও মানসিক বোঝাপড়া। কিন্তু সময়, সমাজ ও সংস্কারের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় জন্ম হয় দাম্পত্যসংকট। অন্যদিকে সমাজনির্দিষ্ট নিয়ম ব্যতিরেকে নর-নারীর সম্প্রীতিকে অভিহিত করা হয় সমাজবিগর্হিত সম্পর্ক রূপে। আধুনিক জীবনের অন্যতম সমস্যা দাম্পত্যসংকট ও সমাজ-নীতি বহির্ভূত প্রেম। উনিশশতক থেকেই বিবর্তিত হতে থাকে নর-নারীর সম্পর্কের সমীকরণ। সেই সময়ের নারী জাগৃতিমূলক বিভিন্ন কার্যের জন্য নব-দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষিত হয় দাম্পত্যসম্পর্ক ও নারীর প্রেমচেতনা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রতিটি পৌরাণিক নারীর বকলমে প্রতিভাষিত হয়েছে কখনো দাম্পত্যসংকট আবার কখনো সমাজ-নীতি বিরুদ্ধ প্রেমের অকৃত্রিম আবেগ। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের শকুন্তলা, দৌপদী, দুঃশলা, ভানুমতীরা একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের সার্থক সাধিকা। তারা প্রত্যেকেই স্বামী সঙ্গসুখের অভিলাষী। পতিসঙ্গই তাদের দাম্পত্যসমস্যা সমাধানের একমাত্র চাবিকাঠি। আবার জনা ও কেকয়ীর পত্রে ক্ষত্রিয়নারীর তেজদীপ্ত প্রতিবাদী স্বর গর্জন করে ওঠে স্বামীকৃত অপরাধের প্রতি। অন্যায়কারী স্বামীকে পরিত্যাগের কথা উচ্চারণের মাধ্যমে তারা তাদের দাম্পত্যসম্পর্ককে করে তুলেছে জটিল থেকে জটিলতর। তারা, সূর্পণখা, উর্বশী যথাক্রমে সোম, লক্ষ্মণ ও পুরুরবার প্রতি যে নির্লজ্জ অথচ নির্ভেজাল প্রেম নিবেদন

করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। এই চরিত্র ত্রয়ীর প্রেমসত্তা তাদেরকে চিরন্তন প্রেমিকা থেকে চিরন্তন মানবীতে উত্তরণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ-সংস্কার-নীতি অতিক্রমী প্রতিটি চরিত্রই হয়ে উঠেছে অত্যন্ত মানবিক। আর এইখানেই মানবিক কবি মসূদনদত্তের সার্থকতা।

সূচক শব্দ

দম্পতি, উনিশশতক, বীরাঙ্গনা, কেকয়ী, সমাজ বিগর্হিত প্রেম।

মূল প্রবন্ধ

'অধরের কানে যেন অধরের ভাষা
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে ---
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙ্গিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে'।[১]

(চুম্বন; কড়ি ও কোমল; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

'দম্পতি' কথাটির আক্ষরিক অর্থ জায়া ও পতি। সাধারণ ভাষায় আমরা দম্পতি বলতে বুঝি বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শাস্ত্রসম্মত ও সমাজ-স্বীকৃত নরনারীর সম্পর্ক। আর শাস্ত্রলঙ্ঘিত এবং সমাজ-অস্বীকৃত সম্পর্ককেই বলে পরকীয়া বা সমাজবিগর্হিত সম্পর্ক। উনিশশতকের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'বীরাঙ্গনা' নামক পত্রকাব্যটি রচনা করেছিলেন। সমকালীন উদীয়মান বাঙালির নবজীবন-ধর্ম, নবজাগরণ প্রসূত নব্যসংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য অনুসারী রোমান্টিকতা – এই ত্রিস্রোতের সমন্বয়ীরূপ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এবং যার সম্পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যের মাধ্যমে। তাঁর জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই- ১৮২৪ সালের ২৫ শে জানুয়ারি সাগরদাঁড়িতে(যশোর জেলা) জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদন দত্ত। মাতা জাহ্নবী দেবী ছিলেন চতুষ্পত্নীক পিতা রাজনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী। কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধি লগ্নে ইংরেজ কবি বায়রন এবং টম মুরের লেখা

জীবনী তাঁর মধ্যে সৃজন করেছিল এক অকৃত্রিম আবেগ। যে আবেগ পরবর্তীকালে মাইকেলের কবি হবার স্বপ্নকে করেছিল উদ্বুদ্ধ। জীবিকা সূত্রে মাদ্রাজে থাকাকালীন তাঁর বিবাহ হয় ইংরেজ কবি রেবেকা ম্যাকটিভিসের সাথে, কিন্তু এই দাম্পত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না, ভেঙ্গে যায় সম্পর্ক। এরপর জীবনসঙ্গিনী ফরাসী মহিলা হেনরিয়েট সোফিয়ার সাথে অতিবাহিত করেন তিনি বাকি জীবন। বর্ণময় তাঁর জীবন, বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর চেতনা। বহুপত্নীক সংসারে মা-বাবার দাম্পত্যকে অনুভব করেছিলেন খুব কাছ থেকে, অসম্পূর্ণ প্রথম দাম্পত্য তাঁকে জ্ঞাত করেছে প্রেমহীন জীবনের দহনজ্বালা, দাম্পত্যসংকট ও বিবাহোত্তর প্রেমকে। 'বীরাঙ্গনা' কাব্য তাঁর সেই বহুরঙের অভিজ্ঞতার রঙিন ফসল।

উনিশ শতকের নবজাগরণ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শ প্রভাবিত করে বাঙালির মনন, সংস্কৃত, শিক্ষা ও সাহিত্যচেতনাকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যকে অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যকে নব-সৃজনে সৃজিত করেছিল যে সকল কবি, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি তিনি রোমক কবি ওভিদের (Ovidius) রচিত 'Heroic Episteles' নামক পত্রকাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিরচন করেছিলেন। কবি তাঁর স্মারকলিপিতে বলেছিলেন… " It is my intention, God willing, to finish this poem (বীরাঙ্গনাকাব্য) in xxi Books."[২] তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আঙ্গিকগত ভাবে তিনি ওভিদের কাছে ঋণী হলেও কাব্য বিষয় তাঁর মৌলিক ভাবনা। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষত পুরাণে নায়ককে প্রেরিত নায়িকার পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক সেই কবিভাবনা মধুসূদনের কাব্যে নবচেতনায় উন্নীত হয়েছে। উনিশশতক থেকেই বিবর্তিত হতে থাকে নারী-পুরুষের সম্পর্ক। সেই সময়ের বিভিন্ন নারীজাগৃতিমূলক আন্দোলন নবদৃষ্টিতে ভাবতে শেখায় দাম্পত্যসম্পর্ক, নারীর প্রেমচেতনাকে। নারীর আত্মবচনে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে বিরচিত এগারোটি পত্রে নারীর অধিকারচেতনা, প্রেমচেতনার সাথে সমীকৃত হয়েছে দাম্পত্যসমস্যা ও অবৈধ সম্পর্কের টানাপোড়েন।

'বীরাঙ্গনা' শব্দ বিশ্লেষণে মধুসূদন দত্ত বলেছেন–

"বিরহলেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীরজায়া-পক্ষে বীরপতিগ্রামে"[৩]

অর্থাৎ 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে বীরাঙ্গনা বলতে তিনি বীরজায়া বা বীরের পত্নীদের বোঝাতে চেয়েছেন। যারা তাদের ক্ষত্রিয় বীরদের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পত্ররচনা করেছেন। কাব্যের প্রথমপত্র শকুন্তলা তার স্বামী দুষ্মন্তকে লিখেছেন। শকুন্তলার প্রকৃত কাহিনী অনুযায়ী– বিশ্বামিত্র ও স্বর্গ-অপ্সরা মেনকার কন্যা শকুন্তলা লালিত হয় কণ্ব মুনির তপোবনে। একবার কণ্বমুনির অনুপস্থিত কালে রাজা দুষ্মন্ত তপোবনে আসেন এবং প্রেম আতিশয্যে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করে শকুন্তলা-দুষ্মন্ত। রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজা দুষ্মন্ত স্বদেশে পুনরাগমন করলে বিরহিনী শকুন্তলা প্রতীক্ষা করে রাজার জন্য। সেই প্রতীক্ষারত সময়ে এই পত্রিকা লিখেছেন শকুন্তলা। তাদের দাম্পত্য প্রেম স্বীকৃত হলেও সমাজ স্বীকৃত নয়। যে জন্য শকুন্তলার পত্রের শব্দে ভাষিত হয় দাম্পত্য অস্তিত্বের সংকট……. 'তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি?'…[৪]
দাম্পত্যর ভিত্তি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া। পতিপ্রাণা শকুন্তলা বিচ্যুত হয়নি সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসা থেকে। বহুপত্নীক সংসারে রাণী নয় বরং দাসী রূপে রাজা দুষ্মন্তের কাছে সহাবস্থান করতে চেয়েছে সে–

'…… সেবিবে
দাসী ভাবে পা দু'খানি ---- এই লোভ মনে-
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!'[৫]

দাসীরূপে শকুন্তলা আত্মসমর্পণ করলেও আশামদে মত্ত পাগলিনী শকুন্তলার প্রকৃত দ্বন্দ্ব নিয়তির সাথে। নিয়তির কারণে সে চিরকাল পিতা-মাতার স্নেহসুখ বঞ্চিতা, আর যৌবনে সে স্বামীসুখ বঞ্চিতা। প্রিয়তম বিরহকাতরা রমণীর দাম্পত্যসংকট যেন কাব্যটিকে করুণ রসে সিঞ্চিত করেছে। এ রকমই বিরহ-মধুর দাম্পত্যের পত্র হল অর্জুনকে লেখা দৌপদীর পত্র । পান্ডবদের বারো বছরের বনবাস কালে অর্জুন দিব্যাস্ত্রের জন্য দেবালয়ে অবস্থান করলে দৌপদী তাকে পত্রপ্রেরণ করেন। 'বীরাঙ্গনা' পত্রিকার মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষা সুখী, নিরুদ্বিগ্ন পত্রিকা দৌপদীর পত্রিকা।

দৌপদী পঞ্চপান্ডবের অর্ধাঙ্গিনী, কিন্তু মনন-সঙ্গিনী একমাত্র অর্জুনের, যে তাকে জয় করেছিল স্বয়ংবরের মাধ্যমে –

"..... বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
.....
আনন্দ সলিলে প্রাণ ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি!' "[৬]

সাময়িক বিরহকাতরা ও অরণ্যের সৌন্দর্য্যে অভিভূত দৌপদী প্রতিক্ষণে অনুভব করে অর্জুনের অনুপস্থিতি। সুখীদাম্পত্যেও সৃষ্টি হয় সংশয়, অধিক প্রেম ও আশঙ্কা করে অনিষ্টের। গর্বিতা দৌপদী আশঙ্কিত অর্জুনকে নিয়ে.....

"শুনেছি কামদা না কি দেবেন্দ্রের পুরী;----
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পারহে যদি সুর-বালা দলে,"[৭]

দৌপদীর এই কৌতুকপ্রবণতা, সুখীদাম্পত্যের দোলাচলতা যেন দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-দাম্পত্য সমস্যাকেই রূপাঙ্কিত করেছেন কবি।

ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে আমরা দেখি বিপথগামী স্বামীকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য দুই স্ত্রীর বেদনাময় আর্তি। ভানুমতী হস্তিনাপুর যুবরাজ দুর্যোধনের স্ত্রী এবং দুঃশলা কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট ও গান্ধারীর কন্যা, যার বিবাহ হয় সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের সাথে। এই দুই পত্রের একজন কুরুবধূ, অন্যজন কুরুকন্যা। সম্পর্কের নিরিখে তারা বৌদি-ননদ। তারা দুজনেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুদ্ধরত স্বামীদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে এবং আপন সধবা ধর্ম বজায় রাখার জন্য এই পত্র বিরচন করেছেন। নারীর কাছে তার স্বামীই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, কিন্তু সেই স্বামীর প্রাণের আশঙ্কা থাকলে সহজেই চিন্তাগ্রস্ত স্ত্রীর হৃদয় হয় কম্পমান। এই দুই পত্রে দাম্পত্যসমস্যা জীবন-মরণ সমস্যায় উত্তরিত হয়েছে। দুই নারীর পতীপ্রেম, যুদ্ধের জন্য ত্রস্ত মনোভাব, স্বামীদের কৃত অন্যায় ধর্ম তাদেরকে করেছে মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত। তারা দুজনেই জানে তাদের স্বামীরা এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করবে না।

পতীপ্রেমে আবিষ্ট হলেও ভানুমতী দুর্যোধনের দোষ-ত্রুটি সহজেই আদর্শ স্ত্রীর ন্যায় বিশ্লেষণ করেছেন এবং মহৎ পথে ফিরে আসার জন্য স্বামীকে অনুরোধও করেছেন-

' .....কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষ বিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্মতি,'[৮]

ভানুমতীর দাম্পত্যসংকটের কারণ প্রেম নয় বরং অন্যায়কারী স্বামীর সাথে নীতিবাদী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে দুঃশলার পতিপ্রেম স্বার্থ দ্বারা আবৃত.....

' .....অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যাজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে!----
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরুপাণ্ডু কুলে !'[৯]

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অপেক্ষা আপন দাম্পত্যসম্পর্ক ও সধবাধর্ম বজায় রাখার জন্য আকুলা দুঃশলা চরিত্রটি যেন এক সাধারণ বাঙালি গৃহবধূরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে।

কেকয়ী ও জনার পত্রদ্বয় আত্মাভিমানী দুই স্নেহশীল মাতার অভিযোগ পত্র। তারা দুজনেই যৌবন উর্ত্তীণা নারী। দাম্পত্য জীবনে দীর্ঘপথ চলার পর, প্রেম নয় বরং সন্তানই হয় সেই সম্পর্কের প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু সেই স্তম্ভে যখন আঘাত করা হয়, তখন ভাঙন ধরে মূলগৃহে। কেকয়ী ও দশরথের একমাত্র পুত্র ভরত। রামায়ণের কাহিনী অনুসারে দশরথ জ্যেষ্ঠ তথা সপত্নীপুত্র রামচন্দ্রকে যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করলে ঈর্ষাকাতর কেকয়ী বয়ন করে এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের জাল। যার জন্য ভরত রাজা হয়, আর রামচন্দ্রের হয় চৌদ্দ বছরের বনবাস। রামায়ণে কেকয়ীকে খলনায়িকা হিসাবে অঙ্কিত করা হলেও এখানে কেকয়ী মানী স্ত্রী এবং তদাপেক্ষা একজন সন্তান শুভাকাঙ্ক্ষী মাতা। কেকয়ীর রূপযৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এক সময় রাজা দশরথ কোন এক অসতর্ক অসহায় মুহূর্তে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ; তা রাজা আজ বিস্মৃত হয়েছেন। কেকয়ী বলেছেন–

'..... কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা কহ;-
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে!'[১০]

দশরথ রূপমোহেই হোক আর কৃতজ্ঞতা বশেই হোক ,জেনে শুনে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে অধর্মের কাজ করেছেন। কেকয়ীর সপত্নী ঈর্ষা এবং নারীসুলভ দেহচেতনার মাধ্যমে সাধারণ দাম্পত্য ও তার সংকট প্রতিভাষিত হয়েছে। এদিকে ক্ষত্রিয় নারী জনা পুত্রশোকে কাতর। অর্জুনের সাথে রণে পুত্র প্রবীর নিহত অথচ পিতা নীলধ্বজ অর্জুনের সাথে সন্ধি করতে প্রস্তুত। জনা কিন্তু পুত্রহন্তারককে কোন অভ্যর্থনা নয় বরং যুদ্ধে আহ্বান করতে চেয়েছে । বীর হলে মহৎ হতে হয়, সৎ হতে হয়; তার মতে পাণ্ডবদের মধ্যে সেই গুণ অনুপস্থিত। অথচ অদ্ভুতভাবে স্বামী পুত্রশোক বিস্মৃত হয়ে সেই পাণ্ডবদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ক্ষাত্রতেজে প্রদীপ্তা নারী তাই আজ স্বামীর থেকে চায় মুক্তি '.....যাচি চিরবিদায় ও পদে!'[১১] সেযুগের অন্যায় তোষামোদকারীর প্রতীকি চরিত্র নীলিধ্বজ, আর এই কর্মের প্রতিবাদী চরিত্র জনা। মহৎ উদ্দেশ্যের কারণে ভিন্ন হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মত, ছিন্ন হয়েছে তাদের দাম্পত্যসম্পর্ক।

দাম্পত্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে শান্তনুকে লেখা জাহ্নবীর পত্র একটি ব্যতিক্রমী পত্র। জাহ্নবী স্বামীবিছিন্না নারী । দেবী জাহ্নবী ও মানব শান্তনু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও সেই বিবাহ দীর্ঘ হয় না। সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দোষে দুষ্ট শান্তনুকে ত্যাগ করে জাহ্নবী। স্বামীর সাথে দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হলেও জাহ্নবী একেবারে স্বামী প্রেম-বিচ্ছিন্না নারী নয়। বরং স্বামীর সুখের জন্য সে বদ্ধপরিকর। অষ্টবসুকে মুক্তি দিতে দেবী জাহ্নবীর মানব জন্ম, সেই উদ্দেশ্যে সে সফলা। স্বর্গে বাস করা তার জীবনের এখন পরম গন্তব্য। কিন্তু নিঃসঙ্গ শান্তনুর দুঃখে সে ব্যথিত। ব্যথিতের ব্যথা উপশমের জন্য জাহ্নবী এই পত্র বিরচন করেছেন। এই দাম্পত্যে প্রেম অপেক্ষা কর্তব্য জয়ী হয়েছে। দাম্পত্যে সংকট-উত্তর সমাধান কবি আমাদের প্রদান করেছেন। দুঃখবিলাস নয়, বিচ্ছেদ-বিলাস নয় বরং অগ্রসর হতে হবে সম্মুখের দিকে।

জীবন স্বততঃ চলমান, আর সেই চলমান জীবনে স্রোতা হওয়ায় হল বুদ্ধিমানের কাজ। যে কারণে গঙ্গার উক্তি.....

'যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে!
পাল প্রজা; দমরিপু; দণ্ড পাপাচারে'---[১২]

আধুনিক জীবনের সংকটময় দাম্পত্যে সহজ সমাধানের সূত্র চিহ্নিত করেছে শান্তনুকে লেখা জাহ্নবীর পত্র।

সমাজবিগর্হিত প্রেম হিসাবে এই কাব্যে তিনটি পত্রকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে– সোমকে লেখা তারার পত্র, লক্ষ্মণকে লেখা সূর্পণখার পত্র এবং পুরুরবাকে লেখা ঊর্বশীর পত্র। এদের মধ্যে তারার পত্রিকাটি সর্বাধিক অবৈধ ও পরিপূর্ণভাবে নীতিবহির্ভূত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বৃহস্পতি-শিষ্য সোমের সহিত বৃহস্পতি-জায়া তারার প্রণয়কাহিনীর উল্লেখ আছে। সামাজিক দৃষ্টিতে তারা পাপীয়সী কিন্তু মধুসূদনের তারা প্রেম-চেতনায় গরীয়সী। আত্মগোপন নয় বরং আত্মোচ্ছ্বাসেই প্রেমের পরমমুক্তি। সে গুরু-পত্নী নয়, গুরুমা নয়, সে একান্তভাবে এমন নারী যে স্বামীশিষ্য সোমের প্রথম সাক্ষাতেই তার প্রতি অনুরাগী.....

'যেদিন, প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,.....'[১৩]

এই প্রেমে আছে দৈহিক কামনার আবেগ আর রূপসৌন্দর্য্যের আবেদন.....

' ..... পোড়ে বিরহিনী
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সে বিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাকর; কোন দোষে দোষী তবপদে
অভাগিনী?.....'[১৪]

তারার অবচেতনের আবেদন সমাজ-নির্মিত পরকীয়াকে অতিক্রম করে মানবীসত্তাকে জয়ী করেছে। লক্ষ্মণকে লেখা সূপর্ণখা পত্রে আমরা দেখি এক বিধবা নারীর আত্মিক চাহিদা ও মানসিক বেদনার বহিঃপ্রকাশ । রামায়ণ কাহিনী অনুযায়ী রাক্ষসরাজ লঙ্কেশ্বর তথা রাবণের বিধবাভগ্নী সূর্পণখা। পত্রের সূচনায় কবি বলেছেন- " কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশমাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকি বর্ণিত বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণ পথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন"।[১৫]

ভারতীয় শাস্ত্রকারদের অভিমত হল স্বামীর-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর উচিত স্বামীর স্মৃতিকে অনুধ্যানের মাধ্যমে সমগ্রজীবন অতিবাহিত করা। মধুসূদন সেই 'ট্যাবু' ভেঙে দিয়েছেন। তিনি সমাজের থেকে জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যে কারণে তাঁর বিনির্মিত রূপাসক্ত সূর্পণখা বলে ওঠে-

'- এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়, মনঃ, প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!'[১৬]

১৮৫৬ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হয়। ১৮৬২তে প্রকাশিত এই কাব্য তিনি তাঁর প্রিয় সুহৃদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করেন। বাল-বিধবা সূর্পণখার প্রেমপ্রবাহ-সঙ্গীত পরিবেশনে কাব্যোৎসর্গটি সত্যই সার্থক বায়িত। প্রকৃত প্রেম মহত্বের শিক্ষা দেয়। প্রেমের মাধ্যমেই পার্থিব ঐশ্বর্যকে পরিত্যাগ করে মনৈশ্বর্যের দিকে ধাবিত হয় আপন সত্তা। উর্বশীর প্রেমপত্র সেই ভাবনারই বার্তাবাহক। সে স্বর্গের বারাঙ্গনা। দেবতার মনোরঞ্জন করা তার পেশা। প্রেমনিবেদন তার অভ্যাসগত হলেও পুরুরবার প্রতি তার প্রেম সেই অভ্যাস-বিরুদ্ধ হৃদয় স্রোতের জোয়ার। মূলকাহিনী কালিদাসের লিখিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের থেকে অনুপ্রাণিত। মধুসূদন প্রতিটি পৌরাণিক চরিত্রের নব-নির্মাণ করেছেন, এখানেও স্বর্গ-অপ্সরা উর্বশী যেন চিরন্তন প্রেমিকা; যে পুরুরবার মধ্যে আদর্শ পুরুষ ও বীরের সন্ধান পেয়েছেন–

'তোমার, বিক্রমাদিত্য! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য তব রণস্থলে!
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য হেরি!
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা?.....'[১৭]

সমাজে এক বারবণিতার প্রেম নিবেদন যেমন নীতি-বিরুদ্ধ ও তার সাথে পরিহাসযোগ্য। তবুও মধুসূদনের উর্বশী সমাজ-নীতির বন্ধন ত্যাগ করে নারীত্বের সর্বোত্তম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি দ্বারা লালিত কেবল আধুনিক যুগের কবিই নন, তিনি আধুনিক মনস্কের কবি। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান বিষয় ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব। তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব বারংবার উচ্চারিত হয়েছে নারীদের আত্মকথনে, তাদের দাম্পত্য সমস্যায় অথবা প্রেম নিবেদনে। উনিশশতক থেকেই বিবর্তিত হতে থাকে নর-নারীর সম্পর্কের সমীকরণ। সমাজ নির্মিত সংস্কার বা রীতি অপেক্ষা জয়ী হয় মানবধর্মের। আর এই মানবধর্মের জয়োচ্ছ্বাস ধ্বনিত হয়েছে তাঁর পুনর্নির্মিত 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পৌরাণিক চরিত্রগুলির মাধ্যমে। সেইজন্যই মধুসূদন দত্ত হয়ে উঠেছেন দেশ-কাল-সময়ের গণ্ডী অতিক্রমী এক মানবদরদী কবি।

তথ্যনির্দেশ :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,(১৩৬২,আশ্বিন); 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী,পৃষ্ঠা-৪৮
২. সান্যাল, দীননাথ; প্রসাদ, শ্রীঅনন্ত(সম্পা.), (১৩৬৩,প্রথম প্রকাশ); 'মধুসূদন কাব্য-পরিচয়', এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, পৃষ্ঠা-১৩৯
৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৪০
৪. ভৌমিক, ড.নির্মলেন্দু, (১৯৮৫,সেপ্টেম্বর, প্রথম প্রকাশ); 'বীরাঙ্গনাকাব্য' (ভূমিকা ও কাব্যপাঠ সম্বলিত), বনমালী-বিশ্বনাথ প্রকাশন, পৃষ্ঠা-২

৫. ঐ, পৃষ্ঠা- ৫
৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩০
৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩১
৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৪
৯. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৩
১০. ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯
১১. ভৌমিক, ড.নির্মলেন্দু, (১৯৮৫,সেপ্টেম্বর, প্রথম প্রকাশ); 'বীরাঙ্গনাকাব্য' (ভূমিকা ও কাব্যপাঠ সম্বলিত),বনমালী-বিশ্বনাথ প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ৫৪
১২. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৫
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা- ৭
১৪. ঐ, পৃষ্ঠা- ১১
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা- ২১
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩
১৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, 'মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প', এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
২. দীননাথ সান্যাল (প্রণীত), শ্রীঅনন্ত প্রসাদ(সম্পা.), 'মধুসূদন কাব্য-পরিচয়', প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৩
৩. নগেন্দ্রনাথ সোম, 'মধু-স্মৃতি', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস, প্রথম সং, চৈত্র, ১৩২৭
৪. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'বীরাঙ্গনাকাব্য'(ভূমিকা ও কাব্যপাঠ সম্বলিত), বনমালী-বিশ্বনাথ প্রকাশন, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬
৫. শ্রীভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (দ্বিতীয় পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, পুনমুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২১, মাঘ, ১৪২৭
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঞ্চয়িতা', বিশ্বভারতী, ১৩৬২, আশ্বিন

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

কল্পপৃথিবীর বয়ানে ‘ননসেন্স’ বাস্তব : ‘সুকুমার’ শৈশবের ভূমিকা

শ্রেয়সী রায়

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি শাখা তার শিশু-কিশোর সাহিত্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মসময় থেকেই সৌভাগ্যবশত শিশুসাহিত্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার তাবৎ বরিষ্ঠ লেখক-লেখিকাবৃন্দ। প্রথম পর্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখের প্রাইমার থেকে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ হয়ে অধুনা অবধি শিশুসাহিত্যে রসস্রষ্টা ও রসসৃষ্টির ধারায় ব্যত্যয় হয়নি কখনো। বলা বাহুল্য, এই পরিসরে রায়চৌধুরী পরিবারের সামগ্রিক দান অতুলনীয়। উপেন্দ্রকিশোর রূপকথা, উপকথা, পুরাণকথা এবং ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার মাধ্যমে যে বীজক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন, একাধিক প্রতিভাধর উত্তরসূরি সত্ত্বেও তার সর্বোত্তম ফসল সম্ভবত ফলেছিল তাঁর দ্বিতীয় সন্তান সুকুমারের কলমে। সুকুমারের প্রায় যাবতীয় গদ্য-পদ্যের ধর্ম এবং বর্ম তাঁর ‘ননসেন্স’-সাহিত্য, খেয়ালি-রচনা। এই বিশেষ রসালেখ্য-ভঙ্গিটি বাস্তব-অবাস্তব-অতিবাস্তবের মাঝের বিভাজক পর্দাগুলোকে যেন হঠাৎ দুলিয়ে দেয়, উড়িয়ে নেয় অদ্ভুতুড়ে আর উদ্ভুট্টে হাসির দমকা হাওয়া তুলে। নিয়মের চোখরাঙানো রাজত্বে তাঁর চরিত্ররা ব্রাত্য, তারা অবৈধ-নিয়মচারী। কিন্তু সেই বিদ্রোহে নেই কোনো গুরুগম্ভীর মনের বুড়োটে তির্যকতার ঝাঁঝ। এ যেন কেবল যা'চ্ছে-তাইয়ের স্বপ্ন-সুখ, কেবল বেখেয়ালির খেয়াল-খুশি। ‘আজগুবি তাল’-এর কবিতা-বিলাসে শুধু নয়, পাশাপাশি ‘হ য ব র ল’র হলেও-হতে-পারে-সত্যি কল্প-

দুনিয়াটিতে, কখনো রূপকথা-গন্ধী ছোট-ছোট নিটোল কিছু গল্পে, কখনো বা কোনো-এক চিরকালের চিরচেনা ইস্কুলের শান্ত-দুষ্টু-মিচকে সব ছেলেদের নানান বিদঘুটে আর বাতিকগ্রস্ত বদমাইশিতে, কিংবা কখনো কৌতুক-নাট্যের ‘অবাক’-করা ‘ঝালা’-পালায় - রঙিন হয়ে বিছিয়ে থাকে ননসেন্সের মায়াবী আলো। সেই আলোয় কতখানি রঙদার হয় শৈশব, ‘নিয়মহারা হিসাবহীন’ দস্যিতা শৈশবকে সত্যিকরে করে তোলে কতখানি ‘সুকুমার’, সেই আলোচনাই আজ।

মূল শব্দগুচ্ছ

সুকুমার-সাহিত্য, ননসেন্স, কল্প-বাস্তবতা, শৈশব।

মূল আলোচনা

১

> “আমি ... বাঙলায় বললুম, ‘গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।’
>
> [মুহম্মদ] বললেন, ‘বুঝিয়ে বলো।’
>
> তর্জমা শুনে দোস্ত মুহম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বলেন, ‘আফরীন, আফরীন, সাবাস, সাবাস, উম্‌দা কবিতা, জরির কলম।’ তারপর মুখে মুখে শেষ লাইনের একটা অনুবাদও করে ফেললেন,
>
> ‘মনে বুরুৎ, তনে বুরুৎ, বুরুৎ সনাক্তদার।’
>
> তারপর বললেন – ‘আমি আরবি, ফারসি আর তুর্কি নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু ভালো রসিকতা কোথাও বিশেষ দেখিনি। পদ্যে তো প্রায় নেই-ই। বাঙলায় বুঝি এরকম অনেক মাল আছে?’
>
> আমি বললুম – ‘না, মাত্র দুখানা কি আড়াইখানা বই।’
>
> দোস্ত মুহম্মদ নিরাশ হয়ে বললেন, ‘তাহলে আর বাঙলা শিখে কী হবে’।”[১]

রম্যরচনার হাল্কা চাল হলেও বাংলা সাহিত্যের এমন সব অসংখ্য দিকপাল রচয়িতা আর অনন্য সব রচনা সত্ত্বেও আফগানী বহুভাষা-সাহিত্যজ্ঞ রসিক সবচাইতে মোহিত হলেন কিনা একটি তথাকথিত- ‘শিশুতোষ’ বইয়ে! মুজতবা আলী তবু ভুল বলেননি।

শিশুর ছোট দুঃখ, ছোট্ট সুখ। ছোট ছোট ঘরবাড়ির ছোট ছোট পুতুল-মানুষদের সঙ্গে তাদের কারবার (আধুনিক কালের শিশুপুত্র আর শিশুকন্যাদের খেলনায় একদিকে বার্বি-পুতুল আর একদিকে গাড়ি-ঘোড়ার ওপরপড়া পার্থক্যটিকে যদি আপাতত আমল না দিই)। কিন্তু সেই আপাত-অলীকের পরিমিত পরিসরে অপ্রমেয় যাপন-সত্য ধরা দিয়ে যায় কেবল জাদুকাঠির ছোঁয়াতে। পুতুলের সুখ-অসুখের মাত্রায় মিলে যায় মানুষিক জীবনেরও ইতিকথা। উপরন্তু পুতুলের গল্প বহু-অর্থ-প্রজ, বহুস্তরী। মানুষ আর না-মানুষের মাঝখানে, বাস্তব আর অবাস্তবের ঝাপসা ঝালরের আড়ালে তাদের যথা-ইচ্ছার রংবাহারী দুনিয়া। সেখানকার পাতালপুরীতে অ্যাডভেঞ্চারসন্ধানী রাজপুত্ররা এক-এক দিন এক-এক সোনাকাঠি রূপোকাঠির ছোঁয়ায় জাগিয়ে তোলে ঘুমন্ত রাজকুমারী-নাগকুমারীদের।

জাদুকাঠির গুণ অশেষ। তাই পাতালপুরীতে রাজকন্যে কম পড়ে না। আর 'ননসেন্স' সাহিত্যের আবেদনও ফুরোয় না প্রথম শৈশব থেকে শেষ কৈশোরে। আবার পরিণত মনও নিরাশ হয় না তার শৈশব-সাহিত্যের সঙ্গে ঝালিয়ে-নেওয়া মোলাকাতে। সকল বয়সের আস্বাদ-আহ্লাদের পুষ্টি সঞ্চিত রাখে যে অনিঃশেষ মধুভাণ্ডার, তার পরিচয় অল্প কথায় সারা কঠিন। তবু স্বল্প পরিসরেই তাকে ফিরে দেখার অবিশদ একটি প্রয়াস এখন।

ছোটদের সাহিত্য আলোচনার প্রধান অসুবিধাটি হল শৈশব-কৈশোরের স্বাদ কোরকগুলির অপমৃত্যু। রসসাহিত্য যে উপাদানে শিশুচিত্ত-জয়ী, তাকে ভুলে কেবল অন্তর্গূঢ় অর্থসন্ধানের কচকচিতে নামতে হয় পরিণত পাঠক কিংবা আলোচককে। এখানে সেই অসুবিধে এড়িয়ে, সাহিত্যের শরীরতত্ত্ব আর সাহিত্যের প্রাণ— এই দুইয়ের বিরোধকে সীমিত সামর্থ্যের আশ্রয়ে যথাসাধ্য ঐক্য দিতে চেষ্টা করা গেল। ফলে এই আলোচনায় অতিরিক্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে আমরা পাশ কাটাব পারতপক্ষে, কিন্তু সহৃদয় পাঠক হয়তো সহজেই বুঝতে পারবেন উদ্ধৃত গল্প-ছড়া-গ্রন্থাংশ পল-কাটা হীরের মতো কতই না রঙের আলো ছড়াতে পারে নিজের চারদিকে, তার ছোট-বড় নানাবয়সী পাঠকমনের দরবারে।

২

টুকরো কথার এক-ঝাপটে হরেক রঙা আলো খেলাতে পারে যেসব লেখা, তারা বেশিরভাগই চশমা-আঁটা গম্ভীর আসরের লোক। তবে আমাদের ছোটবেলায় আমরা কয়েকখানা এমন বন্ধু-বইয়ের সঙ্গ পেয়েছিলাম, যারা লাল-নীল রঙ-বেরঙ হরেক খুশির জিম্মেদার। সেই গোঁফ-সমজদার বড়বাবুদের দুনিয়ার কথা আজ। রাজামশাই সেখানে অ-সুখের অনবকাশে অসুস্থ হয়ে থাকেন, ডাক্তার-বদ্যির গর্দান যায়-যায়। অতঃপর মন্ত্রীমশাই বেরোন 'সুখী লোকে'র সন্ধানে। বৌদ্ধ লোককথার প্রার্থী দুঃখহীন-মৃত্যুহীন ঘরদুয়ারের সন্ধান পায়নি। সুকুমারের মন্ত্রীমশাই কিন্তু পেলেন। পেলেন বহু আয়াসে, বহু ব্যর্থতার দরজা পেরিয়ে। রাজামশাই নয়, নয় 'সাধুতার সুদ কষা'[২] সেলামাকাঙ্ক্ষী দানবীর, কিংবা নয় ক্ষণিক-সুখসন্ধিৎসু মাতাল — অ-সুখকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে গাছতলায় বসে হাসতে পারে কেবল সেই ফকির, যে গায়ের একটিমাত্র শালও ভিখারীকে দিয়ে 'ফেলে', দানগৌরবের পর্যন্ত তোয়াক্কা না রেখে! বেঁচে থাকবার হাজারো দায় এড়িয়ে, জগৎজোড়া পাগলপারার দৃষ্টান্তে হাসতে হাসতে পেট-ফাটার দাখিল হয় সে, যার চাল নেই, চুলো নেই, জামা নেই, বিছানা-তোষক-গদি কিচ্ছুটি নেই, এবং কিমাশ্চর্যম্! অসুখও নেই কোনো।[৩]

একটু অন্যরকম কথামুখ পাব আরেক রাজামশাইয়ের গল্পে। তাঁর রাজত্বের ভিত আলাদা, সেখানে পড়ে-পাওয়া-চোদ্দ-আনা 'সুখে'র ব্যতিব্যস্ততা নেই, বরং আছে দুর্ভাগ্য আর দুর্ভোগের ক্রমবিজিত ইতিহাস। আর অবশেষে — ফলপ্রসূ শ্রমের সানন্দ রাজত্ব। এক সদ্য-স্বাধীন ক্রীতদাস হঠাৎ করে রাজা হয়ে বসেন এক অচিন দেশের দ্বীপে। কিন্তু সে রাজত্বের মেয়াদ মোটে একটি বছর। তারপর তাঁকে ছেড়ে আসা হবে দিগ্‌শূন্য মরুর দেশে। তাই শুনে চটপট লোক লাগিয়ে মরুদেশে বসতি বসান রাজা। আসল চারা, ফলল ফসল, বসল বসতি। এক বছরের রাজা বছর শেষে জন্ম-ভরে রাজত্ব করলেন নতুন দেশে।[৪]

স্ব-সমাজতন্ত্রকে তাচ্ছিল্য করে 'এই এত্তো বড়ো উঁচু, আর ধবধবে সাদা আর ঝকঝকে আলোর মতো' রাজা পাওয়ার শখ জেগেছিল পুকুরবাসী ব্যাঙেদের।

মেঘপুরের ব্যাঙ-দেবতা তাঁর অবিশ্রাম ঘ্যানঘ্যানানো ভক্তবৃন্দের ডাকাডাকিতে অস্থির হয়ে শেষে এনে দিয়েছিলেন চকচকে, ঝকঝকে, ধবধবে এবং এত্তো উঁচু আর বড় একটি বক-রাজা। সেই রাজার উদরপূর্তিতে বহু বলিদান দিয়ে, অনেক দুঃখে, অনেক অভিজ্ঞতায় ব্যাঙেরা চোকায় 'রাজা-পাওয়া'র ইচ্ছেপূরণের দাম। আর অবশেষে ব্যাঙ-দেবতার দয়ায় আবার রাজা-হীন সমাজে ফিরতে পেরে তারা হাঁফ ছেড়ে গান ধরে 'গ্যাঁক গ্যাঁক গ্যাঁক — বাপ বাপ বাপ — ছ্যা ছ্যা ছ্যা — রাজা-টাজা আর কখনও চাইব না।'[৫]

৩

রাজার কথা ফুরোলো। এবার আসা যাক রাজত্বের কথায়, সাম্রাজ্যের পুষ্টি, তুষ্টি, স্ফীতির কার্যকারণ সমীকরণে। ১৯১৯ সাল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল। হল কি? ১৯২৩এ প্রকাশিত 'আবোল তাবোল'-এ দেখি 'লড়াই-খ্যাপা' পাগলা জগাই একাই লড়ে সাত-জার্মানের সঙ্গে।[৬] পলাতক গাছের ছায়াকে ধামায় চেপে বন্দী রাখে আরেক বাতিকগ্রস্ত।[৭] পৃথিবীর ইতিহাসের অজস্র সংঘটিত আর অগণিত আগত যুদ্ধের ঘনায়মান কালো ছায়ার মাঝে বসে কবির কলম আর কীই বা আঁকতে পারে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র যুদ্ধবাজ নেতা-নায়ক-সেনা, এমনকি জনসাধারণের মনের অন্দরে চলা যুদ্ধের অনর্থকর এই ছায়ানাচের ছবিটুকু ছাড়া?

আবার যুদ্ধ-ভীরুতা এবং যুদ্ধ-বিলাস এই দুই ভিন্নকোটিক মনোভাবও যে অদ্ভুত সাম্যে সমাপতিত হতে পারে ব্যক্তির মনস্তত্ত্বে, তার পরিচয়ও আমরা বারবার পাব সুকুমার-সাহিত্যে। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে রামসেনা ও রাক্ষসবাহিনী — দুই যুযুৎসু পক্ষই আসলে যুদ্ধ-ভীরু, পলায়নবাদী, অথচ লোভাতুর জিগীষায় তারা কেবলই আস্ফালন করে, শত্রুর অপঘাতের স্বপ্ন দেখে, অধঃস্তনকে লড়াই করতে হুকুম দেয়, এমনকি প্রতিপক্ষ ধরাশায়ী হলে তার পকেট লুঠ করে। যুদ্ধের সূচক কারণ এবং সমাপক ফলশ্রুতি যে আসলে এই লালসা এবং লুণ্ঠন, যা আদতে একান্তই কাপুরুষোচিত— মহাকাব্যিক বীররসকে ব্যঙ্গনাটকে এভাবে উপস্থাপিত করার মাধ্যমেই যেন তার যথোচিত মুখোসহীন প্রকাশ ঘটল। একইরকম ভীরু সংঘর্ষপ্রিয়তার আরেকটু তরলিত সংস্করণ দেখব

'আবোল তাবোল'-এর 'নারদ-নারদ'-এ। কিংবা পাব 'বাবুরাম সাপুড়ে'র কাছে জনৈক কথকের শিং-হীন, নখ-হীন, নিরীহ, গোবেচারা দুটি দুধে-ভাতে সাপের দাবীতে, যাদের সহজেই 'তেড়ে মেরে ডাণ্ডা' ঠাণ্ডা করে রাখা যাবে। অকপট ভীতি, অথচ ভীতিকরকে দাবিয়ে রাখার দুরাশা— এই দুই বিপ্রতীপ আকাঙ্ক্ষার একমাত্র সুরাহা আর কোথায় মিলতে পারে এমন ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ অথচ আমুদে কবিতার সাযুজ্য ছাড়া!

যে দেশ পরম মহিমান্বিত, ঐতিহ্যের ও আদর্শের আত্ম-কণ্ডূয়নে আপনি মত্ত, সেই 'শিব-ঠাকুরের আপন দেশে' চলে একুশে-আইনের আজব স্বৈর-নীতি। কেবল ঔপনিবেশিক শাসন তথা শোষণতন্ত্রই নয়, স্বদেশীয় সমাজের কূপমণ্ডুকতাকেও বহন করতে হবে এর দায়ভাগ—

'চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়,
এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়ে,
রাজার কাছে খবর ছোটে,
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়
একুশ হাতা জল গেলায়।।'[৮]

কন্যাদায়ে তটস্থ পাত্র-হন্যে বাঙালি ভদ্রলোককে 'সৎপাত্র'-এর সন্ধান বাৎলে দেন রসিক কথক। ম্যাট্রিক-ফেল, পিলে-জর্জর, বহু অপোগণ্ড ভাই-সমাবৃত গঙ্গারাম যতই কেন না বাংলার প্রবাদপ্রতিম 'হাবা গঙ্গারাম'টি হোক, তার সমস্ত কমতি-খামতি অবশ্যই ঢেকে যাবে একটিমাত্র মহৌষধে —

'কিন্তু তারা উচ্চঘর,
কংসরাজের বংশধর!
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের।' [৯]

সহজ-সরল নন্দ খুড়ো তাঁর হাসি-খুশি, নীরোগ, নিরুপদ্রব জীবনের মাঝখানে অকস্মাৎ কী খেয়ালে হাত-গণনা করিয়ে বসলেন এবং গণৎকারের পাকচক্রে

যথারীতি উদ্ঘাটিত হল তাঁর আয়ুরেখায় রাহুর ফাঁড়া, শনির হুড়ো। ['যথারীতি', কেননা এতদ্দ্বারাই প্রমাণিত হবে জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্য, পাথর-ধারণ ইত্যাদি ছাড়া তাঁর বেঁচে থাকাই দুষ্কর— 'এতদিন যায় নি জানা ফিরছি কত গ্রহের ফেরে—/ হঠাত্ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখবে কে রে?'] ফলস্বরূপ—

'দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো,
বুড়ো আছে নেইকো হাসি, হাতে তার নেইকো হুঁকো।'[১০]

৪

বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক। বাঙালি থেকে বিশ্বনাগরিক, সকল সামাজিকের জীবনেই বদলাতে শুরু করেছে যাপনের সংজ্ঞা। চলেছে তথ্যের প্রবল দৌড়, সংবাদ-সংগ্রহ ও বিনিময়ের বিপুল ঊর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগিতা। পদমর্যাদার হায়ারার্কিতে বাঙালি চাকুরিজীবী ভদ্রলোককুল প্রায় হারিয়ে দিয়েছে প্রাক্তন অভিজাত সামন্ততন্ত্রের অভিজ্ঞানকে, সাহেব-আপিসের কেরানী কিংবা পুলিশ ইন্সপেক্টরের সামাজিক সম্মান উঠেছে তুঙ্গে। 'স্বদেশী'-পর্বে কিঞ্চিৎ ঝিমিয়ে আসা সাহেবিয়ানার ঢেউ আবার নবোদ্দমে বল্গাহীন হয়ে ছুটেছে বাঙালি নারী-পুরুষের আহারে-বিহারে। সেই প্রতিবেশ-পরিসরে খবরের কাগজের সম্পাদক বাবার গৌরবে বুক ফুলে ওঠে ইস্কুলের ছাত্র 'সবজান্তা' দুলিরামের।[১১] সাহেবি আপিসের 'মস্ত বড়' চাকুরে বাবার ছেলে শ্যামচাঁদ হয়ে ওঠে 'চালিয়াৎ'।[১২] পুলিশের কাজ করা মামার সৌজন্যে সহ-জাত তীক্ষ্নবুদ্ধির বড়াই করে ফেরে 'ডিটেকটিভ' জলধর।[১৩] হারুদের আপিসে থাকে অন্তঃ-পক্ষী, বহিঃ-গরু 'ট্যাঁশ'-গরু। তার গরু-সুলভ তিন-বাঁকা বাহারি শিং আর প্যাঁচ্যালো ল্যাজটি সত্ত্বেও 'আসলেতে পাখি সে'। তাই তো 'নেটিভ'দের দেশে কিছুতেই তার ল্যাগ্-ব্যাগ্ দশার সমাপ্তি হয় না, 'সাবানের সূপ আর মোমবাতি' ছেড়ে অন্য খাবারের ফালি মুখে তুললেও তিনমাস আধমরা হয়ে বালিশে কাটাতে হয় বেচারিকে![১৪]

৫

তবে, এসব অবশ্য ততখানি ভালো কথা নয়, যতখানি ভালো কথা লিখে এনেছিল ন্যাড়া তার গানের খাতায় — 'লাল গানে নীল সুর, হাসি হাসি গন্ধ'।[১৫]

রং-রূপ-রস-গন্ধের এলোমেলো, অগোছালো আর আজগুবি এই ভুবনে কেবল ইচ্ছে-খুশির অনন্ত উড়ান। সেই খেয়াল রসের স্রোত কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা ফল্গুধারায় সদাসর্বদাই বইছে সুকুমার রায়ের সাহিত্যে। যদিও সেই স্রোতে তরী ভাসাতে পারবেন কেবল তাঁরাই, যাঁরা একেবারে নির্বিকল্প 'ঠিক'টুকুকে কঠিন ভাবে জেনে আর মেনে মনে-মননে শক্ত হয়ে, অনড় হয়ে বসেন নি। আর যাঁদের মন সেই স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে 'হ য ব র ল'র বড়মামাদের মতো 'বুড়িয়ে হোঁতকা' হয়ে গেছে, খেয়াল-রসের 'ভুলের ভবে' তাঁদের প্রবেশ নিষেধ। কেননা সেখানে যে উৎকটের, উদ্ভটের অবাধ দেশ, অগাধ স্বাধীনতা! সহজপাচ্য হিসেবের 'সাত দু-গুণে চোদ্দ' সেখানে কখন মিলবে, কখনই বা মিলবে না তা বোঝা গেছোদাদারও অসাধ্য। তা-বলে সেসব কথা কঠিন নয় মোটেই, কঠিন হলে হতেও পারে বড়মামাদের কাছে। কিন্তু কিশোর-বৃদ্ধ উদো-বুধোদের দেশে, হিসেব-বরদার শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচের গাছতলায়, মাননীয় প্যাঁচার বিচারশালায় যারা যায়, যুগে-যুগে, —তারা ঠিক জানে ও-দেশের সমস্ত অর্থ-অনর্থের সীমানা।

তাই Synesthesia কি ইন্দ্রিয় বিপর্যাস— এসব শক্ত-শক্ত কথার কোনো মানে নেই, যেমন মানে আছে কিনা হাসি-হাসি মুখ ভালোমানুষ ন্যাড়ার লাল গানে নীল সুরের 'মজারু' ছন্দে মাথা দোলানোর মধ্যে।

মানের পিঠে সওয়ার হওয়া ভাষাকে মানে-হীনতার দমকা হাওয়ায় আকাশে উড়িয়ে নিয়ে চলতে পারে যেসব পক্ষীরাজ, তাদেরই একজনকে উপহার পেয়েছিল বাংলার সাহিত্য, বাঙালীর ছেলেবেলা। সেই আকাশে বিষ্টির মিঠে গন্ধ ভাসে। সেই শৈশবে মিলেমিশে থাকে জাত-ধর্ম-বর্ণের বেড়া-ভাঙা শৈশব। সেখানে দুষ্টু-শান্ত, বাঙালি-অ্যাংলো-সাহেবী, এমনকি কালো-কুচ্ছিত সমাজ-ছাড়া ভূতুড়ে ছানাদেরও প্রবেশ অবাধ। তাই তো সেখানে পাশাপাশি-ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করে মোমবাতি-দেশলাই-চোষা ডানপিটে ছেলে-পিলে, ধন্যি-কাঁদুনে বুথ সাহেরের বাচ্চা, এমনকি চাঁদনি আলোয় আহ্লাদে হাত-পা-ছুঁড়ে খেলা পান্তো ভূতের জ্যান্ত ছানাটিও। 'ভূতুড়ে খেলা'য় ভূতের মায়ের কিম্ভূত ভাষা ও ভঙ্গির আদর মনে পড়িয়ে দেয় লীলা মজুমদারের একাধিক গল্পের অনুষঙ্গ। সেখানেও হতদরিদ্র, কালো-কুশ্রী, নোংরা, ন্যাংটা পথশিশুরা সুখী, সম্পন্ন শৈশবের চোখে

বারবার ভূতের ছানা হয়ে ভয় ও বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছে। কখনো বা গল্প-শেষে এই দুই ভিন্নস্তরিক শৈশবের মধ্যে গড়ে উঠেছে সহজ সৌহার্দ্যের সেতু।[১৬]

সুকুমারের সাহিত্যেও ভালো ও মন্দ ছেলেদের মধ্যেকারের বেড়া জল-অচল নয়। ভালো ছেলেরা যেমন সেখানে মাঝেমধ্যে পদস্খলিত হয়েছে আদর্শ 'ভালো'ত্ব থেকে, তেমনই মন্দ ছেলেদের 'মন্দ'তাও কখনো নিরেট, নিপাট হয়নি। দুষ্টু ছেলেরা সেখানে পাঠশালা পালিয়ে, পাড়া বেড়িয়ে গ্রাম-সুদ্ধ লোকের কান-প্রাণ 'ঝালাপালা' করে তুলেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তারা সকলে নির্বোধ কিংবা মূর্খ নয়। নিদ্রিত পণ্ডিতমশাইয়ের ক্লাসে বসে মিহিদানার ফাঁকা হাঁড়িতে চিনেপটকা ফাটায় যে দাশরথি ওরফে 'পাগলা' দাশু, অঙ্কের লম্বা লম্বা গুণ-ভাগের বেলায় তারই আবার আশ্চর্যরকম মাথা খোলে।[১৭] অন্যদিকে, কেবল মেডেলের আশায় লেখাপড়া করে সহপাঠীদের তাক্ লাগাতে চায় যে নন্দলাল, ভাগ্যের ফেরে প্রথম হয়েও তার কপালে মেডেল কিংবা প্রশস্তি কিছুই জোটে না।[১৮] [ঠিক 'ছেলে'র দলে না পড়লেও দুর্দান্ত পাণ্ডিতমূর্খের বিপজ্জনকতার আরেকটি দৃষ্টান্ত আছে 'অবাক জলপান'-এ। জলের 'খবর' জানতে চাওয়া তৃষ্ণার্ত পথিক পড়েছিল বিদ্যে-দিগগজ মামাবাবুর কেমিস্ট্রি-বায়োকেমিস্ট্রির কবলে। মরীয়া পথিক শেষপর্যন্ত কোনোমতে জল আদায় করবার পর তাকে 'হতভাগা জোচ্চোর' বলে গাল দিয়ে প্রস্থান করে।[১৯]]

এই ভালো-মন্দ, বাধ্য-অবাধ্য-দুর্বাধ্য, হাঁদা-বোকা কিংবা চালাক-চতুর, পাগল কিংবা মিচকে — সমস্ত ছেলেদের গল্পই মোড়া থাকে ছেলেমানুষির সহাস্য মাধুর্যের চাদরে। প্রবাহের জল যেমন আবিল হয় না, তেমনই সহস্র দোষ, হিংসুকপনা কিংবা ধূর্ততা সত্ত্বেও এইসব কৈশোরের গল্প-শরীরে কোথাও লাগে না কোনো মালিন্যের স্পর্শ। তাই এদের বিশেষ ও নির্বিশেষ কাঁচা-মিঠে ছেলেবেলাগুলিকে জারণ করে নিতে অসুবিধে হয় না আবালবৃদ্ধ পাঠকের।

৬

সুকুমার রায়ের 'স্বপ্ন-ঘোড়ার চড়নদার' সাহিত্যের স্বপন-ঘোড়াটি যদি হয় ননসেন্স

হিউমার, তবে মানতেই হবে যে তার রাশ টানা থাকে সুললিত খেয়াল-ছন্দের হাতে, অযাচিত, অসম্ভব সব যতি ও মিলের দোলায়। 'ব্যাকরণ মানি না'র প্রখ্যাত অস্বীকৃতিটি সত্ত্বেও 'শব্দ-কল্প-দ্রুমে' যেমন তাঁর অনায়াস নৈপুণ্য, তেমনই 'অসম্ভবের ছন্দে' আসলে তাঁর বহুসম্ভাব্য প্রয়োগ-যশ। 'খিচুড়ি' থেকে 'হেঁসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী', 'অবাক জলপান' থেকে 'খাই-খাই'— শব্দ আর অর্থের হরেক সন্ধি-বিচ্ছেদে, নতুন নতুন জোড়কলম শব্দের 'ধড়ে মুড়ো সন্ধি'তে হাজার আলোর রোশনাই ছুটেছে সর্বত্র। মুক্তির অবাধ দৌড় সুকুমার-সাহিত্যে কেবল শিশুকিশোরের একচেটে অধিকার নয়, ভাষার জন্যও তার উদার বরাত। সেই বাঁধনহারা ছুটির নীল আকাশের নীচে, দুষ্টু-নিরীহ, দস্যি-লক্ষ্মী, আহ্লাদী-কাঁদুনে সমস্ত ছেলেমেয়েদের ঐকতানে এসে থামে আবোল তাবোলের খেয়ালি গান। খ্যাপা মনে বেজে ওঠে ধাঁই-ধপাধপ্ তবলার বোল। আদিম কালের চাঁদিম হিমে ক্রমশ মিলেমিশে যায় ঘুমঘোরে ডুবে আসা শেষ অর্থরহিত গান — তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিমের এযাবৎ সঞ্চয়। সেই বেবাক বিশ্বের সম্মেলনীতে, অনন্ত অনর্থ-সম্ভাবনাশায়ী ভাষা-পৃথিবীতে, জাদু-বাস্তবের বহুস্তরিত ভূমির আশ্রয়েই সবচেয়ে সানন্দ, সর্বাধিক 'সুকুমার' হয়ে বেঁচে থাকে চিরকালের শৈশব।

উল্লেখপঞ্জি :

(১) সৈয়দ মুজতবা আলী, দেশে-বিদেশে, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চব্বিশতম মুদ্রণ: ১৪২২, পৃ. ১১৭

(২) "যারা দান দেয় তারা মুনাফায়
সাধুতার সুদ কষে তবে হয় দাতা।" (অন্নদাতা)—অমিয় চক্রবর্তী,

(৩) সুকুমার রায়, রাজার অসুখ, রাজার অসুখ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, পৃ. ১৬-২০

(৪) সুকুমার রায়, এক বছরের রাজা, রাজার অসুখ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, পৃ. ৯-১১

(৫) সুকুমার রায়, ব্যাঙের রাজা, রাজার অসুখ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, পৃ. ২১-২৫

(৬) সুকুমার রায়, লড়াই-খ্যাপা, আবোল তাবোল, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রকাশ: নভেম্বর

২০০৩, পৃ. ১৫
(৭) সুকুমার রায়, ছায়াবাজি, আবোল তাবোল, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৭
(৮) সুকুমার রায়, একুশে আইন, আবোল তাবোল, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ২৩
(৯) সুকুমার রায়, সৎপাত্র, আবোল তাবোল, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ২০
(১০) সুকুমার রায়, হাত গণনা, আবোল তাবোল, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৪১
(১১) সুকুমার রায়, সবজান্তা, পাগলা দাশু, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ: বইমেলা, ২০০২, পৃ. ১৬-১৮
(১২) সুকুমার রায়, চালিয়াৎ, পাগলা দাশু, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ: বইমেলা, ২০০২, পৃ. ১৩-১৫
(১৩) সুকুমার রায়, ডিটেকটিভ, পাগলা দাশু, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ: বইমেলা, ২০০২, পৃ. ৩৫-৩৭
(১৪) সুকুমার রায়, ট্যাঁশ গরু, আবোল তাবোল, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রকাশ: নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৪৬
(১৫) সুকুমার রায়, হ য ব র ল, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, প্রকাশ: অগাস্ট ২২, ২০০২, পৃ. ৩৫
(১৬) লীলা মজুমদার, ভূতের ছেলে, পেনেটিতে, ছোটদের অমনিবাস, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, প্রকাশ: জানুয়ারি ২৬, ২০০৫, পৃ. ১১-১৩, পৃ. ৩২২-৩২৪
(১৭) সুকুমার রায়, চিনেপটকা, পাগলা দাশু, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ: বইমেলা, ২০০২, পৃ. ৯
সুকুমার রায়, পাগলা দাশু, পাগলা দাশু, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ : বইমেলা, ২০০২, পৃ. ১
(১৮) সুকুমার রায়, নন্দলালের মন্দ কপাল, পাগলা দাশু, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ : বইমেলা, ২০০২, পৃ. ২৫-২৭
(১৯) সুকুমার রায়, অবাক জলপান, এন.বি.এ. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ১৬

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক সাগা : গোপাল হালদার

সঙ্ঘমিত্রা কর্মকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যের একজন মননশীল বক্তব্য সচেতন প্রগতি সংস্কৃতির বুদ্ধিদীপ্ত ধারক গোপাল হালদার। যিনি জন্মেছিলেন ১৯০২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি পৈত্রিক ভিটে ভদ্রাসন যেটি ঢাকা জেলার বিদ্‌গাঁও গ্রামে অবস্থিত। পরবর্তীতে নববাসস্থান হয় নোয়াখালী শহরে, হালদার গোষ্ঠী ভরদ্বাজ গোত্রের রাঢ়ীও ব্রাহ্মণ, তবে "আট পুরুষ ধরে ফারসি পদবীতে চিহ্নিত হালদার"।[১]

গোপাল হালদারের জন্মের বহু আগে থেকেই বিদ্‌গাঁও'য়ের হালদাররা "কার্যত বিত্তহীন বিষয়হীন..... ভদ্রাসন ছাড়া জমি ছিল না এক কড়াও"।[২] অন্ন অর্জনের জন্য বিদেশে চাকরি-বাকরি বা স্বাধীন বৃত্তির আশ্রয়ে থাকতে হতো। সেই সূত্রেই নোয়াখালী শহরে স্থাপিত হয় হালদার গোষ্ঠীর নববাসস্থান। ভূমি না থাকলেও বিদ্‌গাঁওএর হালদারদের যৌথ পরিবারের কাঠামোতে ভূমি প্রধানের জের তখনো বজায় ছিল- নোয়াখালী শহরের 'বাসাবাড়ি' আর বিদ্‌গাঁওয়ের 'ভদ্রাসনে'র সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়নি। গোপাল হালদারের বাবা নোয়াখালী শহরের আইনজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর জীবনে বাবার প্রভাব অনেকখানি। "শিক্ষিত বাঙালি তিনি, ভদ্রতা, শোভনতা, সম্ভ্রমবোধ সব শুদ্ধ একটা সংযত সুন্দর জীবন ছিল তাঁর । আজ মনে হয় জীবনের সকল দায়িত্ব স্বীকার করিয়া ভালোমন্দশুদ্ধ এই জীবনকে এমন সরস, ক্ষমা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যিনি দেখিয়া গিয়েছেন সেই সাধারণ মানুষই আমার আদর্শ মানুষ"।[৩] এই আদর্শ মানুষের আদলেই গোপাল হালদার বাঙালি হিন্দুমধ্যবিত্তের প্রকাশ ও পরিণতির সাগা (saga), 'ভদ্রাসন' উপন্যাসমালার 'ভাঙন' বা (ভাঙনী কূল),

'স্রোতের দীপ', 'উজানগঙ্গা'র জ্ঞানশংকর চৌধুরীর চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠ সমাজমনস্ক বিশ্লেষণ পরায়ন দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁকে বাংলা উপন্যাসের প্রাঙ্গনে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গোপাল হালদারের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ১২, সংখ্যায় বারো হলেও তাঁর প্রত্যেক পর্বে বিভক্ত উপন্যাসগুলিকে বিন্যস্ত করলে দেখা যায় তিনখানা উপন্যাস । 'একদা'-'অন্য দিন'-'আর একদিন' একসঙ্গে 'ত্রিদিবা'। 'ভূমিকা', 'নবগঙ্গা', 'জোয়ারের বেলা', ভাঙন বা (ভাঙনী-কূল), 'স্রোতের দীপ', 'উজানগঙ্গা' - ছয়খন্ডে বিন্যস্ত ভদ্রাসন। 'পঞ্চাশেরপথ', 'ঊনপঞ্চাশী', 'তেরশোপঞ্চাশ' মন্বন্তর ত্রয়ী। তাঁর উপন্যাসগুলি মোটামুটি তিন ধরনের রীতিতে লেখা। 'ত্রিদিবা' চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা উপন্যাস 'ভদ্রাসন' বাঙালি জীবনের পারিবারিক সাগা(saga), মন্বন্তর-১৩৫০ সালের সমকালীন ইতিহাসের দলিল বা ডকুমেন্টারি উপন্যাস । উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনা অনুযায়ী সাজালে বারোখানা উপন্যাসের প্রত্যেকটি স্বসম্পূর্ণ পর্ব হিসেবে সাজালে বিন্যাসটি হয় এইরকম- ১. ভূমিকা (প্রায় ১৬০৯ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ঘটনাকাল) ২. নবগঙ্গা (ঘটনাকাল ১৮৫৮ থেকে ১৮৭০) ৩. জোয়ারের বেলা (ঘটনাকাল ১৮৭০ থেকে ১৮৯০) ৪. ভাঙনী-কূল বা ভাঙন (ঘটনাকাল ১৯২০ থেকে ১৯২৫) ৫. স্রোতের দীপ (ঘটনাকাল ১৯২৫ থেকে ১৯২৭) ৬. উজানগঙ্গা (ঘটনাকাল ১৯২৭ থেকে ১৯৩০) ৭. একদা (১৯৩০ ডিসেম্বর মাসের বিশেষ একটি দিন) ৮. অন্যদিন (১৯৩৭ থেকে ৩৮ এর বিশেষ একটি দিন), ৯. পঞ্চাশের পথ (ঘটনাকাল ১৯৪২ এর এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত) ১০. ঊনপঞ্চাশী (ঘটনাকাল ১৯৪২ এর আগস্ট থেকে ডিসেম্বর) ১১. তেরশো পঞ্চাশ (ঘটনাকাল ১৯৪৩ এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৪ এর এপ্রিল) ১২. আর একদিন (ঘটনাকাল ১৯৪৮ এর বিশেষ একটি দিন)। ঘটনার সময় অনুযায়ী বারোখানা উপন্যাস পরপর পড়ে গেলে সমস্ত পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন লেখক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পতন অভ্যুদয়ের কাহিনিই উপন্যাসগুলিতে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মননএর শ্রেষ্ঠ ফসল 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১) এর উৎসর্গপত্র লিখেছেন-'বাংলাদেশের যে যুগ শেষ হইয়াছে তাহার সংস্কৃতির শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম আমার সেই

পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের চরণোদ্দেশে'।[৪]

গোপাল হালদারের মতে সেযুগ ১৮১৭তে আরম্ভ হয়ে ১৯১৮তে শেষ হয়ে যাচ্ছিল শিক্ষিত ভদ্রলোকের যুগ। এহলো কর্নওয়ালিসী জমিদারিতন্ত্রে পরিপুষ্ট মধ্যস্বত্বভোগীর ইংরেজ কাজের সহযোগী চাকরিজীবীর ও আইনের শাসন আর বড়ইংরেজের ভিক্টোরিয় ঔদার্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্বাধীনবৃত্তিজীবী বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণের যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় ও নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা চিন্তায় ও সৃষ্টিতে নিজেদের এক অদ্ভুত পরিচয় তুলে ধরেছিল। সাধারণভাবে একেই বলা হয় বাংলার 'নবজাগরণ'। এই জাগরণ নির্বাধ নয়, পূর্ণাঙ্গও নয়। ঔপনিবেশিক শাসনশোষণ কুণ্ঠিত হলেও বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভাবজগতের নবগঙ্গায় যে সেদিন জোয়ারের বেলা এসেছিল তারই তথ্যনিষ্ঠ রসোজ্জ্বল লিপিচিত্র ধরা আছে গোপাল হালদারের 'নবগঙ্গা' উপন্যাসে। নবগঙ্গার (ঘটনাকাল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত, আর জোয়ারের বেলা উপন্যাসের (ঘটনাকাল ১৮৭০ থেকে ১৯০৩) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশের ঐতিহাসিক পটভূমিকার ধারাভাষ্য আছে 'ভূমিকা' (ঘটনাকাল প্রায় ১৬০৯ থেকে ১৮৫০) উপন্যাসে। 'ভূমিকা' থেকে 'উজানগঙ্গা' ছয় পর্বে বিন্যস্ত ভদ্রাসনে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রকাশ ও পরিণতির তত্ত্বকথা চিত্রিসারের চৌধুরী বংশের 'সাগা'র মধ্যে কথারূপ দান করেছেন গোপাল হালদার। 'ভদ্রাসন' পর্যায়ের উপন্যাসগুলি 'সাগা'ধর্মী উপন্যাস। 'সাগা' বলতে কোনো উদ্দেশ্য বর্ণনা ব্যতিরেকে কোনো কাহিনী বা গদ্যে রচিত ইতিহাসকে আইসল্যান্ডে মধ্যযুগে সাগা বলা হত। 'In a stricter sence, however, the term saga is confined to legendary and historical fiction, in which the author has attempt and imaginative reconstruction of past and organised the subject matter according to certain aesthetic principles'. 'সাগা' নানা ধরনের হয় যেমন– রাজরাজাদের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পারিবারিক জীবনের 'সাগা' হয়ে থাকে। গলস্ওয়ারদি তাঁর 'Forsyte saga' য় পুরাতন প্রজন্মের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। 'So am forsyte the Victorian was metaphoricaliy in the dock (Edwardian)

generation in the jury box'. (20th century English literature AC world) রোঁলাও 'সাগা' লিখেছেন, রুশদেশের ইগোকে নিয়ে বীরগাথা। তবে সাগাগুলো প্রথম ১৩শ শতকে রচিত হলেও বর্তমানে মেনে নেওয়া হয়েছে এগুলি সচেতন শিল্পসৃষ্টি যা বীরত্বপূর্ণ কাহিনি।

প্রাচীন নর্ডিক ও জার্মানির ইতিহাসের গল্প, ভাইকিংদের সমুদ্রযাত্রা, পথে শত্রুদের সাথে লড়াই, তাদের আইসল্যান্ডে দেশান্তরিত হওয়া এবং সেই পরিবারগুলির দাঙ্গার কাহিনি লেখা হতো আইসল্যান্ডে। লেখাগুলি গদ্যভাষায় রচিত হতো এবং মহাকাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। পরবর্তীতে ঐতিহাসিক বা কিংবদন্তি ব্যক্তি বা পরিবারের জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে একটি মধ্যযুগীয় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গদ্য বর্ণনা। বীরত্বপূর্ণ শোষণের কোনো বর্ণনা সাগা নভেলের ক্ষেত্রে যা একটি পরিবার বা সামাজিকগোষ্ঠীর সদস্য বা প্রজন্মকে বর্ণনা করে। গজেন্দ্রমিত্রের 'কলকাতার কাছেই', 'উপকণ্ঠে'ও 'পৌষফাল্গুনের পালা', প্রমথনাথ বিশির 'জোড়াদিঘির চৌধুরীপরিবার' 'সাগা' জাতীয় রচনা। গোপাল হালদারের 'ভদ্রাসন' পর্যায়ের ছটি উপন্যাস 'সাগা' ধর্মী, আমার আলোচ্য বিষয় 'সাগা' ধর্মিতার মাধ্যমে গোপাল হালদার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে নতুন কৌশলে উপন্যাসগুলি রচনা করলেন যেখানে চলমানতার ইতিহাসে নিজেও আবর্তিত, বিবর্তিত হয়েছেন।

বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ ও পরিণতির তত্ত্ব, লেখক বন্দি নিবাসে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে উপন্যাস আকারে চিত্রিত করেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সনাতন চৌধুরী। বাংলায় দ্বৈতশাসনের নৈরাজ্যের কাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা অর্থাৎ ১৭৯৩এ কর্নওয়ালিসী ভূমিব্যবস্থা, সমাজ ইতিহাসের জটিলকুটিল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অস্থির পরিবেশে বর্ধিত একজটিল মানুষ। নবাবী আমলের শেষ, কোম্পানি আমলের শুরু – সনাতন চৌধুরী সেই যুগসন্ধির এক অনুভূতি প্রবণ মানুষ। সনাতন চৌধুরীর পিতার প্রজাপিড়ন আর বণিক ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা বন্ধু সফর আলীর প্রতি সনাতনের সমর্থন- সহানুভূতি তার বিদ্রোহী প্রজা ঘাসু ঢালীদের প্রতি, কারণ সুফিসাধক ফুলশাহ ফকিরের সাম্য ও প্রেমের বাণী তার বিবেকের ধ্রুবতারা। সনাতন চৌধুরী বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ,

অন্যায়ের প্রতিবাদী, পৌরুষের লাবণ্যে স্নিগ্ধ অনুভূতিপ্রবণ কবি মানুষ, সে সফর আলীর মতো প্রতিবাদে, প্রতিহিংসায় অধীর হয়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় না, তার মনের মধ্যে প্রতিবাদের তুষের আগুন। সফর আলীর দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড আর ফুল-শাহ ফকিরের উৎসাহে ঘাসু ঢালীদের প্রজাবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল সনাতন চৌধুরী কোম্পানির গারদ থেকে ফিরে এসে, হতাশায় ভক্তিমার্গে মাধবের চরণে আশ্রয় নেয়। সনাতন চৌধুরীর স্বভাবে যে বৈরাগ্যের রং ধরেছিল রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও সাংসারিক বিপাকে তা ক্রমাগত গাঢ় হয়ে ওঠে – লেখক তার সুনিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন এই উপন্যাসে। 'ভূমিকা' উপন্যাসে ১৭৬০ থেকে ১৮০০সাল পর্যন্ত সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের কাহিনী পাওয়া যায় সনাতন চৌধুরীর কাহিনীর পাশে। এই বিদ্রোহের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের মিলিত অভিযান ইতিহাসের এই সত্য মেনেই গোপাল হালদার উপন্যাসে কাহিনি গড়েছেন। সনাতন চৌধুরীর স্ত্রী কালিন্দী ঠাকুরানীর চরিত্রটি সমাজবাস্তবের দিকথেকে স্বাভাবিক আচরণ করলেও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। তবে নারায়ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের সাধনায় সনাতন চৌধুরীর আত্মবিস্তৃত হওয়ার প্রয়াসে ট্রাজিক অন্তরদাহে তীব্রতা না থাকলেও যন্ত্রণার অনুচ্চারিত বিষন্ন স্পর্শ পাঠক হৃদয়ে দাগ কাটে।

উদ্যোগ, উদ্যম, পৌরুষ অবলম্বন করেই বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশের কালপর্ব শুরু হলো গোপাল হালদারের পরবর্তী উপন্যাস 'নবগঙ্গা' ও 'জোয়ারের বেলা'য়। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যদিয়ে শিবপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ, রাজীব, বিভূতি শংকর চৌধুরীদের সময়কাল উঠে এসেছে। ইংরেজি শিক্ষার অভ্যুদয়, ব্রাহ্মধর্ম, জাতীয় মহাবিদ্রোহ, মহারানীর শাসন, কলোনীয় বাঙালি মধ্যবিত্তের ইংরেজরাজের অনুগত প্রজা হয়ে চাকরির স্বর্গরাজ্যে আরোহণের প্রয়াস, ইংরেজ রাজত্বের আইনের শাসনের প্রতি আস্থা, 'বড়ো ইংরেজের' ভিক্টোরীয় ঔদার্যের প্রতিশ্রদ্ধা— ঔপনিবেশিক বন্ধনে কুণ্ঠিত হলেও ভাবজগতের নবগঙ্গায় অবগাহন করে জাতীয় জাগরণের বিকাশশীলতার কালপর্ব। বাঙালি মধ্যবিত্ত আরোও নির্দিষ্ট করে বললে দাঁড়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর বণিক ইংরেজদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত জমিদার-

দালাল শ্রেণী, ব্রিটিশরাজের অনুগত আমলা-কর্মচারী- ভিক্টোরীয় ঔদার্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ইংরেজি সাহিত্য পাঠের পথ বেয়ে বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র আর বুর্জোয়া লিবারিজমের ভক্ত উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-অধ্যাপক পত্রিকা সম্পাদক সাহিত্যিক– বাঙালি হিন্দুমধ্যবিত্ত (ভদ্রলোক) বুদ্ধিজীবীশ্রেণির জাগরণের কথা 'নবগঙ্গা' ও 'জোয়ারের বেলা'য়।

আত্মআবিষ্কারের পথ বেয়ে জাতীয় চেতনার উন্মেষ– 'হিন্দুমেলা', 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, 'আনন্দমঠ' এর 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ, কলোনীয় কাঠামোর মধ্যেই 'আত্মশক্তি'তে ভর করে 'স্বদেশীসমাজ' গড়ার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করে, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি আন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশমুক্তির রক্তাক্ত শপথ পাঠ। লর্ড কার্জনের ষড়যন্ত্র, স্বদেশী আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত অধ্যায়ে পৌঁছে ইংরেজ চরিত্র সম্পর্কে মোহভঙ্গ, আর চাকরির সর্গরাজ্য থেকে বিদায়ের কালে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবনে 'ভাঙন' এর শুরু। 'ভাঙন' উপন্যাসে পদ্মার স্রোতে অবলুপ্তির পথে চৌধুরীদের ভূমিচেতনা ও ঐতিহ্যের 'ভদ্রাসন' বাড়ি– এতে উদ্বিগ্ন জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী, তাঁর মধুখালির ভদ্রজীবন যাত্রার নববাসস্থানের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে মেঘনার 'ভাঙন'। স্রোতের গ্রাসে ভাঙনধরা কূলে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার সংগ্রামে অবিচল জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরী, বাঙালি ভদ্রলোকের জীবনে ভাঙনের কালপর্বের ট্রাজিক নায়ক। 'স্রোতের দীপ' উপন্যাসে যুগসন্ধির অন্ধকারে চৌধুরী বংশের সন্তানরা সুরেশ্বর, অমর, অতুল, অশোক চিত্রিসারের যে জমিদারি ঐতিহ্য তাতে 'ভদ্রাসন' রক্ষা করুক আর উদ্যম, উদ্যোগ, পৌরুষ অবলম্বন করে সুস্থ ও ভদ্রজীবন যাত্রার মধ্যদিয়ে মধুখালির নতুন বাসস্থানকে আরোও প্রসারিত করুক– এই মানবীয় আকাঙ্ক্ষা, প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞানশঙ্করের কর্মসাধনা ও জীবনযাত্রার মধ্যদিয়ে। যদিও জ্ঞানশঙ্করের আত্মজরা কেউই 'সুস্থ ও ভদ্র' জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী হয়নি। সুরেশ্বর, অমর, অতুল, অশোক সকলেই সংকীর্ণ স্বার্থের নোঙর ছিঁড়ে 'উজান গঙ্গায়' সমুদ্রসন্ধানী অভিযাত্রী। এই হচ্ছে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বিকাশ ও পরিণতির তত্ত্বকথা। এই তত্ত্বকথা 'নবগঙ্গা', 'জোয়ারের

বেলা', 'ভাঙন', 'স্রোতের দীপ', 'উজানগঙ্গা'য় কথারূপ লাভ করেছে। প্রত্যেকটি উপন্যাসই তথ্যবহুল।

মননশীল লেখক তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিলব্ধ তত্ত্বটিকে তথ্যসহ যুক্তিপরম্পরায় সজ্জিত করে উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন, ফলে উপন্যাসের গল্পরসের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও চরিত্রের অন্তরজগতের জটিলতা ও রহস্যের আবরণ উন্মোচনের শিল্পকুশলতা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। তবুও 'নবগঙ্গা' উপন্যাসে লেখক বিধবা রমণী গিরি ঠাকুরানীর মর্মবেদনা, তার জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি লেখক দরদি মন নিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং ব্রাহ্মচেতনায় উদ্দীপ্ত চিন্তাহরণ ও গিরীশ গাঙ্গুলী এবং তাদের বন্ধু রাজীব চৌধুরী এই তিনটি নবযুবকের আদর্শনিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাস্তবচিত্র এঁকেছেন লেখক। তিনবন্ধুর আদর্শ ও লক্ষ্য অভিন্ন হলেও ব্যক্তিত্বের ভিন্নতার জন্য চিন্তাহরণ ভক্তিমার্গে অপপট, অনুভূতিপ্রবণ, গিরীশ জ্ঞানমার্গে আত্মবিশ্বাসের স্পর্ধায় আপশহীন সংগ্রামী, রাজীব কর্মযোগী, দুঃসাহসী, দরদি দেহে-মনে বলিষ্ঠপুরুষ।

অন্যদিকে 'জোয়ারের বেলা'য় মানবমহিমায় উজ্জ্বল, ব্যক্তিত্বের শ্রীমণ্ডিত কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ চরিত্র আমরা পেয়েছি। ব্রাহ্ম আন্দোলন, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সাধনা, হিন্দুমেলা, স্বাদেশিকতার উন্মেষ, চা-কর সাহেবদের অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন নবজাগরণের– প্রাণোন্মাদনায় দুঃসাহসী, কর্মব্রতী, ত্যাগব্রতী মানুষের সমাবেশ যুগপরিবেশের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। পুরাতন জীবনবোধ অবক্ষয়-যন্ত্রণা-সংশয়-জিজ্ঞাসা, নতুন জীবনবোধে উত্তরণ, দেশ-কাল-সমাজের আবহমান দ্বান্দ্বিক বিকাশের স্রোত কীভাবে ব্যক্তিজীবনে ক্রিয়াশীল, তার মননশীল বিশ্লেষণের ঝোঁক প্রতিটি উপন্যাসেই লক্ষ করা যায়। যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসরণ করায় 'ভাঙন', 'স্রোতের দীপ', 'উজান গঙ্গা'র আবেদন অনেকটাই বুদ্ধির কাছে। 'ভদ্রাসন' এর পর্বগুলিতে কোম্পানির আমল থেকে লবণ-সত্যাগ্রহ পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাসের ঘটনার বর্ণনা বা বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের নিছক বৃত্তান্ত বা চিত্র নয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও জটিলতায় বিকাশমান ইতিহাসের বিশেষসত্যকে উপন্যাসে তুলে ধরার বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার বিরলদৃষ্টান্ত।

বাংলাসাহিত্যে এ জাতীয় রচনা নিঃসন্দেহে গোপাল হালদার পথিকৃৎ। 'ভূমিকা থেকে 'উজানগঙ্গা' মধ্যবিত্ত জীবনের প্রকাশ ও পরিণতির তত্ত্বকথা চৌধুরী বংশের 'সাগা'র(saga) মধ্যে কথারূপ দান করার যে পথ দেখিয়েছেন তাতে তাঁর 'ভদ্রাসন' বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হিসেবে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

তথ্যসূত্র :

১. রূপনারানের কূলে, প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, পুঁথিপত্র, ১৯৯২ (পৃষ্ঠা-৭)
২. রূপনারানের কূলে, প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, পুঁথিপত্র, ১৯৯২ (পৃষ্ঠা-১৫)
৩. রূপনারানের কূলে, প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, পুঁথিপত্র, ১৯৯২ (পৃষ্ঠা-৭)
৪. সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, গোপাল হালদার, প্রকাশ ভবন, ২০১৯ (ভূমিকা)

আকরগ্রন্থ :

১. গোপাল হালদার রচনা সমগ্র, প্রথম জানুয়ারি ১৯৭৯,এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি কলকাতা
২. গোপাল হালদার রচনা সমগ্র, দ্বিতীয়, জানুয়ারি ১৯৯৩ এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা
৩. সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, গোপাল হালদার, প্রকাশ ভবন, ২০১৯

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

নাটকের মধ্যে নাটক ‘বিভাব’ এবং শম্ভু মিত্র : বিশ্লেষণ

সত্যজিৎ বসাক
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

‘বিভাব’ নাটকটি আকারে হয়তো ছোট কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে এবং অভিনয়ের দিক থেকে ‘বিভাব’ নাটকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বাংলা নাট্যজগতে অসীম। এই নাটকে একধরনের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে, নাটকের হাসির দৃশ্য খুঁজতে বেরনোর মজা দেখে দর্শকরা যখন হেসে ওঠে তখনই তাঁদের হাসি স্তব্দ করে দেওয়ার জন্য একটি রাজনৈতিক সত্যের আকস্মিক আঘাত নামিয়ে আনা হয়। নাট্যকার শম্ভু মিত্রের লেখা বেশিরভাগ নাটকেই গণচেতনাধর্মী, সমাজ সংস্কারধমী, ফ্যাসিবাদ বিরোধী চিন্তাভাবনা তাঁর নাটকে উঠে এসেছে। এর প্রধান কারণ হলো, একটা সময়ে তার গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থেকে বামপন্থী আদর্শ অনুসারে পথ চলা। ‘বিভাব’ নাটকেও ‘আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিকাল লিডার’ এর অনুষঙ্গ এবং খাদ্য-বস্ত্রের দাবিতে গণ-আন্দোলন প্রসঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকারের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকে। অর্থাৎ নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারানোর মতো নির্মম বাস্তবতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাট্যকার শম্ভু মিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সূচকশব্দ

কর্মশালা থিয়েটার, জাপানি কাবুকি, বহুরূপী, গণনাট্য সংঘ, গণ আন্দোলন।

মূল প্রবন্ধ

১৯৫১ সালের ২০শে এপ্রিল ‘বহুরূপী’ নাট্যদলের প্রযোজনায় এবং নাট্যকার শম্ভু

মিত্রের পরিচালনায় ‘বিভাব’ নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত শ্রীযুক্ত সুধাংশু গুপ্তরবাড়িতে। প্রাথমিকভাবে ‘বিভাব’ নাটকটি নাট্যকার শম্ভু মিত্রের পরামর্শে একটা আইডিয়ার কাঠামো ঠিক করে নিয়ে , নাটকের কুশীলবেরা যে যার মতো সংলাপ বানিয়ে নাটকটি গড়ে তুলেছিল। নাটকটি কোনও বিশেষ একজনের লেখা নয়, সকলে মিলে তৈরি করা। তবে পরবর্তীতে নাট্যকার শম্ভু মিত্র স্বয়ং এটিকে লিখিত রূপ দিয়েছিলেন। এই নাটকে একধরনের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে, নাটকের হাসির দৃশ্য খুঁজতে বেরনোর মজা দেখে দর্শকরা যখন হেসে ওঠে তখনই তাঁদের হাসি স্তব্দ করে দেওয়ার জন্য একটি রাজনৈতিক সত্যের আকস্মিক আঘাত নামিয়ে আনা হয়। ১৯৫৬ সালে ‘বহুরূপী’ নাট্যপত্রে ‘বিভাব’ নাটকটিপ্রথম প্রকাশিত হয়। আরও পরে কুমার রায় সম্পাদিত ‘বাংলা একাঙ্ক নাটক সংকলন’ এবং শম্ভু মিত্রের ‘দুটি নাটক’ বইতেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শম্ভু মিত্রের ‘বিভাব’ নাটকটি জাপানী কাবুকী থিয়েটারের অনুসরণে রচিত। ‘বিভাব’ নাটকের নাট্যকলা সম্পর্কে শম্ভু মিত্র নিজে মন্তব্য করেছিলেন তা নিম্নলিখিত –

> “ কোনো এক ভদ্রলোক পুরোনো সব নাট্যশাস্ত্র তল্লাস করে আমাদের এই অভিনয়ের নাম দিয়েছেন ‘বিভাব নাটক’। সংস্কৃত হিসাবে তিনি ঠিক কি বেঠিক সে বিবেচনা করবেন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতেরা, কিন্তু নামের দিক থেকে আমাদের একটা সামান্য আপত্তি আছে। আমাদের মনে হয় এর নাম হওয়া উচিত ‘অভাব নাটক’। কারণ দুরন্ত অভাব থেকেই এর জন্ম। আমাদের একটা ভালো stage নেই। সিন সিনারি আলো ঝালর কিছুই আমাদের নিজেদের নেই। সঙ্গে থাকবার মধ্যে আছে কেবল নাটক করবার বোকামিটা। তাও যদি বা যোগাড়যন্তর করে অভিনয় একটা ফাঁদি সংগে সংগে দেখি সরকারের পেয়াদা খাজনার খাতা খুলে স্টেজের দরজায় হাজির। তাঁরা পেশাদারের কাছে খাজনা নেন না। কিন্তু আমাদের কাছে নেন। কারণ, আমরা তো নাটক নিয়ে ব্যবসা করি না। তাই সরকার আমাদের গলা টিপে খাজনা আদায় করে নেন। এবং এই নেওয়াটা এমন বিচিত্র সাঁড়াশি ভঙ্গীতে যে আমরা সর্বস্ব দিয়ে থুয়ে আবার ব্যোমকালী বলে

রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ি। তাই অনেক ভেবে চিন্তে একটা আমরা একটা প্যাঁচ বের করেছি যাতে stage– এর দরকার হবে না। যে কোনও রকম একটা platform হলেই চলবে, সিন সিনারি দরজা জানালা টেবিল বেঞ্চ কিছুরই দরকার হবে না। আমরা অভিনয় করবই ।"[১]

'বিভাব' নাটকটি আকারে হয়তো ছোট কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে এবং অভিনয়ের দিক থেকে 'বিভাব' নাটকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বাংলা নাট্যজগতে অসীম। সেই সময় 'বিভাব' নাটকটি কতটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার একটা নিদর্শন পাওয়া যায় একটি বিশেষ সংবাদপত্রের অভিমতে–

"একাঙ্কিকাটিকে প্রথম থেকে আমরা হাসি-তামাসার ব্যাপার বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু এর বিস্ময়কর পরিণতি যেন সপৎ করে এক ঘা চাবুকের মতো এসে পড়লো সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর চমকে উঠলাম। কেবল দৃশ্যটির পরিণতির জন্যে নয়, চমকে উঠলাম এর পরিবেশনার কায়দায় এবং অভিনয়ে নিতান্ত বৈঠকি আঙ্গিকের জন্য। মনে হল, সুযোগ পেলে, এঁরাই নাট্যজগতের বিপ্লব ঘটাবার শক্তির প্রকৃত অধিকারী।"[২]

এবার আসা যাক 'বিভাব' নাটকের মূল বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে। 'বিভাব' নাটকটি আসলে "নাটকের মধ্যে নাটক"। অর্থাৎ এই জাতীয় নাটকের সংলাপ আগে থেকে লেখা হয় না। এই ধরনের নাটকগুলি মঞ্চে দেখলে মনে হবে, নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নাটকের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা নিজেদের বুদ্ধি, ধীশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষনিক সংলাপ রচনা করে। এরপর নাটকটি যখন পূর্ণাঙ্গতা পায় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে তখন নাট্যকার লিখিত রূপ দিয়ে থাকেন। এই জাতীয় নাটককে ওয়ার্কশপ থিয়েটার বা কর্মশালা থিয়েটার বলা হয়ে থাকে। 'বিভাব' নাটকটির সবচেয়ে আস্বাদের বিষয়টি হলো যে, এই নাটকে যারা অভিনয় করেছেন তারা ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনে যে যা সেই চরিত্রটাই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এই নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্রই বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর এক একজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী। নাট্যকার শম্ভু মিত্র এই নাটকে শম্ভু মিত্র রূপেই অবতীর্ণ হয়েছেন, আবার তৃপ্তি মিত্র ব্যক্তিজীবনে শম্ভু মিত্রের স্ত্রী বা বৌদি

রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্যদিকে অমর গঙ্গোপাধ্যায় হলেন শম্ভু মিত্রের বন্ধু অমর গাঙ্গুলী রূপেই অবতীর্ণ হয়েছেন।

'বিভাব' নাটকের শুরুতে শম্ভু মিত্র দর্শকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার আকারে কিছু বলেন। তিনি বলেন যে, অনেক অভাব ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে এই নাটকটি তাঁরা মঞ্চস্থ করছেন। নাটকটি মঞ্চস্থ করার মতো তেমন কোনো উপযুক্ত উপকরণ অর্থাৎ আলোক, মঞ্চসজ্জা, ঝালর তাঁদের নেই। শুধু "নাটক করবার বোকামি"টা তাঁদের আছে। অথচ অভাবের মধ্যে দিয়ে সরকারকে খাজনা দিতে হয় তা না হলে নাটক করাই বন্ধ করে দেবে। তাঁদের এই অভাব দেখে শম্ভু মিত্র অনেক চিন্তা ভাবনা করে নাটক করবার একটা উপায় বা কৌশল বের করেছেন। সেখানে নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য কোনো উপকরণের প্রয়োজন হবে না। নাটকের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অভিনয়ের মাধ্যমে ও দেহভঙ্গিমার মধ্যে দিয়ে মঞ্চের উপকরণের উপস্থিতি দর্শকদের বুঝিয়ে দেবেন এবং দর্শকগণ সেটা সাগ্রহে মেনে নেবেন। এই প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র চারটি উদাহরণ দিয়েছেন –

১) নাট্যকার শম্ভু মিত্র কোনো এক পুরোনো বাংলা নাটকে একটি লেখা দেখেছিলেন "রাজারথারোহণম্ নাটয়তি" অর্থাৎ রাজা রথে চড়ার অভিনয় করলেন। কিন্তু এই দৃশ্য মঞ্চস্থ করার জন্য কোনো রথ বা ঘোড়ার দরকার পড়ত না। দর্শকেরা রাজার দেহভঙ্গি দেখেই বুঝে নিতেন যে রাজা রথে চড়লেন।

২) ওড়িশার একটি যাত্রায় শম্ভু মিত্র দেখেছিলেন রাজার দূত সংবাদ আনার উদ্দেশ্যে দুই পায়ের ফাঁকে লাঠি গলিয়ে হেঁট হেঁট শব্দ করতে করতে ঘোড়ায় চেপে চলার অভিনয় করলেন। সমস্ত দর্শকগণ সেই ভঙ্গিমাকে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মেনে নিলেন, দর্শক কিন্তু কেউ হাসলো না।

৩) মারাঠি তামাশায় শম্ভু মিত্র দেখেছিলেন একজন অভিনেতা দুইটি চরিত্রে অভিনয় করলো। একদিকে জমিদার বাবুর চরিত্রে আবার অন্যদিকে পুরুত মশাইয়ের চরিত্রে। কিন্তু দর্শকেরা সেটিকে নীরবে মেনে নিল।

৪) রুশদেশীয় চিত্রপরিচালক আইজেনস্টাইন-এর লেখা জাপানি কাবুকি থিয়েটারের উপর বই পড়ার প্রসঙ্গ তুলে নাট্যকার শম্ভু মিত্র বললেন যে, নাটকের

উপকরণ অপেক্ষা অভিনয় এবং দেহভঙ্গিমার গুরুত্বই বেশি। তাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন দর্শকরা সবকিছু মেনে নিলেই "সবঝঞ্ঝাট মিটে যায়।"[৩]

– এই চারটি উদাহরণ দেওয়ার পর মূল নাটকে প্রবেশ করা হয়। অমর গাঙ্গুলীর বাড়িতে আসেন শম্ভু মিত্র হাসির নাটক করার বিষয়ে আলোচনা করতে। কারণ সর্দার প্যাটেল গাল দিয়ে বলেছেন, 'বাঙালি হাসতে ভুলে গিয়েছে'। তাই শম্ভু বাবু সঙ্গে অমর বাবু ও বৌদিকে(তৃপ্তি মিত্র) নিয়ে ভাবতে বসলেন, সত্যিই কি বাঙালি হাসতে ভুলে গেছে এমন নাটক কি করা যায় না যা দেখে দর্শক হো-হো করে হাসবে? কেমন হবে তার কাহিনী? তৃপ্তি মিত্রের মতে 'পৃথিবীতে সবচেয়ে পপুলার জিনিস হচ্ছে প্রেম'। তাই তৃপ্তি মিত্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী শম্ভু বাবু ও অমর বাবু 'লভসিন' করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু দুই রকমের লভ সিনেও দর্শকদের হাসির উদ্রেক হয় না। নানা জল্পনার শেষে শম্ভু বাবু এবং অমর বাবু বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়, হাসির খোঁজে। পথে মেলে নানা অভিজ্ঞতা। শেষে খাদ্য ও বস্ত্রের দাবিতে তাদের সামনে হাজির হয় একটা মিছিল। তাঁরা দেখেন একদল শোভাযাত্রী সরকারের কাছে খাদ্য ও বস্ত্রের দাবি জানিয়ে স্লোগান দেয় "চাল চাই, কাপড় চাই"। পুলিশ গুলি চালায়, মিছিলকারীদের মধ্যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে গুলি খেয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে গোঙাতে থাকে। আহত তরুণ-তরুণীর রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে বোঝাতে মঞ্চটি লাল আলোতে ভরে যায়। শম্ভু মিত্র প্রথমে অমরবাবুর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করেন সবার হাসি পাচ্ছে কিনা এবং শেষে উপস্থিত দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলেন– বাঙালি বোধহয় এবার হাসবে। নাটকটির পরিসমাপ্তি এখানেই ঘটে।

এইভাবে 'বিভাব' নাটকের মধ্যে দিয়ে এক অতর্কিত চাবুকের আঘাত এসে পড়ে রাষ্ট্রের সমাজ তথা রাজনৈতিক পটভূমির উপর। নাট্যকার শম্ভু মিত্রের লেখা বেশিরভাগ নাটকেই গণচেতনাধর্মী, সমাজ সংস্কারধমী, ফ্যাসিবাদ বিরোধী চিন্তাভাবনা তাঁর নাটকে উঠে এসেছে। এর প্রধান কারণ হলো, একটা সময়ে তার গণনাট্যসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থেকে বামপন্থী আদর্শ অনুসারে পথ চলা। 'বিভাব' নাটকেও 'আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিকাল লিডার' এর অনুষঙ্গ এবং খাদ্য-বস্ত্রের দাবিতে

গণ-আন্দোলন প্রসঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকারের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকে। অর্থাৎ নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত মানুষের ন্যূনতম বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারানোর মতো নির্মম বাস্তবতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাট্যকার শম্ভু মিত্র দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র শম্ভু, 'বিভাব', বহুরূপী ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা নং–১৪

২. 'দেশ' পত্রিকা, ২১শে মে ১৯৫১ সাল

৩. মিত্র শাঁওলী, শম্ভুমিত্র রচনা সমগ্র-১, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা–৭০০০০৯ ,পৃষ্ঠা নং–৩৬৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১. মিত্র শাঁওলী, শম্ভু মিত্র রচনা সমগ্র-১, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা–৭০০০০৯

২. ঘোষ জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০৭৩ , পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০১৬

৩. চট্টোপাধ্যায় মোহিত, শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনা, নাট্যচিন্তা, সম্পাদক চক্রবর্তী রথীন, কোলকাতা–৭০০০৯২ , বর্ষ-১৫, সংখ্যা–৭ থেকে ১২, মে' ১৯৯৭ থেকে অক্টোবর' ১৯৯৭

৪. সমাদ্দার শেখর, নাট্যকার শম্ভু মিত্র, নাট্যচিন্তা, সম্পাদক চক্রবর্তী রথীন, কোলকাতা–৭০০০৯২ , বর্ষ-১৫, সংখ্যা–৭ থেকে ১২ , মে' ১৯৯৭ থেকে অক্টোবর' ১৯৯৭

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘দেনা-পাওনা’ : আর্থ-সামাজিক ও প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত

সত্যা দেবনাথ
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ - জানুয়ারি ১৯৩৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার কারণে ‘অপরাজেয় কথাশিল্পী’ নামে খ্যাত। তাঁর রচিত ‘দেনা-পাওনা’ উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যের একটি দিক-নির্দেশক উপন্যাস। পূর্ববর্তী শরৎসাহিত্যে তো বটেই, পূরবর্তী বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত ছক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের একটি উপন্যাস হলো ‘দেনা-পাওনা’। উপন্যাসে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক দিকের একটি স্পষ্ট পরিচয় আছে। এই উপন্যাসের নায়িকা ষোড়শী, সে আত্মসমর্পণ, নিঃশর্ত প্রেম নিবেদন কোনোটাকেই আর অগ্রাহ্য করতে পারেনি। তার মন আবার অলকা হতে চেয়েছে। সেই মুহূর্তে ভুলে গেছে সে শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি আর তার কাছে আত্মসমর্পণ করা মানুষটিও বিরোধী শ্রেণীর প্রতিনিধি। জীবানন্দ যে শোষক শ্রেণীর নেতা, যার বিরুদ্ধে তাদের হাজার প্রতিবাদ, তাদের সমস্ত সংগ্রাম যেন আজ শক্তিহারা। ষোড়শীর মনের এই পরিবর্তনের জন্যই শেষপর্যন্ত উপন্যাসে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সন্ধি রচিত হয়েছে। সমাজ বাস্তবতায় দুটি নর-নারীর ব্যক্তিগত সমস্যা অঙ্কনের সাথে লেখক জীবনজিজ্ঞাসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটিও এখানে প্রতিফলিত করেছেন।

সূচক শব্দ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘দেনা-পাওনা’, আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্ব, প্রেম-মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত।

মূল আলোচনা

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬- জানুয়ারি ১৯৩৮) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার কারণে ‘অপরাজেয় কথাশিল্পী’ নামে খ্যাত। এই অমর কথাশিল্পীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে গেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। জনপ্রিয়তার দিক থেকে আজও কেউ তাঁকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প ‘মন্দির’ এবং প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস ‘বড়দিদি’। ‘দেনা-পাওনা’ উপন্যাসটি ১৩২৭ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত মাসিক ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে ‘দেনা-পাওনা’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যের একটি দিক-নির্দেশক উপন্যাস। পূর্ববর্তী শরৎসাহিত্যে তো বটেই, পূরবর্তী বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত ছক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের একটি উপন্যাস হলো ‘দেনা-পাওনা’। উপন্যাসে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক দিকের একটি স্পষ্ট পরিচয় আছে। সমাজ বাস্তবতায় দুটি নর-নারীর ব্যক্তিগত সমস্যা অঙ্কনের সাথে লেখক জীবনজিজ্ঞাসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটিও এখানে প্রতিফলিত করেছেন।

‘দেনা-পাওনা’ উপন্যাসের শুরু পল্লীগ্রামের পটভূমি ও পরিবেশে, সমস্ত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে চন্ডীগড় নামক গ্রামে। তবে একথা ঠিক ঔপন্যাসিক রাঢ়বঙ্গের সেই গ্রামকে শুধু পটভূমি হিসেবেই রেখেছেন, ভূপ্রকৃতি পরিবেশ কোনোকিছুর কথাই বলেননি। ‘দেনা-পাওনা’ উপন্যাসটির ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করলে শুধু সমকালের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের আভাসটি পাওয়া যাবে। উপন্যাসে আমরা দেখি সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কথাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এখানে একটি বিশেষ শ্রেণীগোষ্ঠীর মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন পদ্ধতির পরিচয় ফুটে ওঠে। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে গ্রাম-বাংলার ছবি আমরা উপন্যাসে দেখি। এখানে আছে দু’দল মানুষ, একদল সমাজের শোষক ও শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ আর একদল শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষ। এরা কৃষিজীবী বা শ্রমজীবী এবং এরা সবাই প্রতিবাদী আর সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এদের প্রতি ঔপন্যাসিকের

সহানুভূতি স্পষ্টভাবে পাঠকের নজর কাড়ে।

জমিদার জীবানন্দের ভোগবিলাস, শোষণ, অত্যাচার- সমস্তকিছুরই পরিষ্কার ছবি আছে উপন্যাসে, আছে চন্ডীগড় গ্রামে জমিদারের আগমনের ছবি–

> "জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চন্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, এইটুকু সময়ে অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকা আদায় হইতেছে, কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে তাহা জমিদার-সরকারে চাকরি না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও পাগলামি।"[১]

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটির চন্ডীগড় গ্রামটি যেন সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিনিধি রূপে অঙ্কিত। এই গ্রামের প্রজারা কৃষিকাজ করে খুব কষ্ট করে দিনপাত করে। আগে সবাই সুখে-শান্তিতে কৃষিকাজ করতে পারতো কিন্তু আজ তাদের বেশির ভাগই ভূমিহীন। সামন্তবাদ ও ধনবাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে নিরুপায় হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের জীবন। ভূমিহীন ভাগচাষীরা প্রাণপ্রাত পরিশ্রম করে কিন্তু তবু তাদের সংসার চলে না। তবুও সেই ভূমিহীন মানুষগুলোরও মেটাতে হয় মোটা অঙ্কের খাজনা। সাগর, বিপিন, হর প্রমুখরা এখানে এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছে। ষোড়শীর দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক এই শোষিত মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন–

> "সে দেখিল চন্ডীগড়ের ইহারাই একপ্রকার আদিম অধিবাসী, এবং একদিন ইহারা সকলেই গৃহস্থকৃষক ছিল; কিন্তু আজ অধিকাংশই ভূমিহীন - পরের ক্ষেত্রে মজুরি করিয়া বহু দুঃখে দিনপাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দন, না হয় জমিদারের কর্মচারী স্বনামে বেনামে গিলিয়া খাইয়াছে।"[২]

এই শোষক শ্রেণীর মধ্যে শুধু জমিদার জীবানন্দ নয়, আছে এককড়ি নন্দী, জনার্দন রায়, শিরোমণি মশাই প্রমুখরা। এরা সবাই এই নিরীহ গরীব মানুষগুলোর উপর অকথ্য অত্যাচার করে। এই শোষকদের জন্য পুকুরের তাজা তাজা মাছ, টাটকা শাকসবজি, ফলমূল সমস্ত কিছুরই যোগান দিতে হয় গরিব মানুষদের, কিন্তু তাদের এইসব ভালো জিনিস তো দূরের কথা, দুবেলা দু'মুঠো খাবারও জোটে না। জমিদার জীবানন্দর শয্যায় বহুমূল্য শালপাতা, রুপোর পাত্রে তার খাবার আসে,

জরিপাড়ের ঢাকাই চাদর তিনি ব্যবহার করেন হাত মোছবার জন্য। অধ্যাপক সোহারাব হোসেন 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের শোষিত মানুষ প্রায় অনাহারে থাকবার প্রসঙ্গে বলেছেন–

> "চন্ডীগড় গাঁয়ের দরিদ্র মানুষের খাদ্যাভাসের দিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। সাগর সর্দার, বিপিন প্রমুখের মতো বাউরী সমাজের মানুষরা দুবেলা কেন একবেলাই বোধ হয় ভালো করে খেতে পায় না, সামান্য মুড়ি জল খেয়ে এদের দিন কাটে– রাত কাটে।"[৩]

খাবারের পাশাপাশি পোশাকেও লক্ষ্য করা যায় আকাশ পাতাল বৈষম্য। জমিদার জরি পাড়ের ঢাকাই চাদর দিয়ে হাত মুছলেও গ্রামের দরিদ্র প্রজাদের পোশাকহীনতার কারণে শীতের রাত জেগে কাটাতে হয়।

'দেনা-পাওনা'র ভূমিহীন মানুষগুলোর অনেকেই ভিটেমাটি ছেড়ে কোনো চা বাগানে বা কয়লা খাদানে চলে যেতে বাধ্য হয়। এক অসহায় ভূমিহীন প্রজা সাগর ষোড়শীকে যেন সে কথাই বলেছে–

> "তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বেনের-ডাঙ্গাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বসতি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা-বাগানে। কিন্তু আমি দেখেচি ছেলেবেলায় তাদের জমিজমা হাল-বলদ। দু-মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সব্বায়ের ছিল। আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায় মশায়ের।"[৪]

তবে আমরা উপন্যাসে এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখি, দেখি সেই তীব্র শ্রেণীশোষণের প্রতিরোধের চেষ্টা। বাইরে এই প্রতিবাদে সক্রিয় হয়েছে ফকির সাহেব আর ভেতরে এই প্রতিবাদকে সক্রিয় করেছে ষোড়শী ও সাগর সর্দার। সাধারণ মানুষও তো রক্তে মাংসে গড়া, তাদেরও সহ্যের সীমা আছে। শাসকের শোষণে সহ্যের সেই সীমা অতিক্রান্ত হলে তারাও প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তার সাথে যদি অর্থের সম্পর্ক থেকে তাহলে তো কথাই নেই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শোহারাব হোসেন বলেছেন–

> "সামন্তবাদ ও ধনবাদের এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে প্রকম্পিত হয়েছে

সাধারণ মানুষের জীবন। আর ফকির সাহেব ও ষোড়শী এই একপেশে ভূমি-ব্যবস্থার ও অর্থনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অন্যকথা বলার চেষ্টা করেছে।"[৫]

আমরা উপন্যাসে যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র পাই, সেটার অবসান হয়েছে শ্রেণী সমঝোতার পথেই। শেষপর্যন্ত মেহনতি মানুষের জয় ঘোষিত হয়নি। মেহনতি মানুষেরা অধিকার রক্ষায় যে সংগ্রাম শুরু করেছিল জমিদার এবং ধনবাদের বিরুদ্ধে, সেই সংগ্রামে তারা জয়ী হয়নি। শোষিত মানুষেরা অধিকার লড়াইয়ের আশায় আদালতে মামলা পর্যন্ত লড়েছিল। তারা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যে তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সেই অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যেতে তারা দৃঢ়সংকল্প থাকবে। কিন্তু শ্রেণী সমঝোতা তাদের লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। উপন্যাসে আমরা দেখি একদিকে আছে সামন্তবাদী জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী আর ধনবাদজনার্দন রায় এবং অন্যদিকে অত্যাচারিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের লড়াই সামন্তবাদ ও ধনবাদের বিরুদ্ধে। ষোড়শী নিজে উদ্যোগী হয়ে শ্রেণী সমঝোতা করেছিল। প্রথমে সামন্তবাদী জমিদার ও ধনবাদী জনার্দন সন্ধি করেছিল, পরে ষোড়শী তাদের সাথে সন্ধি করে। ষোড়শীর কথা মতো সাগর, হরিহররা জমিদার ও জনার্দনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাও তুলে নেয়। কারণ সাগর, হরিহররা ষোড়শীকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো ও সম্মান করতো। অধ্যাপক শোহারাব হোসেনের কথায়–

> "দেনাপাওনার স্বতন্ত্র রাজনীতি ভাবনার উৎস যাই হোক না কেন, শরৎসাহিত্যে প্রবল আবেগ ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব ছেড়ে এই উপন্যাস গ্রামবাংলার বাস্তবচিত্র অঙ্কনে মুক্তি পেল। 'দেনাপাওনা'র সারা অঙ্গ জুড়ে তাই আমরা দেখি প্রতিটি ঘটনাও কাহিনী শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সামঞ্জস্যের আলিঙ্গনে মুখর। সেখানে স্পষ্ট রেখায় সেই দ্বন্দ্ব ও সমঝোতার ইতিহাসটি বিবৃত।"[৬]

তবে একথা ঠিক যে শ্রেণী সমঝোতার আসরে জমিদার পক্ষও এগিয়ে এসেছিল। প্রজা শোষণের মূর্তিমান রূপকার জীবানন্দকে পরবর্তীকালে প্রজাহিতৈষী রূপে দেখা যায়। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে– শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম

পুরো ব্যর্থ হয় নি, সমাজবিপ্লব না ঘটুক, অত্যাচারী শোষকের শাস্তি না হোক, তবে তাদের মনের পরিবর্তন হয়েছিল। এখানেই শোষিতদের প্রতিবাদের সার্থকতা। জীবানন্দ বলেছে–

> "আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণেএ শুধু তাদের অন্ন-বস্ত্রের কথা নয়। তাদের সাত-পুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে। একটু চুপ করিয়া কহিল, আপনি ভালই জানেনঅন্যপক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার ওপর জোর জুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষাদের উপর কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসচে, আর হতে আমি দেব না।"[৭]

এখানে আমরা দেখতে পারি সামন্তবাদী জমিদার নিজেই যেন শোষিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ধনবাদের বিরুদ্ধে। যদিও আমরা উপন্যাসে দেখি ধনবাদ ও সামন্তবাদেরও সহজেই সন্ধি হয়ে যায়। শেষে আমরা বলতে পারি শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে, জমিদার জীবানন্দ ও ষোড়শীর মানস পরিবর্তনের মাধ্যমে। যেখানে জীবানন্দ অত্যাচারের পথ ছেড়ে প্রজামঙ্গলের পথে আত্মনিয়োগ করেছে, সেখানে ষোড়শীও যে অনায়াসেই জমিদারকে ক্ষমা করে এগিয়ে আসবে- এটাই স্বাভাবিক। জমিদার যখন চাষের সুবিধার জন্য সেতু নির্মাণ করেছিল স্বয়ং মজুরদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে, সেখানেই যেন শোষিত অত্যাচারিতদের জয় ঘোষিত হয়েছে।

শ্রেণীদ্বন্দ্ব কেন শ্রেণী সামঞ্জস্যের পথে বাঁক নিল- এটা নিয়ে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন থেকে যায়। মূলত ষোড়শীর সংস্পর্শে এসেই কৃষকেরা বুঝল তাদের সঙ্গত শক্তির জোরেই নিজেদের অধিকার আদায় করতে হবে। ষোড়শীর সংস্পর্শে এসেই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। ষোড়শী তাদের নিরলসভাবে সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকেও সে ভয় করেনি–

> "ষোড়শী আর কোন তর্ক করিল না। পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া কহিল, সাগর তোদের সমস্ত ঠিক আছে?
> সাগর স্ববিনয়ে কহিল, আছে মা, তোমার আশীর্বাদে অভাব কিছুই নেই।
> ষোড়শী কহিল, বেশ। জমিদারের লোক কাল একটা হাঙ্গামা বাজাতে চায়।

আমি তার চাইনে। এই গাজনের সময়টা রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলা তোরা দেখে রাখ, এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে।"[৮]

এখানে আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা প্রত্যক্ষ করি, সশস্ত্র প্রতিরোধের ছবি পাই। তবে শেষপর্যন্ত এই জোরালো শ্রেণীদ্বন্দ্ব শ্রেণী সমঝোতায় বদলে গিয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে উপন্যাসের প্রথম দিকে যেতে হবে। ষোড়শী ও জীবানন্দের প্রথম দেখা হয়েছিল অবশ্য অত্যাচারীর অত্যাচারের হাত ধরেই। ষোড়শীর জীবন দ্বন্দ্বে ভরা ষোড়শী-অলকা দ্বন্দ্বের স্তর, সন্ন্যাসিনী সত্তা ও গৃহী নারী সত্তার দ্বন্দ্ব, প্রেম ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব, শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে শোষক শ্রেণীর সাথে দ্বন্দ্ব।

অলকা ভৈরবীর ছোটবেলার নাম। নারী জীবনের চাওয়া পাওয়া কামনা বাসনায় পূর্ণ সেই অলকাকে বিয়ে করে তাকে ছেড়ে দেয় জীবানন্দ। আমরা সেই গল্প, উপন্যাসের প্রথমেই পাই। অলকাকে প্রতারণার প্রতিশোধ স্পৃহা ষোড়শী তার মনে জাগিয়ে রেখেছিল। প্রথমদিন জীবানন্দের সাথে দেখা হওয়ার পর ষোড়শীর মনে প্রেম ও আত্মমর্যাদার দ্বন্দ্ব শুরু হয়–

"জীবানন্দের মুখে অলকা নাম, তাহার সলজ্জ ক্ষমা ভিক্ষা, তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা, এমন কত কি যেন একটা ভুলিয়া-যাওয়া কবিতার ভাঙ্গাচোরা চরণের মত রহিয়া রহিয়া তাহার মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিতে লাগিল; অথচ যে সঙ্কট ওই গ্রামখানার মধ্যে তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া আছে, তাহার বিভীষিকা সেই মনের মধ্যে অনুক্ষণ তেমনি ভীষণ হইয়াই রহিল।"[৯]

জীবানন্দ অলকাকে বিয়ে করলেও কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য করেনি, এমনকি বিয়ের পর দিন সে চলে এসেছিল আর কোনোদিনও তাকে খোঁজার চেষ্টাটুকু করেনি। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী ষোড়শী অলকার সেই অপমান সহজে ভুলতে পারেনি। কিন্তু জীবানন্দকে অসুস্থ অবস্থায় দেখে প্রেম ও আত্মমর্যাদার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় ষোড়শীর। উপন্যাসের অনেকগুলো পরিচ্ছেদে দেখা যায় জীবানন্দের প্রতি

ষোড়শীর মনের দুর্বলতা কীভাবে বেড়েছে। সেই চিরন্তন নারী মন আজ ক্ষমায়, দয়ায়, ভালোবাসায় কাউ আঁকড়ে ধরতে চায়।

হৈমবতীর দুঃখী সংসারের চিত্র দেখে ষোড়শীর মনে সন্ন্যাসী ও গৃহনারীর দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। তার বারে বারে মনে হয় সেও একজন প্রেমিকা হতে পারতো, হতে পারতো আদর্শ গৃহিণী, প্রেমময়ী স্ত্রী ও স্নেহময়ী মা। ষোড়শীর মন বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে–

"নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সে মনের মাঝখানে গৃহিনীপনার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননী সকল কর্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে।"[১০]

ষোড়শীর মনের সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসানে সাহায্য করেছে জীবানন্দ। জীবানন্দ নিজেকে আকাশ পাতাল পরিবর্তন করেছে বলেই ষোড়শী তার মনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ষোড়শী মনের আত্মাভিমানের থেকে প্রেম এবং সন্ন্যাসিনী থেকে গৃহী নারী হওয়ার বাসনা জয়ী হয়েছে। ফকির সাহেব যখন প্রশ্ন করেছে সে কেন জীবানন্দ চৌধুরীকে বাঁচালো– তার উত্তর ষোড়শী দিতে পারলো না, কিন্তু সে নিজের মনকে সেই উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিল। উপন্যাসের প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং থানার দারোগার হাত থেকে জীবানন্দকে কেন বাঁচিয়েছিল তার উত্তর সে নিজের মনকেও দিতে পারেনি। নিজের মনকে বুঝতেও তার অনেকদিন সময় লেগেছিল। মনের সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হতেই সে মনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্র: পুনর্বিচার' বই- এ বলেছেন–

"বস্তুত ষোড়শী নিজেকে আজ ভাল করে বুঝতে পারছে না। জীবানন্দর সংস্পর্শ আজ তার জীবনে বিপরীত স্রোত এনেছে, তা কোথায় নিয়ে যাবে তাকে সে কথা তার জানা নেই।"[১১]

ফকির সাহেব ষোড়শীকে ভালোবাসতো, বিশ্বাস করতো। সাগর ষোড়শীকে শুধু মা বলে ডাকত না, মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতো, সরাসরি সমস্ত সিদ্ধান্ত তারা নীরবে মেনে নিয়েছিল।

উপন্যাসে শুরুতেই আমরা দেখি জমিদার জীবানন্দের পাইকরা ষোড়শীকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাতে আটকে রাখে। প্রথম থেকেই ষোড়শীকে শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে দেখা যায় এবং সে শোষক শ্রেণীর নেত্রী হয়ে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। সেই ষোড়শীর যখন হৈমন্তীর সাথে বন্ধুত্ব বেড়ে ওঠে, তখন সে হৈমন্তীর বাবা জনার্দন রায়ের বিরুদ্ধে আর সংগ্রাম করতে চায় না এবং স্বামী জীবানন্দকে চিনতে পারার পর থেকেই তার সংগ্রাম করার ইচ্ছে কমে যেতে থাকে। ষোড়শীর মধ্যে স্ত্রীর সত্তা জাগ্রত হতে থাকে–

> "এক দুর্মদ পাষণ্ড নরপশুকে ষোড়শী এই যে নিজের প্রতি অনুরক্ত হতে বাধ্য করেছে, তার মধ্যে দিয়েচরিত্রের একটি বিশেষদিক উন্মোচিত হয়েছে। সেটা হল তার স্ত্রী সত্তা- তার গৃহীসত্তা।"[১২]

অলকা থেকে ভৈরবী হয়ে ষোড়শীর মনের যে দিকগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিল, ভাবনার সেই দিকগুলোকে চাঁপা দিয়েছিল, জীবানন্দের সাথে দেখা হওয়ার পর সেই দিকগুলো যখন একটা একটা করে খুলছিল, তখনই ষোড়শীর মনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নারী মনের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সে। পুরুষের কোনো নারীর কাছে আত্মসমর্পণ– সেই নারীর সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান করে দেয়। তাইতো–

> "জীবনানন্দ কহিল আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা-আত্মসমর্পণের এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ষোড়শীকে চমকাইয়া দিল।"[১৩]

এই আত্মসমর্পণ, এই নিঃশর্ত প্রেম নিবেদন কোনোটাকেই আর অগ্রাহ্য করতে পারেনি ষোড়শী। তার মন আবার অলকা হতে চেয়েছে। সেই মুহূর্তে ভুলে গেছে সে শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি আর তার কাছে আত্মসমর্পণ করা মানুষটিও বিরোধী শ্রেণীর প্রতিনিধি। জীবানন্দ যে শোষক শ্রেণীর নেতা, যার বিরুদ্ধে তাদের হাজার প্রতিবাদ, তাদের সমস্ত সংগ্রাম যেন আজ শক্তিহারা। ষোড়শীর মনের এই পরিবর্তনের জন্যই শেষপর্যন্ত উপন্যাসে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সন্ধি রচিত হয়েছে।

আলোচ্য 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে শেষপর্যন্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে মধ্যস্ততা দেখা যায়, সেটাতে আমরা লেখকের দুরদৃষ্টির পরিচয় পাই। গভীর কাল সচেতন লেখক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এরকম উপসংহার টেনেছেন তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভৈরবীদের স্বামী স্পর্শ একান্ত নিষিদ্ধ- একথা জেনেও একরাত্রের জন্য স্বামীর সেবা নিজ হাতে করে নিজের ভৈরবী পদ অনায়াসেই ছেড়ে দিয়েছে ষোড়শী-ভৈরবী। তারপর তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়, এই দ্বন্দ্ব যে দেবী-ভৈরবীর সঙ্গে স্বামী-স্পর্শ করা প্রবৃত্তিময়ী নারীরই দ্বন্দ্ব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই দ্বন্দ্ব যে সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে গৃহগতপ্রাণা রমণীর দ্বন্দ্ব তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আমরা দেখি– এই দ্বন্দ্বগুলোর সাথে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব মিলেমিশে যেমন একাকার হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি সবদ্বন্দ্বের সমাধানও একই পথ ধরে সংগঠিত হলো।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৬২০।
২. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), তদেব, ৬৮১।
৩. হোসেন সোহরাব(১৯৯৯), 'শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা', কলকাতা, রত্নাবলী, ২৭।
৪. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), তদেব, ৬৭৯।
৫. হোসেন সোহরাব(১৯৯৯), 'শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা', তদেব, ৩২।
৬. হোসেন সোহরাব(১৯৯৯), 'শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা', তদেব, ৩৪।
৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), তদেব, ৭৩০-৭৩১।
৮. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), তদেব, ৬৭৭-৬৭৮।
৯. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), তদেব, ৬৩৭।
১০. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), তদেব, ৬৩৩।
১১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার(২০০১),'শরৎচন্দ্র: পুনর্বিচার', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ৮৫।
১২. হোসেন সোহরাব(১৯৯৯), 'শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা', তদেব, ৫৫।
১৩. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), তদেব, ৬৮৭।

আকর গ্রন্থ :

১. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র(১৯৯৮), 'শরৎ রচনা সমগ্র'(প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ইউনাইটেড পাবলিশার্স।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. হোসেন সোহরাব(১৯৯৯), 'শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনা', কলকাতা, রত্নাবলী।

২. মন্ডল প্রকাশচন্দ্র(২০০৮), 'কথাসাহিত্যের নানাপাঠ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৩. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার(২০১৪), 'কালের প্রতিমা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৪. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার(২০১৬), 'কালের পুত্তলিকা' (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৫. ভট্টাচার্য দেবীপ্রসাদ(২০০৩), 'উপন্যাসের কথা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৬. ভট্টাচার্য অধ্যাপক দেবাশীষ(২০১০), 'বিশ শতকের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা', কলকাতা, অক্ষর পাবলিকেশন।

৭. নাথ প্রিয়কান্ত(২০০৭), 'কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৮. নাথ প্রিয়কান্ত ও চক্রবর্তী রামী(২০১৭), 'বাংলা উপন্যাস সংজ্ঞার সন্ধানে' (সম্পাদিত), কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৯. চক্রবর্তী রামী, 'কথাসাহিত্যের বহুমাত্রিক পাঠ'(সম্পাদিত), কলকাতা, একুশ শতক।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিফলন– অথ কিম্

সত্যেন বর্মন

গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়(বিহার),

সারাংশ

যে কোন সভ্যতা, সমাজকে জানার জন্য সাহিত্য হচ্ছে একটি অন্যতম দলিল। আর এই সাহিত্য যেকোন ভাষাতেই রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ইত্যাদি। সেই প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমাজের ভাল-মন্দ, উন্নয়ন অবনমন আমরা সাহিত্য থেকেই জানতে পারি। প্রাচীন সমাজকে জানার জন্য যেমন প্রাচীন সাহিত্য প্রয়োজন তেমনি আধুনিক সমাজকে জানার জন্য অর্বাচীন সাহিত্য প্রয়োজন। আর এই অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাংলার একজন বিখ্যাত নাট্যকার। তাঁর খ্যাতি শুধুমাত্র বাংলাতেই ছিল না, বাংলার বাইরেও তাঁর খ্যাতি বিদ্যমান। বার্লিনের ব্রেশট্ গ্যালারিতে আজও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে। তিনি নাট্যকারের পাশাপাশি একজন দক্ষ অভিনেতা, নাট্যনির্দেশক, নাট্যসমালোচক ও নাট্যতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক নাট্যগ্রন্থগুলি হল ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্, স্বর্গীয়হসনম্, অথ কিম্ ও ননাবিতাড়ণম্। তাঁর প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যে ফুটে উঠেছে বর্তমান সমাজের বিবিধ সমস্যা। যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক। এছাড়াও বর্তমান সমাজে সংস্কৃত ভাষার করুন অবস্থা তাঁর লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচিত অথ কিম্ নাটকটিতে আমরা দেখতে পাই বর্তমান সমাজের মানুষের করুন অবস্থা। মানুষ এক মুঠো অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। রাজনৈতিক নেতাদের ভয়ে সাধারণ মানুষ সমাজে কচ্ছপের মতো মুখ লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হন।

শব্দসংকেত

জননী, নির্বাচন, ধরিত্রী, ক্ষুধার্ত, বিতাড়ন।

প্রস্তাবনা

আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ড.সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় একজন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তাঁর নাট্য প্রতিভায় সমগ্র বিশ্ব আলোকিত। এই নাট্যকার সকলের কাছে ‘বুড়োদা’ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯১৮ সালে অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার নহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিত। আর সেখান থেকেই কবির সংস্কৃতের প্রতি প্রেম শুরু হয়। কবির বাল্যকাল খুব একটা ভাল ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাকে গ্রেফতার হতে হয়। এদিকে অল্প বয়সে তাঁর বাবা তাদের ছেড়ে চলে যান। ফলে তাকেই সংসারের হাল ধরতে হয়। তিনি রাজশাহী জেলার বগুড়া কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন।

ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র একজন নাট্যকারই ছিলেন না, তিনি নাট্যকারের পাশাপাশি ছিলেন একজন সুদক্ষ অভিনেতা, নাট্যনির্দেশক, নাট্যসমালোচক ও নাট্যতত্ত্ববিদ। তাঁর প্রতিটি নাটকের মধ্যেই মৌলিকতার ছাপ স্পষ্ট এবং নাটকগুলি বাস্তব ধর্মী। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে বার্লিনের ব্রেশট্ এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই ব্রেশট্ ছিলেন বার্লিনের একজন বিখ্যাত নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও নাট্যতত্ত্ববিদ। ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই ব্রেশট্ এর জীবনদর্শন দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বার্লিনের ব্রেশট্ কে বাংলার তথা ভারতের (এশিয়ার) মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। আজও বার্লিনের ব্রেশট্ গ্যালারিতে নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে। এই নাট্যনির্দেশক ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যজগতে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তাকে ‘স্বর্ণকলসম্’ পুরস্কার দেওয়া হয়। নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আধুনিক সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে চারটি মৌলিক নাটক উপহার দিয়েছেন। তাঁর রচিত এই চারটি নাটক হল–

১ ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্ ,

২ স্বর্গীয়হসনম্,

৩ অথ কিম্ এবং

৪ ননাবিতাড়নম্ ।

ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রত্যেকটি নাটকের মধ্য দিয়ে কখনও বর্তমান সমাজের করুন অবস্থা কে, কখনও পৃথিবীর করুন অবস্থাকে, আবার কখনও বা আমাদের সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষার করুন অবস্থাকে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত করেছেন। যেমন 'ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্' নাটকে ধরিত্রী অর্থাৎ পৃথিবী (অপূর্ব রমণী), পতি অর্থাৎ প্রভু বা স্বামী, নির্বাচন অর্থাৎ কে হবেন। এই পৃথিবীর প্রভু বা স্বামী কে হবেন তা নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যেই দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। তারা সবাই চান যে এই ধরাভূমির পতি আমি হব। কিন্তু তারা কেউ বুঝতেই চাননা এই ধরাভূমি কিসে ভাল থাকবে। তাই প্রতিনিয়ত লড়াই করেই চলেছেন। যার ফলে আমাদের এই অপূর্ব রমণী পৃথিবীর সৌন্দর্য ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যাচ্ছে। কবির আশঙ্কা ধরিত্রীকে নিয়ে অসৎ লোকদের এই দ্বন্দ্ব কি আদৌ শেষ হবে। তাই নাট্যকার বলেছেন- ***'রচনাকালাৎ পরম্ অতীতানি কতি বর্ষাণি, কিঞ্চিৎ পরিবর্তনং জাতং নাটিকা-বর্ণিতস্য দৃশ্যস্যৈব। অঙ্কস্তু নাধুনাপি পরিসমাপ্তঃ। ধরিত্রী-পতি-নির্বাচন-সভায়া আয়োজনং প্রচলতিতরাং, সভা তু নানুষ্ঠিতাদ্যাপি'***। (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২, পৃ. ১২৮) এর ফলে পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছে এবং সর্বোপরি আমাদের এই পৃথিবী ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই নাট্যকার ড.সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ধরিত্রীপতিনির্বাচনম্' নাটকের মধ্য দিয়ে সকল পৃথিবীবাসীকে জাগ্রত করেছেন এবং সকলকে এক হতে বলেছেন। আবার নাট্যকার তাঁর 'ননাবিতাড়নম্' নাটকের মধ্যদিয়ে বর্তমান সময়ের জননী তুল্য সংস্কৃত ভাষার করুন চিত্র তুলে ধরেছেন। নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সেখানে দেখিয়েছেন যে বর্তমান সময়ের আমাদের দেশের কিছু মানুষ আমাদের সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষাকে বিতাড়ন করার চেষ্টা করেছেন। তারা নানান ভাবে মানুষের কর্ণে বিষ ঢেলে সংস্কৃত ভাষাকে মৃত বলে চিহ্নিত করেছেন

এবং পাঠ্য বিষয় থেকে সংস্কৃতকে সড়ানোর চেষ্টা করেছেন। ড.সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের এই ভাবনাকে যদি আমরা একটু অন্য ভাবে দেখি তাহলে আমরা এর থেকে আর একটি অন্য তথ্য পেতে পারি। যেমন বর্তমান সময়ে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই কিছু মানুষ নিজের ভালো থাকার জন্য জন্মদাত্রী মাতা পিতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেন। আবার দেখা যায় মানুষ সামান্য একটু শিক্ষিত হলেই তাদের যে সংস্কৃতি, মাতৃভাষা তা অনায়াসে ভুলে যায় এবং বিদেশি সংস্কৃতি, ভাষাকে নিয়ে গর্ব বোধ করেন। এর ফলে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা নয় এর পাশাপাশি নিজের সংস্কৃতিরও অবনমন ঘটে।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিফলন : ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন নির্ভীক, সাহসী এবং স্পষ্টবাদী নাট্যকার। তিনি তার প্রত্যেকটি নাটকের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ের বাস্তবসত্যকে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত 'অথ কিম্' নাটকটি হল এর চাক্ষুষ প্রমাণ। নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই 'অথ কিম্' নাটকের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে সমাজের নির্বাচন ব্যবস্থা, দুর্নীতিবাজ, সাধারণ মানুষের করুন অবস্থা এবং সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষার করুন চিত্রকে সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের এই সমাজ, রাষ্ট্র রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত। এমনকি আমাদের পরিবারও এর দ্বারা পরিব্যাপ্ত। আর যেখানে সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবারের মধ্যেই এই রাজনীতি বিদ্যমান সেখানে সমাজের সকল মানুষেরই এই রাজনীতিতে অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমান সমাজের রাজনীতিতে তা প্রায়শই অগোচর। বর্তমান সময়ের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের সত্যকথা বলার কোনও অধিকার নেই। নেই সৎপথে চলার অধিকার। তাই নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অথ কিম্' নাটকে বলেছেন– ***জানামি সর্বম্। পরমতি-তীক্ষ্ণং মে বিষাণযুগলং যৌবনে ভগ্নম্। অধুনা জানন্নপি কিমপি ন কথয়ামি, যতোঽদ্যত্বে সত্যকথনায় প্রয়োজনীয়ং সুতীক্ষ্ণং।*** (ভট্টাচার্য্য & মাইতি, ২০২৩, পৃ. ৭৬) অর্থাৎ নাট্যকার এখানে বলতে চেয়েছেন যে বর্তমান সময়ের নেতা, মন্ত্রীরা সহস্র খারাপ কাজ, ভুল কাজ করলেও তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কারণ তাদের কাছে রয়েছে সাহস আর অত্যাধুনিক অস্ত্র। আর এই অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়েই তারা সমাজের সাধারণ মানুষদের বশ করে রাখেন। এই জন্যই নাট্যকার ড.সিদ্ধেশ্বর

চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে আমাদের শিং দুটি তারা যৌবনেই ভেঙে দিয়েছেন। তাই আমাদের কিছু করার নেই। আর এরপরেও যদি আমরা তাদের বিরুদ্ধে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করি তাহলে হয়ত এর পরিণাম হবে অনেক ভয়ঙ্কর, এমনকী মৃত্যু। আর এই অকাল মৃত্যুর হাত থেকে পরিবার ও নিজেকে বাঁচার জন্য মানুষ ধূর্ত নেতাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে আত্মরক্ষার জন্য নেই কোনও তীক্ষ্ণাস্ত্র। আর যেখানে ক্ষমতার গহ্বরে সত্যের বাণী নিভৃতে কাঁদে, সেখানে আমরা সাধারণ মানুষ নিরুপায়।

আবার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই 'অথ কিম্' নাটকের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন বর্তমান সমাজের রাজনীতিবিদরা নির্বাচন ক্ষেত্রে কিভাবে সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করছেন। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট। আর এই স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচন বা ভোটগ্রহণ ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল ১৯৫১ সালে ২৫ অক্টোবর থেকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে। আর এই সময়েই সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন আমরা এখন স্বাধীন। আমাদের আর কোনও ভয় নেই। কারণ আমরা আর ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ নই। আমাদের দেশের সরকার এখন অনায়াসে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা গুলি পূরণ করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা একদু'বার হতে না হতেই নেতাদের আসল রূপ সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল যে আমরা ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু দেশের ধূর্ত রাজনৈতিক নেতাদের কবল থেকে আমাদের নিস্তার নেই। কারণ তারাই আজ দেশের সর্বেসর্বা। এই ধূর্ত নেতারাই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত নানা রকম আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি দিয়েই চলেছেন। আজও সমাজে দেখা যায় ভোট গ্রহণের আগে নেতারা সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন ভাবে প্রলোভন দেখিয়ে ভোট আদায় করেন। তাই নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন– ***'নভবিষ্যতি মূল্যবৃদ্ধিঃ পুনরপি। অপি চ প্রাচুর্যং ভবিষ্যতি নিত্যপ্রয়োজনীয়দ্রব্যাণাম্'।*** (ভট্টাচার্য্য & মাইতি, ২০২৩, পৃ. ১৭৫) অর্থাৎ ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচন করুন, তাহলে দেখবেন সমাজে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অঢেল হবে এবং দাম কম হবে।

আর এইভাবেই প্রত্যেক বছর ভোটগ্রহণ হচ্ছে, সরকার নির্বাচনো হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর দেওয়া প্রতিশ্রুতি সেই প্রতিশ্রুতিই থেকে যাচ্ছে। এইভাবেই সাধারণ মানুষ যখন নেতাদের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা হারাতে লাগল তখন শুরু হল দানের রাজনীতি। এই দানের রাজনীতিতে ধূর্ত নেতারা ভোটগ্রহণ এর পূর্বে সাধারণ মানুষদের মদ, নারী, ও বিভিন্ন সামগ্রী দিয়েই নিজেদের হাতের মুঠোয় করে নিত। আবার নেতারা যে দান সামগ্রী দিচ্ছেন তার খরচ বহন করবেন কে? সেই খরচও বহন করবেন সাধারণ খেঠে খাওয়া মানুষ। এখানে শুধুমাত্র কৌশলটা একটু অন্যরকম। তারা অর্থাৎ নেতারা ভোটপরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে সারাবছর ধরে জোকের মত সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করবে। তাই ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন– ***'(সবিনয়ং সহাসং চ) হেঁ হেঁহেঁ। কথং কুপ্যসি ভ্রাতঃ! তবকপর্দকেন তস্য কিং প্রয়োজনম্? দেশে ধনিকানাং ন জাতোঽভাবঃ। ত এব দাস্যন্তি কপর্দকাদিকং মুদ্রাসঞ্চয়ং বা। ত্বয়া তু ব্যালটাখ্যনির্বাচনপত্রস্থিতস্য তন্নাম্নঃ পার্শ্বে (হস্তাভ্যাং গুণনচিহ্নং দর্শয়তি) দাতব্যম্'।*** (ভট্টাচার্য্য & মাইতি, ২০২৩, পৃ. ১৫৯)

আবার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই নাটকের মধ্যদিয়েই সমাজের সাধারণ দরিদ্র মানুষের জীবনযাপন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। নাট্যকারের ভাষায়– ***'জানাসি কিমেতাদৃশীম্ অবস্থাম্ ? (গোণিকাদ্বয়মধোমুখং বিধায় দর্শয়তি) গৃহে মে বর্ত্তন্তে কানিচিদ্ ব্যাত্তমুখানি গহ্বরাণি, ভরণায় তেষাং ভ্রমত্যয়ং জনো মার্গান্মার্গম্'।*** (ভট্টাচার্য্য & মাইতি, ২০২৩, পৃ. ১৩৮) অর্থাৎ এখানে সূত্রধার সমাজের সাধারণ মানুষের করুন অবস্থা দেখে সমাজের ধূর্ত রাজনৈতিক নেতার উদ্দেশ্যে বলেছেন আপনি কি জানেন এই দিকের কী অবস্থা? জানেন আমার বাড়িতে কতগুলো ক্ষুধার্ত পেট হা করে রয়েছে, তাদের পেট ভরানোর জন্য এই মানুষটি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন দুবেলা দুমুঠো ভাত। পেটে অন্ন না থাকলে মানুষের মনে কোনও আনন্দ থাকে না। ক্ষুধার্ত মানুষের কোনও ধর্ম হয় না, কোন জাতি হয় না, তাদের রাজনীতির কোন রং হয় না। সে শুধু তার জন্য নয়, তার পরিবারের জন্য অন্ন চায়। আর এই দুমুঠো অন্নের জন্যই মানুষ অক্লান্ত কঠোর

পরিশ্রম করেই চলেছেন। কিন্তু দিনশেষে সাধারণ মানুষের সেই ক্ষুধা ক্ষুধাই থেকে যায়। আর এই ক্ষুধার্ত মানুষগুলোয় তাদের পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য অসৎ পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। তাইতো বাংলার কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন–

'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'।। (ভট্টাচার্য্য স. , ১৯৪৮)

এই বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম হল সংস্কৃত ভাষা, যা অধুনা বৈজ্ঞানিক ভাষা বলে চিহ্নিত। এইভাষাতেই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ রচিত হয়েছে, যার মধ্যে নিহিত আছে ভারতীয় সংস্কৃতির গুঢ়তত্ত্ব। আমাদের দেশের প্রায় সকল ভাষাই সৃষ্টি হয়েছে এই সংস্কৃত ভাষা থেকে। তাই বলা *হয়েছে-'সর্বেষাং জননী ইয়ং সংস্কৃতভাষা'*। (ভট্টাচার্য্য & মাইতি, ২০২৩, পৃ. ১১৩) কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের এই জননী উপেক্ষিত। কিছু ধূর্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ আমাদের এই জননীকে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাকে প্রতিনিয়ত অপমানিত করেই চলেছেন। যে মায়ের জন্য তারা এই দুনিয়ার আলো দেখছেন, আজ সেই মাকেই তারা গলা টিপে মারার জন্য উঠেপরে লেগেছেন। তাই নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কটাক্ষের সুরে দর্শকদের ***বলেছেন–'ভবদ্ভিরত্রাভিনয়দর্শনার্থমাগতম্, তত্রাপি সংস্কৃতরূপকস্য। পরমদ্যত্বে সর্বং জাতমসংস্কৃতম্, — দেহে চিত্তে, সমাজে সংস্কৃতস্য গন্ধোঽপি নাস্তি। অভিনয়শ্চ ভবতি সর্বত্রৈব— মার্গে, হট্টে, ঘট্টে, পরিবারে, বিদ্যালয়ে, বিধানসভায়ামপি। তথাপি কথং ভবতাং সংস্কৃত রূপকাভিনয়দর্শনেচ্ছা জাতা তন্নাবধারয়ামি। মন্যে বাস্তববিমুখাঃ সর্বে ভবন্তঃ। নায়ং তিরস্কারঃ, স্বয়মপ্যহং ভবদ্গোষ্ঠীগত এব'।*** (ভট্টাচার্য্য & মাইতি, ২০২৩, পৃ. ১০৭)

আবার নাট্যকার গৌরী ধর্মপাল তাঁর 'জননী' নাটকের মধ্যদিয়ে বর্তমান সময়ে জননীর করুন অবস্থা সুন্দরভাবে তার নাটকে তুলে ধরেছেন। এখানে নাট্যকার জননী বলতে কখনও ভারত মাতাকে কখনও জন্মদাত্রী মাতাকে কখনও ধরিত্রী মাতাকে আবার কখনও বাসকল ভাষার জননী সংস্কৃতভাষাকে বুঝিয়েছেন। বর্তমান সময়ে একজন মা সংসারের সবরকম দায়িত্ব পালন করার পরেও সংসারে সকলের

কাছেই খারাপ বলে বিবেচিত হন। এই মাকে কখনও তার স্বামীর কাছে কখনও সন্তানদের কাছে আবার কখনও বা পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে প্রতিনিয়ত অপমানিত অবহেলিত হতে দেখা যায়। এই নাটকে দেখা যায় স্ত্রীর সামান্য ভুলের জন্য স্বামী রেগে গিয়ে বলেছেন ***'নাস্তি ত্বয়া প্রয়োজনাৎ'।*** (চট্টোপাধ্যায়, ২০১২, পৃ. ১৫৪) এমনকি তাকে পরিবার থেকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ঠিক তেমনই আমাদের মাতা ধরিত্রী আজ সকলের কাছে অবহেলিত। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য নানা রকম ভাবে এই ধরিত্রী মাতাকে দূষিত করছেন, কলুষিত করছেন। একই ভাবে আমাদের সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা প্রায়ই সকলের কাছে অপমানিত। যেইখানে পৃথিবীর প্রায় সকলভাষার ব্যুৎপত্তি এই সংস্কৃত ভাষা, যার মধ্য থেকেই পাওয়া যায় এই সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত– এর সমস্ত তত্ত্ব, সেই মাতৃতুল্য সংস্কৃত ভাষাই আজ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের জন্য মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। তারা আমাদের এই সুস্থ সাবলীল মাতৃতুল্য সংস্কৃত ভাষাকে বারবার মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ তার 'মাতৃহননম্' নাটকে বলেছেন – ***'বিতাড্যতে জননদ্য স্বপুত্রৈর্নিজভূভমিতঃ। দুঃখং লজ্জা চ ঘৃণা বা কিমস্মাদ্ ভবিতা ক্ষিতৌ'।।***
(চট্টোপাধ্যায়, ২০১২, পৃ. ১৫৭)

উপসংহার : নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অথ কিম্' নাটকের সর্বত্র বর্তমান সমাজের নির্মম স্বার্থপরতাকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রাজনৈতিক নেতাগণ কিভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করছেন। তারা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে প্রতিনিয়ত মহান সেজেছেন। ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতে দেশের ধূর্ত রাজনৈতিক নেতারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছল, বল, কৌশল, দান, দণ্ড, ভেদ এই সকলনীতি প্রয়োগ করে ক্ষমতায় আসেন এবং সাধারণ মানুষকে শোষণ করেন। এই পৃথিবীর সবথেকে বুদ্ধিমান প্রাণী হল মানুষ কিন্তু মূর্খের মতো একে অপরের ক্ষতি করে, নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে, নিজেরা নিজেদের হত্যা করে। কারও মধ্যে নেই সহানুভূতি, নেই সহমর্মিতা। বর্তমান সমাজে নিজেকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। তাই ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-
'কালস্য গতিমালোচ্য সাম্প্রতং প্রার্থয়ামহে। অস্তু মে মঙ্গলং নিত্যং ভবতামস্তু বা ন বা'।। (ভট্টাচার্য্য & মাইতি, ২০২৩, পৃ. ৯৮)

অর্থাৎ নাট্যকার নিজে স্বার্থপর হতে চাননি এবং কাউকে কেবল নিজের মঙ্গল বলেননি। কিন্তু বর্তমান সমাজের এই স্বার্থপর দিকের প্রতি তিনি তীব্র আঘাত করে এই কথা বলেছেন। যাতে সকল মানুষ স্বার্থ ভুলে মানবতার জয়ধ্বনি বা জয়গান করতে পারে।

তথ্যসূত্র-

• ঋতা চট্টোপাধ্যায়. (২০১২). আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য. কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স.
• পরমেশ ভট্টাচার্য্য,& খোকন মাইতি. (২০২৩). অথ কিম্. কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.
• বনবিহারী ঘোষাল . (২০২১). অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস : ১৮০১-২০২০. কলকাতা: পারুল প্রকাশনী.
• শুভ্রজিৎ সেন. (তারিখ নেই). ভারতবর্ষে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যম্ বিহঙ্গমদৃষ্ট্যা পরিশীলনম্. কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার.
• সুকান্ত ভট্টাচার্য্য. (১৯৪৮). ছাড়পত্র. কলকাতা.

গ্রন্থপঞ্জি-

• ঘোষাল, ব. (২০২১). *অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস : ১৮০১-২০২০.* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী.
• চট্টোপাধ্যায়, ঋ. (২০১২). *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স.
• ভট্টাচার্য্য, প., & মাইতি, খ. (২০২৩). *অথ কিম্.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো.
• ভট্টাচার্য্য, স. (১৯৪৮). *ছাড়পত্র.* কলকাতা.
• সেন, শ. *ভারতবর্ষে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যম্ বিহঙ্গমদৃষ্ট্যা পরিশীলনম্.* কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার.

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি

সন্দীপ দাস
M.Ed. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ
অলিক কুমার মণ্ডল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ

সারসংক্ষেপ

শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হবার ক্ষেত্রে B.Ed. কোর্স যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকগণ এই গবেষণায় B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বর্তমান গবেষণাটির ক্ষেত্রে কেস স্টাডি পদ্ধতি আবলম্বন করা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে, অধ্যয়নটি একটি গুণগত গবেষণা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ, ওয়েবসাইট এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ থেকে ১০০ জন B.Ed. কোর্স উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে উক্ত গবেষণার সমস্যার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত অধ্যয়নটি থেকে দেখা যায় যে, সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হবার সম্ভাবনার সমূহ সুযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে আরও দেখা গেছে যে, স্কুল ও কলেজে স্থায়ী সরকারিপদে কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা খুব কম এবং বেশিরভাগ প্রশিক্ষণার্থীরা আস্থায়ী বিভিন্নপদে কর্মরত। B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকে চেষ্টা করছেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাগুলিতে সফল হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। আবার অনেকেই B.Ed. কলেজে শিক্ষকতায় সুযোগ পাবার জন্য M.Ed. কোর্স করছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী আরো উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হয়ে M. Phil. ও Ph.D.

স্কলার হিসেবে নিজেদেরকে গবেষণায় যুক্ত করতে পেরেছেন। যদিও বর্তমানে কর্মসংস্থানহীন প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যাও কম নয়।

মূল শব্দ

ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (B.Ed.), প্রশিক্ষণার্থী, কর্মসংস্থান।

মূল আলোচনা

ভুমিকা : ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (B.Ed.) ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেছে নেওয়া পছন্দের পেশাদার কোর্সগুলির মধ্যে একটি। যেসমস্ত শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী, এই কোর্সটি সেই সকল প্রার্থীদের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন খুবই বেশি কারণ সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে একজন সফল পেশাদার হওয়ার জন্য, একজনের শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম যোগ্যতা থাকতে হবে B.Ed.। দেশের শিক্ষাবিভাগ সংক্রান্ত অধ্যয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি হল ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)। আগে B.Ed. কোর্স ছিল এক বছর, কিন্তু এখন তা বাড়িয়ে দুই বছর করা হয়েছে (NCTE Regulations, 2014)।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলি হয় মেধা-ভিত্তিক ভর্তিপদ্ধতি ব্যবহার করে অথবা তাদের নিজস্ব বা রাজ্য-ভিত্তিক প্রবেশিকা পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে। B.Ed. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রচুর প্রার্থী প্রতিবছর আবেদন করে থাকেন। এর পিছনের কারণ হল B.Ed. কোর্স সুনির্দিষ্ট ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ প্রদান করে। এছাড়াও, শিক্ষকতায় আয়ের সম্ভাবনা বেশি। প্রতিবছর লক্ষাধিক প্রার্থী CTET পরীক্ষা দেন ভারতের শীর্ষ সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষকতার লক্ষ্যে। CTET উত্তীর্ণরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, সেই সাথে অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। বেশিরভাগ রাজ্য নিজস্ব শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (যেমন- TET, SLST ইত্যাদি) পরিচালনা করে, যা বিভিন্ন সরকারি স্কুলে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করে থাকে। B.Ed. ডিগ্রী অর্জনকারীরা শিক্ষকতা পেশা ছাড়াও

অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। অন্যান্য B.Ed. উত্তীর্ণরা যারা চাকরি খুঁজছেন না, তারা অতিরিক্ত শিক্ষা যেমন M.Ed. এবং Ph.D. করতে পারেন। একটি M.Ed. ডিগ্রী বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন, বা শিক্ষায় একটি ডক্টরেট ডিগ্রী, B.ED. স্নাতকদের জন্য কর্মসংস্থানের বিভিন্ন সুযোগ এবং বৃহত্তর প্রারম্ভিক আয়ের দরজা খুলে দিতে পারে।

গবেষণার সমস্যা : শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের জন্য বি.এড. কোর্সটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে (২০১৮-২০২২) B.Ed. কোর্স সম্পন্ন প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষেত্রে এই কোর্স তাদের কাঙ্ক্ষিত জীবিকার সুযোগ করে দিতে কতদুর সার্থক তা যাচাই করে দেখা এবং তাদের বর্তমান কর্মসংস্থানের অবস্থাই-বা কিরূপ তা অনুসন্ধান করতে বর্তমান গবেষকগণ নিম্নলিখিত গবেষনার সমস্যাটি বেছে নিয়েছে "B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি"।

গবেষণার উদ্দেশ্য :

১. পেশাদারি কোর্স হিসেবে B.Ed. –এর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলির বর্ণনা।

২. B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির অনুসন্ধান।

গবেষণার প্রশ্ন :

১. পেশাদারি কোর্স হিসেবে B.Ed.-এর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলি কিকি?

২. B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি কি?

গবেষণা পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণাটির ক্ষেত্রে কেস স্টাডি পধতি আবলম্বন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষকগণ বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ, ওয়েবসাইট এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নশিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ থেকে ১০০ জন B.Ed. কোর্স উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে(Google Form -এর সাহায্যে এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে) প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে উক্ত গবেষণার সমস্যার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে, অধ্যয়নটি একটি গুণগত গবেষণা, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমস্যার একটি ব্যাপক বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

১. B.Ed. কোর্স-এর পর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমুহ :

B.Ed. কোর্স-এর পর সরকারি চাকরি : যে প্রার্থীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী এবং যারা ভবিষ্যত প্রজন্মকে জ্ঞানপ্রদানে বিশ্বাস করেন তাদের অবশ্যই B.Ed. করা উচিত। নিম্নে B.Ed. –এর পর বিভিন্ন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রগুলি আলোচনা করা হল-

- B.Ed. ডিগ্রী অর্জনের পর সরকারি স্কুলে চাকরির অনেক সুযোগ রয়েছে। জাতীয় ও রাজ্যস্তরে TET পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিভিন্ন সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা একজন আবেদনকারীর একটি সু-সম্মানিত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। প্রথম থেকে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। তারা বিভিন্ন গ্রেডে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় শেখান। একজন PGT শিক্ষক (স্নাতকোত্তর শিক্ষক) শ্রেণী কক্ষ ব্যবস্থাপনা, বিষয়বস্তু এবং আরও অনেককিছু দেখাশোনা করে থাকেন। CTET(Central Teacher Eligibility Test) উত্তীর্ণরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, সেই সাথে অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।
- B.Ed.উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীরা স্কুল ইন্সপেক্টর (SI) হতে পারেন, যার কাজ হল স্কুল পরিদর্শন করা এবং স্কুলের মান এবং অবস্থার রিপোর্ট করা ও উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হওয়া।
- B.Ed.কোর্স সম্পূর্ণ করার পর, প্রশিক্ষণার্থীরা স্নাতকোত্তর আরও বিশেষায়িত কোর্সে ভর্তি হতে পারেন যেমন-মাস্টার ইন এডুকেশন এবং মাস্টার অফ এডুকেশন (M.Ed.)। MA(শিক্ষাবিজ্ঞান) বা M.Ed. অর্জনের পর, তারা শিক্ষাবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি করতে পারবেন। পরবর্তীতে তারা কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতায় সুযোগ পেতে পারবেন।

প্রাইভেট সেক্টরে B.Ed.-এর পর চাকরির সুযোগ : সরকারি চাকরি ছাড়াও, প্রার্থীরা B.Ed. কোর্স শেষ করার পর বেসরকারি সেক্টরে ভালো ক্যারিয়ারের সন্ধান

করতে পারেন। নিচে B.Ed. এরপর কিছু জনপ্রিয় ক্যারিয়ারের বিকল্প দেখুন।

- B.Ed. অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলির বিস্তৃত পরিসরের কারণে সবচেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ কিছু চাকরির বিকল্প প্রদান করে। B.Ed. গ্র্যাজুয়েটরা তাদের স্পেশালাইজেশনের উপর নির্ভর করে, অধ্যয়নের নির্বাচিত বিষয়গুলিতে শিক্ষাবিদ, গবেষক হিসাবে কাজ করতে পারেন।
- B.Ed. কোর্স সম্পূর্ণ করার পরে, প্রশিক্ষণার্থীরা বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা পেশাও বেছে নিতে পারেন। একজন B.Ed. ডিগ্রিধারীর জন্য অন্যান্য চাকরির বিকল্পগুলির মধ্যে তারা প্রাইভেট টিউটর হিসাবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তারা নিজস্ব কোচিং ইনস্টিটিউট শুরু করতে পারেন। এটি তাদের কেবল একজন ভাল শিক্ষক হতে এবং আরও শিখতে সহায়তা করবে না, এটি তাদের আয়ও বাড়াবে।
- কারোর যদি প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান এবং পরিচালনার দক্ষতা থাকে তবে তিনি নিজের স্কুলও শুরু করতে পারেন। এক্ষেত্রে সরকার ও ব্যাংকগুলিও বিভিন্নভাবে স্কুল খোলার জন্য আর্থিক সাহায্য করে থাকে।
- দেশে করোনাভাইরাস মহামারী পরিস্থিতির সময় থেকে নিয়মিত ক্লাসের জায়গা করে নিয়েছে অনলাইন টিউশন। B.Ed. করার পর, প্রার্থীরা পেশা হিসেবে অনলাইন গৃহশিক্ষকের পেশা বেছে নিতে পারেন।
- B.Ed. কোর্স-এর পরে, প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষাগত পরামর্শদাতা হতে পারেন। একজন শিক্ষাগত পরামর্শদাতার ভূমিকা হল একাডেমিক সমস্যা সমাধান করা, শিক্ষার্থীদের গাইড করা এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী একটি কোর্স নির্বাচন করতে সাহায্য করা।
- বর্তমানে বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং পোর্টালে বিভিন্ন বিভাগের প্রার্থীদের নিয়োগ করার কারণে একজন B.Ed. ডিগ্রিধারীও বিষয়বস্তু লেখক বা কন্টেন্ট রাইটারের চাকরি বেছে নিতে পারেন।

- মার্কেটিং এজেন্সি এবং কর্পোরেট কনসালটেন্সি হল কয়েকটি জায়গা যেখানে B.Ed. গ্র্যাজুয়েটরা কাজ খুঁজে পেতে পারেন।
- বর্তমানে ইউটিউব-এর মতো প্লাটফর্মে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের শিক্ষকতার দক্ষতাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারেন ও এই ক্ষেত্রে নিজেদের ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ভালো অর্থ উপার্জনের পথ খুলে যেতে পারে।
- এছাড়াও B.Ed. শেষ করার পর, প্রশিক্ষণার্থীরা M.Ed. ডিগ্রী অর্জন করতে পারেন। M.Ed. অর্জনের পর পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পেতে পারবেন।

২. B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির বিশ্লেষণ:

পশ্চিমবঙ্গের B.Ed. প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের আবস্থা অন্বেষণ করতে বর্তমান গবেষকগণ এই রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ থেকে ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধে B.Ed. কোর্স সম্পন্ন করা ১০০ জন প্রার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই তথ্যের উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত পর্যায়ে করা হল।

সারণী : ২০১৮-২০২২ সালের মধ্যে B.Ed. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি

বেকার	২৪
গবেষক	৬
প্রাইভেট টিউটর	২৬
বেসরকারি স্কুল শিক্ষক	২৮
সরকারি স্কুল শিক্ষক	২
অস্থায়ী কলেজ শিক্ষক	৮
শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের শিক্ষক	৩
SACT(State Aided College Teacher)	৩
অন্যান্য	৪
মোট	১০০

উপরি উক্ত সারণী থেকে দেখা যায়, যে সমস্ত প্রশিক্ষণার্থীরা ২০১৮-২০২২ সালের মধ্যে B.Ed. উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের মধ্যে ২৮% প্রশিক্ষণার্থী বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতায় কর্মরত এবং ২৬% প্রশিক্ষণার্থী নিজেদের বর্তমান পেশা হিসেবে প্রাইভেট টিউটরিং বা গৃহশিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছেন। সেই তুলনায় বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন সরকারি বা সরকারপোষিত শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত কম, যথাক্রমে ২% এবং ৩%। SACT হিসেবে নিযুক্ত আছেন ৩%। ৪% প্রশিক্ষণার্থী আংশিক সময়ের জন্য বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতায় যুক্ত আছেন। অন্যান্য পেশায় (যেমন IT কর্মচারী, কন্টেন্ট লেখক, পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি) যাঁরা যুক্ত রয়েছেন তাদের সংখ্যা ৪%। উল্লেখযোগ্যের বিষয় এই যে ৬% প্রশিক্ষণার্থী আরো উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হয়ে Ph.D. স্কলার হিসেবে নিজেদেরকে গবেষণায় যুক্ত করতে পেরেছেন। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় যে ২০১৮ থেকে ২০২২ সালে উত্তীর্ণ এই ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের বেশির ভাগ অংশ (২৪%) এখনো কোনো রকম পেশায় নিজেদের সংযুক্ত করতে পারেননি।

মূল্যায়ন : শিক্ষকশিক্ষণ কোর্স হিসাবে B.Ed. কোর্স-এর গুরুত্ব অনঃস্বীকার্য। শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হবার ক্ষেত্রে এই কোর্স অত্যাবশ্যকীয় ডিগ্রী হিসাবে বিবেচনা করা হয়।কিন্তু কেবলমাত্র শিক্ষকতা পেশাই B.Ed. প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে একমাত্র সুযোগ, তা কিন্তু একেবারেই নয়। আলোচ্য গবেষণাকার্যটিতে গবেষকগণ এই কোর্স-এর বিভিন্ন জীবিকার সুযোগ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং বর্তমান সময় এই কোর্সসম্পন্ন করা প্রশিক্ষণার্থীদের জীবিকার পরিস্থিতি কিরূপ তা পর্যালোচনা করেছেন। উপরিউক্ত এই আলোচনাতে দেখা গেছে যে স্কুল ও কলেজে স্থায়ী সরকারি পদে কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা খুব কম। বেশিরভাগ প্রশিক্ষণার্থীরা অস্থায়ী বিভিন্ন পদে কর্মরত এবং বেশ কিছু প্রশিক্ষণার্থী এখনও কর্মসংস্থানহীন অবস্থায় আছেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীদের সাক্ষাৎকার থেকে বোঝা গেছে যে

বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করছেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে (NTA NET/ WB SET/ CTET/ WB TET/ SLST ও অন্যান্য) সফল হয়ে জীবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে আবার অনেকেই B.Ed. কলেজে অধ্যাপনায় সুযোগ পাবার জন্য M.Ed. কোর্স করছেন এবং কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীরা M.Phil. ও Ph.D. কোর্স এর মাধ্যমে গবেষণার কাজে যুক্ত হয়ে রয়েছেন।

উপরিউক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ B.Ed. প্রশিক্ষণার্থীরা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেও নিজেদের কাঙ্ক্ষিত কর্মক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হতে পারেননি। এই পরিস্থিতির জন্য বিভিন্ন কারণকে দায়ী করা যেতে পারে, যেমন- ১. অনিয়মিত ও দীর্ঘকাল ব্যাপী শিক্ষকনিয়োগ প্রক্রিয়া। ২. শিক্ষকতা পেশাছাড়া B.Ed. প্রশিক্ষণার্থীদের অন্যান্য জীবিকার সুযোগের ব্যাপারে অস্বচ্ছ ধারণা ও অনিহা। ৩. ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষকতার সুযোগ তুলনামূলক বেশি থাকলেও বেশিরভাগ প্রশিক্ষণার্থীদের এই ভাষার প্রতি ভীতি তাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। ৪. বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ গুলিতে নিম্ন মানের প্রশিক্ষণ। বিশেষত অনেক প্রাইভেট শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির পাঠ্যক্রমের প্রয়োগ নিম্ন মানের ও পরিদর্শনের অভাব। যার ফলে বেশিরভাগ B.Ed. প্রশিক্ষণার্থীদের গুণগত বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও B.Ed. প্রশিক্ষণার্থীরা নিরন্তন চেষ্টা করে চলেছেন জীবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। এছাড়াও বেশকিছু শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিও Placement Cell প্রতিষ্ঠা করে B.Ed. প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে জীবিকার সুযোগকে প্রসারিত কয়ে দিতে চেষ্টা করছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেবার জন্য বিভিন্নবৃত্তি প্রদানের ব্যাবস্থা করেছে। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে আমাদের সরকার B.ED. উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আরও নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, পুরাতন স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করে, ইংরাজি মাধ্যমের স্কুল চালু করে, স্বশাসিত স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক সংস্থাকে (রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত

সেবাশ্রম সংঘ, খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা ইত্যাদি) উৎসাহ দান করে শিক্ষকতা পেশার ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগকে আরও সম্প্রসারিত করবে।

References:

Htang, L. K. (2019). Motivations for choosing teaching as a career: teacher trainees' perspective from a Myanmar context. Journal of Education for Teaching, 45(5), 511–524. https://doi.org/10.1080/02607476.2019.1674561

Nataraja, R. (2016). Attitude of Teacher Trainees towards Two Year B.Ed Programme And Their Future. Scholarly Research Journal for Humanity Sciences & English Language, 3(15), 3646–3649.

NCTE Regulations, 2014 https://ncte.gov.in/website/PDF/regulation/regulation2014/english/appendix4.pdf

Singh, A. (2023). Career after B.Ed.: Teaching Job Opportunities in Government & Private Sector. Shiksha.com. https://www.shiksha.com/teaching-education/articles/career-after-b-ed-blogId-66399

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজ্ঞানীদের অবদান

সমর দাস
গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

আমাদের চিরপ্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল সর্বাংশে রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সেখানে কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখব ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধকরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রমথনাথ বোস, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ এবং আরো অনেক পণ্ডিত-বিজ্ঞানী পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এ সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের নিবিড় সংকল্প, আত্মসম্মান এবং দেশপ্রেম দিয়ে তাঁদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করতে তাঁদের ভূমিকা ছিল গঠনমূলক। তাঁরা তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে ভারতকে শিক্ষা-অর্থনীতিতে স্বনির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের অবদান বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলশব্দ

আইএসিএস, স্বদেশী, জাতীয়তাবাদ, পরিকল্পনা কমিশন।

মূল আলোচনা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনায় আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের

বীরগাথা শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকেই। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক ছিল বা এই আন্দোলনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই ভূমিকা ছিল ভাবলে ভুল হবে। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মানুষেরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। কিন্তু সেইসব মানুষেরা রয়ে গেছেন প্রদীপের নিচের অন্ধকারে। যেমন, আজ আমরা যতই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা নিয়ে মেতে উঠি না কেন, যাঁদের সক্রিয় অবদানের ফলে ভারতীয় বিজ্ঞান আজ বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত, সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ উৎসাহী নই। স্বাধীনতার সংগ্রামে বৈজ্ঞানিকদের অংশগ্রহণের কাহিনি তাই আজও অনেকাংশে উপেক্ষিত। তাই বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় সেইসব বিজ্ঞানীদের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যাঁরা সে দিনের সেই কঠিন সময়েও ভারতের বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিকাশেই শুধু নিয়োজিত ছিলেন না, স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গড়ে তুলেছিলেন।

প্রথমেই যাঁর কথা বলব তিনি হলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪)। যুক্তিনিষ্ঠ মনের অধিকারী মহেন্দ্রলাল শুধু চিকিৎসাবিদ্যা নয়, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, ভূবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর দখল ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকদের এদেশের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবহেলার বিষয়টি তিনি লক্ষ করেছিলেন। এছাড়া ব্রিটিশদের ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার মহেন্দ্রলাল নিজেও হয়েছিলেন। মহেন্দ্রলাল একজন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন আর এজন্য তিনি ইংরেজদের প্রশংসাও অর্জন করেছিলেন।[১] শুধু তাই নয় ১৮৬৩ সালে কলকাতায় ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর শাখা চালু হলে মহেন্দ্রলাল তার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতে হোমিওপ্যাথির চর্চা শুরু হলে তিনি হোমিওপ্যাথির অধ্যয়ন শুরু করেন। ডাঃ সরকার অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন এবং হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৮৬৭ সালে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের

সভায় তিনি হোমিওপ্যাথির গুণগান করলে ব্রিটিশদের তা ক্ষুণ্ন করে। তাই তারা ডাঃ সরকারের ডাক্তারি বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়। সেই সময়েই মহেন্দ্রলাল সংকল্প করেন বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অগ্রগতির জন্য এমন এক সংস্থা গড়ে তুলতে হবে যা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং যেখানে ভারতীয়রা স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানচর্চা করতে পারবে।[২] তাই তিনি ব্রিটেনের Royal Institute (RI) ও British Association for the Advancement of Science (BAAS)-এর আদলে ১৫ই জানুয়ারি ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন Indian Association for the Cultivation of Science (IACS)।[৩] এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা বাস্তব রূপ পায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডাঃ সরকার দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন। প্রথমত, ভারতীয়দের দ্বারা বিজ্ঞানের চর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা এবং দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানো ও তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা।[৪] এদেশের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ তখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাই তারা ব্রিটিশদের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে সক্ষম ছিল না। এই অবস্থায় ডাঃ সরকারের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা দেশের মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধের বিকাশে সাহায্য করেছিল। তাঁর এই স্বদেশী উদ্যোগে তাঁর পাশে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ পণ্ডিতেরা।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার গ্রেডেড সায়েন্টিস্ট পদাধিকারী প্রথম ভারতীয় এবং স্বনামধন্য ভূবিজ্ঞানী প্রমথনাথ বোস (১৮৫৫ – ১৯৩৪) প্রথম বিজ্ঞান নির্ভর শিল্পের কথা বলেন। তিনিও ব্রিটিশদের বৈষম্যনীতির শিকার হন। শুধুমাত্র ভারতীয় বলে সংস্থার তৎকালীন মহানির্দেশক মেডলি কাল্ট মহানির্দেশক পদের জন্য যোগ্যতম প্রার্থী প্রমথনাথকে বঞ্চিত করে তুলনায় কম যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজকে ওই পদে মনোনীত করলে অপমানিত প্রমথনাথ ১৯০৩ সালে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৯১-এ Indian Industries Association গড়ে তোলা হয়।[৫] এর প্রধান সদস্য ছিলেন প্রমথনাথ বোস এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখার্জি। তাঁরা স্বদেশী

ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশিয় কাঁচামালের সাহায্যে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন।

সেই সময় ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা ও বেতন বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছিল।[৬] প্রাতিষ্ঠানিক ও গবেষণার ক্ষেত্রে নানাবিধ বঞ্চনা ভারতীয় বিজ্ঞানী মহলে ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তার প্রতিবাদ দেখা যায়। এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল জগদীশ চন্দ্র বসু, সি.ভি. রামন, গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজ, কৃষিবিজ্ঞানী গিরিশচন্দ্র বসু প্রমুখ। এইসব বিজ্ঞানসাধকদের মনে জাতীয়তাবোধ, অটুট দেশভক্তি দেশে বিজ্ঞানের বিকাশের মূল প্রেরণা ছিল। ব্রিটিশরা এদেশে নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে এনেছিল। সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশে নানারকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হত। ভারতীয় প্রতিভাকে বিকশিত হতে না দেবার চেষ্টা তারা সবসময় করে যেত। তাদের এই অন্যায় কার্যকলাপই দেশের মানুষের মনে জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ বিরোধীতা জাগিয়ে তোলে।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ও জাতীয়তাবাদের প্রচারের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭)। মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'আই এ সি এস'-এর সাথে যুক্ত ছিলেন আচার্য বসু। এখানে থাকাকালীনই তাঁর মধ্যে স্বদেশভাবনা গড়ে ওঠে। বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার প্রাপক লর্ড র‍্যালে জগদীশচন্দ্র বসুর নামে শংসাপত্র পাঠান যাতে লেখা ছিল, তাঁর এই মেধাবী ছাত্রটিকে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষকতার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু ভারতীয়রা যথেষ্ট যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নন – এই অজুহাতে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোর অনুমতি দেওয়া হল না।[৭] কিন্তু জগদীশচন্দ্র এত সহজে দমেননি। তিনিও ঘোষণা করেন, তিনি পদার্থবিদ্যা পড়াবেন কিন্তু ইংরেজদের থেকে বেতন নেবেন না।[৮] এরপর ১৮৮৪ সাল থেকে তিন বছর তিনি বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেন। অবশেষে ইংরেজরা বাধ্য হয় তাঁকে পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতায় ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিস (যা কেবল ইংরেজ শিক্ষকদেরই প্রাপ্য ছিল) পদে নিয়োগ করতে।[৯] তিন বছরের বকেয়া বেতনও তাঁকে দেওয়া হয়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রতি ঘটে চলা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে জগদীশ

বসুর এই সত্যাগ্রহ পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি প্রদান করেছিল। তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ১৯১৭ সালে স্থাপনা করেন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। পরাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।

একই সময়ে আমরা পাই রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে (১৮৬১ – ১৯৪৪)। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। শুধু রসায়নবিদ হিসেবেই তাঁর পরিচয় সীমিত নয়। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পদ্যোগী এবং একজন গান্ধিবাদী কর্মী। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ই তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি প্রাকৃতিক ও দেশীয় সম্পদের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতেন। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৯২ সালে ভারতে শুরু করেন সম্পূর্ণ স্বদেশী উদ্যোগে তৈরি রসায়ন শিল্প। স্থাপিত হয় Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd.[১০]

১৯০৫ সালে কার্জনের বাংলা বিভাজনের পরিকল্পনার ফলে বাংলার বুকে নেমে আসে ঘোর সঙ্কট। দেশবাসী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়, শুরু হয় বিদেশী পণ্যদ্রব্যের বর্জন। ম্যাঞ্চেস্টারের কলে তৈরি কাপড় পুড়িয়ে সাধারণ মানুষ বিরোধ প্রদর্শন করে। তার আগেই বিজ্ঞানীরা দেশকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র দোরাবজি টাটার সাথে দেখা করে দেশে স্বদেশী উদ্যোগে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের পরিকল্পনা করেন। কারণ লৌহ শিল্পের জন্য সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রয়োজন ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র রায় বুঝতে পেরেছিলেন দেশকে সমস্তরকম অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করতে শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন, "it is education and nothing but education that can remove social evils, sanitary troubles and economic distress from the country and can awaken political consciousness and create social solidarity in the people. Self-government without literacy would be nothing but a farce and might possibly be a tragedy." [১১]

প্রফুল্লচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই তালিকায় সামিল ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা ও আরো অনেকে। অল্প বয়স থেকেই মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩ – ১৯৫৬) ছিলেন তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী। টডের 'রাজস্থান' এবং মারাঠা বীরত্বের কাহিনী বালক মেঘনাদের মনে জাতীয়তাবোধের বীজ বপন করে।[১২] তাঁর স্কুল জীবনে ১৯০৫ সালে বাংলার গভর্নর স্কুল পরিদর্শনে এলে তিনি গভর্নরকে বয়কট করেন। এর ফলে তাকে সরকারি বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরেন। ইডেনে হোস্টেলে থাকাকালীনই মেঘনাদ টের পেয়েছিলেন একদল ছেলে হোস্টেলের পিছনের মাঠে মিলিত হয়। তারা যে বিপ্লবী তা বুঝতে মেঘনাদের দেরী হয়নি। হোস্টেলের অনেকের মতই মেঘনাদের ডাক পড়েছিল সেখানে। ইংরেজদের মেরে এই দেশ থেকে তাড়ানোই ছিল তাদের লক্ষ্য। মেঘনাদ তাদের সাধ্যমত সাহায্য করেন, গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন তাদের সাথে।[১৩]

মেঘনাদ বরাবরই ছিলেন রাজনীতি সচেতন। বিজ্ঞান শিক্ষা তাঁর রাজনীতি বোধকে আরো শাণিত করে তোলে। ছাত্রাবস্থা থেকেই বাংলার বহু বিপ্লবী ও বামপন্থী নেতা কর্মীর সাথে সাহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বাঘা যতীন ও পুলিন দাসের হাত ধরে মেঘনাদ অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। সমিতির সদস্যদের সাথে তিনি লাঠি ও ছোরা খেলা শিখতেন।[১৪] তখন বিদেশে সানফ্রান্সিসকো ও কানাডায় গদর পার্টি কাজ করছে। বাঘা যতীনের কাছে খবর আসে গদর পার্টি জার্মানি থেকে অস্ত্র সরবরাহ করে সাহায্য করবে। ওই অস্ত্র আসবে 'হেনরী' নামক জাহাজে সিঙ্গাপুর ফিলিপিন্স হয়ে সুন্দরবনে। সেই অস্ত্র আনার দায়িত্ব পরে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও যদুগোপাল মুখার্জির উপর। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সুন্দরবনে চলে যান। কিন্তু পথিমধ্যে ব্রিটিশরা জাহাজটিকে আটক করে ও সমস্ত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে নেয়। ফলে বিপ্লবী বিজ্ঞানীকে শূন্য হাতেই ফিরতে হয়।

১৯২২ সালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনের আয়োজন করেন, সদ্য বিলেত ফেরত মেঘনাদকেই তিনি উক্ত সম্মেলনের সভাপতি করেছিলেন। মেঘনাদ

তাঁর ভাষণে জাতীয় উন্নতির উপায় সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেন। গুরু প্রফুল্লচন্দ্রের মতো মেঘনাদও আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে দেশের উন্নতি সম্ভব বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন শুধুমাত্র চরকা বা গ্রামীণ শিল্পনীতি দিয়ে দেশ ও দশের উপকার সাধিত হবে না, দরকার একটি সুপরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি।[১৫]

১৯১৯-এর রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাশিয়ার বিপ্লব – এ সবই মেঘনাদ সাহাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তবে এসবের পাশাপাশি তিনি বিজ্ঞান সাধনা চালিয়ে যান। বিদেশি 'Nature' পত্রিকার মতো তিনি 'Science and Culture' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এখানে দেশিয় উন্নতির বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 'Science and Culture' পত্রিকা সম্বন্ধে বলেছেন, "... বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করিতাম ড. সাহার গভীর জ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বহু বিস্তৃত কর্ম সম্পর্কে। ... এই বিশাল ভারতবর্ষের অপরিমিত দারিদ্র, কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে লড়াই করিবার সংকল্প দেখিয়াছি ড. সাহার রচনায়।"[১৬] সুতরাং মেঘনাদ সাহা দেশের স্বাধীনতার পাশাপাশি এই দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন যে কিভাবে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। আর এজন্য দরকার সংগঠিত পরিকল্পনার। তাই তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (National Planning Commission) গঠন করার প্রস্তাব দেন। নেতাজি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকার সুবাদে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যায়। গঠিত হয় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (১৯৩৮)। এছাড়া নেহেরুর সাথে আলোচনা করে মেঘনাদ সাহা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের (DVC) পরিকল্পনা তৈরি করেন, যা ভারতীয় নদী পরিকল্পনায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মেঘনাদ সাহা শুধুমাত্র একজন সফল বিজ্ঞানী ছিলেন না, বিপ্লবীদের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ। জার্মানিতে গিয়ে বিপ্লবী অবনী মুখোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করেন এবং তাকে বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পৌঁছে দেন।[১৭] এইভাবে মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞানী থেকে বিপ্লবী হয়ে

উঠেছিলেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। দেশমাতৃকার সেবায় এই বিজ্ঞানী ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন Indian Statistical Institute–এর প্রতিষ্ঠাতা রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৮৯৩-১৯৭২)। মেঘনাদ সাহার মত প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে যুক্ত না থাকলেও ড. মহলানবীশ স্বদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর চিন্তাভাবনার মিল ছিল। তিনিও মনে করতেন ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।[১৮] তিনি 'সংখ্যা' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। যেখানে রাশিবিজ্ঞান আলোচনার পাশাপাশি চলত জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার কাজ। এই প্রতিষ্ঠানে গণিতবিদরা অংশগ্রহণ করতেন স্বদেশী আলোচনায়। শুভেন্দুশেখর বসু, হরিশচন্দ্র সিনহা, রাজচন্দ্র বসু, সমরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ গণিতবিদগণ গোপনে স্বদেশী কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৩ –এর দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেন মহলানবীশ তাঁর রিপোর্ট ও গবেষণাপত্রে। ব্রিটিশ সরকারের এই অমানবিক দায়িত্বজ্ঞানহীন নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনেই যথেষ্ট জনমত গড়ে ওঠে। যাতে মহলানবীশের রিপোর্টের বিশেষ ভূমিকা ছিল।[১৯]

আলোচ্য বিজ্ঞানীগণ ছাড়াও আরো অনেকেই পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আন্দোলনের পাশাপাশি এই বিজ্ঞানীরা তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার দ্বারা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামণ, জগদীশচন্দ্র বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নিখিলরঞ্জন সেন, দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। বিজ্ঞানীর কাজ সর্বদা কেবল গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পশ্চাৎপদতা যখন তাকে আন্দোলিত করে, বিশেষ করে পরাধীন দেশের এক নাগরিক হিসেবে তার চিন্তা যখন দেশের একেবারে সাধারণ মানুষের হিতাহিত ঘিরে আবর্তিত হয়

তখন তিনি আর নিছক শিক্ষক বা গবেষক-বিজ্ঞানী থাকেন না। তিনি হয়ে ওঠেন এক সমাজ সংস্কারক, দখল করেন এক বিশিষ্ট স্থান।

পরাধীন ভারতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মণীষাদের স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়বাদী চিন্তাভাবনার কথা আজও জনমানসের আলোচনায় সেইভাবে স্থান পায়নি। অথচ লক্ষ করলে দেখা যাবে যাঁরা স্বাধীনতার লড়াইয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের তুলনায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিজ্ঞান সাধকদের অবদান কোনো অংশে কম নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন দেশকে বিদেশীদের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করেছেন, তেমনই এই বিজ্ঞানসাধকরা ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের ভিত স্থাপন করেছেন, দেশকে দিশা দেখিয়েছেন।

সূত্রনির্দেশ :

১। সদগোপ পত্রিকা, বঙ্কুবিহারী ঘোষ (সম্পা.), প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৩৫।

২। Mahendra Lal Sircar, On the Desirability of a National Institute for the Cultivation of Sciences by the Natives of India, Calcutta, 1869, pp. 3 – 6.

৩। Suvobrata Sarkar, 'Bhadralok Aspirations and the Quest for Technical Knowledge 1830 – 1900' in Joseph Bara, Ch. Radha Gayathri, Nandita Khadria, Deepak Kumar (eds), Education in Colonial India : Historical Insights, Manohar, 2013, p. 109.

৪। Mahendra Lal Sircar, The Indian Association for the Cultivation of Sceince, Calcutta, 1877, p. 29.

৫। Deepak Kumar, Sciene and the Raj : A study of British India, 2nd edn, New Delhi : Oxford University Press, 1995, p. 210.

৬। Deepak Kumar, Sciene and the Raj : A study of British India, 2nd edn, New Delhi : Oxford University Press, 1995, p. 209.

৭। Deepak Kumar, Sciene and the Raj : A study of British India, 2nd edn, New Delhi : Oxford University Press, 1995, p. 218.

৮। Deepak Kumar, Sciene and the Raj : A study of British India, 2nd edn, New Delhi : Oxford University Press, 1995, p. 219.

৯। Deepak Kumar, Sciene and the Raj : A study of British India, 2nd edn, New Delhi : Oxford University Press, 1995, p. 223.

১০। Suvobrata Sarkar, Education in Colonial India, op. cit. p. 113; Deepak Kumar, Science and the Raj, op. cit, p. 239.

১১। 'Ray, Life and Experiences', Quoted in Deepak Kumar, 'New' knowledge and 'New' India : Lessons from the Colonial Past in Deepak Kumar et. al. (eds). Education in Colonial India, op. cit, p. 52.

১২। অতি মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ মেঘনাদ সাহা : বিজ্ঞান সমাজ রাষ্ট্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৩

১৩। অতি মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ মেঘনাদ সাহা : বিজ্ঞান সমাজ রাষ্ট্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৬ – ১৭।

১৪। ড. অচিন্ত্য কুমার মাইতি, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, গ্রন্থতীর্থ, ২০০৩, পৃ. ৬২।

১৫। অতি মুখোপাধ্যায়, অবিনাশ মেঘনাদ সাহা : বিজ্ঞান সমাজ রাষ্ট্র, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৫১।

১৬। সুনির্মল চক্রবর্তী, সার্ধশতবর্ষে বাংলার দুই বিজ্ঞানী : মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রতিশ্রুতি, ২০২০, পৃ. ৪৭ – ৪৮।

১৭। সুনির্মল চক্রবর্তী, সার্ধশতবর্ষে বাংলার দুই বিজ্ঞানী : মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রতিশ্রুতি, ২০২০, পৃ. ৯১।

১৮। অপরাজিত বসু, অনির্বাণ কুণ্ডু, শুভাশিস ঘোষাল, গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী, তিন বাঙালি বিজ্ঞানী : মেঘনাদ সাহা সত্যেন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৯৮।

১৯। অপরাজিত বসু, অনির্বাণ কুণ্ডু, শুভাশিস ঘোষাল, গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী, তিন বাঙালি বিজ্ঞানী : মেঘনাদ সাহা সত্যেন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ, জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৯৮।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

দরদশীল সমাজে নৈতিক কাঠামোর ‘সম্পর্ক’ সম্বন্ধে : দরদী নীতিশাস্ত্রের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

সর্বজিৎ মিত্র

গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

দরদী নীতিশাস্ত্র আমাদের সমাজে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরে। এই নীতিশাস্ত্রের মধ্যেদিয়ে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্ক কিভাবে দরদের দ্বারা লালিত পালিত হয় তা সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা আমরা পাই। আর দরদ আমাদের শেখায় নিঃস্বার্থভাবে বা কোনকিছুর বিনিময় ছাড়া কারোর প্রতি কোন ব্যক্তির আত্মিক বন্ধন যা সমাজকে এক সহনশীল উদার ভাবনা ভাবতে শেখায়। এই প্রবন্ধে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, দরদের যে নৈতিক কাঠামো তা বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করেছি।

মূলশব্দ

দরদী নীতিশাস্ত্র, দর্শন, নৈতিকতা, নারীবাদ।

মূল আলোচনা

ভূমিকা: দরদী নৈতিকতা হল একটি স্বতন্ত্র নৈতিক তত্ত্ব যা 1980 দশকে শুরু হয়েছে। 1960 দশকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে শুরু হওয়া অনুসন্ধানের বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে নারীবাদী চিন্তাধারার জ্ঞান কি গঠন করে তা পুনর্বিবেচনা থেকে এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। দরদ কি সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে যে “আমরা জগতে বসবাস করার জন্যই জগতকে সঠিকভাবে চালনা এবং সংস্কার করি”(Toronto, 1990)। দরদী নৈতিকতা; তার সাথে জড়িত মূল্যবোধ; জাগতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য বৈচিত্রের ক্ষেত্রে নারীদের নারীবাদী অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিকতা

এবং কিভাবে এই ধরনের নীতিশাস্ত্রের মান সহিংসতা এবং আধিপত্যে প্রত্যাখ্যান করে তা বোঝার অন্তর্ভুক্ত। এই ধারণার মূল ভিত্তি হল মানুষ সহজাত ভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল জীব এবং মানুষের অবস্থান সর্বদাই পরস্পর সংযোগ রক্ষাকারী জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে দুটি ব্যক্তির স্বভাবের পরিবর্তে সম্পর্কের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়, ব্যক্তিদেরকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীল, নৈতিকভাবে এবং জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই গবেষণাপত্রে মূলত ব্যক্তিত্ববাদের সমালোচনাকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটিকে নারীবাদী পটভূমি এবং সমালোচনামূলক রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে বোঝা হয়েছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে দরদীনীতি শাস্ত্র নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে পরিবার অথবা আন্তরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দরদ, নারীবাদী চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে দরদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দরদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে দরদী প্রাপকদের বাধা উক্ত গবেষণা আলোচ্য বিষয়। এই গবেষণাটি দরদী নৈতিকতাকে আহ্বানকারী একটি সামাজিক স্থানের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ অবদান রাখে, আমি একজন দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করছি, এক্ষেত্রে একজন দৃষ্টির অভাবযুক্ত ব্যক্তি এবং সমাজে তার ‘দরদ’ প্রাপ্তির অভিজ্ঞতার পটভূমি রচিত হয়েছে, আমি বিগত পনেরো বছর ধরে আমার পরীক্ষার জন্য অনুলেখক এর উপর নির্ভরশীল; আমি অগণিত লিখিত পরীক্ষার মধ্যে আমার অনুলেখকদের সহায়ক পূর্ণ পরিষেবার জন্য কখনো অর্থপ্রদান করিনি। লেখকরা কেউ আমার বন্ধু, কেউ আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচেনা ব্যক্তি; যারা শুধুমাত্র প্রতিকূলতা দূর করার জন্য আমাকে সহযোগিতা করেছে এবং করে চলেছে। এই লেখাতে তাদের উল্লেখ্য এক প্রকারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং আত্মোপলব্ধির মধ্যদিয়ে ‘দরদ’-এর এক প্রকার স্বরূপ প্রদান করা। আমার গবেষণাপত্রটি সাম্প্রতিক লেখাগুলির উপর ভিত্তিকরে রচিত এবং সমাজের একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ দরদী একটি বিস্তৃত বিবরণএর ধারণার ক্ষেত্রে যুক্তি প্রদান করে। এটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক মৌলিক মূল্যবোধগুলি গঠন করে এবং নৈতিকতা গঠন করে একটি দরদশীল সমাজকে পালন করতে পারে।

লিঙ্গ এবং প্রতিবন্ধী অধ্যায়নে 'দরদ': দরদী নৈতিকতার মূলগঠন স্বরূপ তার মূল্য এবং অনুশীলন উভয়ের অধ্যায়ন এবং তা বোঝা আবশ্যক, কিছু নারীবাদী দরদকে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যার মাধ্যমে লিঙ্গকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, Graham(1983) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে দরদএর মাধ্যমে একজন নারীর পরিচয় ফুটে ওঠে। যদিও দরদ প্রদান করা মহিলাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে, দরদশীল কাজের লিঙ্গগত প্রকৃতি, অর্থপ্রদান এবং অবৈতনিক উভয়ই, ভালোভাবে নথিভূক্ত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এগুলি শ্রমবাজারে বিদ্যমান বৈষম্যগুলিকে তীক্ষ্ণ করে (Hughes et.al 2005, Rake 2001)। বিদ্বজ্জনেদের দ্বারা পর্যবেক্ষিত হয়েছে যে দরদী লিঙ্গগত প্রকৃতি উভয়ই মহিলাদের 'প্রাকৃতিক বিষয়' হিসেবে উপনিবেশিত এবং গঠন করে (Hochschild,1983), দরদী সাথে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিণতি রয়েছে। একইভাবে অক্ষমতা তাত্ত্বিকরা দরদকে প্রতিবন্ধকতার সাপেক্ষে নির্ভরশীল মর্যাদা রূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে দরদ নেওয়া একজনকে সামাজিক অভিনেতা হিসেবে ঘাটতিতে রাখে, সংস্থা থেকে বঞ্চিত হয়। কিছু পণ্ডিতেরা মনে করেন যে সমস্ত প্রতিবন্ধী দরদ প্রাপ্তি হয় তারা ট্রাজিক জীবনযাপনও করে থাকে (Oliver,1990), Bauman(1993,11) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, অন্যের দরদ নেওয়ার প্রবণতা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন তা অন্যের স্বায়ত্তশাসনের বিনাশ ঘটায় এবং কিছু ক্ষেত্রে তা আধিপত্য ও নিপীড়নের দিকে নিয়ে যায়। ফলাফলস্বরূপ প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের ক্ষমতাহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে দরদকে দেখা হয়। ফক্স(2000,338) হেলেন সিক্সসেকে অনুসরণ করে দেখিয়েছেন যে দরদ পুরুষালী তত্ত্বাবধায়ক আধিপত্যের প্রযুক্তি মুক্ত করতে পারে, এটিকে একটি 'উপহার' হিসেবেও ব্যক্ত করা যেতে পারে। যার ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন উদারতা, বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস, ভালোবাসা, প্রতিশ্রুতি, আনন্দ এবং সম্মান DPM-এর পদ্ধতিতে দরদী একটি বাস্তববাদী এবং বস্তুবাদী ব্যাখ্যা জড়িত যা পুরুষবাদী নীতি দ্বারা অবহিত হয় এবং স্বায়ত্তশাসনের পুরুষবাদী ধারণাকে নিজের আদর্শ রূপে প্রতিহত করে। এটি দরদী সংজ্ঞা প্রদানে সহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে DPM-কে পরিচালিত করে এবং যুক্তিপ্রদান

করে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজেদের ব্যক্তিগত সহকারি(PAs)-দের পরিষেবা অর্থ প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে হবে। যদিও অক্ষমতার সাপেক্ষে দরদী এই প্রকার বোঝাপড়া দরদকারী এবং দরদকর্তাএর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের একটি বিপরীত প্রস্তাব প্রদান করে, এ ক্ষেত্রে কার্যকরী ভাবে দরদকারী নিয়োগকর্তা হয়ে ওঠে এবং দরদকর্তা কর্মচারী হয়ে ওঠে, মূলত এই ধরনের ব্যবস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কার্যকারী হয়, সরাসরি অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা প্রভু/দাস সম্পর্ক প্রত্যাহার করার পরিবর্তে বিপরীত হয়ে যায় এবং বাস্তবে দরদ এবং দায়িত্বের নৈতিকতার সম্ভাবনাকে দূর করে। Hughes et al (2005,261)-এর মতে এই ধরনের অবস্থান একটি বাস্তব সম্মত উপাদানকে বিশ্লেষণে সুযোগ প্রদান করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দরদশীল সম্পর্কের উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অর্জনে সক্ষমহয়। এটি কার্যকরী ভাবে আবেগ পরিধির (Heller,1979) বাইরে দরদ প্রদান করে, যা মাতৃত্ব, নারীসুলভ এবং স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতা এবং পারিবারিকতার সাথে চিহ্নযুক্ত এবং রাজনীতি এবং নৈতিকতার থেকে স্বতন্ত্রভাবে পৃথক, এটি পুরুষতান্ত্রিক এবং বুর্জোয়া রাজ্যে নৈতিকতাকে ছেড়ে দেয়, যেখানে ন্যায়বিচার এবং অধিকারকে নৈতিক আচরণের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (Gilligan,1982)। Whitford(1991a,53) বলেছেন ব্যক্তি মানবতার শরীর যে মহাবিশ্বের গঠনের দ্বার প্রান্তে তা মনে রাখে না। বর্তমানে প্রতিবন্ধকতার সামাজিক মডেল এবং DPM গুরুত্বপূর্ণভাবে সমালোচিত হয়েছে (Hughes and Paterson, 1997)। দরদী নৈতিকতার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তের পরিবর্তন হল দরদী বোঝাপড়াকে একটি অ-প্রান্তিক স্থান হিসেবে স্থাপন করা, যেখানে দেহের ব্যবস্থাপনা এবং এর বর্জ্যকে জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা নারীর কল্পনায় গঠিত, যেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা, আবেগ এবং সম্পর্ক সমসাময়িক কাল্পনিক গঠনের সমালোচনামূলক অংশহিসেবে পুনরুদ্ধার করা হয়। দরদ সম্বন্ধিত নারীবাদী কার্যকলাপ আবেগ এবং মূর্ততার তাৎপর্যকে তুলে ধরেছে। আমরাএখানে দেখতে পাচ্ছি যে যার প্রতি দরদ হচ্ছে আর যিনি দরদ করছেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কটা বোঝার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফুকোর টেকনোলজি অফ দা সেল্ফ (1980,1988) এ বলেছেন এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, এখানে বলা হচ্ছে ফুকোর

ধারণাটি প্রকাশ পাবে ,যখন আধিপত্যশীল নিয়মের সাথে সম্পৃক্ততার দ্বারা পরিচয় বা স্বউৎপন্ন হয় অর্থাৎ আধিপত্যের প্রযুক্তি (যা পুরুষ, আনুষ্ঠানিক, চুক্তিভিত্তিক, আংশিক অপরিচিতদের সাথে বিনিময়ের সম্পর্কের দ্বারা অবহিত একটি বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যায়) এবং এ গুলি প্রতিহত বা গৃহীত হয় 'অস্তিত্বের নান্দনিকতা' এবং 'নীতিশাস্ত্রের কোড' উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। যদিওস্ব-গঠনের এই ধারনাটি স্বাধীনতা এবং সীমাবদ্ধতার দ্বৈত দ্বন্ধে সীমিত হয়েছে। দ্বৈতবাদী অন্বেষণের জন্য সমালোচিত হয়েছে (McNay,2000:9) পরিলক্ষিত হয়েছে যে দরদী পারিপার্শ্বিক পরিচয় গঠনে ইহা গঠনের সাথে সম্পর্কেযুক্ত উত্তেজনা এবং সমস্যাগুলি পরীক্ষা করার একটি উপায় প্রদান করে (Hughes et al 2005, 262), এর সাথে সাথে আমরা দেখতে পারছি যে এই পারস্পরিক সম্পর্ক যিনি দরদ করছেন আর যিনি দরদ নিচ্ছেন এই বিষয়টি আমরা জানতে পারছি ন্যাঙ্গিফেজারের লেখাতে (1989) এর মধ্যে থেকে আমরা জানতে পারছি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আমাদের সমাজে কার প্রতি কতটা। আত্মনির্ভরতা বলতে বোঝায় যে উপায়ে পারস্পরিক প্রয়োজন দরদশীলকার্য এবং দায়িত্বে মূর্ত হয়। এটি আমাদের প্রত্যেকের জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজন, এটি মূলত দরদী গুরুত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং আত্মনির্ভরতার জটিলদ্বান্দ্বিক তার মাধ্যমে দরদ নেওয়ার ব্যপকতাকে প্রতিফলিত করে (Hughes,2005,262)। এটি পুরুষের কাল্পনিক প্রতিদ্বন্ধিতা করে যার মাধ্যমে 'নারীবাদীর' প্রান্তিকতা ঘটে যা সামাজিক মর্যাদা, লিঙ্গনির্বিশেষে ঘটে। এটি দরদী একটি পরিণতি যেমন প্রেম, লালন-পালন, সামাজিক প্রজনন প্রভৃতি সম্পর্কিত ধারণাগুলি আধুনিক বুর্জোয়া থেকে শুরু করে প্রকৃতির রাজ্যের অধীন । যাজন সাধারণের ক্ষেত্রের নিচে ব্যক্তি মানবের কার্যকলাপের ব্যক্তিগত সীমা যা অধিকার এবং ন্যায়বিচারের সংস্রব।

দরদনীতি তত্ত্বের নারীবাদী ধারা : দরদনীতিতত্ত্বের প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায় Sara Ruddick(1980) এর রচনা "Maternal Thinking"-এ, যেখানে মাতৃত্বের দরদশীলতার অনুশীলন, স্বতন্ত্রচিন্তা-চেতনা এবং ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া মান ও মূল্য-এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, গুণ বা virtue যেমন- নম্রতা, সহনশীলতা এবং ভালো মানসিকতার গুনগুলিকে মাতৃত্বের মূল্যবোধ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

যখন তাঁর রচনায় দেখা যাচ্ছে, কিভাবে মাতৃত্বের এই অভিজ্ঞতা মাতৃত্বের অনুশীলনের মধ্যেথেকে স্বাতন্ত্র্য নৈতিকতার মডেলকে একটা রূপদেয় এবং অভিজ্ঞতাজাত মূল্যবোধ কিভাবে এই অনুশীলনের মধ্যে থেকেও অনুশীলন অতীত অর্থবহ হয়ে ওঠে। এরপর বলা যায় Carol Gilligan- এর গবেষণামূলক কাজ- In a Different Voice(1982) দরদী নৈতিকতাকে ভিন্ন কাজ হিসেবে ন্যায্যতা প্রদান করে, এই গবেষণামূলক কাজ ব্যক্তির এরসাথে সম্পর্কের এবং যুক্তির সাথে আবেগের সংযোগ গঠন করে। The Roe vs. Wade-মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলা হয়েছে, কোন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা কোনরূপ সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতীত সংবিধান অনুসারে গর্ভপাতের সম্পূর্ণ স্বাধীন তা উপভোগ করবে। উনবিংশশতকে নারীসুলভ ধার্মিকতার চরিত্র কবি কভেন্ট্রিপ্যাট্রিমোর দ্বারা অমর হয়ে রয়েছে। যেখানে বলছেন যে মহিলারা কেবল অন্যদের জন্য কাজ করবে এবং কথা বলবে। নারীরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যার কথা না বলায় এই নিঃস্বার্থ ব্যবহার অ্যাঞ্জেলের অমরত্তের দাবি করে, যেখানে কণ্ঠস্বরহীনতা, সম্পর্ক ও দায়িত্ব থেকে অদৃশ্যতা প্রতীয়মান হয়, দেবদূতের কণ্ঠটি ছিল একজন ভিক্টোরিয়ান পুরুষের কণ্ঠস্বর যা একজন মহিলার শরীরে অবস্থান করে কথা বলছে। এই পছন্দটি ছিল মহিলাদের কথা বলার জন্য যা তাদের গিলিগানে আগ্রহী করে তোলে। তিনি অসংখ্য মেয়ে ও মহিলাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যার মধ্যে গর্ভপাত বিষয়ে দোদুল্যমান নারীরাও ছিলেন। এই সাক্ষাৎকার এর মধ্যে দিয়ে তিনি নারী নৈতিকতার ধারাকে প্রকাশ করতে পারেন। তার গবেষণা ছিল কিভাবে মানুষের নৈতিক দ্বন্দ্ব ও পছন্দগুলি তৈরি হয়। তারা নৈতিকসমস্যা ও প্রশ্নে কি দেখছেন, কিভাবে নৈতিকভাষা তাদের পছন্দ ও দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে একটা রূপ দিচ্ছে তা পর্যালোচনা করা। তার গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, এটাকে ব্যাখ্যা করা যে, নারীরা পুরুষদের আগে নৈতিক বিকাশ বন্ধ করে না, বরং তাদের নৈতিক বিকাশ Lawrence Kohlberg-এর নৈতিক বিকাশেরতত্ত্ব বর্ণিত একটি ভিন্নগতি পথ অনুসরণ করে। তিনি নৈতিকতত্ত্বের কণ্ঠস্বর ও তৃণমূল স্তরে থাকা মানুষের বৈষম্যকে সামনে নিয়ে এসেছেন। গিলিগানের মতানুসারে পুরুষরা ন্যায়ের নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। যেখানে নৈতিকতা বিমূর্তনীতির কেন্দ্রে রয়েছে এবং নিয়ম যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করতে

হবে। ইতিমধ্যে নারীরাও দরদী নৈতিকতাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যেখানে নৈতিকতা আন্তঃব্যক্তির সম্পর্কের কেন্দ্রীভূত এবং নৈতিকবিচার একটি সমস্যার প্রেক্ষাপটে ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে। তার মতানুসারে, দরদ হল কণ্ঠস্বর ও সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো নীতি, সেখানে প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরের গুরুত্ব আছে এবং তার সাথে মর্যাদার সাথে সেই কণ্ঠস্বর শোনা ও শোনানো। এটি সম্পর্কের প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ দেয় (মনোযোগ দেওয়া, শোনা প্রতিক্রিয়া জানানো) এবং একে অন্যের সাথে সংযোগ ছিন্নের মূল্যকে প্রাধান্য দেয়। এর যুক্তি হলো অনুমানমূলক, প্রাসঙ্গিক, মনস্তাত্ত্বিক, অবরোহী অথবা গাণিতিক নয়। গিলিগ্যানের মতে, দরদী নৈতিকতা মনস্তাত্ত্বিক তর্কের ভিত্তিতে নীতি-নৈতিকতা বর্তমান, যে উপায় আমরা অন্যদের সাথে নিজেকে অনুতা করি এবং নৈতিকতার উৎস মানুষের সম্পর্কের মধ্যে নিহিত কারণ তারা অন্যায় এবং অদরদ সম্পর্কে উদ্বেগের জন্ম দেয়। তিনি তার বই Joining the Resistance (2011)- এ স্পষ্ট করেছেন, দরদ নারীদের সাথে জড়িত ও নারীবাদীনীতি, যা পিতৃতন্ত্রের নৈতিকশৃংখলায় কম বলে মনে করা হয়- 'জীবনের আদর্শ লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল' যেখানে একজন পুরুষ হওয়া মানে একজন মহিলা না হওয়া ও শীর্ষে থাকা। পিতৃতন্ত্রের জ্ঞানীয়, নৈতিক অনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর দৃষ্টি প্রদান করে, এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে কিভাবে পিতৃতন্ত্র সম্পর্কিয় নীতি শ্বাসরোধ করে। সমস্ত ধরনের নিরঙ্কুশ, দ্বৈতবাদীকর্তিক ভুলগুলি, নৈতিক বাহকদের সম্পর্কগত তাও প্রাসঙ্গিক ও পুনর্বিবেচনার সমালোচনামূলক তাৎপর্যকে তুলে ধরে, তার সাথে থাকে নৈতিকবিচার। অন্যের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোযোগী হওয়ার গুরুত্ব পর্যবেক্ষণে, এটি মানুষকে মূর্ত, দুর্বল এবং পরস্পর নির্ভরশীল বোঝে, যার সাথে নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা করা হয় না। এটি পিতৃতন্ত্রকে শুধুমাত্র 'নিয়ম ও মূল্যবোধ কোড এবং স্ক্রিপ্টের একটি সেট যা নির্দিষ্ট করে কিভাবে বিশ্বে পুরুষ ও মহিলাদের আচরণ করা উচিত' তবে সেই পিতৃতন্ত্র 'অভ্যন্তরীণ ভাবে বিদ্যমান, আমরা কিভাবে চিন্তা করি এবং অনুভব করি এবং বিচার করি, আমাদের সম্পর্ক এবং আমরা যে বিশ্বে বাস করি(Gilligan- and Snider, 2018,6)।

Baier(1994,26) কান্ট ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন, যার ভিত্তি হলো কান্টের নৈতিকতার তত্ত্ব; যার মূল কথা হলো, আবেগের ওপর নির্ভরতার কারণে নারীদের সম্পূর্ণ নৈতিক হওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেছেন, 'যেখানে কান্ট উপসংহারে বলছেন, নারীদের অবস্থা খুব খারাপ, আইন প্রণয়নের বিশেষ দক্ষতার ওপর পুরুষ নির্ধারণের জন্য, শাসন উপাসনার আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার জন্য এবং পুরুষের অতিরঞ্জনের জন্য আরও খারাপ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। পারস্পরিক আন্তনির্ভরতার ওপর স্বাধীনতার গুরুত্ব। অন্যদিকে Margaret Walker (1989,19-20) নারীবাদী নৈতিকজ্ঞান তত্ত্বকে সমর্থন করেন। নৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে মনোযোগ, প্রাসঙ্গিক এবং বর্ণনামূলক উপলব্ধি ও যোগাযোগ-এর বিপরীতে নৈতিকজ্ঞান তত্ত্ব যা বিমূর্ততার মাধ্যমে সাধারণতার কাছে যায়। নারীবাদী নৈতিকতা হিসাবে, এটি সমাজের বিদ্যমান কাঠামোতে নারীদের জন্য শুধু সমতায় দাবী করে না বরং দরদী মূল্য এবং নৈতিক তাৎপর্য প্রকাশ এমন অভিজ্ঞতার জন্য সমান বিবেচনার দাবি করে (Held,2006,12)।

দরদী নৈতিকতার দিক : দরদী নীতিশাস্ত্রের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো-"আমরা আমাদের জন্য দায়িত্ব নিচ্ছি তাদের প্রয়োজনে যোগদান করা এবং পৃথক করা(Held,2006,10)। পণ্ডিতরা দরদী ক্ষেত্রে আমাদের উপর যারা নির্ভরশীল যেমন– শিশু/বয়স্ক/অসুস্থতাদের নৈতিক দাবি তুলে ধরেছেন। আমি মূলস্রোতের বাইরে একজন ছাত্র যে আংশিক দৃষ্টিহীন। আমি আমারবন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সক্রিয় সমর্থনের মাধ্যমে নিজের লেখাপড়া চালিয়ে গেছি, যারা বর্ধিত পরিবারের সদস্যস্বরূপ বিভিন্ন সংকটের সময়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে আমার পাশে থেকেছেন। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের মাধ্যমে আমি যে সমর্থন এবং দরদ প্রাপ্ত হয়েছি (আস্থাশীল, বিবেচ্য এবং দরদশীল প্রকৃত সম্পর্কের উদাহরণ হিসেবে) সেটি হল আমার নৈতিক দাবির প্রতিফলন এবং বন্ধুদের দরদ ও সমর্থনের প্রতি নৈতিকতা প্রদর্শন এক্ষেত্রে আমার বন্ধুরা এবং বর্ধিত পরিবারের সদস্যরা আমাকে এবং আমার পরিবারকে স্বাধীন, যৌক্তিক স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করিনি যারা কোনো-না-কোনো ভাবে স্ব-প্রতিহিত। তারা তাদের নিজস্ব জগৎ, জীবন এবং আমার প্রতি ব্যয়িতো সময় যা নিজেদের জীবনে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মাধ্যমে তারা মানব

নির্ভরতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা করেছে সম্পর্ক এবং দায়িত্বের নৈতিকতা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একজন আংশিক দৃষ্টিহীন ছাত্রহিসেবে আমার সংগ্রামে আমার পরিবার এবং বন্ধুদের আমাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসতে দেখেছি। এমন অনেক পরিস্থিতিতে যেখানে একজন ছাত্র হিসেবে আমি ভেঙে পড়েছি, হয় সাহিত্যের অধ্যায়ন করতে পারিনি বা আমার বিষয় সম্পর্কে কিভাবে যেতে হবে তা বুঝতে পারিনি, এক্ষেত্রে আমার বন্ধু, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমার মানসিক ভাঙ্গনে আমাকে সাহায্য করতে দেখেছি। হেল্ড(2006,10) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে- ‘‘সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার মতো আবেগ গুলিকে এমন নৈতিক আবেগ হিসেবে দেখা হয় যেগুলি কেবল যুক্তির নির্দেশ বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য নয় বরং আরো ভালোভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন’’। অনেক ক্ষেত্রে আমার অনেক বন্ধুকে আমার প্রতি হওয়া অন্যায় যেগুলি তারা অন্যায় বলে বোধ করতো তার বিরুদ্ধে ক্রোধ করতে দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ আমার এক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা যেতে পারে, একবার সরকারি কেরানি পদের টাইপিং পরীক্ষায় আমাকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল, যেখানে প্রতি মিনিটে আমাকে কুড়িটি শব্দ টাইপ করতে বলা হয়, একজন আংশিক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি হিসেবে আমি আমার সহায়ক পাঠকবন্ধুর দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হই যে আমাকে কম্পিউটারের স্ক্রিনে থেকে শব্দগুলি পড়ে শোনায়। আমার পদটি একটি সংরক্ষিত পদ ছিল এবং এক্ষেত্রে আমার সহায়ক বন্ধুর মনে হয়েছিল এই ধরনের পরীক্ষা আমার মত একজন আংশিক দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একটি অসাধ্য কাজ। এটিকে তারা একটি নৈতিক ভুল রূপে গণ্য করেছিল এবং নিজেদের নৈতিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। একে কেউ বলতে পারে যে সরকারের কিভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করা উচিত সে সম্পর্কিত চুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে আমার প্রতিবন্ধকতাকে তাদের সম্পর্কগত সংবেদন-শীলতার মাধ্যমে প্রাধান্য দিয়েছিল, যদিও যুক্তিবাদী নৈতিকতত্ত্বগুলি সাধারণত অহংবোধ এবং আক্রমণাত্মক আবেগকে অগ্রাধিকার দেয় যেখানে নিরপেক্ষতা বাস্তবায়নে এবং পক্ষপাত ও স্বেচ্ছাচারিতার অনুপস্থিতির আবেদনের মাধ্যমে ন্যায় বিচার বোঝা যায়। হেল্ড (2006,10) নির্দেশ করে যে দরদী নৈতিকতা ‘‘আবেগ এবং

সম্পর্কের প্রশংসা করে যা নৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রকৃত আন্তঃব্যক্তিক পেক্ষাপটে বুঝতে সক্ষম করে যে কোনটি সর্বোত্তম হবে’’। বলা যায় যে দরদীনীতিশাস্ত্র একটি নৈতিকসমস্যা সম্পর্কে বিমুর্তযুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং যার সাথে আমরা প্রকৃত সম্পর্ক ভাগ করি তাদের থেকে নিজেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে সম্মান করে। দরদী নৈতিকতা ‘‘স্বার্থপর ব্যক্তি’’ এবং ‘‘ক্ষমতাবান’’ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আমর বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী যারা সর্বদাই আমাকে সমর্থন করেছে যদি তারা বলে যে একজন বন্ধু হিসেবে আমি তাদের সহযোগিতা লাভ করেছি সেক্ষেত্রে এটিকে সার্বজনীন হিসেবে গণ্য করা যাবে না, কিন্তু যদি তারা আমি এবং আমার মত আংশিক প্রতিবন্ধী বা সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমভাবে সহমর্মী হয়ত বেতাসার্বজনীন রূপে গণ্য হবে। যেকোন প্রকার নৈতিকবিচারের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শর্তগুলি সর্বজনীনভাবে পরিমাপযোগ্য একক এবং পূর্বাভাসগুলি সার্বজনীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। তদুপরি আমার বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের দ্বারা আমার সমর্থন লাভ কখনোই তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থচরিতার্থ করে না তারা আমার ওপর দরদশীল এবং সম্পর্কসূত্র আগ্রহী ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা সবার জন্য সমভাবে কার্যশীল নয় তবে নিজেদের এবং প্রতিবন্ধীদের মধ্যে একটি প্রকৃত মানবিক সম্পর্কের প্রচার করে, তাদের এই পন্থা কোনভাবেই অহংবাদী বা পরার্থবাদী নয়। এটি স্যারারুডিক(1980) দ্বারা বিস্তারিত ন্যায়বিচার এবং দরদী অ-বিচ্ছেদকেও বোঝায়, ‘‘ন্যায়বিচার সর্বদা দরদ সহকারে দেখা হয়’’, দরদকে যদি কেউ আমার অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে দেখে সেক্ষেত্রে সে বাস্তবে একজন স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অবগত হতে পারবে। আমার দীর্ঘ অধ্যবসায়ের জীবনে যারা আমার প্রতি দরদশীল হয়েছে তাদের দরদ আমার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ় করেছে। প্রদর্শিত করেছে যে আমার মত ব্যক্তিরা অবহেলিত নয়। প্রতিদিনের জীবনে তাদের সহানুভূতিশীল দরদীহাত আমাকে আরো দৃঢ় করেছে নিজসংকল্পে অটুট থাকার জন্য। নিজেদের ব্যস্ততম সময়ের থেকে সময় বের করে জীবনের মূলস্রোতে এগিয়ে যেতে তারা আমাকে বদ্ধপরিকর করেছে, তাদের এই সমর্থন আমাকে মূল জনজীবনে সক্ষম করে তুলেছে। আমার জীবনে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেওয়া একটি ব্যক্তির কারণে বর্তমানে আমি এই গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করার জন্য অগ্রসর হতে পেরেছি, যেখানে

আমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারব দরদী নৈতিকতার গুরুত্ব। যদিও প্রভাবশালী নৈতিক তথ্যগুলি নৈতিকতাকে অনুমান করে-অসম্পর্কহীন, স্বাধীন এবং পারম্পরিক উদাসীন ব্যক্তিদের পরস্পর সমান ধরে নেওয়া, একটি বিমূর্ত অনুঘটক, তারা পরিবার, বন্ধুত্ব এবং সামাজিক অন্যান্য প্রেক্ষাপটের আন্তঃসংযুক্ত প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত নৈতিক সমস্যাগুলি পরিত্যাগ করে। সম্পর্কিত আন্ত: নির্ভরতার জনতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রাখার ক্ষেত্রে দরদী নৈতিকতা ব্যক্তির ধারনার প্রস্তাব দেয় যা পূর্ব থেকে আমাদের সংযুক্ত করে এজন্য পৃথক ব্যক্তি হিসেবে যা আমাদের সম্পর্কে আমাদের পরিচয় হিসেবে ব্যক্ত করে। একটি মূল ক্রম যা দরদীনীতিশাস্ত্রকে আহ্বান করে তাহলো মন এবং শরীরের পৃথকীকরণ, যার দর্শনশাস্ত্রে একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে (গ্রীকদর্শন এবং দেকার্তের দ্বৈতবাদ) এবং যা শরীরের ওপর মনের বিশিষ্টতাকে সমর্থন করে। সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে এটি মন দেহের বিচ্ছেদ এবং মহিলাদের সাথে শরীরের মেলামেশাকে অতিক্রম করে, যা পুরুষতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ জীবনের মাধ্যমে নৈতিকতা কি পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা : ফরাসি দার্শনিক স্যান্ড্রালজিয়ার (2015,219) দরদকে– "একটি সাধারণ বাস্তবতার সাথে মিলিয়েছেন, এটি সত্য যে লোকেরা পরস্পর দরদশীল এবং এই ভাবে বিশ্বের কার্যকারীতার প্রতি মনোযোগী, এর উপর নির্ভর করে দরদীধরন"। তাঁর মতে দরদী নৈতিকতা দরদ এবং মনোযোগের গুরুত্বকে নিশ্চিত করে যা অন্যদের প্রতিকরা হয়, বিশেষ করে যাদের জীবন এবং সুস্থতা বিশেষ, ক্রমাগত এবং দৈনন্দিন মনোযোগের ওপর নির্ভর করে যা আমাদের লক্ষ্যকে নৈতিকতার পেক্ষাপটে সাধারণ জনগণের সমর্থন নির্দেশ করে। তিনি সাধারণতার ব্যাখ্যায় দুর্বলতার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন, সাধারণ ভাষাদর্শন এবং দরদীনৈতিকতার মধ্যে সংযোগস্থাপন করেছেন, এক্ষেত্রে তিনি উইটগেনস্টাইন এবং অস্টিনের সাধারণ জীবনের ধারণা গ্রহণ করেছেন একই সাথে ক্যাভেল এবং দাসের এই বিষয়ে যে লেখা তার সহায়তা গ্রহণ করেছে। সাধারণভাষাদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং অভিব্যক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা। তাঁর গবেষণার কাজ হলো যে সাধারণের অস্বীকার, অবমূল্যায়ন এবং অবহেলা (আমাদের চোখে যা সঠিক এবং বর্তমানে অদৃশ্য), সে সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা

অবমূল্যায়িত কারণ তাদের দ্বারা কৃতকর্ম সর্বসমক্ষে অলক্ষিত থাকে, যারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নারী, অশ্বেতাঙ্গ নারী, তাত্ত্বিক চিন্তাধারার সাধারণ জীবনের প্রতি অবজ্ঞার সাথেমুক্ত-যা বৌদ্ধিক গবেষণায় বস্তুরলিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস থেকে উদ্ভূত। তাঁর মতে দর্শনের ক্ষেত্রে সাধারণজীবন এবং সাধারন ভাষার অবমূল্যায়ন সাধারণের প্রতি অসতর্কতার পরিচয় বহন করে। তাঁর মতে মানুষের প্রতি দরদী প্রদর্শনের একটি মূর্ত কণ্ঠ হলো নারী। Laugier (2020) এর মতে– দরদ হল কোনো নির্দিষ্ট চাহিদার একটি বাস্তব প্রতিক্রিয়া এবং মানুষের সাধারণ বিবরণের প্রতি সংবেদনশীল।

কেন দরদীনীতিশাস্ত্র একটি নৈতিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব : লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে নারীবাদীতত্ত্বের পূর্বসূরী স্বরূপ দরদীনীতিশাস্ত্রকে মনে করা হয়। রবিনসন (2020,13) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে দরদীনীতিশাস্ত্র সম্পর্কীয় বিষয় লিঙ্গ বিশ্লেষণের বহির্ভূত এবং সম্পাদকীয়, সম্ভাব্য অবমূল্যায়ন স্বায়ত্তশাসিত স্ব-আইন প্রণয়নের সম্ভাবনাকে দুর্বল করে দেয় (Hekman,1995:2)। রবিনসন দরদীনীতিশাস্ত্র সংক্রান্ত সম্পর্কীয়তা পর্যবেক্ষণে ব্যক্ত করেছেন এটি 'ব্যক্তিবাদের' বিরোধী এবং তাছাড়াও বাইনারি জ্ঞানতত্ত্ব এবং শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত অন্টলজিরো বিরোধিতা করে যা সাধারণকে তাত্ত্বিক গবেষণার সীমার বহির্ভূত রাখে। সম্পর্কের নৈতিক বৈধতা বজায় রাখার সময় দরদী নৈতিকতা সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সংগ্রামকে স্বীকৃতি প্রদান করে, নিজের এবং অন্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে, বিদ্যমান ক্ষমতা সংক্রান্ত সম্পর্ককে অক্ষত রাখে এরূপ শ্রেণিবিন্যাসের প্রতিরোধ করে। এটি কোন প্রকার ক্ষতি, অভিজ্ঞতার অবমূল্যায়ন অবহেলা, ভাষা এবং ধারনার ক্ষতি পুনরুদ্ধার করে, যা 'সাধারণ'-এর তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রশ্নের অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিহিত রয়েছে, যা সমসাময়িক চিন্তাধারায় 'অন্য'- এর স্থানস্বরূপ অস্বীকৃত হয়েছে।

একটি সমালোচনামূলক নারীবাদীতত্ত্ব হিসাবে দরদীনীতিশাস্ত্র প্রতিফলিত করে, যে প্রক্রিয়ায় কিছু গুণাবলী এবং বিচারের পদ্ধতিগুলি যেমন পারস্পরিক দুর্বলতা এবং আত্ম-নির্ভরতা, মনোযোগিতা এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল স্বীকৃতি যুক্তিবাদীদের আধিপত্যের স্বরূপ পিতৃতন্ত্রের রূপে উপহাসিত হয়েছে (Robinson, 2020,16)। এটি প্রতিফলিত করে যে কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতির দ্বারা নিরবে পরিচালিত হয় মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া, যা কার্টেসিয়ান পদ্ধতির ভাবধারাকে

বিশেষ সুবিধা প্রদান করে এবং সমর্থন করে এবং এই তথাকথিত স্বায়ত্তশাসিত বিষয়গুলিকে দরদী সম্পর্কের দ্বারা বহাল রাখার উপায় কি আড়াল করে। এটি প্রথাগত এবং নব্য ঔপনিবেশিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি প্রদান করে, যেখানে লিঙ্গ নিপীড়নের একক কারণ নয়, পরিবর্তে এটি জীবনের একটি আদেশ যা মানুষকে উচ্চতর এবং নিকৃষ্ট, স্পর্শযোগ্য এবং অস্পৃশ্য জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণী, বর্ণ, যৌনতার ভিত্তিতে বিভক্ত করে(Gilligan and Snider, 2018, 14)। এইরূপ কার্যনৈতিকতাকে বিশদ বিবরণে মনোনিবেশের সক্ষম করে এবং এর ফলে চিন্তার স্বতন্ত্র রূপরেখা গড়ে ওঠে, বীণা দাস (2006)-এর মতে এটি– "মানুষের দৈনন্দিন জীবন, জীবন রূপ স্বরূপ উইটজেন স্টাইনের জীবনের ধারণার সাথে সংযুক্ত, অর্থাৎ জীবনের রূপ বা আকার জীবনের দ্বারা নেওয়া"।

উপসংহার: দরদী নৈতিকতা সাধারণ মানুষের ভাষা এবং অভিজ্ঞতাকে সম্মুখে নিয়ে আসে, Laugier (2015, 2020) দরদী বিষয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করেছেন এটি প্রভাবিত এবং সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত– "জীবনের একটি রূপ/ আকার যা সামাজিক এবং জৈবিক উভয়ই"। এটি নারীবাদী স্বরূপ এমন একটি কণ্ঠের সাথে সংযুক্ত যা সমান ভাবে শোনা যায় না। এটি নারী ও নারীত্বের সাথে সম্পৃক্ত, দরদী কার্যের নারীরূপ ন্যায়বিচারের একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়-যা সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃত নয় কিন্তু বিশেষ বাধ্যবাধকতা বা আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ফলাফল রূপে গণ্য হয়। নারীবাদীরা দরদীনীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে তত্ত্বের সঠিক দাবি নিবন্ধনের দিকপ্রদর্শন করে এবং দ্বৈত লিঙ্গের মাধ্যমে সমাজ ও তার প্রতিষ্ঠান এবং সংস্কৃতি যা পিতৃতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তার থেকে সাম্যের রাজনৈতিক স্থান স্বরূপ গণতন্ত্রকে মুক্তকরার সংগ্রামকে সমর্থন করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি নৈতিক অবস্থানের প্রস্তাব দেয় যা তাদের সামাজিক ভাবে বৈধ কুসংস্কারের মাধ্যমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, যা সংশোধনমূলক বক্তৃতার মাধ্যমে অকার্যকর হয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক কার্যপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বাধাকে মুক্ত করে, সক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত নিয়ম, চাহিদা এবং প্রকল্পযুক্ত বিশ্বে বসবাসের সুযোগের পথ প্রশস্ত করে। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি অনুধাবন করেছি যে দরদ বা সাহায্য সাধারণ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়, যা

পুরুষের প্রতিক স্বরূপ জগত যেটি পুরুষ দ্বারা পরিচালিত তার আদেশ দ্বারা নির্ধারিত নয়। দরদী নৈতিকতা নৈতিকজীবন থেকে নৈতিকতা নিয়ে আসে যা 'ভালো', 'সঠিক', 'ন্যায়', 'ন্যায্য' শব্দের মাধ্যমে ধরা পড়ে। এটি প্রত্যেকের জন্য সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে নৈতিকতাকে মানবজীবনের গঠনের প্রতিমনোযোগ আনতে রূপান্তরিত করে। এর ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে দরদশীল সমাজের নৈতিক ভিত্তি।

গ্রন্থপঞ্জি:

- Gilligan, Carol. 2011. Joining the resistance. Polity Press
- Gilligan C. 1982. In A Different Voice: Psychological Theory And Women's Development. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Gilligan, Carol. Snider,Naomi. 2018. Why does patriarchy persist? Polity Press
- Held, V., 2006. The Ethics of Care: Personal, political, and global. Oxford University Press on Demand.
- Hoogland, R.C., 2002. L. MacNay. Gender and Agency: Reconfiguring the subject in feminist and social theory. Cambridge: Polity Press, 2000 0-7456-1348-9.
- Kohlberg L. 2008. The Development of Children's Orientations Toward a Moral Order. Hum Dev.;51(1):8-20. doi:10.1159/000112530
- Laugier, S., 2015. The Ethics of Care as a Politics of the Ordinary. New Literary History, 46(2), pp.217-240.
- Ruddick, Sara. 1980. Maternal Thinking. Feminist Studies
- Ruddick, S., 1982. Maternal thinking. In Philosophy, children, and the family (pp. 101-126). Springer, Boston, MA.
- Walker, M.U., 1989. Moral Understandings: Alternative "epistemology" for a feminist ethics. Hypatia, 4(2), pp.15-28.

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

সেলিনা হোসেনের দিনকালের কাঠখড় : সংকট ও সংকটের অভিমুখ

সর্বানী পাল
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ

সময়ের স্বরকে কখনও এড়িয়ে যেতে পারেন না কোনো সাহিত্যিক। ওপার বাংলার কিংবদন্তি সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের দিনকালের কাঠখড় উপন্যাসটি মূলত কয়েকটি কাহিনীর সমান্তরালে উপন্যাসের বহুমুখী আবেদনকে সামনে এনেছে। যেখানে সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন মানুষের প্রকৃতি জীবন-জীবিকা থেকে শুরু করে বিশ্বজলবায়ু সমস্যা, দেশভাগের ফলে উঠে আসা উদ্বাস্তু সমস্যা ও সর্বোপরি সমাজের অন্ধকারে উঠে এসেছে হীন সাম্প্রদায়িকতার বিষ ফল। যেখানে সময়ের জলছাপ রয়েছে প্রবল ভাবে। যে জলছাপ পৌঁছে যায় সীমান্তের কাঁটা তারে।

জীবন জীবিকার যুদ্ধে বেঁচে থাকার অনির্দেশ্য পরিসরে সুন্দরবনে মাছ, কাঠ, মধু, গোলপাতা সংগ্রহে গিয়ে মুখোমুখি হতে হয় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। বাঘের থাবা বা বনদস্যুর থাবায় নিহত হয়ে অতীত হতে হয় যাদের, তাদের স্ত্রীদের ভাগ্যে জোটে ‘বাঘবিধবা’ খেতাব, সমাজ তাদের নাম দেয় অপয়া, অলক্ষ্মী। উপন্যাসের আখ্যান ভাগে শরবানু, হনুফা, রমলা, নুরিরা এই ঘুন ধরা পঁচে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গেই প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে। সংসারে অনটন, ক্ষুধার জ্বালায় জীবিকার সন্ধানে কখনও বা স্বামীহীন বিধবা শরবানু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্ত্রাসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ সোমেনকে একটু টিকে থাকার আশায় পা বাড়াতে হয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যাত্রায় সীমান্তের ওপারে, কাঁটাতারে ঝুলে থাকে ফালানিরা। সাম্প্রদায়িকতার ছুড়িকাঘাত বারবার সহ্য করে রমলারা শিকড়েই ঘর বাঁধতে চায় বার বার। এই সমস্ত আশায় শুধুমাত্র সমাজব্যবস্থা নয়, বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় প্রাকৃতিক দুয়োগ যা বিশ্বের তাবড় দেশগুলির অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণের ফল। এ সবের মূলোৎপাটন করতে চায়

বিপ্লবী চেতনায় জারিত শারমিন, যার সাথ দেয় শরিফ। কখনও বা উপন্যাসের বয়ানে, দেশভাগের লেলীহান শিখায় উঠে আসা উদ্বাস্তু সমস্যা প্রান্তিকা ও সুমিতদের প্রেমে বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।তবুও এরা স্বপ্ন দেখে উত্তরণের। তবুও সংগ্রাম চালিয়ে যায় শরবানুরা, তাই শরবানুরা হয়ে ওঠে বিশ্বমঞ্চে বিশ্বপ্রতিনিধি। আর এই পরিসরেই সেলিনা হোসেনের উপন্যাসের আবেদন পৌঁছে যায় কাঁটাতার ডিঙিয়ে উন্মুক্ত বিশ্বদরবারে।

সূচক শব্দ

বাঘবিধবা, সাম্প্রদায়িকতা, জীবিকাসঙ্কট, বিশ্বজলবায়ুসমস্যা , উদ্বাস্তু সমস্যা ।

মূল প্রবন্ধ

“জীবন এবং মানুষের সত্যটুকু ধারণ করে ঔপন্যাসিক গল্পকার তাত্ত্বিক হতে পারবেন, তিনি রসজ্ঞ হতে পারবেন– এটা ভিন্ন বিষয়। মূল সত্য এই জায়গায় যে, আমি জীবনকে ভালোবেসে জীবনের কথা বলছি। বেঁচে থাকার পরিচর্যা করছি।”[১]

এই উপলব্ধি, এই অভিব্যক্তি বাংলাসাহিত্যের একালের দর্পণের ভাস্বর সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের। যাঁর শান দেওয়া ধারালো কলমের খোঁচায় উঠে আসে যুগের প্রবাহমানতার আশ্চর্যতম ফসল। যে ফসলের একটি ‘দিনকালের কাঠখড়’(২০১৫) উপন্যাস । একজন সাহিত্যিকের প্রধান কাজই জীবনের কথা বলা, তাই স্বাভাবিকভাবেই সেলিনা হোসেনের সাহিত্যে উঠে আসে সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষের কথা, তাই প্রথাগত ধারণায় সীমাবদ্ধ না থকে তিনি তাঁর উপন্যাসে সরাসরি কতগুলো ঘটনার সাপেক্ষে সমস্যার অবতারণা করেছেন।

বর্তমান পরিসরে বিভিন্ন উপন্যাসে দেশভাগ প্রসঙ্গ, উদ্বাস্তু সমস্যার অবতারণা দুর্লভ নয়। প্রফুল্ল রায়ের ‘কেয়া পাতার নৌকা’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’ প্রভৃতি উপন্যাস এই সাক্ষ্য বহন করে। তবে বর্তমান প্রেক্ষিতে সুন্দরবনের মানুষের জীবনের লড়াই থেকে শুরু করে বহুমুখী সমস্যার অবতারণা ও ভবিষ্যত পরিস্থিতির সম্ভবনা, দেশভাগের ফলে উঠে আসা উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাধীনতার এতকাল পরেও সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাস, সর্বপরী সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের আধুনিক দৃষ্টি ভঙ্গি তাঁর উপন্যাসটিকে চালিত করেছে অগ্রসরতার পথে।

ওপার বাংলার সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন, বংলাদেশের রাজশাহী শহরে। তাঁর বেড়ে ওঠা শিক্ষাজীবন প্রায় এই শহরেই। তিনি তাঁর 'দূরন্ত শৈশব' কাটিয়েছেন পঞ্চাশের দশকে। এরপর পিতার কর্মসূত্রে বগুড়ার করতোয়া নদী সংলগ্ন এলাকায় ছিলেন তিনি। এখানেও তাঁর শৈশব স্মৃতিপট তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির লীলাক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখে। তাঁর শৈশব কেটেছে এক জ্বলন্ত অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করা যায়। যেখানে তিনি তাঁর ছোটোবেলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন– "পাশাপাশি আমি মেয়েদের কি ধরণের নির্যাতন হয়, কি ধরণের বৈষম্য তৈরি হয়; সেটা দেখেছি। একদিকে প্রকৃতির এই বিষয়টা; আরেকদিকে মানুষ, মানুষের সম্পর্কের এই জায়গাটা আমি ছোটবেলায় দেখেছি।"[২]

পূর্ববঙ্গে তাঁর জন্মের কিছুকাল পরেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। এসেছে ভারতবর্ষের স্বরাজ প্রাপ্তি; এই সময় তার পরিবার চলে যাচ্ছেন তথাকথিত পাকিস্তানে। কারণ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাশাপাশি এসেছে দেশভাগ, যার যন্ত্রণা পোহাতে হয় বাঙালি সমাজকে। বলাবাহুল্য এই বাঙালিই স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য রক্তক্ষয়ি সংগ্রাম করেছে বারবার। একদিকে গোটা ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎসবে মেতে উঠেছে তখন বাঙালি এক কালো সময়ে রাতের অন্ধকারে 'বাঙালি খেদাও' উৎসবের victim হয়েছে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে কখনও তারা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে কখনও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে পালাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে প্রকট হয়েছে উদ্বাস্তু সমস্যা। আর যাঁরা নানান অক্ষমতায় পালাতে পারেননি তারা মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন। এই ধারাতেই এসেছে ১৯৫২র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। যে সময় এই ঘটনাগুলি ঘটছিল সে সময় বেড়ে উঠছিলেন সেলিনা হোসেন। সমসাময়িক সংকটময় পরিস্থিতি, তাঁর জীবনদর্শন, সাহিত্য সৃষ্টির গভীরে তাঁকে যেতে সাহায্য করেছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেলিনা হোসেন তৎকাল থেকে বর্তমান কালের পরিসরকে তাঁর চিন্তাশক্তি ও আদর্শ ও কর্মশক্তির রুপায়নে সাহিত্যে তুলে ধরলেন যুগ যন্ত্রণার রূপ ও মনুষ্যত্বের পরম পরকাষ্ঠাকে। তাঁর প্রত্যক্ষ বাচনে

ধরা পড়ল সময়ের ভাষা। তাই স্বাভাবিকভাবে যুগ যন্ত্রণা থেকে উঠে আসল 'জ্যোৎস্নায় সূর্য জ্বালা'(১৯৭৩), 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড'(১৯৭৬), 'কাঁটাতারে প্রজাপতি'(১৯৮৯), 'গেরিলা ও বীরাঙ্গনা' (২০১৪) 'দিনকালের কাঠখড়' (২০১৫) প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাসগুলি।

'দিনকালের কাঠখড়' উপন্যাসের আখ্যানভাগে রয়েছে শারমিন ও শরবানু নামের প্রধান নারী চরিত্র।যেখানে এক নারী, আর এক নারীকে সাংবাদিকতার মাধ্যমে Project হিসবে তুলে ধরছেন। যে নারী ঘটনার সাক্ষী, যে নারী ভয়াবহতার সাক্ষী। উপন্যাসের আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে শরবানুর জীবনকে কেন্দ্র করে। যে শরবানুর জীবন তার সমগ্র যাপনে কোনো নিশ্চয়তার অববাহিকা দেখা যায়নি শেষ পর্যন্ত। এই শরবানুকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে উপন্যাসের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত যাত্রা। স্বাভাবিকভাবেই সেলিনা হোসেন শরবানুর জীবনকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের প্রান্তিক নারীদের জীবন সংকটকে দেখিয়েছেন। দারুণ জীবনস্পৃহা এখানকার মেয়েদের অদ্ভুত জীবনী শক্তি এদের। কাহিনীর সূচনায় সুন্দরবন সংলগ্ন অধিবাসী শরবানুকে চেনা যায়, ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বিশ্ব জলবায় পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের হয়ে ক্ষতিপূরণ চাওয়া প্রতিনিধি হিসেবে। কাহিনী-পট যত এগোতে থাকে আমরা শরবানুর জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের জীবনযন্ত্রণা সম্পর্কে অবগত হয়। উপন্যাসের আখ্যানে উঠে আসে সভ্যতার আলোয় নির্মিয়মানতার দাপটে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝড় আয়লার দাপটের পরে সুন্দরবনের করুণ চিত্র। ঝড়ের দাপটে ভেঙ্গেছে শরবানুর ঘর, ভেঙ্গেছে শরবানুর ঘরের মতো আশেপাশের স্থানীয় ঘরগুলি। উল্লেখ্য সুন্দরবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বড় বালাই, যা সুন্দরবনের জনজীবনের আতঙ্কের অন্যতম কারণ। বার বার নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা, তার ফল ভুগতে হয় শরবানুদের। সাময়িকভাবে শরিফের কর্মতৎপরতায় তাদের অস্থায়ী কুঁড়ে নির্মাণ করা হলেও সমস্যার শিকড়ে পৌঁছনো সম্ভব হয় না। আবার সমগ্র পৃথিবীর দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের দায় যেন শুধুমাত্র উপকূলবাসীদের নিতে হয়। সহ্য করতে হয় বঙ্গোপসাগরের প্রবল দাপট।আর এই অবস্থার জন্য ঔপন্যাসিক

সেলিনা হোসেন শারমিনের কর্মজীবনের সূত্রে তার বয়ানে তুলে ধরেন বিশ্বের বড়ো বড়ো উন্নতশীল দেশগুলির জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি ঔদাসিন্যের কথা– "এখন রাগ বাড়ছে সাগরের। আর সেই রাগ গায়ে নিচ্ছে সাগর উপকূলের মানুষেরা।... একেই বলে জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব জুড়ে উষ্ণতা বাড়ছে। অঘটন ঘটাচ্ছে ধনী দেশগুলো। আর দায় সামলাচ্ছি আমরা। আচ্ছা ওরা কি কখনও কার্বন নিঃসরণ ঘটানো বন্ধ করবে ?"[৩]

কিংবা সারমিনের কথা পটে তাঁর স্যার এর বক্তব্যে উঠে আসে– "...বিশ্বের বড় দেশগুলোর কাছে ছোটো দেশের মানুষের কোনো অন্যায় নেই।কিন্তু তাদের অন্যায়ের দায় গরিব দেশের মানুষের উপর বর্তায়। যারা কার্বন নিঃসরণে সম্পদের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে তাদের কাছে সাধারণ মানুষ জীবন মূল্যহীন,"[৪] ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র আয়লা ঝড়ে থেমে থাকেননি তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন শরবানুর জীবনে রুঢ় বাস্তবতাকে। যার সঙ্গে উঠে এসেছে বাঘবিধবা প্রসঙ্গ। উপন্যাসের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'বাঘবিধবা'র প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকটিত। কাহিনী পরম্পরায় শরবানুর স্বামী থেকে শুরু করে হুনুফার স্বামী সকলকেই বাঘের থাবায় প্রাণ দিতে হয়েছে। সুন্দরবনে জীবিকাসঙ্কটে সেখানকার বেশিরভাগ মানুষদের নির্ভর করতে হয় বন সম্পদের ওপর। জঙ্গলের মধু সংগ্রহ থেকে শুরু করে কাঠ আহরণ, নদীর মাছ, কাঁকড়া ধরা, চিংড়ি ঘের তৈরি করে তা আহরণ করেই এদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিধ্বংসী ঝড়ে বারবার বিপন্ন হতে হয় সুন্দরবনকে। যেমন সাম্প্রতিক ২০০৯ সালে বিধ্বংসী আয়লার প্রভাবে সুন্দরবনের কৃষিজমি নদীর লোনা জলের তলায় তলিয়ে যায় ফলে একদশক কাল পরিয়ে গেলেও বর্তমানে চাষের জমি তার উৎপাদনশীল ক্ষমতা ফিরে পায়নি। তার সঙ্গে নষ্ট হয়েছে চিংড়ির ঘের। মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে প্রবল জীবিকা সংকট। পেটের দায়ে জীবন জীবিকার যুদ্ধে সুন্দরবনে কাঠ, মধু পাতা সংগ্রহে গিয়ে হাসমত আলী থেকে শুরু করে হনুফার স্বামীকে প্রাণ দিতে হয় বাঘের থাবায়। বস্তুত সমস্যার শুরু এখান থেকেই যা বাঘবিধবাদের পরবর্তী জীবনকে কেন্দ্র করে প্রকট হয়েছে সমস্যার গভীরে। শতবছরের কুসংস্কারে স্বামীর মৃত্যুর পর লক্ষ্মী বউটি হয়ে

গেছে অলক্ষ্মী এই কুসংস্কারের নিকষ কালো অন্ধকারে সভ্যতার আলো ফেলা প্রায় সম্ভব হয় না। তাই বাঘবিধবা নারীকে শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে আসতে হয় তার বাবার ভিটেয়। নিজের মেয়ে বলে হয়ত বাঘবিধবা নারীর অসহায় পিতারা ফেলে দিতে পারেন না তাদের মেয়েদের তবুও সমাজের নিগ্রহে এই সব পিতাদের জ্বালা হয়ে দাঁড়ায় এই বাঘবিধবা মেয়েরা। তাই শরবানুর বাবা শেরখানকে বলতে শোনা যায়– "মেয়েটা বাঘবিধবা হয়ে আমাদের জ্বালা বাড়িয়েছে ওর কষ্টই তো এখন আমার কষ্ট।"[৫] অথবা সংকটের ধারাবাহিকতায় উঠে আসে ঔপন্যাসিকের অত্যাশ্চর্য ধারালো উচ্চারণ– "হায়রে জীবন ! জীবন বাঘের পেটে যায়। কুমিরের পেটে যায়। নোনা পানির নিচে তলায় বাঁধ ভেঙে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে সাগরের স্রোত। ঝড়ে উড়ে যায় ঘরবাড়ি। তারপরও লড়াই থামে না। সামনে ধু ধু চর। ফসল নাই, ঝাউবন নাই ,পানি নাই ,ভাত নাই, হাসমত আলি চায়নি যে তার বউকে লোকে বাঘবিধবা বলুক। এখন শুধু বিধবা বলে না, বলে বাঘবিধবা। মাঝে মাঝে বয়সি নারী পুরুষের কেউ তাকে বলে, উ-ই-ই বাঘবিধবা শরবানু।"[৬]

একদিকে উন্নতশীল দেশে ২৭ বছরের শারমিনের মতো শিক্ষিতা নারী। যে বলতে পারে আমি বাঘবিধবা শব্দটিকে সুন্দরবনের সব নদী এবং খালের ভিতর চুবিয়ে দিতে চাই; অন্যদিকে সভ্যতার বিপরীত প্রান্ত যেখানে সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করতে হয় শরবানুদের এগারো বছরের ফালানিকে পুরুষের লালসার উপকরণ হতে হয় তবুও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শরবানুরা হেরে যায় না। তাই নুরুদ্দীনের কুরচি মন্তব্যে অকপট জবাব দেয় শরবানু– "এই গাঁয়ে তো বাইশ জন বাঘবিধবা আছে। আপনি কয়জনকে এই নামে ডাকেন?... আরেকদিন ডাকলে আপনার থোতামুখ ভোঁতা করে দেব।"[৭]

যে শরবানু প্রতিবাদ করতে জানে, যে শরবানু দেশের হয়ে ক্ষতিপূরণ চায়তে জানে, জীবনকে দুমড়ে-মুছড়ে দেওয়া ঝড়ের তান্ডবে উপড়ে যাওয়া শরবানুদের ঘরের শেষ চিহ্নের মতো এই সমাজে টিকে থাকে শরবানুরা। তাই আর্থিক অনটনকে সঙ্গী করেই সংসার চালাতে, বেঁচে থাকতে হাজার হাজার বার পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়; ঠিক যেমন আধ সের মধুর জন্য ক্ষুদ্র

মৌমাছিকে অনন্ত পথ পাড়ি দিতে হয়। আবার যে বয়সটা পড়াশোনা করার বয়স, শৈশব উপভোগ করার বয়স, সেই বয়সেই সংসারের ভার কাঁধে তুলে নিতে হয় এগারো বছরের ফালানিদের। অথবা বাঘবিধবা নুরির দশ বছরের ছেলেকে বলতে শোনা যায় কঠিন সত্য যা তাকে বয়সের তুলনায় একটু বেশি বড়ো করে তোলে– "...এখন থেকে আমাদের ইশকুল নাই, পড়ালেখা নাই, বই খাতা খালের পানিতে দিলে খালের পানি বঙ্গোপসাগরে নিয়ে যাবে বলেছে।"[৮]

উপন্যাসের আখ্যানে হনুফার জীবনপটের কেন্দ্রে উঠে আসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বর্বরতার চিত্র, জোড় করে ভোগ দখলের চেষ্টা। একদিকে সেখানে সভ্যজগতের মানুষ তাদের প্রভুত সম্পদের ছিটেফোঁটাকে যক্ষের ধনের মতো আঁকড়ে ধরে যাপন করে, সেখানে হনুফার ক্ষুদ্র সম্পদ প্রকৃতির দান শুকনো পাতা, যা তার বাড়ি থেকে চোরে নিয়ে গেলে তার নিজেকে রানি মনে হয়। তবে প্রতিনিয়ত জীবন সংকটের মধ্যেও এই মানুষেরা হাসে, যে হাসি সুন্দরবনের অপার সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

বহুমুখী ঘটনা প্রবাহের স্বাক্ষর উপন্যাসটিতে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট আয়লা বিপর্যয়ে থেমে থাকেনি। বস্তুত এর পাশাপাশি অতীত ঘটনার সাপেক্ষে সাম্প্রতিক ঘটনা সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন কাহিনীপটে। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে নানান প্রশ্নচিহ্ন। মূলত পালযুগে বাংলাদেশে যেখানে উদার ধর্মসংস্কৃতি রচনা হয়েছে, দেহতত্ত্ব রচনা হয়েছে। সেখানে সাম্প্রদায়িক বীজ থাকলেও সংহতি টানার ব্যাপারটা ছিল;কিন্তু ঔপনিবেশিক কলোনিয়াল এসে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাঙালির মধ্যে এমনভাবে গেঁথে দিয়ে যায়, ফলে বাংলাদেশীদের ভাবনার রদবদল ঘটে।

১৯৭১ সালে বাঙালি হত্যাযজ্ঞের অমানিশাকালে সব থেকে বেশি অত্যাচারিত হয়েছিল বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়। পাকিস্তানি শাসকেরা সংখ্যা লঘুদের ওপর অত্যাচারের মদত দিয়ে গেছিল ক্রমাগত। এই ক্রমাগত সংখ্যা গরিষ্ঠের, সংখ্যা লঘুদের ওপর অত্যাচারের দংশনে স্বভূম থেকে চলে আসতে হয় এপার বাংলায়। তবে শান্তি মেলে না এখানেও। তারা পরিচিতি পায় উদ্বাস্তু নামে। স্বাভাবিকভাবেই

দেশভাগ ও দেশভাগের পরবর্তী সময়ে দিবিধ ঘটনাসমূহের স্মৃতিসত্তা উঠে আসে সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে। স্বদেশে থেকেও স্বদেশ অনুসন্ধানের যাত্রা তার সাহিত্যে সর্বদা বিদ্যমান 'সোনালি ডুমুর' উপন্যাসে সে সমাজ চিত্রপটে মাতৃভূমির প্রতি টান দেখিয়েছেন। তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা সম্পর্ক একটি সাক্ষাতকারে সেলিনা হোসেন জানান– "...অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পেরেছি। মাতৃভূমিকে ছেড়ে যাওয়া যে কত কষ্টের ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে..."[৯]

এই প্রেক্ষিতই যেন উঠে আসল তাঁর সাম্প্রতিক 'দিনকালের কাঠখড়' উপন্যাসে। উঠে আসল বাংলাদেশে অবস্থানকারী সংখ্যালঘু মানুষদের দেশভাগের সময় করুণ অবস্থার কথা। উঠে আসল ইতিহাসের উত্তাল কালো অধ্যায় মরিচঝাপির করুণ চিত্র। শেকড়ের টান কেওই ভুলতে পারে না তবুও একটু টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষায় তাদের ছাড়তে হয় ভিটে মাটি। তাই স্বাভাবিকভাবে সর্বহারা সুমিতের মায়ের সংলাপ আমাদের মনে প্রবলভাবে আঁচড় কাটে – "এ কেমন স্বাধীনতা? ভিটে পোতা ছাড়তে হল। স্বদেশ ফেলে আসতে হল। হাড়ভাঙা খাটুনিতেও খাবার ঠিকমতো জোটে না।"[১০]

একদিকে পেটের তাড়ায় জীবিকার সন্ধানে সোমেনকে মাতৃভূমি ছেড়ে লুকিয়ে সীমান্ত পার হয়ে আসতে হয় ভারতের কেরালার তিরুবন্তপুরমে– "পেটের তাড়ায় এসেছি। জানো তো সন্ত্রাসীরা হিন্দুদের কয় ঘরে আগুন দিয়ে মন্দির তছনছ করেছিল। দেবীমূর্তি ভেঙে দেওয়ার পর বাবা আর প্রতিমা বানায় না। সংসারে অভাব দিদি।"[১১] পেটের ক্ষিদেয় সোমেনকে বাধ্য হয়ে ভুলতে হয় জন্মভূমির টানকে। রাষ্ট্রের কাছে আর কোনো কিছু পাওয়ার আশা সে করে না। অন্যদিকে শারমিনের সাংবাদিকতার সূত্রে কখনও বা উঠে আসে সময়ের নির্মম কালো চিত্র– "সমীর মণ্ডল বলেছে, নদীভাঙনে চাষের জমি তলিয়ে গেলে ওর বড় ভাই ইন্ডিয়া চলে গেছে। সমীর মাটি কামড়ে পড়ে আছে...কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, আমাদের কোনো ভবিষ্যত নাই। এ দেশেও না ওই দেশেও না। ওই দেশে গেলে তো রিফুউজি বলে।"[১২] – এরকমই মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছে গাবুরা গ্রামের সোমেনের দিদি বাঘবিধবা সমাজের রমলা। সোমেনের বিবৃতিতে যা স্পষ্ট – "এ নিয়ে চারবার পোড়ানো হল

আমার বোনের বাড়ি, বোনটাও ঠ্যাঁটা। মানুষের কাছ থেকে কিছু জোগাড় করে চালাটা ওঠাবে।দমবে না। বলবে হাজার বার ঘর ওঠাব কারও সামনে মাথা নোয়াব না।"[১৩]

সেলিনা হোসেন মুখ্যত মেয়েদের প্রতিবাদী সত্ত্বায় বিশ্বাসী ছিলেন। যে সত্তাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন শরবানু, রমলাদের মধ্যে। আদতে মানুষ বাঘের চেয়েও বন্য, হিংস্র। যারা সুযোগ পেলেই মানুষকে ছিঁড়ে খায়। বাঘেরা যদিও খাবার নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা মানে না, তথাপি সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাসে সন্ত্রাসবাদের দাপটে অতীত হতে হয় মৃৎশিল্পী সুভাষকে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশ পরিসংখ্যানব্যুরো থেকে জানা গেছে ১০ বছরে ৯ লাখ হিন্দু কমেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশী অভিনিবিষ্ট গবেষক সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতার কথা জানাতে গিয়ে একটি জার্নালে বলেছেন– "সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাববোধ বাস্তব ও অনুমিত সম্পত্তি দখলের উদ্দেশে কিছু লোক নানা ঘটনা ঘটাচ্ছে। কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু নেতা বা রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়। তবে স্থানীয় পর্যায়ে সেই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় না।" (ড. আনিসুজ্জামান) তাঁর উপন্যাসে বর্ণিত আখ্যানে কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতার ভীত টলাতে সেলিনা হোসেনের আত্মগত বয়ানে উঠে আসে রমলা ও শরবানুর বন্ধুত্বের কথা। সেই বন্ধুত্বের টানেই শরবানু ঘর পোড়া রমলাদের আশ্রয় দিয়েছে তার কুঁড়েতে।তবে উপন্যাসের অন্তিমপটে এসে দেখা যায় পেটের দায়েই শরবানুকে কাঁটাতার পার হতে হয়। কাঁটাতারে ঝুলে থাকতে হয় ফালানিকে, তবুও ফিনিক্স পাখির মতো বাঁচতে হবে শরবানুদের।

পরিশেষে উল্লেখ্য, উপন্যাসটি মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ফলাফলেই থেমে থাকেনি, সমসাময়িক নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত কে কেন্দ্রে রেখে কাহিনীবৃত্তের পরিসরে বাংলাদেশ সংলগ্ন সুন্দরবনে বসবাসকারি মানুষদের তার সংকটাপূর্ণ জীবন থেকে শুরু করে উদ্বাস্তু স্রোত, সংখ্যালঘুদের বাস্তুচ্যুত, সর্বপরী মরিচঝাপির করুন কাহিনীর পাশাপাশি বাঘ-মানুষের কাহিনীর আখ্যানে জ্বলজ্বলে কালো সময়ের বিবরণ হয়ে থেকে গিয়েছে। একদিকে ঝড়ের দাপটে গৃহহীন হয়ে শরবানুদের উদ্বাস্তু হতে হয় অন্যদিকে দেশভাগের ফসলে 'উদ্বাস্তু জীবনের তাচ্ছিল্যে'

ইচ্ছামতী নদী পেরিয়ে ৯০০০ উদ্বাস্তু'র সঙ্গে সঙ্গে মুছড়ে যেতে হয় সুমিতদের। আবার খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের শৃঙ্খল ভেদ করে বর্তমানে অত্যাধিক কার্বন নিঃসরণ, জনসংখ্যার বিপুল চাপে, অরণ্যধ্বংসের ফলে কোথাও গিয়ে বাঘ ও মানুষের খাদ্য-খাদকের সম্পর্কের বৈপরীত্য কেটে গিয়ে জীবন প্রবাহিত হয় একই খাতে। সেলিনা হোসেনের 'দিনকালের কাঠখড়' উপন্যাস সেই সাক্ষ্যতাকেই বহন করে। তাই এই উপন্যাস শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বহুমুখী সমস্যার মুখপত্র হিসেবে উন্মোচিত হয় পাঠকের দরবারে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, নবগোপাল, কুইরী, বিশ্বনাথ (সম্পা.), (২০২১). কথায় কথায় সেলিনা হোসেন (প্রথম সংস্করণ) কলকাতা: পুনশ্চ পৃ: ৪৭

২. ঐ পৃষ্ঠা সংখ্যা, ১৫

৩. হোসেন, সেলিনা, (জানুয়ারি ২০১৬). দিনকালের কাঠখড় (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, পৃ: ১৭

৪. ঐ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮

৫. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১

৬. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০

৭. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩

৮. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৬

৯. রায়, নবগোপাল, কুইরী, বিশ্বনাথ (সম্পা.), (২০২১). কথায় কথায় সেলিনা হোসেন (প্রথম সংস্করণ) কলকাতা: পুনশ্চ পৃ: ৩০

১০. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১

১১. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৪

১২. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮

গ্রন্থপঞ্জী:

১. পাল, মধুময়,(সম্পা.),(২০০০). মরিচঝাঁপি ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস (প্রথম প্রকাশ) কলকাতা: গাঙচিল

২. ভট্টাচার্য, তুষার (সম্পা.),(২০১৫). অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি (দ্বিতীয় সংস্করণ) কলকাতা: একটি গুরুচন্ডাল প্রকাশনা

৩. রায়, নবগোপাল, কুইরী, বিশ্বনাথ (সম্পা.), (২০২১). কথায় কথায় সেলিনা হোসেন (প্রথম সংস্করণ) কলকাতা: পুনশ্চ

৪. হোসেন, সেলিনা, (জানুয়ারি ২০১৬). দিনকালের কাঠখড় (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্পে রাজনীতিভাবনা

সাদিয়া আফরোজ সিফাত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ

অমিয়ভূষণ মজুমদার কালসচেতনতায় ও বস্তুনিষ্ঠ মননে বাস্তবতার প্রখর রূপ চিত্রায়ণ করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। সচেতন নাগরিকের মতো দেশ-কাল সম্বন্ধে অমিয়ভূষণের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। দেশভাগের অস্থিরতা অমিয়ভূষণকে তীব্রভাবে আক্রান্ত করার ফলে রাজনৈতিক শুভবোধের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন অমিয়ভূষণ। গল্পকারের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব পড়েছিল তাঁর সাহিত্যকর্মে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্পে তাই রাজনীতি হয়ে উঠেছে নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের ক্ষমতা লাভের হাতিয়ার। সাধারণ মানুষের জন্য যে রাজনীতি কোনো সম্ভাবনা তৈরি করে না অমিয়ভূষণ তাঁর গল্পে সে রাজনীতিকে সমর্থন করেননি। একই সাথে মধ্যবিত্তের দ্বান্দ্বিকতা ও পলায়নপর মানসিকতার সমস্যাকেও চিহ্নিত করেছেন লেখক। অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্পে লেখকের সমগ্রচিত্র অনুসন্ধান বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ

রাজনীতি, গণতন্ত্র, প্রিভিলেজড বাবল, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ ।

মূল আলোচনা

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) সাহিত্যে সচেতন মনোভঙ্গি পোষণ করেছেন বরাবর। সাহিত্যের সত্য অর্থাৎ শিল্পের সত্য এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সত্যকে তিনি কখনও এক করে তোলেননি। দেশভাগ অমিয়ভূষণের মনোজগতে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। দ্বিখণ্ডিত দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে তিনি তাল মেলাতে পারেননি। দেশভাগের পরিক্রমায় সুবিশাল মানবগোষ্ঠীর উদ্বাস্তুতায় বুদ্ধিজীবি শ্রেণি রাজনেতিক

ঐক্যের আহ্বান করেনি। পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদেরা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এক ধরনের সমঝোতা সৃষ্টি করে। সে প্রক্রিয়ার ফলাফল বর্ণনা করেছেন অমিয়ভূষণ :

> "দেখা গিয়েছিল বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছে, প্রগতিবাদী এবং অপ্রগতিবাদী প্রযোজনায় কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, গীতিকার এবং নট নড়াচড়া করছেন। লক্ষ করা গেল এই আন্দোলনটার সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগ নেই। কেমন যেন আমদানি করা, উপর থেকে চাপানো। কবিরা কাল্পনিক যন্ত্রণায় পীড়িত, ঔপন্যাসিক এমন একদল পাত্র-পাত্রীকে টেনে আনছেন যাদের বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তার প্রয়োগক্ষেত্রের বাইরে খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং এক হাস্যকর পরিস্থিতিতে সুকান্তকে রবীন্দ্রনাথের চাইতে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা হল এবং এক ট্র্যাজেডির নির্মম মুহূর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জ্যোতিস্ককে কক্ষচ্যুত হতে দেখলাম।"[১]

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সচেতন লেখকমাত্রেই উপলব্ধি করেন এবং শিল্পীর 'কলাকৈবল্যতা'র দায় অথবা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ফুটে ওঠে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে। অমিয়ভূষণ মজুমদার কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসের কক্ষপথে সাহিত্যের আবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু সাহিত্যে রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি অসচেতন ছিলেন না, তার প্রমাণ তাঁর সাহিত্যকর্ম। মহৎ শিল্পী সমাজের প্রতি তাঁর দায়বোধকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। ফলে গল্পের অংশবিশেষ হিসেবেই রাজনৈতিক বিশ্বাসের পথ ধরে সংঘটিত বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি অংকন করেছেন লেখক। গল্পের রসাস্বাদনে কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটায় না এই সচেতনতা–

> "দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি, গৌরবময় সাহিত্য। কিন্তু যখনই জনগণ এগিয়ে এসে একধরনের ঐক্য সৃষ্টি করে তখনই এর সাহিত্যিক উপকরণগুলো একত্রিত হতে থাকে আর তারপরই রচিত হয় সুমহান সাহিত্য। আসুন এটা স্বীকার করে নিই, আমাদের মহৎ সাহিত্যের অভাব রয়েছে; এর কারণ এই নয় যে আমরা এটা পারি না, আসল কারণ হলো আমরা এমন কোনো বড়ো জাতি নই যে সাহিত্যে তার অনিবার্য প্রতিফলন পড়বেই পড়বে।"[২]

কিউবার মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক হোসে মার্তি ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সাহিত্যের রূপ স্বস্বন্ধে এমত পোষণ করেছেন। অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর লেখায় 'বড়ো জাতি' -র অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়েছেন 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে। 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' গল্পে 'সাম্যবাদী' হান জাতির চরমতম নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। হানরা সাম্যবাদী, সে সাম্যের বাণী 'সবার প্রতি অবিদ্বেষ'। কারণ বিদ্বেষ থেকেই জারিত হয় ভয়, হিংসা; অবিদ্বেষেই শুধু মানুষকে সবার সমান করে তুলতে পারে।সাম্যের এ বাণী সত্ত্বেও ভুল বিচারে থেনডুপকে পঁচিশ বছর জেলে কাটাতে হয়। থেনডুপের পূর্বপুরুষ রিম্পোচে আর গিয়াৎসো সাম্যের বাণী প্রচারের কারণে লামাদের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। বিদ্রোহী লামাকে সহায়তা করার অপরাধে সাম্যের ধারক হানদের হাতে প্রাণ দিতে হয় থেনডুপকে। সাম্যবাদ অর্থাৎ মার্কস-লেনিনবাদ সাধারণ মানুষকে সাম্যের শান্তি, আশ্রয় দিতে পারে না, মানবতা ভুলুণ্ঠিত হয়। অমিয়ভূষণের মন্তব্য:

> "...মার্কস-লেনিনবাদে আত্যন্তিক বিশ্বাস না রাখার কারণ এই যে ইতিহাসে তারা দেখেছে যে কোন মতবাদে আত্যন্তিক বিশ্বাসের ফলেই ক্রুসেড, জেহাদ, ইনকুইজিসান প্রভৃতি ঘটে থাকে যা সব চাইতে বেশী দগ্ধ করে মানবতাকে।"[৩]

মানবতাকে দগ্ধকারী রাজনৈতিক মতাদর্শকে মানতে নারাজ অমিয়ভূষণ। ফলে থেনডুপের পূর্বপুরুষকে লামারা হত্যা করে আবার লামাদের হত্যা করে হানরা। এই প্রক্রিয়ার রূপ এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে। বিপন্ন মানবতাকে সাহায্য করলেও দেশদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী হতে হয় থেনডুপকে :

> "এইমাত্র খবর পাওয়া গেলো উত্তর পাহাড়ের দিকে একজন বড়ো জাতের লামা পালিয়েছে।... সে দেশদ্রোহীও বটে। তাকে আশ্রয় দেওয়া বা পালাতে সাহায্য করা দেশদ্রোহের অপরাধ হবে।"[৪]

মানবতাবাদ এবং সাম্যবাদের মুখোমুখি অবস্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিকতার উপর তীব্র স্যাটায়ার ছুঁড়ে দেন অমিয়ভূষণ। থেনডুপ মানবতার কারণে নিহত হয়, তার স্ত্রী হয় ধর্ষিত। সমাজ, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনীতির দ্বিমুখীনতার প্রতি তীব্র কশাঘাত অমিয়ভূষণের 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া'।

'অ্যাভলনের সরাই' বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু জীবনের গল্প। গল্পকার উন্মূল এই মানুষদের আলেখ্য রচনার পাশাপাশি বৈশ্বিক রাজনীতির নির্মমতম রূপও তুলে ধরেছেন। 'অ্যাভলনের সরাই' গল্পে রাষ্টযন্ত্রসমূহ উদ্বাস্তুদের নিয়ে এক ধরনের বোঝাপড়ায় উপনীত হয় কিন্তু মানবিকতা নিয়ে চিন্তিত হয় না। সীমান্তে লাঞ্ছিত আর্তমানবতাকে নিয়েও রাজনৈতিক ও বণিকেরা নিজ উদ্দেশ্য হাসিল করে–

> "বেড়ার এপারে ওপারে, বেড়ার গায়ে অনেক মৃতদেহ-শিশু বৃদ্ধ যুবক এবং নারীরা জমা হয়।...এরকম সময়ে বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব– এমন সব শব্দ রয়টারের মতো সংবাদ-বণিকরা সংবাদে ব্যবহার করে।"[৫]

কাঁটাতারের এপার ওপারে রাজনৈতিক কারণে মানুষ খুনের যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, অমিয়ভূষণ উদ্বাস্তুদের মনোজগৎ উন্মোচনের পাশাপাশি সেই নষ্ট রাজনৈতিক মুখোশটিও ছিড়ে ফেলেন। সংবাদমাধ্যমের অসততা, রাষ্ট্রনায়কদের অঙ্গুলিহেলনে স্তুপাকার হয়ে ওঠা মৃতদেহ-এর সবই দেশভাগে আহত অমিয়ভূষণকে আহত করে। ফলে সংবাদ ব্যবসায়ী অথবা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনেতা সকলের প্রতিই কটাক্ষ হানেন গল্পকার।

'উরুণ্ডী' গল্পে সরকারের লোককে মেরে ফেরার হয় পুলিন। ঘটনা পরিক্রমায় এক উদ্বাস্তু দলের নেতৃত্ব এসে পড়ে তার কাঁধে। উদ্বাস্তু দলের বাইশ জন মানুষ উরুণ্ডীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ছয় মাস ধরে। উরুণ্ডীতে নির্বাচনের জোয়ারে গজু, ভাসান, শোভা চায় নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে। তারা কিছু টাকা, তিনটি তাঁত এর আর্জি পাঠাতে চায়। কিন্তু নির্বাচন কি সত্যিই সঠিক পথে হবে, নাকি এ কেবলই ফাঁদমাত্র এ ভাবনা তাদের সচকিত করে তোলে:

> "...এখন এই সমিস্যের কী করা? যে আসছে তার ট্যাকা আছে। কিন্তু চেনা নাই জানা নাই তার সামনে দাঁড়ালেই কি ট্যাকা দেবে? তা কেউ দেয়?
>
> – সুরেন যে বললো ইলেকশন, ভাসান বললো, ভাবো কি, ফাঁদ? কাঁচের গ্লাসে চা ঢেলে এগিয়ে দিতে দিতে গজু বললো, কিছু যদি নাই পাও, এই অবেলায় চা খাওয়া মন্দ কি?"[৬]

নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়া। ধনবাদী সামাজিক কাঠামোতে অর্থের দাপটে গণতন্ত্রের 'গণ' অংশ চাপা পড়ে যায়। ফলে সাধারণ মানুষও সুযোগসন্ধানী হয়ে ওঠে। ভোটের বিনিময়ে তারা চায় কর্মসংস্থানের যোগান। অথবা নির্বাচনী প্রার্থীদের আশ্বাস মিথ্যে হলেও নির্বাচনের ডামাডোলে বিনামূল্যে চা খাওয়াও উদ্বাস্তু দলের কাছে আরাধ্য হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের কাছে নির্বাচন, রাজনীতি, প্রার্থীতার এই অসাড়তা অমিয়ভূষণ মজুমদার দারুণভাবে তুলে ধরেছেন। নির্বাচনের ডামাডোলে উদ্বাস্তু মানুষের ভরসা ও ভয় দুইয়েরই প্রতীক হয়ে ওঠে রাজনীতি।

'পুকুরের মুক্তো' গল্পে মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণে চরকার তকলিতে সুতোকাটা এবং স্বদেশী আন্দোলনের চিত্র পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রবন্ধ পাঠ করে সুরমা আইচ চরকা ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু স্বদেশীদের সম্পর্কে তার মনোভাব 'স্বদেশী ডাকাত'। সুরমা উচ্চবিত্ত সমাজের সদস্য। তার অভিজাত 'প্রিভিলেজড বাবল'-এ (Privileged Bubble) স্বদেশী সমাজপরিবর্তন অন্বেষী মানুষের কর্মকাণ্ড নীতিগর্হিত বলে মনে হয়। স্বদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত উচ্চবর্গের স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধেই বিরূপ ভাবনার যোগান ছিল–

> "সুরমা বলল সে সম্ভবত এক স্বদেশী ডাকাত ছিল।
> কাসকেটটা কি লুটের মাল ছিল?
> লুটের হতে পারে, নিজের মায়ের বাক্স থেকে সরানোও হতে পারে। আসলে স্টেশনে অত পুলিশ দেখে ভড়কে গিয়ে ভেবেছিল, তার খোঁজেই পুলিশ। অথচ বলেছিল কাসকেটটার জন্য গুণ্ডারা তাড়া করেছে।"[৭]

'শহিদ' গল্পের শ্রী বিনোদলাল বাড়ই, শহিদ সুধীরলালের পিতা। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে প্রাণ হারায় সুধীর:

> "বিনোদলালের মেজো ছেলের নাম ছিল সুধীরলাল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তার বয়স ছিল ষোলো-সতেরো। ম্যাট্রিকে ফেল করেছিল বলে বিনোদলাল একদিন রাগারাগি করেছিল।...তারপর একদিন কী একটা কাজে খোঁজ করতে গিয়ে বিনোদলাল শুনল সে সদরে তার পিসির বাড়িতে গেছে। সেই পিসির বাড়ি থেকে ছেলে কোথায় কোনদিকে চলে গেল এই পাঁচ মিনিট আগেও বিনোদলাল জানত না। এখন সে নিশ্চিততম সংবাদ পেয়েছে। সেই ৪২ এ সদরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দপ্তর দখল করতে গিয়ে যে কয়েকটি তরুণ গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল সুধীরলাল তাদের অন্যতম। সুধীরলাল এবং সহমৃত অন্য কয়েকটি যুবকের প্রতিমূর্তি স্থাপনের উৎসব হচ্ছে তাতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে সে।"[৮]

সুধীরলাল প্রাণের ভয়ে ভীত হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতির আশাবাদে নিজের প্রাণদান করে। রাজনৈতিক ঘেরাটোপে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা ও স্বস্তিকে ব্যাহত করে রাজনীতিবিদরা নিজেদের ফায়দা হাসিল করেন। কিশোর সুধীর অথবা বৃদ্ধ বিনোদলাল হয়ে ওঠে রাজনীতির নির্মম শিকার।

ভারত ছাড় আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলেও সাধারণ মানুষ এর সুফল পায়নি। অমিয়ভূষণের কলমে এমনই বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত সুধীরলাল রাজনৈতিক বুলির মোহে ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর দখল করতে গিয়ে প্রাণ হারালেও শহিদের পিতার সম্মাননা লাভ করে রাজনৈতিক নেতা, তার চাচা গোবিন্দলাল।

'একটি বিপ্লবের মৃত্যু' গল্পে রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে অমিয়ভূষণের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'বিশের কোমলতার রেখা না পেরোনো' হিরন্ময় বিপ্লবী, আত্মগোপন করে আছে বনে। দুর্বল, অলস মুহূর্তে বিপ্লবের অসাড়তার কথা তার মনকে আবিষ্ট করে দেয়। আদর্শবাদ সত্ত্বেও বিপ্লবী দলনেতা নিরঞ্জনকে মরতে হয়েছিল নিজের দলের রাজনীতির মারপ্যাচে। মানুষের মৃত্যুর পরেও আদর্শবাদ থেকে যাওয়ার আশাকে হিরন্ময় প্রশ্নবিদ্ধ করে :

> "আদর্শ থেকে যাবে। তাই কি থাকে? যারা ফ্যাসিস্ট আদর্শে প্রাণ দিয়েছে? তাদের কাছে তাদের আদর্শ কি কম উজ্জ্বল ছিল? এখন কি সে আদর্শ ধিকৃত নয়। সব আদর্শের ব্যাপারেই কি এমন হতে পারে না? ক্রিশ্চানি ক্রুসেডে কত মৃত্যু ঘটে গেছে কিন্তু সে আদর্শ কি এখন পরিত্যক্ত নয়।"[৯]

অমিয়ভূষণের বক্তব্যের অনুরণনই ঘটেছে হিরন্ময়ের বক্তব্যে। সংঘাতের রাজনীতি

মানবতার কোনো অগ্রগতি সাধন করতে পারে না, মৃত্যুই সেখানে ছায়াপাত করে। 'আদর্শের' ছায়া বিলীন হয়ে যায়। অমিয়ভূষণের রাজনৈতিক সজ্ঞায় মানবতাবাদই প্রধান। মানবতার মৃত্যু যেখানে ঘটে তেমন রাজনীতি ও রাজনৈতিক সচেতনতাকে অমিয়ভূষণ মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেন না। অমিয়ভূষণ মজুমদার বাঙালির চিরন্তন বিদ্রোহের ঐতিহ্য লক্ষ করেছেন:

> "এ পোড়া বাংলাদেশে বিদ্রোহ চিরায়ত বলেই তাকে ব্রাত্য বলা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বেও দেখেছি কোন এক সদাগর দেবতার সঙ্গে সংঘর্ষে নেমেছে। শেষ পর্যন্ত যদি পূজো করে থাকে তবে তা বাঁ হাতে এবং হেন্তালের বাড়িতে তার কোমর ভেঙে দেয়ার পর।"[১০]

মিথ-পুরাণের ঐতিহ্যিক ধারাতেও বাঙালি চির বিদ্রোহী। চাঁদ সওদাগর ও দেবী মনসার দ্বৈরথে দৈবীশক্তি বলে মনসার জয় ঘটলেও চাঁদ সওদাগরের দ্রোহী মানসিকতাই প্রণিধানযোগ্য।

> "সারা পৃথিবী জুড়ে সেই একই বস্তাপচা চলচ্চিত্র, সেই বিরক্তিকর যন্ত্র, সেই প্লাস্টিক অথবা অ্যালুমিনিয়মের অত্যাচার, সেই একই ঘোরানো-প্যাচানো প্রচারণার ভাষা, ইত্যাদি। অন্যদিকে (উন্নয়নশীল দুনিয়ায়) অতীতের মাটিতে শেকড় গাড়তে চাইছে, উচুতে তুলে ধরছে জাতীয় সত্তাকে। খুলে দিতে চাইছে উপনিবেশবাদী ব্যক্তিত্বের অধ্যাত্মবাদী আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসী চেহারা। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় যদি অংশগ্রহন করতে হয়, তাহলে ওই একই সময়ে দরকার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী হওয়া। এ জন্যে প্রয়োজন সমস্ত বিশুদ্ধ আর সরল অতীতকে বর্জন করা।"[১১]

মার্কিন দার্শনিক পল রিকোয়ার ঔপনিবেশিকতায় বিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাদের উত্থানের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এরই সাথে রাজনীতি এবং যৌক্তিকতার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। অমিয়ভূষণের রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও একই ধারামুখী।

অমিয়ভূষণ বিদ্রোহ, সংগ্রাম, বিপ্লবকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু বিদ্রোহ, রাজনীতি ও শিল্পীর সত্তাকে পৃথক দেখতে চেয়েছেন। আমাদের দেশের চিন্তাশীল শ্রেণির 'সাবসিডিয়ারি এলায়েন্সে'[১২] আবদ্ধ হওয়াকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছেন গল্প

সমূহে বরাবরই। ফলে 'একটি মাঝারি মানুষের গল্প' গল্পে নির্বোধরাই দেশোদ্ধারে যায় আবার যারা এর সমালোচনা করে তারা নিজেরাই 'এসকেপিস্ট'। এই দু'ধরনের মানুষের কথাই সাহিত্যে উচ্চারণ করেছেন অমিয়ভূষণ। তাই অমিয়ভূষণ সাহিত্যের মাধ্যমেই 'রেসারেকশন' আশা করেন:

> "আশা রাখি আমাদের মধ্যে যদি হোমার বা ব্যাস নাও আসেন আর অর্থাৎ তেমন কোন সাহিত্য যদি সৃষ্টি না হয় যা হবে ইনটেলেক্ট এর শেষ আশ্রয়ের উইজডম আমাদের কেউ হয়তো ভলতেয়ার হতে পারে যে নিজের কাঁধে বয়ে একটা যুগকে মাতান্ধতার চার্চ থেকে প্রশস্ত সূর্যের আলোকে পৌঁছে দেবে।"[১৩]

সাহিত্যের প্রতি অমিয়ভূষণের এই আশাবাদ খানিকটা ইউটোপিয়ান মনে হলেও যুগবাস্তবতা সম্বন্ধে প্রখর ধারণা এবং রাজনীতি সচেতন মানুষের নবযুগের আকাঙ্ক্ষারই পরিচায়ক। অমিয়ভূষণ তাঁর গল্পে রাজনৈতিক মিথ্যাচার এবং ভ্রষ্টাচারের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বস্তুত, দেশভাগের ফলে অমিয়ভূষণের মনোজগতে সৃষ্ট তীব্র বেদনার্ততা রাজনৈতিক বুলির প্রতি গল্পকারের মনে বিরূপ বোধ তৈরি করেছিল। একইসাথে উচ্চবিত্তের রাজনীতি অসংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও নিশ্চিত জীবনযাপন এবং রাজনৈতিকতার প্রতি কটাক্ষও অমিয়ভূষণ সদর্থক বোধে গ্রহণ করতে পারেননি। মধ্যবিত্তের রাজনীতিচেতনা এবং দ্বিধাজর্জর এসকেপিস্ট মনকেও গল্পকার তীব্র কটাক্ষ করেছেন। বিপ্লবের প্রয়োজন নয় বরং জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের মাধ্যমে দেশমাতৃকার অন্ধকার দূর করতে চেয়েছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, 'সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪১৯

২. মাসুদুজ্জামান, রাষ্ট্র রাইফেল ও ব্যক্তিমানুষের বয়ান, প্রথম প্রকাশ, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৩

৩. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, 'সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব', অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪২১

৪. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘সাইমিয়া ক্যাসিয়া’, শ্রেষ্ঠগল্প, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, অক্টোবর-২০০০, পৃ. ১০০
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৬. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘উরুণ্ডী’, শ্রেষ্ঠগল্প, দে’জ পাবলিশিং, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
৭. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘পুকুরের মুক্তো’, শ্রেষ্ঠগল্প, দে’জ পাবলিশিং, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬
৮. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘শহিদ’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, ২য় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৪৯১
৯. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘একটি বিপ্লবের মৃত্যু’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, ৩য় খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৮৪
১০. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩
১১. মাসুদুজ্জামান, রাষ্ট্র রাইফেল ও ব্যক্তিমানুষের বয়ান, প্রথম প্রকাশ, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৩
১২. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, ‘সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব’, অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, ৪র্থ খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৪২০
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

সাঁওতালিভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে মহাকবি

সিদ্ধেশ্বর মুর্মু
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সাঁওতালি বিভাগ,
মহাত্মা গান্ধী কলেজ, লালপুর।

সারসংক্ষেপ

সাধু রামচাঁদ মুরমু ছিলেন সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য জগতের খ্যাতনামা অন্যতম এক মহান কবি। পশ্চিমবাংলার প্রান্তিক পরিবার থেকে উঠে আসা এই মহান কবি একাধারে ছিলেন সাধু, দার্শনিক, শিল্পী, প্রকৃতি প্রেমিক ও গবেষক। তাঁকে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের 'জাগরণ কবি' নামে আখ্যায়িত করা হয়। সাধু রামচাঁদ মুরমু ছিলেন সমাজ সংস্কারক, লিপি আবিষ্কারকও ছিলেন। তিনি কোলকাতার ভারতীয় সংগ্রহসালায় সংরক্ষিত মহোঞ্জোদাড়োর লিপি পড়তে পেরে ছিলেন। পরবর্তী কালে বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। সেই বররণমালাতেই তার সাহিত্য সম্ভার রচনা করে যান । তিনি যে সময়ে আর্বিভূত হয়েছিলেন সে সময় বহু শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রচুর আদিবাসী খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । মিশনারীগণ প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় মিশন স্থাপন করেন । তাই আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজেদের ধর্ম থাকলেও প্রসার ছিল না । তাই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন । সাঁওতালি সাহিত্য উন্নয়নের সূচনায় রোমান হরফে সাহিত্য রচনা করা হত। তাই বিদেশী মিশনারী সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন কিন্তু সাধু রামচাঁদ মুরমু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ না করে সারি ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর এই ধর্ম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বিস্তার লাভ করে। তিরিশ দশকের প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে সাধু রামচাঁদ মুরমু সাহিত্য রচনার জন্য রোমান লিপি ব্যবহার করেননি। ভাষাচার্য সুকুমার সেনের লিখেছিলেন যে–"ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ"। সেই অন্তরতম সত্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীর মতোই রঘুনাথ মুরমু, সারদাপ্রসাদ কিস্কু, ড: কৃষ্ণচন্দ্র টুডু, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে এবং সাধু রামচাঁদ মুরমু গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সাধু রামচাঁদ সহজ ও সরল ভাষায় শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত আদিবাসী ভাইদের প্রতি সহমর্মী হয়ে তাদের জীবনকথা আন্তরিক ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সূচক শব্দ

সাঁওতালি ভাষা, সাহিত্য, লিপি, সংস্কৃতি, যাত্রাপালা।

মূল আলোচনা

শিল্প সাংস্কৃতির প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর। জনজাতির সংস্কারক হিসাবে দক্ষ ছিলেন। গ্রামের নাচ ও গানের আসরে যোগ দিতেন নিয়মিত। ভাল বাঁশী ও গিটার বাজাতে পারতেন। এই সময় কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে। গান নিজেই লিখতেন রামচাঁদ মুরমু। সেইগান গিটার বাজিয়ে গ্রামের লোকজনকে শোনাতেন। সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমী লোকেরা সাধু রামচাঁদকে মহাকবি বা কবিগুরু হিসাবে উল্লেখ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সমস্তই রামচাঁদ মুরমুর মধ্যে বিরাজমান বলে তারা বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁকে কবিগুরুর সম্মান দেওয়া হয়। তখন বিট্রিশ সামাজ্যের সূর্য মধ্যগগনে বিরাজমান। সাঁওতালদের উপর চলছে অত্যাচার ও শোষণ। তাদের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে আদিবাসী ও খেরওয়ালদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য ব্রাহ্মণবাদের প্রচার চলছে। সামাজিক হেনস্থারও শিকার হতে হচ্ছে। দোকানে আদিবাসী ক্রেতাকে জিনিস দিতে চাইত না। কোনো দোকানে খাবার খেলে পাত্র ধুঁয়ে দিতে হত। হিন্দু বাড়িতে ঢুকলে গোবর জলে পুরো জায়গা ধুয়ে দেওয়া হত।

সাঁওতালদের মধ্যে নানা কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও অনাচার ছিল। তারা বিপথে চালিত হচ্ছিল। সমস্যার অন্য বৃহত্তর রূপও ছিল। সেটা ধর্মান্তরকরণ। একদিকে হিন্দুত্বকরণ আরেকদিকে মিশনারীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দান। রামচাঁদ সাঁওতালদের সনাতন ধর্মের অর্থাৎ সারি ধর্মের প্রচার শুরু করলেন। তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ যখন তার সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতিও নিজে পালন করার মতো কিছু পায়

না, তখন অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই পরিস্থিতি নিয়েও লেখা শুরু করলেন রামচাঁদ মুরমু, তাঁর কবিতা গানে এল প্রতিবাদের সুর। সাঁওতালদের মধ্যে তখন লেখাপড়ার অত চল ছিল না। রামচাঁদের মনে হল ধর্মের মূলকথা ছড়িয়ে গানই হল গ্রহণযোগ্য মাধ্যম। লিখলেন সারি ধরম সেরেঞচ পুথি। তার লেখা গান 'এসো জাগি আধিবাসী বীর' ভারতবর্ষের পশ্চিমবাংলা ছাড়াও বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, আসামে সাঁওটালদের মধ্যে এখনো জনপ্রিয়।

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক সুন্দরবন দেশারৎ কলেজে অধ্যাপনা কালে কয়েক জন সাঁওতাল ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের দেওয়া সাঁওতালি পত্রিকা পড়েন। তিনি সাঁওতাল সাহিত্য উন্নয়নের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সাঁওতালদের নিয়ে শুরু হয় তার নতুন যাত্রাপালা। তিনি সুন্দরবনের এই কলেজের ছাত্রছাত্রী নিয়ে দ্বিভাষিক (বাংলা ও সাঁওতালি) দেওয়াল পত্রিকা বের করেন। নাম দেন 'সবুজপত্র'। 1963 সালে প্রকাশিত হয়। বেশ কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষর পরামর্শে দেওয়াল পত্রিকাটি সাহিত্য পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয় ।

সাঁওতালি সাহিত্যের বিকাশে বেদান্ত প্রেসের পরই মারাং বুরু প্রেসের নাম স্বাভাবিক ভাবে আসে। ডঃ ভৌমিকের তত্ত্বাবধানে ও আর্থিক সহযোগিতায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। 1972 সালে প্রকাশিত সাধু রামচাঁদ মুরমু 'লিটো গডেৎ' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এর অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশিত হয় 2012 সালে। সাধু রামচাঁদ বাংলা অনুবাদসহ দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রকাশিত হয় সাঁওতাল সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে পদ্যে-গদ্যে লেখা গ্রন্থ মহাকাব্যর এই গান ভারতবর্ষের বাইরে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, আমেরিকা, মরিসাস, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে এই গান বিস্তার লাভ করে ।

ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া কোনও জাতির বিকাশ সম্ভব নয়, তা সাঁওতাল জাতি গোষ্ঠীর মানুষ বুঝতে পারে। তাই সাঁওতাল গবেষকেরা সাহিত্য চর্চায় নির্ভীক ভাবে মনোযোগী হন। জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষাসচেতন ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন হয়। আর সেই শিক্ষা দিতে হবে মাতৃভাষায়। যে জন্য তিনি সাঁওতালি

ভাষায় নিজস্ব লিপি তৈরী করেছিলেন। পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমুও সাঁওতালি বর্ণমালা তৈরি করেন। কিন্তু রামচাঁদের বর্ণমালা তেমন পরিচিতি পায়নি। অর্থাভাবে রামচাঁদ লিপি তৈরি করে প্রচার করতে পারেননি। রামচাঁদের প্রথম গ্রন্থ ঐ লিপিতেই মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটির অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি তার বাসভবনে রেখে গেছেন ।

সাধু রামচাঁদ মুরমুকে মহাকবি বলা হয় । তার একটা কারণ হল তিনি অসম্ভকে সম্ভব করেছিলেন। সাঁওতালি ভাষা এক প্রাচীন ভাষা হিসাবে বিবেচিত। সেই ভাষায় কবিতা লেখা হয়। ছন্দ অলঙ্কার সহযোগে রস-সম্পৃক্ত রূপে রচিত হওয়ায় সাঁওতালি কবিতা সাঁওতালি সমাজে সাদরে গৃহীত হয়। জীবৎকালে সাধু রামচাঁদ মুরমুর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালে অনেক বই প্রকাশিত হয়। সাধু রামচাঁদ মুরমু স্মৃতি রক্ষা কমিটি এবং মারাং বুরু প্রেস সাঁওতালি সাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করে।

সেকালে যাত্রাপালা জনজাগরণের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। সাধু রামচাঁদ মুরমু আদিবাসী যাত্রাপালার দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট করেন। তাই তিনি নিজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যাত্রাপালা লেখেন ও নিজে যাত্রাপালার সাথে যুক্ত ছিলেন। সাঁওতাল আদিবাসীরা অশিক্ষিত তাই পড়াশুনার ধারেপাশে আসেনি। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে যাত্রা অভিনয় দিয়ে মানুষকে সচেতন করা যাবে। তিনি এক যাত্রাপালা লেখেন যার নাম হল "সংসার কেন্দ্র"। প্রখ্যাত গবেষক সুহৃদ কুমার ভৌমিক তার মারাং বুরু প্রেম থেকে যাত্রাপালাটি প্রকাশ করেন। সাধু রামচাঁদ মুরমুর দুটোই ধর্মীয় গানের সংকলন। 1997 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর মহাকবির জন্ম শতবার্ষীকিতে 'সাধু রামচাঁদ অনলমালা' প্রকাশ করে। এটি কবির রচনা সমগ্র।

রামচাঁদ নামের আগে কেন সাধু বিশেষণ ? এর সঠিক কারণ এখনো জানা যায় নি। তবে কবির সহযোগীদের মধ্যে অনেকে বলেন, বৃদ্ধ বয়সে সংসার ধর্ম ত্যাগ করে প্রকৃতি প্রেমিক হয়ে পড়েন। তাই কোলাহল থেকে দূরে প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্জনে কুঁড়ে ঘর বানিয়ে তাতে একাকী দিন যাপন শুরু করেন। তার জীবনের শেষ পর্বে সাত্ত্বিক জীবন-যাপনের জন্য তাঁর নামের আগে "সাধু" শব্দের ব্যবহার হয়ে

আসছে। কবি একাধারে সাধু, দার্শনিক, শিল্পী, প্রকৃতিপ্রেমিক ও সমাজ সেবক ।

তিনি সাঁওতাল সমাজকে বাঁচানোর জন্য লেখেন– "চিনতে যদি পারো নিজের ভাষা ধর্ম সমাজ তবে বেঁচে থাকবে আদিবাসী সমাজ"। সাঁওতাল সমাজ ও শোমাজোটাট্টীক গোবেষকেরা রামচাঁদের অবদান মূল্যায়ন প্রয়াস পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালের ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পরিমল হেমব্রম, সুহৃদ কুমার ভৌমিক ও কৃষ্ণচন্দ্র টুডু, মহাদেব হাঁসদা, কালেন্দ্রনাথ মান্ডি, নিচাস চেকসি তারা গভীর ভাবে রামচাঁদ মুরমুর অবদান মূল্যায়ন করেছেন। জানাম রড (সাঁওতাল ভাষা) মাতৃভাষা সবাই ভালবাসেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন- মাতৃভাষা হল মাতৃদুগ্ধের সমান। তাই এখন আমরা বুজতে পারছি সাঁওতাল ভাষা ছাড়া সাঁওতাল জাতিকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। সাম্প্রতিক কালে ঝাড়গ্রাম জেলায় তার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়।

উপসংহার : 1955 সালে এই মহান মনীষীর জীবনাবসান ঘটে। বাংলা সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, তেমনি, সাঁওতালি সাহিত্যে অবদানের জন্য পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু ও কবি সাধু রামচাঁদ মুরমুর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সাঁওতালি ভাষার কাব্যকে ছন্দ, অলংকারে মণ্ডিত করে এমন রস সম্পৃক্ত করে তুলেছেন, যে তাতে এসে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। কবিতার ভাব-ভাষা ও গঠনকৌশলের দিক দিয়েও সাধু রামচাঁদ মুরমু আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিধাহীব চিত্তে এ কথা স্বীকার করতেই হবে সাঁওতাল কাব্যসাহিত্যে সাধু রামচাঁদ একটি মাইলস্টোন।

গ্রন্থসূত্র / সহায়ক গ্রন্থ : লেখক, পাবলিস্‌ার, সাল

১। সাঁওতাল সাহিত্যের ইতিহাস- পরিমল হেমব্রম নির্মল বুক এজেন্সী, ২০০৮।

২। সাঁওতাল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়---পরিমল হেমব্রম , পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন নিগম, ২০০৬।

৩। হিতাল – দুর্গাচরণ মুরমু, আদিম পাবলিকেশন,২০০৪।

৪। জাহের বগাঁ গান্তাড় কো– বানেশ্বর মুরমু, আদিম পাবলিকেশন,২০১০।

৫। আপাসুলঃ সাঁদেশ- সঞ্জয় সরেন (২০১৭)।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

হিড়বাঁধ পরিমণ্ডলে লৌকিক দেবদেবী : এক অনালোচিত অধ্যায়

সুমিত মহন্ত
বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বাঁকুড়ার গ্রাম জীবনে ছড়িয়ে রয়েছে প্রভূত অনার্য সংস্কৃতি। দক্ষিণ বাঁকুড়ার হিড়বাঁধ ব্লকে অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদিবাসীর জনজাতির আবাসস্থল। তাদের বিচিত্র লৌকিক দেবদেবী বৈচিত্র্যময় লোকাচার নিয়ে আজও সগর্বে পূজিত। বিচিত্র তাদের নামধাম, বিচিত্র লোকপুরাণে তারা জনমানসে আজও সঞ্জীবিত। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কাছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বৃক্ষের তলায় আজও লোকদেবতারা প্রাচীন ভারতের বৈদিক আচার বিহীন পুরাতন পদ্ধতিতে পূজিত হন। অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনের বিবিধ ছবি লৌকিক দেবদেবীর পূজা রীতিগুলিতে প্রতিভাত হয়েছে। প্রকৃতি পূজার আদি রূপটি এই এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের পূজা পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়েছে।

সূচক শব্দ

লৌকিক দেবতার স্বরূপ – হিড়বাঁধ ব্লক- বিচিত্র লৌকিক দেবদেবী- শীতলা চণ্ডী- ভান সিং-অন্যান্য লৌকিক দেবতা- উপসংহার ।

মূল আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় জেলা হল বাঁকুড়া। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার অন্তর্গত হিড়বাঁধ ব্লকটি রুক্ষ, শুষ্ক ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার বুকে শাল, পিয়াল, পলাশ, চন্দন গাছের সমারোহে গঠিত। এই ব্লক বাঁকুড়া শহর থেকে দক্ষিণে ৪৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার জন্ম হয়। তার

পূর্বে জঙ্গলমহল জেলার সুপুর পরগনার অন্তর্গত ছিল হিড়বাঁধ ব্লক। (মাহাত ও বিশ্বাস, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৮)[১] পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত হিড়বাঁধ ব্লকের নামকরণের মধ্যে অস্ট্রিক ভাষার ছাপ রয়েছে। বাঁকড়ি ভাষায় 'হিড়' শব্দের অর্থ হল চাষ যোগ্য বড় উর্বর জমি। সাঁওতালি ভাষায় হিড় শব্দের অর্থ হল বাঁধানো বা প্রতিরোধ করা। বাঁধ শব্দের অর্থ পুকুর। হিড়বাঁধ গ্রামে প্রায় ৫-৬ খানা পুকুর রয়েছে। হিড়বাঁধ গ্রামের অবস্থান উচ্চভূমিতে। অতএব পুকুর বেষ্টিত চাষ যোগ্য উচ্চভূমিকে হিড়বাঁধ নামকরণ করা হয়তো অযৌক্তিক নাও হতে পারে। ডালটন ও রিসলের মতে এই এলাকার প্রাচীন ও প্রধান বাসিন্দা ভূমিজ সম্প্রদায়। সাঁওতালরা এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। (ভট্টাচার্য, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২২৩)[২] বাউরী গোষ্ঠী এই অঞ্চলের বৃহত্তম গোষ্ঠী। এছাড়া শুঁড়ি, হাড়ি, ডোম, গোয়ালা, ময়রা, কামার, কুমার প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের বাসস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের জনজীবন কে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিচিত্র লোকাচার ও জন্ম নিয়েছে বিচিত্র লোক দেবদেবীর। অনুমান করা যায় গ্রাম্য দেব দেবীর সৃষ্টির ঊষাকাল হল নব্য প্রস্তর যুগ (নিওলিথিক পিরিয়ড – খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০- ৭০০০ অব্দ)। এই নব্য প্রস্তর যুগে কৃষির আবিষ্কার ও প্রচলন নারী সমাজের দ্বারা; ফলে একাধারে নারীসমাজ কৃষির ফলন উৎপাদন এবং সন্তান জন্মদিন ও লালনপালন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকার কারণে সমাজে ও পরিবারে স্বতন্ত্র মর্যাদা, বিশেষ মান্যতা, একটা উচ্চ বর্গিয় স্ট্যাটাস অর্জন করেছিল। এছাড়া 'সর্বপ্রাণবাদ' (অ্যানিমিজম) অর্থাৎ সকল অচেতন-চেতন বস্তুতে প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা, ক্রমান্বয়ে পুষ্ট হয়ে ধর্মসংক্রান্ত ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, সেই ধূসর অতীত কালের ধারনা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যায়নি। সেই আদিমকালের ধ্যান- ধারণাই যুগের সাথে সাযুজ্য রেখে রূপান্তরিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রামদেবতার। (কর, ১৪২৮, পৃষ্ঠা- ৬)[৩] হিড়বাঁধ ব্লকের লৌকিক দেব দেবী সম্পর্কে নিম্নে নিম্নে আলোচিত হল।

শীতলা চণ্ডী : সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬৬ টি রকমের চণ্ডীর নাম পেয়েছেন স্বনাম ধন্য প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা।(কামিল্যা, ২০২০, পৃষ্ঠা - ১৯০)[৪]

কিন্তু কোথাও শীতলা চণ্ডীর উল্লেখ নেই। আমরা তার সন্ধান পেলাম হিড়বাঁধ ব্লকের তিলাবনী **(J.L.No. – 072)** গ্রামে। বাঁকুড়া জেলার বিবিধ নামের চণ্ডীর নাম পাওয়া যায় যেমন- আটবাই চণ্ডী, বসনচণ্ডী, নাচনচণ্ডী, ঝগড়াই চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। এর মধ্যে হিড়বাঁধ ব্লকের মলিয়ান গ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়। চণ্ডীর উল্লেখ কোন বৈদিক সংহিতায় বা মহাকাব্যে নেই, শুধুমাত্র কয়েকটি অর্বাচীন উপপুরাণে ছাড়া। তাই এই দেবীর জন্ম যে অনার্য জাতি থেকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চণ্ডী শব্দটি অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষা থেকে সংস্কৃতে এসেছে বলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন। ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতির পূজিত চাণ্ডী থেকে থেকে বাংলাদেশে চণ্ডী পূজার উদ্ভব বলে তাঁর অনুমান। (ভট্টাচার্য, ১৩৮১, পৃষ্ঠা- ৩৪৬-৩৪৭)[৫] আলোচ্য লৌকিক দেবীকে তিলাবনী মৌজার বাউরী জাতিরা চার পুরুষের বেশী সময় ধরে পূজা করে আসছে। এই মৌজার গড়া নামে এক গ্রামের প্রবেশের মুখে প্রাচীন দীর্ঘ কুসুম গাছের তলায় অজস্র ছোট- বড় পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়া দেবী চণ্ডী রূপে পূজিত হন। গ্রামের লোকে বলে শীতলা-চণ্ডী। শীতলা দেবী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিষ-চিকিৎসা প্রকরণে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও রোগ প্রশমন করে বলে শীতলা দেবীর উল্লেখ আছে। এই দেবীর পূজা শুধুমাত্র বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের বহু স্থানে এই শ্রেণির দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। (ভট্টাচার্য, ১৩৮১, পৃষ্ঠা – ৭১৭)[৬] সমীক্ষা থেকে জানতে পারা যায় যে, কলেরা, পক্স, বসন্ত রোগের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দেবীর আরাধনা করা হত সুদূর অতীতে। তাই শীতলা দেবী নাম হয়ত। আবার দেবী চণ্ডীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ছাপ ফেলেছে বলে এখানে ব্রাহ্মণ ও বাউরী একসাথে পূজা করেন।অধিকাংশ সময়ে পঞ্চ উপাচারে ধূপ, জল, চাল, চিড়ে, মিষ্টি প্রভৃতি সহযোগে আবার কখনো দশম উপচারেও চণ্ডী পূজা সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণপ্রথমে যজ্ঞ করে। তারপর বাউরী পুরোহিত ছাগল বলি দেয়। আসলে সময়কালের প্রবাহ-ধারায় গ্রাম-দেবী তথা লৌকিক দেবী চণ্ডীর পূজার্চনা- বিধি প্রভৃতির সঙ্গে পৌরাণিক মাতৃকা পূজার্চনা রীতি-পদ্ধতির মিথস্ক্রিয়া বা অভিযোজন এবং সংশ্লেষ ঘটেছে। (মান্না, ২০০৭ পৃষ্ঠা- ২৬)[৭]এই গ্রামে তার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রধান পূজারী

মধু বাউরী জানান যে, তার পূর্বপুরুষরা যখন পূজা করতেন তখন তাদের ভরণ আসত। ভরণ এলে তারা চণ্ডীর থান থেকে খানা পাহাড় পর্যন্ত ছুটে যেত। ঐ খানা পাহাড় হল ভোজদার ডুংরি যেখানে সুঁদ বা সুড়ঙ্গ ছিল। যে সুড়ঙ্গে ছিল বাঘের বসবাস। পূজার সময় তারা সুড়ঙ্গে গিয়ে আবার চণ্ডীর থানে ফিরে আসত। সম্ভবত তারা সুড়ঙ্গে পূজা করত। পুরাকালে বাঘের মত হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য চণ্ডীর মতো মাতৃকা দেবীর পূজা-অর্চনা করা হত। এমনকি পশু পূজা করা হত। চণ্ডীথানে হাতি-ঘোড়া গুলি তার প্রমাণ। পূজা হয় এখ্যান দিনে। চার পুরুষ আগে পূজার সূচনা রাখাল বাউরী প্রথম করলেও পূজা শুরু তার বহু শতাব্দী আগে থেকে বলে আমাদের ধারণা। তারা পিতৃ দত্ত মন্ত্রে পূজা করতেন। তারা কবিরাজি করেন।

তারা লাল কালিতে লেখা সাগরি মন্ত্রে, রামসার, বগিসার এই তিন মন্ত্রের দ্বারা পূজা করেন। যে মন্ত্রে তারা পূজা করেন, সেই মন্ত্রে তারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করেন। যেমন সাগরি মন্ত্রে তারা পক্স চিকিৎসা করেন। কিন্তু মন্ত্র গুলি রুগীকে সাহস ও শক্তি দেয়। বিশ্বাস জাগায় মনে। তাদের আরোগ্য করে তোলে খাবার ঔষধ রূপে দেওয়া আদার রস ও মকরের ধ্বজ। এতে বৌদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্রের অবশিষ্ট রূপ বলে যেমন অনুমান করা যায় তেমন বাউরী সম্প্রদায়ের আদিতম শাস্ত্র পাঠের দিকটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধু বাউরী ও তার পূর্ব পুরুষরা মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ করে মনসা জাত গাইতেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘ পদ্মাপুরাণ’, দ্বিজ বংশীদাস ও দ্বিজ রাধানাথের ‘পদ্মাপুরাণ’ প্রভৃতি মনসামঙ্গল কাব্য তারা পাঠ করে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ক্ষেত্র-সমীক্ষার দ্বারা জানা যায় এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘পদ্মাপুরাণ’ সমাদৃত ও অজস্র মানুষ পাঠ করে থাকেন। তবে তার কোন প্রাচীন পুঁথি এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

ভান সিং : হিড়বাঁধ ব্লকের অন্তর্গত আমঝুরি **(J.L.No- 056)** গ্রামে প্রতি বছর মাঘের ১০ তারিখে ভান সিং পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। ভান সিং হলেন ভূমিজদের আরাধ্য লোকদেবতা। পুরুলিয়া জেলায় লোকপ্রিয় দেবতা হল ভান সিং। বাঁকুড়া জেলায় যে চারটি ব্লকে ভান সিং লোকদেবতার সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে

হিড়বাঁধ ব্লকের আমঝুরি অন্যতম, বাকি তিনটি ব্লক হল ইঁদপুর, ছাতনা ও রাণিবাঁধ। আমরা পাঞ্জাবের বীর ভান সিং-এর কথা সকলে জানি। এখানে 'ভান সিং' শব্দের প্রকৃত রূপ ভানু সিংহ। ভানু মানে সূর্য। আবার মানভূম অঞ্চলের রাজারা 'সিংহ' উপাধি নিয়েছেন। ঠাকুর দেবতার ক্ষেত্রে হয়ত তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। (কামিল্যা, ২০২০, পৃষ্ঠা- ১১১)[৮] অতএব ভান সিং লৌকিক সূর্য। জৈন ধর্মে সূর্য পূজার প্রচলন ছিল। এই ব্লকে অজস্র জৈন মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুমান করা যায় জৈন ধর্মের প্রভাবে এই এলাকার ভূমিজরা সূর্য দেবের আঞ্চলিক রুপায়ন ঘটিয়ে ভান সিং রূপে পূজা করছে। (লোকশ্রুতি ২০১৭,পৃষ্ঠা- ৩১)[৯] এই গ্রামে আবিষ্কৃত ১৮৩৫ সালের দলিল প্রমাণ করে পূর্বে এই এলাকায় এক বৃহৎ ভূমিজ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বিস্তর জমির মালিক ছিলেন এই ভূমিজ জাতি। বাঁকুড়া জেলায় তাই এদের জমিদার বলা হয়। তীব্র অর্থনৈতিক অভাব, খরা ও দুর্ভিক্ষে এদের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। অসহনীয় দৈন্যতার দায়ে তারা এই জমিজমা জলের দরে বিক্রি করেন উড়িষ্যা থেকে আগত উৎকল সম্প্রদায়কে। আমঝুরি গ্রামে ছিল শাল, বট আর আম গাছের জঙ্গল। আমঝুরি গ্রামের নামের মধ্যে সেই আম গাছের জঙ্গলের ইঙ্গিত রয়েছে। এই গ্রামের আদি বাসিন্দা ভূমিজ, এছাড়া ডোম ও মুসলিম জাতির মানুষ বাস করে। তবে সেই বন্য পরিবেশে এই গ্রামের ভূমিজ কন্যাদের সুপাত্র ছিল অপ্রতুল। তাই ভূমিজ জমিদাররা স্থির করলেন এক মেলার আয়োজন করা হবে। সেই মেলায় আগত কুটুম্ব দের সঙ্গে ভূমিজ কন্যাকে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া হবে। ভূমিজদের কন্যাপণ লাগে না বরং পাত্র পক্ষকে পাত্রীর পিতাকে অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে হয়। এই ধরনের মেলাকেন্দ্রিক বিবাহ বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে আদিবাসীদের মধ্যে। ভূমিজরা মধ্য যুগে শৌর্য বীর্যে গৌরবান্বিত জাতি ছিল। চুয়ার বিদ্রোহে এদের অবদান বিপুল। ভান সিং নামের মধ্যে সেই শক্তিমান পুরুষের আভাষ আমরা খুঁজে পায়। ভান সিং মেলাটি প্রায় ২০০ বছরের অধিক প্রাচীন। ভান সিং পূজায় আমরা বীরত্বের নিদর্শন পেয়েছি। ভান সিং হলেন বৃক্ষের তলায় উঁচু বেদী করে পোড়া মাটীর হাতি ঘোড়া। এই দেবতার সামনে যে কোন সাধারণ নারী বা পুরুষ ফুটন্ত ঘিয়ের মধ্যে পিঠে ছ্যাঁকা

নিতে পারে। দেবতার সামনে কখনো কোন ভক্তের ক্ষতি হয় না। এছাড়া এই দেবতা গ্রামের মধ্যে কলেরা, বসন্তরোগ প্রভৃতি রোগ থেকে মানুষকে আরোগ্য করে তুলে বলে স্থানীয় গ্রামবাসীদের ধারনা। পূজাতে পায়রা বলি দেওয়া হয়। কিছু বছর পূর্বে এই মেলায় ঝুমুর গীত, বালিকা সঙ্গীত, ছৌ নৃত্য প্রভৃতি হত।

ক্যাঁদতলা : এই ব্লকের শিলাবতী নদীর দক্ষিণে মলিয়ান অঞ্চলের অন্তর্গত খয়ের কুন্দি (J.L.NO- 19) গ্রামের প্রধান গ্রামদেবতা হল ক্যাঁদতলা। নামের মধ্যে বৃক্ষ পূজার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পূর্বে ক্যাঁদ গাছের তলায় পোড়া মাটির হাতি ঘোড়ার প্রতীক রূপে পূজা করা হত। এখন অশ্বত্থ গাছের তলায় পূজা করেন ভূমিজ সম্প্রদায়ের পুরোহিত যাদের 'লায়া' বলা হয়। পূজা হয় ১লা মাঘ। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ মানদ থাকলে দণ্ডী দেয়। বলি হয় – মুরগি, পায়রা, শূকর স্থানীয় ভাষায় যাকে 'বরা' বলে। মহামারী, কলেরা প্রভৃতি রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই দেবীর আরাধনা করা হয়। গ্রামের রক্ষাকারী দেবতা রূপে পূজিত হন ক্যাঁদতলা।

বাহাদুর : মলিয়ান গ্রামে (J.L.No- 023) ধীবর পরিবারের দ্বারা পূজিত পুরুষ দেবতা হল বাহাদুর। নিম গাছের তলায় মাটির বেদীতে পোড়া মাটির হাতি ঘোড়া ও এক জোড়া কাঠের খড়মকে প্রতীক রূপে পূজা করা হয়। পূজা করেন ধীবর পুরোহিত। পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। কোন মন্ত্র নেই। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বাহাদুর বহুরূপী দেবতা। তার গায়ে লোম আছে। শুধুমাত্র অব্রাহ্মণ পুরুষরা পূজা করে। নারীদের পূজা- অর্চনার কোন অধিকার নেই। পূজার নৈবেদ্য হল- ফল, চিড়ে, খিচুড়ি, মনুই, গুড় প্রভৃতি। এই দেবতার জন্য মলিয়ান গ্রামের বৈদ্যরা ধীবরদের ভূমিদান করেছেন। বর্তমান পূজারি শ্যামাপদ ধীবর জানান যে তার পূর্ব পুরুষরা কবিরাজি করতেন বিশেষত স্ত্রীরোগসংক্রান্ত। তারা সারাবলি ও মহাভারত পুঁথি পাঠ করতেন। বাহাদুর নামক এই লৌকিক দেবতার সঙ্গে সন্ন্যাসী ঠাকুরের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। তবে অন্যান্য সন্ন্যাসী দেবতার মত থানে ত্রিশূল বা পৈতা নেই। পুরোহিত জানান দেবতাকে কোন ব্রাহ্মণ সাধন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পূজা প্রকরণ, দেবতার স্বরূপ এই সবকিছুই ইঙ্গিত দেয় যে বাহাদুর আসলে এক

ধরনের সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রকারভেদ। প্রজননবাদ ও প্রাচীন যাদু বিশ্বাসের সঙ্গে এই দেবতার সংযোগ রয়েছে।

কুমার‍্যা : কুমার জাতির গ্রামদেবতা হল কুমার‍্যা । মলিয়ান গ্রামের শিলাবতি নদীর দক্ষিণ তীরে ১০০ মিটার দূরে কুমার‍্যা থান অবস্থিত। পাশে রয়েছে মলিয়ানের গ্রামদেবতা গেরাম থান। শেওড়া গাছের তলায় এই দেবী কুমারদের স্বহস্তে নির্মিত পোড়া মাটির হাতি ঘোড়ার প্রতীকে পূজিত হন। ১লা মাঘ এখ্যান সংক্রান্তিতে পূজা হয়। কোন বলি নেই। পূজা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈদিক আচার বহির্ভূত। শেওড়া গাছের প্রতীকে বাংলাদেশে বনদুর্গা পূজিত হন এবং নিম বাংলায় বউ ঠাকুরানী। (ভৌমিক, ১৪২৮, পৃষ্ঠা- ৩৯)[১০] এখানে শ্যাওড়া গাছ কুমার জাতির আরাধ্য দেবী কুমার‍্যা রূপে পূজিত হন। পূজার দিন ডালা ভর্তি হলুদ মুড়ি পরিবেশন করা হয়।

তারাসিনি : এই ব্লকের মশিয়াড়া অঞ্চলের বিরাডি গ্রামের (J.L.No-039) শাল গাছের নিম্নে পূজিত হন তারাসিনি নামক ভূমিজদের গ্রামদেবতা। পুরোহিত হলেন ভূমিজদের দেঘরিয়া। নাম থেকে বৌদ্ধতন্ত্রের মহাচীনতারা দেবীর সাথে মিল পাওয়া যায়। পোড়া মাটির হাতি ঘোড়া প্রতীক রূপে পূজিত হন। এই পূজায় স্ত্রী জাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। পূজা হয় ১লা মাঘ ও আষাঢ় মাসের ১লা তারিখে। চিড়ে, গুড়, ফল- মূল প্রভৃতি নৈবেদ্য সহযোগে পূজা হয়। ভেড়া ও ছাগল বলি হয়। এই দেবস্থানে বলি দেওয়ার রীতি স্বতন্ত্র। দেবতার সামনে ফুল রেখে ভেড়া ছেড়ে দেওয়া হয়, ঐ ফুল যদি সে খায় তবে তাকে বলি দেওয়া হয়। ফুল না খেলে পশুটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পূর্বপুরুষ প্রদত্ত ধ্যান মন্ত্র শুনে মনে রেখে দেঘরিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। লিখিত কোন মন্ত্র নেই। পূজার সময় ভরণ আসে দেঘরিয়ার।

বাঁশরাণী : বাঁশরাণী হল বিরাডি গ্রামের অন্যতম গ্রামদেবতা। দেঘরিয়া প্রথমে এই গ্রামের গেরাম থান তারপর বাঁশরাণী পূজা করেন। নাম থেকে অনুমান করা যায় এটি বৃক্ষ পূজার অবশেষ। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে পৌষ মাসে বাস্তু দেবতার প্রতীক রূপে পূজা করা হয় বাঁশ গাছকে। (ভৌমিক, ১৪২৮, পৃষ্ঠা- ৪৬)[১১] ভারতবর্ষে বাঁশ গাছের ধর্মীয় মর্যাদা রয়েছে। সমীক্ষা থেকে জানতে পারা যায় যে মধ্যযুগে বহিঃশত্রু আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধবলভূমের রাজা খাতড়ার খড়বন এলাকায় চারপাশে বাঁশগাছ লাগিয়েছিলেন। অতএব নগর সভ্যতার

রক্ষক রূপেও বাঁশ গাছ লাগানোর রীতি ছিল সে যুগে। তারা সিনির মতো এখানেও একই পদ্ধতিতে পূজা রীতি। তবে স্ত্রী- পুরুষ যে কোন লিঙ্গের মানুষ পূজায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। বিশেষত বিভিন্ন স্ত্রী-রোগ, সন্তান-সন্ততি লাভের জন্য এই দেবীর আরাধনা করা হয়। প্রজননবাদের সঙ্গে এই লোকদেবীর যোগ রয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

বসন্তকুমারী : বহড়ামুড়ি অঞ্চলের বেঞ্জটাবনী গ্রামে বসন্তকুমারীর পূজা হয়। প্রথমে এই দেবীর নাম ছিল শীতলা, পরে বসন্ত রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য এর নাম হয় বসন্ত কুমারী। এখ্যান সংক্রান্তির দিন পূজা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করেন দেবী দুর্গার ধ্যান মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে। পাঁঠা বলি হয়। বসন্ত কুমারী আসলে একটি ভগ্ন প্রায় জৈন তীর্থঙ্করের দণ্ডায়মান মূর্তি। দ্বিখণ্ডিত মূর্তিটির লাঞ্ছন চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যায় না বলে এটি কোন তীর্থঙ্করের মূর্তি তা অনুমান করা খুব মুশকিল। রোগ দূরীকরণ এবং ফসল উৎপাদনের ভাবনাকে মাথায় রেখে এই লৌকিক দেবীর জন্ম। অতএব এই দেবী উর্বরতাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

ঝরিয়াকোচা : মলিয়ান অঞ্চলের ঝরিয়াকচা (J.L.NO- 014) গ্রামের প্রবেশ মুখে একটি গাছ তলায় পূজিত হন গ্রামদেবী পার্বতী। বছরে তিনবার পূজা হয়। আষাঢ় এবং মাঘ মাসে দুবার এই পূজা সম্পন্ন হয়। পূজারী বৈদিক ব্রাহ্মণ শর্মা পদবীর। শর্মা ও স্বামীকে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলা হয়। এর মধ্যে স্বামী পদবী লুপ্ত কিন্তু শর্মা থেকে গেছে। প্রসাদ রূপে আতব চাল, দুধ, ঘি দিয়ে মনুই বানানো হয়। পূজার দিনে গ্রামের সকলের বাড়িতে মনুই বানানোর রীতি আছে।শস্য উৎপাদনের জন্য এবং মানুষের জীবনকে রক্ষার উদ্দেশ্যের পার্বতী দেবী পূজিত হন। তিনি ফসল দায়ী দেবী এবং উর্বরতাবাদের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে।

উপসংহার : লৌকিক দেবদেবীর প্রাচীনতা নিয়ে সংশয় থাকলেও বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতার থেকে এইসব প্রান্তিক গ্রামজীবনের আঞ্চলিক দেবতা গুলি যে প্রাচীন তা অধিকাংশ গবেষক মেনে নিয়েছেন। বর্তমানে সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ছাপ পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন- " একদা সমগ্র পূর্ব-ভারতে গ্রামের যে ধর্মানুষ্ঠান-রীতি ছিল তাহা পরে শুধু বাঙ্গালা দেশে– আরও পরে শুধু পশ্চিম বাঙ্গালাতেই– রহিয়া গেছে। উত্তরপ্রদেশ

ও বিহারে ঘন ঘন রাষ্ট্র-বিপর্যয়ে পুরানো গ্রাম – রীতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।'' (সেন, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ১২)[১২] হিড়বাঁধ ব্লকের অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী পূজা-পদ্ধতি ও প্রকরণের মধ্যে সেই প্রাগার্য সভ্যতার ছাপ পাওয়া যায়। লৌকিক দেব দেবীর নাম, পূজা প্রকরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের অরণ্য কেন্দ্রিক জীবনের ছবি প্রতিভাত হয়েছে। হিড়বাঁধ ব্লকের আনাচে কানাচে বৈচিত্র্যময় লৌকিক দেব দেবীর সমাহার। প্রতীক রূপে বৃক্ষ, পোড়া মাটির হাতি ঘোড়ার পূজা সেই নব্য প্রস্তর যুগে দল বেঁধে শিকার যাত্রার শিকারিদের কথা স্মরণে আসে। এই এলাকার লৌকিক দেব দেবীর মধ্যে পশু পূজা ও প্রতীক পূজার অবশেষ পরিলক্ষিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। কাঁসাই-কুমারী- সম্পাদক- ডঃ বাবুলাল মাহাত ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মহকুমা শাসকের কার্যালয়, খাতড়া, বাঁকুড়া , প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৮।

২। ভট্টাচার্য,ত., (১৯৮২), বাঁকুড়া-পশ্চিমবঙ্গ দর্শন- ২, ফার্মা কে এলো এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,পৃষ্ঠা- ২২৩ ।

৩। টেরাকোটা – সম্পাদক – প্রদীপ কর, তিলবাড়ি বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, শীত-বসন্ত ১৪২৮, পৃষ্ঠা- ৬।

৪। ডঃ কামিল্যা মি., (২০২০), আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা- ১৯০।

৫। ভট্টাচার্য, আ.,(২০১৫), বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন যৌথ উদ্যোগে,পৃষ্ঠা- ৩৪৬-৩৪৭।

৬। তদেব , পৃষ্ঠা – ৭১৭।

৭। মান্না, শি.,(২০০৭), বাংলার লোকমাতা দেবী চণ্ডী, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পৃষ্ঠা- ২৬।

৮। ডঃ কামিল্যা, মি., (২০২০), আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা- ১১১।

৯। লোকশ্রুতি (জানুয়ারি ২০১৭), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা- ৩১।

১০। ধর্মবিশ্বাস বৃক্ষ-পূজা দেবদেবী, (বৈশাখ, ১৪২৮) , সুহৃদকুমার ভৌমিক সম্পাদিত। প্রকাশক- প্রদীপ কর, টেরাকোটা, তিলবাড়ি, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পৃষ্ঠা- ৩৯।

১১। তদেব , পৃষ্ঠা- ৪৬।

১২। সেন,সু., (২০১৬), বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোল লেন,পৃষ্ঠা- ১২।

সাক্ষাৎকার :

১। শ্যামাপদ ধীবর (৬১), মলিয়ান, বাঁকুড়া, তারিখ- ১০/১০/২০২২

২। মধু বাউরী(৬০), তিলাবনী, বাঁকুড়া, তারিখ- ১১/১০/২০২২

৩। কালিপদ সিং (৫৫), পায়সাগোড়া, পুরুলিয়া, তারিখ- ১২/১০/২০২২

৪। নন্দকুমার মুখোপাধ্যায় (৫০), বেঞ্জটাবনী, বাঁকুড়া, তারিখ- ১২/১০/২০২২

৫। শান্তনু কুম্ভকার(২৬), মলিয়ান, বাঁকুড়া, তারিখ- ১৩/১০/২০২২

৬। বংশী সর্দার (৮০), দেউলী, হিড়বাঁধ, বাঁকুড়া, তারিখ- ০৯/০১/২০২১।

৭। সিমু বাউরী (৪০)। মলিয়ান, হিড়বাঁধ, বাঁকুড়া, তারিখ- ১০/০১/২০২১।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

তুহিন বাউরী (১৯), মশিয়াড়া, বাঁকুড়া

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

নজরুলের ‘অ-নামিকা’ : বাসনার বিপুল আগ্রহ

সুরজিৎ প্রামাণিক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

সারসংক্ষেপ

বাংলা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম মানে শুধুই বিপ্লবের রণহুঙ্কার নয়; নজরুল মানে কেবলই বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি নয়। বাংলা কবিতায় নজরুল মানে প্রেমের স্বতন্ত্র ঘরানা; নজরুল মানে দারিদ্র্যের মহোত্তম নির্যাস; ভক্তিরসের উচ্ছ্বসিত প্লাবন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ঐশ্বর্যময় বিচ্ছুরণের কালে আবির্ভূত হয়েও, রাবীন্দ্রিক মোহ-মায়া থেকে তিনি বেড়িয়ে যেতে পেরেছেন, স্বতন্ত্র এক সৃষ্টি বৈচিত্র্যের প্রবণতা নিয়ে। এই স্বকীয় প্রয়াসের বোধ থেকে উঠে আসা ‘অ-নামিকা’, নজরুলের কাব্যমালায় এক অসাধারণ সৃষ্টি। যে কবিতার ভাষ্যে প্রেমের বাচন রচনা করতে গিয়ে, বাসনার বিপুল আগ্রহে জমে থাকা পৃথিবীর আদি অকৃত্রিম কামনার প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছেন নজরুল। রবীন্দ্রনাথ যেখানে একাধিক কবিতায় দেহহীন প্রেমের স্তব করেছেন, সেখানে নজরুল তাঁর অজস্র কবিতায় প্রেমের কথনে, প্রিয়জনের দেহগত সত্তার এক পরিকল্পিত ও বহু কাঙ্ক্ষিত অবয়ব নির্মাণ করতে পেরেছেন। তাই মানস-রঙ্গিনীকে ‘অনন্ত যৌবনাবালা’ বিশেষণে বিশেষিত করে, তাকে ‘চিরন্তন বাসনা-সঙ্গিনী’ রূপে প্রকাশ করতে পারেন তিনি। সেই অসীম তৃষ্ণা জাগানিয়ার প্রার্থনা করতে পারেন, তাঁর বাসনার তৃষ্ণাকে নিবারণ করার লক্ষ্যে। যা তাঁর সমকালীন বহু কবিই যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন, ঠিক তেমনি নজরুল পরবর্তী বাংলা কবিতার বহুধা বিস্তৃত অধ্যায়ে অন্যান্য একাধিক কবি সেই পথ নিয়েছেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবে একথা বলাই যায় যে, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্য প্রতিভায়, প্রেম ভাবনার মহিমময় উৎকর্ষের ধারায় অনায়াসেই ভরিয়ে দিয়েছেন, বাংলা কবিতার

বহুধাব্যাপ্ত বৈচিত্র্যময় মহাপৃথিবী। যা নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন সময়ে ব্যতিক্রমী এবং অভিনব।

সূচক শব্দ

প্রেম, বাসনা, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ ও সমকাল।

মূল আলোচনা

“সখি! নতুন ঘরে গিয়ে আমায় প'ড়বে কি আর মনে?
সেথায় তোমার নতুন পূজা নতুন আয়োজনে।।”[১]

নজরুলের কবিতায় গণজাগরণ, বিদ্রোহ, বিপ্লবের মা-ভৈ ধ্বনির পাশাপাশি প্রেম, দারিদ্র্য, ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবিটিও প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে। “হাজার বছরের বাঙালির ঋদ্ধ ইতিহাসের ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক বাঙালির নাম কাজী নজরুল ইসলাম। একজন স্রষ্টা এবং কর্মযোগী মানুষের নাম কাজী নজরুল ইসলাম। সাহিত্য ও সংগীতের মাধ্যমে একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলেন যিনি, তিনিই নজরুল। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এক প্রবলপ্রাণ বিদ্রোহীর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। মানবতার তূর্যবাদক এক সেনানীর নাম নজরুল, অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক সংহত রূপের নাম নজরুল। পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাগাতে চান যিনি, প্রেমের অধরা মাধুরীর কথা কবিতা ও গানে শোনান যিনি, স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ান যিনি, শাস্ত্রাচার-লোকাচার আর সাম্প্রদায়িক শক্তির বিপক্ষে কলম ধরেন যিনি তিনিই নজরুল। কতভাবেই তো নজরুলের পরিচয় তুলে ধরা যায়।”[২] আসলেই বাংলা কবিতায় এবং সার্বিকভাবে বাংলা সংস্কৃতির পটভূমিকায় নজরুলের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি, বাঙালি জাতির মানসক্ষেত্রে অনির্বচনীয় এক শস্য প্রতিমা প্রতিস্থাপন করে যেতে চেয়েছে। যা আমাদের অমৃতময় ঐতিহ্য ও চিরকালীন সম্পদ।

‘দোলনচাঁপা’ কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতায় নজরুল দেখিয়েছেন প্রণয়িনীর হৃদয়ের বিচিত্র লীলার বর্ণোজ্জ্বল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ছবি। বাসনার বিপুল আগ্রহে হৃদয় বৃন্তে জন্ম নেয় যে অনুপম প্রেম, সেই প্রেমেরই অমৃত-ধারা প্রেমিক যুগলকে নিয়ে যায় লোক হতে লোকান্তরে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে। বাংলা সাহিত্যের মাঝ আকাশে যখন রবীন্দ্রনাথ

একেবারেই একক সম্রাটের মতো বিচরণ করছেন, সেই অসীম এক রাবীন্দ্রিক বাতাবরণের চূড়ান্ত সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার আকাশকে নতুন রামধনুর অভিনবত্বে ভরিয়ে দিয়ে গেলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যাহ্নকালে আবির্ভূত হয়েও, নজরুল নিঃসন্দেহে ফুটিয়ে তুলতে পারলেন তাঁর স্বকীয় মৌলিকত্বের ছাপ। কাব্য-ভাবনার বিচিত্র আঙ্গিকে বাংলা কবিতায় তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে উঠলেন ক্রমাগত। তাই বলা যেতেই পারে, রবীন্দ্র যুগের প্রবল প্রতাপের সময়ে কবিতা লিখতে এসেও, যিনি রবিতাপের বন্ধন থেকে নিজেকে উন্মুক্ত করে বাংলা কাব্যে নতুনত্বের বিজয় কেতন ওড়াতে পেরেছিলেন তিনিই কাজী নজরুল ইসলাম।

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে। আর নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে। এবার ওই একই বছর অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দেই জন্ম নেন রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার দিগন্তে আর এক মহীরূহ জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়েছেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল নিয়ে আসছেন সুইডিশ আকাদেমি থেকে, তখন নজরুল কিংবা জীবনানন্দের বয়স মাত্র ১৩-১৪ বছর। কথাটা খুব সচেতনভাবেই আলোচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করা গেল, কারণ রবীন্দ্রনাথের এ হেন খ্যাতির শীর্ষত্বের পরেও বাংলা কবিতায় একজন নজরুল, স্বয়ং সম্পূর্ণ নজরুল হয়ে উঠেছেন; একজন জীবনানন্দ নৈরাশ্য ও ক্লান্তির জীবনে অবস্থান করেও, কবিতা পাঠকের অনুভবের বৈতরণী ভরিয়ে দিতে পেরেছেন জীবনের আনন্দ স্বরূপ। বলা বাহুল্য রবীন্দ্র দীপ্তির প্রবল ঘূর্ণনের কালেও দিশাহারা হয়ে যাননি তাঁরা।

নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায়। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ এবং মাতা জাহেদা খাতুন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তৃত পটভূমিকায়, বিশেষত বাংলা কবিতা এবং সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুলের যে অনবদ্য ভাবনার উন্মোচন তা বাঙালি জন-জীবনকে বিস্মিত করে। কাজেই বাংলা কবিতা ও সংগীতের ধারায় নজরুলের প্রবাহিত বোধের দীপ্তিতে বাঙালি জাতি আলোকিত হতে পারে নিঃসন্দেহে। তাঁর কাব্যিক ঐশ্বর্যের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে, কাজী নজরুল ইসলাম 'অগ্নিবীণা' (১৯২২), 'দোলনচাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশি'

(১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'ছায়ানট' (১৯২৫), 'ফণি-মনসা' (১৯২৫), 'চিত্তনামা' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'পুবের হাওয়া' (১৯২৬), 'ঝিঙেফুল' (১৯২৬), 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০) ইত্যাদি একাধিক কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিশেষ বটবৃক্ষের সমান। উপরিউক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির বিষয়বস্তুর নিরিখে এবং প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতায় নজরুল তাঁর প্রদীপ্ত সৃষ্টি-চৈতন্যের স্বকীয়তায় ভর করে, একজন প্রকৃত শিল্পীর মতোই বারবার নিজেকে নতুন ভাবে মেলে দিয়েছেন শাশ্বত সৃষ্টির আঙিনায়- এক একটি নতুন কাব্যের উন্মোচনে। যদিও বাংলা কবিতায় নজরুল ইসলামের নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই কবিতা পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে যে বিষয়টি, সেটি হল- তাঁর প্রবল বিদ্রোহী চেতনা। কিন্তু নজরুল ইসলাম মানে শুধুই কি বিদ্রোহের ক্রোধান্বিত আবেগ? আদতেই তা নন। কারন কোনও কবিই কোনও একটি বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না, বা বলা ভালো রাখতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবে নজরুলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হতে পারে না। তাই বিদ্রোহের পাশাপাশি তাঁর রচনায় মানব-সভ্যতার সংকট থেকে বিপন্নতা; প্রেম থেকে ঈশ্বর; একাকিত্ব থেকে মৃত্যু ইত্যাদি বহুল বিষয় অবতারিত। আসলে পৃথিবীতে তো শিল্পকর্মের কোনো বাঁধন নেই। তাই শিল্পীও তাঁর সহজাত ভঙ্গিতে স্বাধীন।

শিল্পের দোয়াতে ভাবনার তুলি নিমগ্ন হতে হতে কবিতা হয়ে ওঠে সীমাহীন দিগন্তের দিশা- আলোকের উৎস স্বরূপ। "অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বিস্তৃত এই যে পটভূমি এই পটভূমিতেই নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। তিনি লালিত-পালিত হন এই পরিবেশে এবং তাঁর কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশ এই যুগেই ঘটে। তাই এই যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনে ও কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর কাব্য বিচারে যুগমানস তো অনস্বীকার্য মানদণ্ড।"[৩] ফলে নজরুলের কবিতার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি কখনও তিনি বিদ্রোহের হুংকার ধ্বনিত করছেন, আবার কখনোবা দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিপীড়নে ক্লান্ত মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত আঁকছেন সুনিপুণ ভাবে। আবার মানব-সংসারের ক্ষমাহীন

দারিদ্র্যে ব্যথিতও হচ্ছেন কোথাও কোথাও। কোথাও আবার প্রেমের নিগূঢ় উপলব্ধির কথা বলে যাচ্ছেন অনর্গল, কিংবা শস্য-শ্যামল প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় বৈভবটিকে কবিতার পাতায় তিনি ফুটিয়ে তুলছেন অসাধারণ দক্ষতায়। ফলে এই সকল একাধিক দিক নিয়ে নজরুলের কবিতা হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতার বর্ণময় আকাশে অনন্য সম্পদের মতো। যা তাঁর ব্যক্তিগত সময়কাল পেরিয়ে, বর্তমানের কাছেও চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার রামধনুমাখা শস্যখেত আর প্রেমের স্নিগ্ধ জগতে বিচরণ করেছেন অতি স্বচ্ছন্দের সঙ্গেই। 'সঞ্চিতা'-র অজস্র কবিতায় প্রেমের ভাব-বিহ্বল উচ্চারণ শোনা গেছে নজরুলের কণ্ঠে। প্রিয়জনের বাঁশির স্নিগ্ধ সুর যেমন তার প্রিয়জনকে ঘর থেকে পথে বের করে আনে, ঠিক তেমনই নজরুলও যেন তাঁর প্রিয়জনের বাঁশির উদাস বাউলিয়ায় সংসারের সকল বাঁধন ছিন্ন করে পথ ভোলা কোনও পথিকের মতো পথেই খুঁজে ফেরেন প্রিয় বধূয়ার। 'দূরের বন্ধু' কবিতায় কবি বলেন-

"তোমার বাঁশীর উদাস কাঁদন
শিথিল করে সকল বাঁধন,
কাজ হল তাই পথিক- সাধন,
খুঁজে ফেরা পথ- বধূরে,
ঘুরে ঘুরে দূরে দূরে।।"[৪]

নজরুলের প্রেমভাবনা আবার রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ 'দেহ'কে বাদ দিয়ে প্রিয়জনের মনের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা রাখতে পারেন। বাসনা ভরপুর দৃষ্টির আচ্ছাদন সাজিয়ে তিনি তাঁর প্রিয়জনকে দেখতে পারেন না। "জগৎ হচ্ছে খণ্ড অখণ্ড প্রাণের বিচ্ছেদ-মিলনের লীলাখেলা। এতেই আনন্দের স্ফূরণ হয়। সৃষ্টির পর থেকেই খণ্ডপ্রাণ চলেছে অখণ্ড প্রাণের সঙ্গে মিলনের অভিসারে অথবা বরযাত্রায়। অভিসারের পথে তার পদে পদে সংশয় ভয় দুঃখ কষ্ট। কিন্তু সে সব বিপদজাল কাটিয়ে উঠে একদিন সে স্বয়ম্বর বা বিবাহসভায় পৌঁছবেই। তার দুঃসহ দুর্গম অভিসার একদিন সাড়ম্বর বরযাত্রায় পরিণত হবেই। এই মহৎ কবিকল্পনা এক

এপিক ছবিপরম্পরায় রূপ পেয়েছে।"[৫] ফলে প্রিয়তমার সঙ্গে দেহহীন এক আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রত্যাশায় নিজেকে নিমগ্ন করেন রবীন্দ্রনাথ। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় তিনি বলেন-

"হৃদয় আকাশে থাক্-না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখি কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি.....
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানস প্রতিমার দৈহিক অবয়বের ঊর্ধ্বে গিয়েই, তার মধ্যে দৈব মহিমার শাশ্বত স্বরূপ খুঁজেছেন। পাশাপাশি এও স্বীকার্য যে, আরাধ্যার উজ্জ্বল আলোর ঝলকে অনন্তকাল তিনি জেগে থাকতে পারেন বা নিজেকে জাগিয়ে রাখতে পারেন ক্লান্তিহীন। কিন্তু নজরুল ইসলাম-রবীন্দ্রনাথের মতো এই ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অন্য পথের সন্ধান করেছেন তিনি। "নজরুলের প্রেমের কবিতায় হৃদয়াবেগের তীব্রতা অতিমাত্রায় প্রকটিত। সচেতন মন দিয়ে তিনি প্রেমের বিচার করেননি। তত্ত্ব নয়, প্রেমের আবেগই তাঁকে আলোড়িত করেছে। মানবিক জীবনের অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রেম। কিন্তু নজরুলের কাব্যের স্পর্শে সুপ্ত প্রেম চেতনা যেমন জেগে উঠেছে, তেমনি প্রকৃতি পরিবেশ ও পৃথিবীকে মায়াজালের স্পর্শে অপূর্ণ করে তুলেছে। সময়ের প্রয়োজনেই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বিদ্রোহী বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, তাই মানুষের মহত্তম বৃত্তি প্রেমকে তিনি আত্ম অনুভবে দীপ্ত করে তুলেছেন তাঁর কবিতার অধিকাংশে। তাঁর প্রেমের কবিতায় অভিমান আছে, অভিযোগ আছে, ব্যর্থতাজনিত হা-হুতাশ আছে, আর আছে বিরহের তীব্র জ্বালা। আমরা তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোর প্রকৃতি বিচার করে নজরুল মানসে প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থে প্রেমের নিবিড়তা, চিরন্তনতা ও বিচ্ছেদের তীব্র জ্বালার প্রকাশ দেখা যায়। সিন্ধুর অশান্ত রূপ কবি চিত্তের বিচ্ছেদ জ্বালা পথিকের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। 'এক জ্বালা, ব্যথা নিয়া তুমি কাঁদ আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া।' নারীর দৃষ্টিতে থাকে দহন দীপ্তি, যা জ্ঞান

ও শিল্পের প্রেরণা। তাই কবিতার বিষয় হিসেবে প্রেম এবং আধার হিসেবে নারী যুগ হতে যুগান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে সমাদৃত ও ধৃত। নজরুলের কণ্ঠেও সর্বজনীন সত্য উচ্চারিত– 'নারীর বিরহে নারীর মিলনে, নর পেল কবি প্রাণ যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।' (সর্বহারা)"[৭] বাসনার বুক চিড়ে যে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে, সেই আগুনের উষ্ণ উত্তাপে নজরুল যেন তাঁর প্রেমিকাকে পান করতে চান তরলের মতো। আবার চিরপ্রেয়সীকে নিজ অঙ্গে ধারণ করে, তার বন্দনাও করতে চান কাজী নজরুল ইসলাম। 'অ-নামিকা' কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতা পাঠকের কাছে তিনি সরাসরি জানিয়ে গেলেন–

"নাম-নাহি-জানা ওগো আজো-নাহি-আসা!
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালোবাসা...
গোপন-চারিণী মোর, লো চির-প্রেয়সী!
সৃষ্টি-দিন হ'তে কাঁদ বাসনার অন্তরালে বসি',.....
ধরা নাহি দিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে।"[৮]

নজরুল ইসলাম যেন জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর প্রিয়তমাকে দেহে ধারণ করার বাসনা বুকে বেঁধে পৃথিবীতে এসেছেন। যদিও তাকে কাছে পাওয়া যায় না খুব সহজেই। স্বপ্নের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আবার স্বপ্নেই সে হারিয়ে যায়। বধূ হয়ে সে অধরে এসে ধরা দেয় না সংগোপনে। তাই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি-মনের অন্তরঙ্গ সত্তায় নিমজ্জিত ভাব ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও প্রকাণ্ড এক বিরহজনিত আকুলতা প্রকাশ পায়। এই ভাববিহ্বল আকুলতা দিয়েই আত্ম-মগ্ন হতে পারেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রেমিক চেতনার জাগরণে। তবে পাঠককে একথাও সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে যে নজরুলের বিরহ "বৈষ্ণব পদাবলির রাধার মতো বুক ভাঙা বিরহ নয়; সংসার অনভিজ্ঞ বাউণ্ডুলে তরুণ-তরুণীর ইচ্ছে করে পরস্পরের অভাবজনিত মন উদাস করে রাখা খামখেয়ালিপনা। তাঁর প্রেমিকা রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবীর মতো নিরুদ্দেশ যাত্রী নয়– সে প্রেমিকা কামনাকাঙ্ক্ষী মর্ত্যের নায়িকা। আর তাই

তীব্র বেদনায় সমাচ্ছন্ন হলেও সুন্দর এক আশার অভীপ্সায় তিনি মুখরিত কবি। ব্যক্তি এবং কবি হিসেবে নজরুল ছিলেন রোম্যান্টিক, সুন্দরের পূজারী; আর প্রেমিক নজরুলের গভীর প্রেমানুভূতির রসে টইটুম্বুর করা কাব্য দোলন-চাঁপা। এখানে দেখা যায় : নারী অধিকার করেছে তাঁর অভিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞানকে। বস্তুত, 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে বিদ্রোহী কবি অভিধায় সমধিক পরিচিতি লাভ করলেও, তিনি তাঁর প্রেম সম্পর্কিত কবিতার মাধ্যমেই কাব্য-জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।"[৯] তবু কবির দুরন্ত কামনার পেয়ালা বারবার তাকে অতি নিকটে ধারণ করতে চায়। জন্ম হতে জন্মান্তরে, লোক হতে লোকান্তরে মানব সমাজ করে তার আরতি। আর নজরুল নিজ ব্যাক্তি জীবনের একই জন্মের ভেতর শত সহস্রবার তাকে স্মরণ করেন বন্দনায়।

প্রিয়তমার লাবণ্যমণ্ডিত রূপের মধ্যে এক অপরূপ তৃপ্তির সুষমা তিনি খুঁজে পান। তাই বহু সাধনার সেই রানী দূরে কোথাও দিগ্বলয়ে মিলিয়ে গেলেও, তাকে কাছে পাওয়ার তৃপ্তি যেন ইন্দ্রধনুর সমান বলে মনে হয় কাজী নজরুল ইসলামের। এ হেন বুক ভর্তি অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা মেটানোর তাগিদে বারবার জন্ম নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারেন তিনি। বারবার না-পাওয়া সেই 'সুদূরিকা'-র করতে পারেন আরাধনা। 'অ-নামিকা' কবিতাতেই কামনা-বাসনার উদগ্র আগ্রহের জায়গাটিকে তিনি নির্দিষ্ট করে গেছেন–

"চির-দূরে-থাকা ওগো চির-নাহি-আসা!
তোমার দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ল'য়ে যায় মোরে!
বাসনার বিপুল আগ্রহে–
জন্ম লভি লোকে লোকান্তরে!
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা উদগ্র কামনা,
জন্ম তাই লভি বারে বারে,
না-পাওয়ার করি আরাধনা।..."[১০]

সুন্দর যা কিছু নজরুলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তা তিনি হৃদয়ে ধারণ করতে

চেয়েছেন। কখনও তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেও চেয়েছেন। আসলেই সুন্দরের অধরে নিজের ওষ্ঠ স্থাপন করে, তিলে তিলে তিনি অনুভব করেছেন তাঁর তিলোত্তমাকে। গভীর অর্থে প্রতিটি 'ঘুম-ভাঙা রাতে' অথবা 'রাত্রি-জাগা তন্দ্রা- লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে' প্রিয়ার ঠোঁট ছুঁয়ে যেন বিশ্ব নিখিলের স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছেন নজরুল। তাই গাছ পাতা পশুপাখির কামনার সাথে, নিজের কামনাকে বিশ্ব-কামনায় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। নিজেকে স্বয়ং 'কাম' রূপে প্রকাশ করে, প্রিয়তমাকে 'রতি' রূপে মানব সভ্যতার সকল তরুণ-তরুনীর মাঝখানে খুঁজে পেয়েছেন তিনি। এ তো বাংলা কবিতায় প্রেমভাবনা বহিঃপ্রকাশের একেবারেই স্বতন্ত্র একটি ঘরানা। তা ছাড়া আর কী! নজরুল এক চিঠিতে লিখছেন—"আমি বিশ্বাস করি যে, যে আমায় এমন করে চোখের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সে আমার আজকের নয়। সে আমার জন্ম জন্মান্তরের, লোক লোকান্তরের দুঃখ জাগানিয়া বন্ধু। তার সাথে নব নব লোকে এই চোখের জলে দেখা ও ছাড়াছাড়ি।"[১১] রবীন্দ্রনাথ আবার বাসনার আগুনকে চোখের জলে নিভিয়ে প্রিয়তমাকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন আত্মায়। বিশ্ব-প্রকৃতির মধুর ঐশ্বর্যে আরাধ্যাকে মিলিয়ে, তার সঙ্গে মিলে যেতে চেয়েছিলেন সংগোপনে, নিভৃতে, নিরালায়। তা তো শাশ্বত বটেই। কিন্তু নজরুল! নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমভাবনাকে সরিয়ে রেখে, একেবারেই স্বতন্ত্র একটি ভাবনা প্রকাশ করতে পেরেছেন, তাঁর কাব্যিক বোধের বৈতরণীতে। মহাকাল তাঁকেও তো গ্রহণ করল নিঃসন্দেহে। কারন রবীন্দ্রনাথের স্বাদ যেমন রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব, ঠিক তেমনই নজরুলের স্বাদ নজরুলের সৃষ্টি ছাড়া অসম্ভব। তাঁর কোনও বিকল্প নেই। নজরুল সমকালীন বা তাঁর পরবর্তী সময়ের বাংলা কবিতার সৃষ্টি বৈচিত্রে অনেকেই কামনা-বাসনাময় প্রেমের বীজ বপন করেছেন ঠিকই, কিংবা প্রতিবাদ প্রতিরোধের প্রতিধ্বনিতে অনেকেই নজরুলের মতো বা তাঁর থেকেও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সবকিছুর পরেও বাঙালি জীবনে নজরুলের বৈভব এবং বিকল্প একমাত্র নজরুলই।

কাজেই বাংলা সাহিত্যে বা একেবারে নির্দিষ্ট করে বললে বাংলা কবিতায় ও সংগীতে বাঙালি জাতির অহংকার করার মতো শাশ্বত সূর্যের দীপ্তি বিচ্ছুরিত যেমন একটা রবীন্দ্রনাথ আছেন, ঠিক তেমনই বিস্তীর্ণ একটা আকাশের মতো নজরুলও

আছেন। "যে গতিস্পন্দ এবং থট্ রিদম নজরুলকে দুঃসাহসিক শব্দসমন্বয় ঘটাতে তৎপর করে তুলেছে তারও মূলে আছে নজরুলের জীবন। যে স্বরস্বাতন্ত্র্যের জন্য নজরুল প্রধান রবীন্দ্রোত্তর কবি সে স্বরস্বাতন্ত্র্য নজরুলের স্বতন্ত্র জীবনচর্যার দান। লেটোর দলে ঢুকে পড়া সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করা, সৃজনী সাহিত্য বাবদে ইংরাজের কারাগারে জেলখাটা, জেলে অনশন.... এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে তিনি কোনো পূর্বসূরী দ্বারা প্রভাবিত হননি। টেকনিকের উপর তাঁর নিজস্ব দখল তাঁর জীবনযাত্রার নিজস্ব চালের প্রতিচ্ছায়া।"[১২] যিনি বাঙালি কবিতা পাঠককে পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন, সুন্দরকে দেহে ধারণ না করতে পারলে, সেই সুন্দরের আস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না কখনও। তাই–

"যেদিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টার সাথে তুমি এলে আমি আসিলাম!
আমি কাম তুমি হ'লে রতি,
তরুণ-তরুনী-বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!"[১৩]

এ তো বাস্তব সত্যেরই পটভূমি। এ যেন বিজ্ঞান প্রমাণিত সত্য– কবিতা হয়ে উঠে এল পাঠকের পাঠের দরবারে। আসলে নজরুল কল্পনার সমুদ্রে পাড়ি জমানোর চেয়ে বরং অনেক বেশি বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে অবস্থান করে, তাঁর যাবতীয় চিন্তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন। এটাই বোধ হয় তাঁর দার্শনিক ভাবনার আত্মীকরণ, দার্শনিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। তাই প্রেম সত্য ও চিরন্তন হলে, প্রেমের পাত্রটিও যেন সত্য ও চিরন্তন হয়ে ওঠে নজরুলের কাছে। কামনার বীজে জন্মানো জীব, কামনার মাঝেই বেড়ে ওঠে ক্রমাগত। তারপর হয়তো একদিন সে কল্পতরু বৃক্ষের মতো হতে পারে প্রশস্ত। ধীরে ধীরে তার পাখনার হয় অভিযান। তখন অসীম আকাশের বুক জুড়ে তার কামনার বলাকা খেলিয়ে যায় সবুজ। প্রতিটি রূপের ভেতর যেমন অপরূপ লাবণ্য থাকে, প্রতিটি অবয়বের ভেতরেও তেমনি বহু বিস্তৃত একটা বৈভব লুকিয়ে থাকে অতি সূক্ষ্ম। এভাবেই অনন্ত ভাবনার বৈচিত্র্যে ও প্রশস্ত বোধের দীপ্তিতে প্রেয়সীকে নির্দিষ্ট কোনও একক পাত্রে আস্বাদন করতে চাননি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি অমৃতের স্বাদ নিতে চেয়েছেন

তাঁর চির সহচরীকে বহুপাত্রে স্থাপন করে। তাই বলতে পারেন–

"তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!"[১৪]

নজরুলের প্রেমভাবনা আলোচনা করতে গিয়ে, আমরা যেমন বহুক্ষেত্রে অগ্রজ কবি মোহিতলাল মজুমদারের চুড়ান্ত ভোগবাদের স্পর্শ খুঁজে পাই, পাশাপাশি আবার কাজী নজরুল ইসলামের দেহবাদের ছোঁয়া আমরা লক্ষ্য করি বাংলা কবিতায় নজরুল পরবর্তী যুগের অন্যতম কবি বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের কবিতাতে। প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতে বাসনার বুকে যৌবনের ক্ষুধিত রূপ ফুটিয়ে তোলার যে প্রবনতা, সে বিষয়টিতে দৃষ্টি রাখা যেতে পারে। 'বন্দীর বন্দনা' কবিতায় বুদ্ধদেব বসু সরাসরি স্বীকারোক্তি করছেন–

"বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।" (বন্দীর বন্দনা: বুদ্ধদেব বসু)

কাজেই, বুদ্ধদেব বসুর এই কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে নজরুলের কবিতার কথন ভাষ্যের অনেকটাই যে সাযুজ্য রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে শুধুমাত্র তা নয়, কল্লোলের কবিরা আদতেই তরুণ বয়সের টগবগে চেতনায় ভর করে রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভেদ করতে চেয়েছিলেন নানাভাবে। নজরুল, জীবনানন্দ থেকে শুরু বুদ্ধদেব বসু প্রমুখেরা অনেকটা সেই উৎকর্ষেরই পথিক বলা যেতে পারে। বাংলা কবিতার পাঠক নজরুলের কবিতা পড়তে পড়তে এ কথাও নিশ্চিত অনুধাবন করেছেন যে, "শেলী, ব্রাউনিং বা রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি অতীন্দ্রিয় প্রেমরাজ্যে বিহার প্রয়াসী নন। রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল কাব্যে বিবসনা, স্তন, দেহের মিলন প্রভৃতি কবিতা রয়েছে। কিন্তু তিনি এ ধরনের কবিতায় তৃপ্তি খুঁজে পাননি। নজরুল দেহনিষ্ঠ মানবীয় ভালোবাসার প্রধান সপ্রতিভ স্তুতিকার। তাঁর অনেক কবিতায় দৈহিক বাসনা ও কামনার নিরাভরণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

"তোমারে করিব পান, অনামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।" (অ-নামিকা)

আবার–

"আজ লালসা অলসমদে বিবশ রতি শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি। তার নিধুবন- উন্মন ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন বুকে পীন যৌবন উঠিছে ফুঁড়ি মুখে কাম কন্টক ব্রণ মহুয়া কুঁড়ি।" (মাধবীলতা) ভোগবাদের ক্ষেত্রে মোহিতলালের প্রভাব কাজী নজরুলের কবিতায় আছে। কবি মোহিতলাল শারীর-প্রেমের কবি। সে-প্রেম অবশ্য আত্মাকে বাদ দিয়ে নয়। এছাড়াও নজরুলের কবিতায় আছে ত্রিশোত্তর কবিদের নগ্ন অনুসৃতি। প্রেম মানবাত্মার এক গভীরতম ক্ষুধা, যে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় একমাত্র প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনে। যৌন কামনাকে ভিত্তি করে প্রেমের জন্ম। প্রেমের প্রতিবন্ধকতায় সৃষ্টি হয় বেদনা, বিষাদ, নৈরাশ্য। প্রেমের কবিতার জন্ম এখানেই। সুখী প্রেমের কোনো ইতিহাস নেই। বিরহের বেদনাই প্রেম। নজরুলের কবিতায় নিত্যকালের নর- নারীর বিরোহী প্রাণের অশেষ কান্না ধ্বনিত হয়েছে। চির চাওয়া প্রেমের পরিনতি চির বিচ্ছেদ। মানুষ তাকেই লাভ করে সংবেদনশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ভরে আজো নাই শেষ। নজরুল বলেছেন- "দূরের প্রিয়া। পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদা রোল।" (গোপন প্রিয়া) নজরুলের শারীর-নিষ্ঠ সাধনায় অসংযম বা অশ্লীলতা নেই। এ দেহসর্বস্ব প্রণয়েও পবিত্রতা এবং সুষমা কোথাও অস্বীকৃত হয়নি। নজরুল শারীর-প্রেমের সাধক হলেও আত্মার অস্তিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করেননি।[১৫] তাই বাসনার বিপুল আগ্রহ থেকে প্রতিস্থাপিত হৃদয়ের যে বোধিবৃক্ষ নজরুল চিনিয়ে গেছেন বাঙালি জাতির জীবনচৈতন্যে, শতবর্ষ পরেও সেই মহিরূহের শাখা-প্রশাখার দীঘল প্রচ্ছায়ায় আমরা আশ্বস্ত হতে পারি নিশ্চিত। নিত্য জীবনের ক্লান্তি-হতাশা ডিঙিয়ে, অমোঘ সান্ত্বনার বারিমণ্ডলে আমরা নিমগ্ন হতে পারি, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এ হেন ঐতিহ্য পরম্পরায়।

তথ্যসূত্র :

১। ইসলাম, নজরুল; সঞ্চিতা; ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, চতুঃসপ্ততিতম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-৩৭

২। ঘোষ, বিশ্বজিৎ; 'কে নজরুল কেন নজরুল'; কালি ও কলম, ২৭ আগস্ট ২০১৯, https://www.kaliokalam.com

৩। গুপ্ত, ড.সুশীলকুমার; নজরুল চরিত-মানস; দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ ২০১২, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৫

৪। ইসলাম, নজরুল; সঞ্চিতা; ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, চতুঃসপ্ততিতম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-৫৪

৫। সেন, সুকুমার; রবীন্দ্রনাথের গান; টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮২, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৪২

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; রবীন্দ্র-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড, কবিতা); পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, জুলাই ১৯৮০, পৃষ্ঠা-৩৭৭

৭। 'নজরুল মানসে প্রেমের স্বরূপ'; দৈনিক জনকণ্ঠ'; ২১ মে ২০২১, https://www.dailyjanakantha.com

৮। ইসলাম, নজরুল; সঞ্চিতা; ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, চতুঃসপ্ততিতম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-১৩২

৯। দত্ত, শ্যামলকান্তি; 'নজরুল-কাব্যে প্রেম'; ভোরের কাগজ, ২৯ আগস্ট ২০১৯, https://www.bhorerkagaj.com

১০। ইসলাম, নজরুল; সঞ্চিতা; ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, চতুঃসপ্ততিতম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-১৩৩

১১। খান, আলি আশরফ; নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়; করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, আগস্ট ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-৩৫

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ; বাংলা কবিতার কালান্তর; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা-১১৮

১৩। ইসলাম, নজরুল; সঞ্চিতা; ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, চতুঃসপ্ততিতম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-১৩৪

১৪। তদেব; পৃষ্ঠা-১৩৬

১৫। 'নজরুল মানসে প্রেমের স্বরূপ'; দৈনিক জনকণ্ঠ'; ২১ মে ২০২১, https://www.dailyjanakantha.com

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর কথাসাহিত্য

সুরেন্দ্র নাথ দে

সারসংক্ষেপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদ প্রতীম সাহিত্যিক। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনি, নাটক– সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি সার্থক। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্য লেখা তার গল্প উপন্যাস গুলিও পাঠক মহলে অতীব জনপ্রিয়। ছোটদের জন্য তিনি মজার, ভূতের, রহস্যের, কল্পবিজ্ঞানের ইত্যাদি সব ধরনের গল্প উপন্যাসই লিখেছেন। কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রণজয়, গুটলি, বিশ্বমামা কিংবা রহস্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে কাকাবাবু– সন্তু, বাংলা সাহিত্যে সুনীল সৃষ্ট এই চরিত্রগুলি প্রায় অমরত্ব লাভ করেছে একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না। ছোটদের জন্য তিনি প্রায় দুশোটি গল্প এবং পঞ্চাশোর্ধ উপন্যাস লিখেছেন। শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয় উৎকর্ষের দিক থেকেও এইসব গল্প উপন্যাস গুলি বিস্ময়কর। মণিমুক্তোসম এই গল্প উপন্যাস গুলির মধ্যে লেখক নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কিশোর কথাসাহিত্যের ঝরঝরে গদ্য, মোহময় ভাষা, পরিমিতিবোধ, গল্প বলার দক্ষতা মুগ্ধ করেছে সব বয়সী পাঠকদের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত কিশোর কথা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে কিশোর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র সৃষ্টির পিছনে ক্রিয়াশীল তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়েও সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা রইলো আলোচ্য প্রবন্ধে।

সূচকশব্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিশোর কথাসাহিত্য, কাকাবাবু সিরিজ, সুনীলের কিশোর কথাসাহিত্য, সুনীলের কল্পবিজ্ঞান ।

মূল প্রবন্ধ

বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাবান লেখকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভূত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভা ছিল বহুমুখী, বিস্ময়কর। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য, নাটক, ভ্রমণকাহিনি– সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর সমান গতিবিধি, সব শাখাতেই তিনি সমান সার্থক। বড়দের জন্য লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাসের সম্ভার যেমন বিপুল ছোটদের উদ্দেশ্যে লিখিত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যাও প্রচুর। শুধু পরিমাণের দিক থেকে নয় উৎকর্ষের দিক থেকেও সেইসব গল্প-উপন্যাস কালজয়ী। তাঁর কথাসাহিত্যের স্বাদু ভাষা, গল্প বলার দক্ষতা, পরিমিতিবোধ পাঠক ভুলতে পারবেনা কখনো।

মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও শারীরবিজ্ঞানের সতর্কদৃষ্টিতে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, কার্ল ইয়ুঙ প্রমুখ মনোবিদ যৌবনের পূর্ববর্তী জীবনের তিনটি ভাগ লক্ষ্য করেছেন শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর; পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত শৈশব, ছয় থেকে বরো বছর পর্যন্ত বাল্যকাল এবং বারো থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত সময়কাল কৈশোররূপে বিবেচিত। এস্থলে উল্লেখ করতে হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'ছোটদের বাছাই গল্প' বইটির ভূমিকায় খুবই সচেতনভাবে মন্তব্য করেছেন– "ছোটদের জন্য লেখা আমি ছোট বয়সে শুরু করিনি। তখন ছিলাম শুধুই পড়ুয়া।...বেশ বড় বয়সে শুরু করেছি ছোটদের জন্য লেখা। যখন ছোটদের জন্য লিখি, তখন আমার বয়েসটাও যেন কমে যায়, কমতে কমতে এসে যায় বরো বছরে সেই বয়সে যেসব জিনিস আমার ভালো লাগত, যেসব অজানা বিষয় সম্পর্কে আমার কৌতুহল ছিল, সেই সব বিষয় নিয়েই লিখতে চেষ্টা করি।" এরকমই আশ্চর্য কিশোর মন নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিশোরদের জন্য লিখতেন। ছোটদের সাহিত্য জগত নির্মাণ করতে গিয়ে লেখকদের বিশেষ কিছু দিকে নজর রাখতে হয়। সাধারণত কিশোর মনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, এমন বিষয় থেকে তাঁরা ছোটদের সাহিত্য জগতকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখেন। যৌনতা, হিংস্রতা এখানে ব্রাত্য; তাছাড়া ছোটদের উপযোগী নয় বলে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সম্পর্কের জটিল টানাপোড়েন সাধারণত এই জাতীয়

সাহিত্যে থাকে না। বরং ছোটদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, তাদের মানসিক গঠন, বৌদ্ধিক বিকাশ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখেন লেখক। এ বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাফল্য প্রশ্নাতীত। কিশোর মনস্তত্ত্বের একজন মস্ত বড় শিল্পী ছিলেন তিনি। এত বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে তিনি কিশোরদের জন্য গল্প উপন্যাস লিখেছেন ভাবলেও চমকিত হতে হয়। সাহিত্যিক রতনতনু ঘাটী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখিত– 'তাঁর কিশোর সাহিত্য বৈচিত্র্যে ভাস্কর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন– "কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর এক-একটি গল্প-উপন্যাস পড়লে পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন এক-একটা নতুন মহাদেশ তার ভূগোল, ইতিহাস আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে। কিন্তু সে মহাদেশের চরিত্ররা সকলেই হয়তো কিশোরদের প্রতিদিনের চেনা প্রতিবেশী নয় ঠিকই, তবে সেই চরিত্ররা খুব সহজেই তাদের মনের জানলায় গিয়ে উঁকি দেয়, তাদের বন্ধু হয়ে যায়। এই বন্ধুরা যেন কিশোরদের জেগে থাকা স্বপ্নে দেখা মানুষ। তাদের প্রত্যেককেই ছোটরা খুব কাছের মানুষ বলেই মনে করে। তাই সেই চরিত্ররা নিমেষেই তাদের মন জয় করে নেয়।" শুধু ছোটদেরই বা বলি কেন বড়রাও সুনীলের কিশোর সাহিত্য পড়ে সমান আনন্দ পায়। যেকোনো সফল শিশু-কিশোর সাহিত্যের ধর্মই তাই। সংবেদনশীল রসজ্ঞ পাঠক (যে কোনো বয়সী) মাত্রেই অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অন্দরমহলে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় প্রত্যেক বয়স্ক, পরিণত মানুষই তাদের শৈশব অতিক্রম করে এসেছেন, ছোটদের আনন্দ-সুখ-দুঃখ বুঝতে তাই তাদেরও অসুবিধা হয় না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের জন্য লিখিত সাহিত্য তাই ব্যাপকার্থে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটদের জন্য মজার, রহস্যের, ভূতের, ঐতিহাসিক, কল্প বিজ্ঞানের ইত্যাদি সব ধরনের গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর মজাদার গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য– 'জলের তলায় রাজপুরী', 'ছোড়দির বড়দি', 'বিশুর কান্ড', 'শালিক ও ছোটকাকা', 'সাতজনের তিনজন', 'ছোটমাসির মেয়েরা', 'ঝুনুমাসির বিড়াল' ইত্যাদি। নির্মল আনন্দ আর দারুণ মজাই এই গল্পগুলির প্রধান বিষয়। যেমন 'জলের তলায় রাজপুরী' গল্পে 'পুপলু' তার বাবা মায়ের সঙ্গে হাউস বোটে

করে শ্রীনগরের লেকে ঘুরতে ঘুরতে একদিন জলে পড়ে যায়। জল থেকে উদ্ধার পেয়ে সে তার বাবাকে জানায় – "আমি কী রকম জলের তলায় দৈত্যদের দেশ দেখে এলুম।" তার দেখা দৈত্যগুলো নাকি মোটেই খারাপ নয়, তারা বেশ ভালো। তারা তাদের দেশের রাজকন্যার সাথে পুপলুর পরিচয়ও করিয়ে দেয়। তারা কথাও বলে বাংলায়। 'বিশুর কান্ড' গল্পে বিশু সার্কাসের বাঘের পিঠে চেপে পৌঁছে যায় কুড়ি মাইল দূরে সার্কাসের তাবু পর্যন্ত, আবার 'সাতজনের তিনজন' গল্পে দেখা যায় পুরাণের তিনজন চিরঞ্জীবী কৃপাচার্য, অশ্বত্থমা এবং বীর হনুমানকে যেখানে কৃপাচার্য আর অশ্বত্থমাকে তাঁদের পূর্বকৃত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হনুমান রেখে আসে একটি খাদের অন্ধকারে, সেখানে অজস্র পিঁপড়ে তাদের সর্বক্ষণ কামড়াতে থাকে।

শুধু মজারই বা বলি কেন? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি কিশোর গল্প রয়েছে যেগুলি পাঠ করলে মনকে গ্রাস করে এক অদ্ভুত বিষন্নতা। যেমন- 'মাসতুতো ভাই' গল্পে বিদেশ ফেরত বড়লোক মাসিমা, মেসো এবং মাসতুতো ভাই রণির সঙ্গে আশ্চর্য এক শ্রেণীগত দূরত্ব অনুভব করে বালক শিবু কিংবা 'কেন দেখা দিল না' গল্পে মৃত বন্ধুর জন্য কথকের স্মৃতিকাতরতা মন ভারাক্রান্ত করে। 'মাঝরাতের অতিথি' গল্পে একজন নৃশংস খুনী ডাকাতের চেহারার সঙ্গে নিজের মৃত সন্তানের সাদৃশ্য খুঁজে পায় মানদা । প্রচন্ড আহত অবস্থায় ডাকাতটি আশ্রয় নিয়েছিল মানদা এবং সনাতনের ঘরে। গল্পের শেষে ডাকাতটির মৃত্যু হলে মানদা হাহাকার করে বলে ওঠে "ও খোকন না হলেও একজন মানুষ তো! চোখের সামনে একজন মানুষ মরে গেলে কাঁদবো না?" এভাবেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিশোরদের শেখান মানুষকে ভালোবাসতে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জাতীয় অপর কয়েকটি গল্প হল– 'অমলের পাখি', 'কাঞ্চনের দুঃখ', 'নিউইয়র্কের সাদা ভাল্লুক'।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মনে করতেন ভূত বলে আসলে কিছু হয় না। মানুষ ভয় করে শুধুমাত্র অন্ধকারকে। তাঁর বহু কিশোর গল্পে তিনি এই মত প্রচার করেছেন বটে কিন্তু পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ভৌতিক বা অলৌকিক গল্প লিখে কিশোর সাহিত্যের এই শাখাটিকেও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর ভৌতিক তথা অলৌকিক সিরিজের অন্যতম গল্পগুলি হল– 'পানিমুড়ার কবলে', 'বটুকদাদার পাখি', 'বেণী লস্করের কাটা মুন্ডু',

'ছোটমামার ব্যাপারটা', 'পার্বতীপুরের রাজকুমার'। অবশ্য এই সমস্ত গল্পে কোনো ভয়ঙ্কর অতিলৌকিক ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে কিশোর পাঠকদের ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা নেই বরং অনেক গল্প থেকে কিশোররা কুড়িয়ে পায় জীবনে চলার পথের অদম্য সাহস। যেমন 'পানিমুড়ার কবলে' গল্পে জলের ভূত পানিমুড়া একদিন বাবলুকে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, বাবলুর চিৎকারে তার মা ছুটে এসে তাকে জল থেকে তোলেন। তারপর সাতদিনেই বাবলুর সাঁতার শেখা হয়ে যায়। আর কোনোদিন পানিমুড়া তাকে ভয় দেখাতে আসেনা। কিংবা 'পার্বতীপুরের রাজকুমার' গল্পে অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা সুজয় ধরিয়ে দেয়া নকল মেজবাবুকে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞানের গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যেও তাঁর নিজস্বতা পুরোমাত্রায় উপস্থিত। উক্ত সাহিত্যধারাটিকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন-'নীল মানুষের বন্ধু', 'নীল মানুষের মন খারাপ', 'পৃথা ও চন্দ্রদেবতা', 'আজব লড়াই', 'মেঘ চোর', 'রাক্ষুসে পাথর', 'বিশ্বমামা ও নকল ফুল', 'বিশ্বমামার ভূত ধরা', 'বিশ্বমামার খুদে বন্ধু', 'ম্যাজিশিয়ান বিশ্বমামা', 'হীরে কি গাছে ফলে' ইত্যাদি গল্প এবং 'তিন নম্বর চোখ', 'আকাশ দস্যু', 'ইচ্ছাশক্তি'র মতন উপন্যাসের দ্বারা। নীল মানুষ রণজয় এবং গুটলি তাঁর একাধিক কল্পবিজ্ঞানের গল্পে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। রণজয় লম্বায় আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি, তার গায়ের রং নীল; আর গুটলি একেবারে বেঁটে।অন্যদিকে বিশ্বমামার গল্পগুলিতে ফিরে ফিরে এসেছেন বিজ্ঞানী বিশ্বমামা এবং তার দুই ভাগ্নে নীলু ও বিলু। এই সকল গল্প উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যও জানিয়ে দেন লেখক। যেমন ধরা যাক- 'হীরে কী গাছে ফলে' গল্পটির কথা। জিপগাড়িতে করে রানীগঞ্জ ছাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বিজ্ঞানী বিশ্বমামা তাঁর খুদে দুই ভাগ্নে নীলু ও বিলুকে জঙ্গলের শাল, মহুয়া, জারুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছ দেখিয়ে বলেন –

"জানিস তো এর মধ্যে অনেক গাছই আমাদের দেশের নয়। বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। এই দ্যাখ না। এই যে কৃষ্ণচূড়া। কী সুন্দর নাম। এই গাছ আনা হয়েছে ম্যাডাগাসকার থেকে। এখন আমাদের দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

বিশ্বমামা যে গাছটাকে কৃষ্ণচূড়া বলে দেখালেন, বাস্তা সোরেন সেদিকে তাকিয়ে

বললো, ওটা তো গুলমোহর। বিশ্বমামা আমার দিকে ফিরে বললেন, আই নীলু, বল তো গুল মানে কী ?....

বিশ্বমামা বললেন, গুল মানে ফুল। বাস্তা যে বললো গুলমোহর, সেটা ঠিক নয়। আমরা যে গুলকে বলি কৃষ্ণচূড়া, হিন্দীতে তাকেই বলে গুলমোর। মোহর নয়, মোর। মোর মানে ময়ূর। ময়ূরের পাখার মতন ফুল। রংটা না মিললেও ফুলটা দেখতে অনেকটা ময়ূরের পালকের শেষ দিকটার মতন। কৃষ্ণের মাথায় একটা ময়ূরের পালক থাকে, তাই বাংলায় বলি কৃষ্ণচূড়া আর হিন্দীতে গুলমোর।" গল্পের শেষে যখন কয়লার টুকরোর মধ্যে থেকে হীরে আবিষ্কার করেন বিশ্বমামা, তখন তিনি খুব সহজভাবে ছোটদের বুঝিয়ে দেন কিভাবে হীরে জন্মায়–"আমাদের দিকে ফিরে বললেন, এবার বুঝলি তো? গাছ লক্ষ লক্ষ বছর মাটির তলায় চাপা পড়ে গেলে কয়লা হয়ে যায়, তা জানিস তো? সেই কয়লা থেকে গ্র্যাফাইট, তার থেকে হীরে। তা হলে গাছ থেকেই হীরের জন্ম নয়?" গল্পে বিশ্বমামার মাধ্যমে লেখক কিশোর পাঠকদের নির্লোভ হওয়ার উপদেশ দিতেও ভোলেন না, তাই তো নিজের আবিষ্কৃত হীরে বিশ্বমামা দিয়ে দেন জাম্বোকে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন– " বিশ্বমামা বললেন, আমি কেন নেব? আমি তো আবিষ্কার করিনি। সে কৃতিত্ব জাম্বোকে দিতে হবে। জাম্বো যদি একটা গাছে হীরের ফুল না আঁকতো, তাহলে ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসতো না। দেখো, বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বের চেয়েও মানুষের কল্পনা কত শক্তিশালী। ঐটুকু একটা ছেলে, একটা গ্রাফাইটের টুকরো পেয়েই হীরের ফুল আঁকছিল কেন? এই হীরেটা আমরা জাম্বোকেই উপহার দেবো।" বলাই বাহুল্য বিশ্বমামার এই নির্লোভ মন এবং নির্মোহ দৃষ্টি কিশোর মনকে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

কিশোর সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে বোধহয় রহস্য আডভেঞ্চারধর্মী কাহিনি রচনার ক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিশোর পাঠকদের বৌদ্ধিকস্তর যেহেতু বেশ কিছুটা পরিণত তাই রহস্যকাহিনি বা অভিযান কাহিনির প্রতি তাদের আকর্ষণও তীব্র। আর এই ধারায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কীর্তি 'কাকাবাবু' চরিত্রটির সৃষ্টি। কাকাবাবু ও সন্তুর কাহিনিগুলি একাধারে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি এবং গোয়েন্দাগল্প। অবশ্য গল্পের নায়ক কাকাবাবুকে লেখক কোনোদিনই গোয়েন্দা বলতে

চাননি। সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'কাকাবাবু কি ডিটেকটিভ' শীর্ষক প্রবন্ধে কাকাবাবুকে বলেছেন–'রহস্য-অন্বেষী'। যদিও তাঁর মতে- সেই রহস্য অন্বেষণ যেহেতু অনেক সময়ই অপরাধী শনাক্তকরণ পর্যন্ত গড়ায়, কাজেই তাঁকে ডিটেকটিভ বলাই যায়। কিন্তু প্রথাগত ডিটেকটিভ চরিত্র থেকে তিনি একটু ব্যতিক্রমী। আসলে প্রথাগত ডিটেকটিভদের মত কাকাবাবু কখনও অপরাধী সন্ধান করার কাজে কারোর দ্বারা নিযুক্ত হন না, বরং তিনি নিজে থেকেই এগিয়ে আসেন বিভিন্ন রহস্য সমাধানে। সেই রহস্য হতে পারে হত্যাকারী কে, কিংবা হাঁসেরা কেন এ বছর নির্দিষ্ট সরোবরে নামল না? অথবা পরপর দুজন বিজ্ঞানী কেন একই জায়গা থেকে নিরুদ্দিষ্ট হলেন ? অথবা চালকহীন একটি লঞ্চ কেন জেটিতে এসে ঠেকল? কিংবা মানুষের দাঁতের চেয়ে প্রায় ছ'গুণ বড় দাঁতগুলি প্রকৃতপক্ষে কোন প্রাণীর? অবশ্য আরো একদিক থেকে কাকাবাবু চরিত্রটি ব্যতিক্রমী, কারণ একজন খোঁড়া মানুষকে গোয়েন্দা বা অ্যাডভেঞ্চারার এর চরিত্রে উপস্থাপন করার দৃষ্টান্ত বিরল। কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরী আসলে ছিলেন ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা। আরকিওলজিক্যাল সারভে অব ইন্ডিয়ার ডাইরেক্টর। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান। কর্মসূত্রে আফগানিস্তানে গিয়ে কাবুলের কাছাকাছি তাঁর গাড়ি উল্টে যায়। সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে যায় একটি পা। এই দুর্ঘটনার পর তিনি আর চাকরি করেননি। ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন এবং ভাইপো সন্তু ওরফে সুনন্দ রায়চৌধুরীর সঙ্গে নিজস্ব উদ্যোগে বেরিয়ে পড়েন দুঃসাহসিক সব অভিযানে। তাঁর সম্বল অদম্য মনোবল। কাকাবাবুর এই চরিত্রটির পিছনে কাজ করেছে সুনীলের প্রত্যক্ষ কিছু অভিজ্ঞতা। যেমন 'কাকাবাবু সমগ্র ১' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তিনি লিখেছেন– "একবার আমি একজন খোঁড়া মানুষকে খুব উঁচু পাহাড়ে উঠতে দেখেছিলাম । তাঁর যেন একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। তখন আমি ছোট, সন্তুর বয়েসী। সেই মানুষটিকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, অসাধারণ তাঁর মনের জোর, আর এরকম মনের জোর থাকলে মানুষ যে-কোনো বাধাকেই জয় করতে পারে। সেই মানুষটিই কাকাবাবু।" এছাড়া 'শতমুখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' গ্রন্থে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধু সমীর রায়চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণামূলক রচনা 'চাইবাসা চাইবাসা'তে লিখেছেন চাইবাসা অঞ্চলের একটি পরিবারের সঙ্গে

তাঁদের (অর্থাৎ সুনীল, শক্তি, সন্দীপন, সমীর) সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেই পরিবারে ছিল ৯ টি মেয়ে এবং তাদের একমাত্র ভাইয়ের নাম ছিল সন্তু। এছাড়া চাইবাসার স্থানীয় এ.ডি.এম যাকে ওরা কাকাবাবু বলে ডাকতো তিনি সেই বাড়িতে অনেক অ্যাড- ভেঞ্চারের গল্প শোনাতেন। সেই আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন সুনীল এবং বন্ধুবান্ধবরাও। বোঝাই যায় এখান থেকেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মাথায় আসে কাকাবাবু ও সন্তুকে নিয়ে উপন্যাসের কথা। অবশ্য বাস্তবের কাকাবাবুর বলা গল্পের চাইতে সুনীলের রচিত গল্পগুলি অনেক বেশি উন্নত ও চমৎকার। কাকাবাবুর প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় ১৯৭১ সালের পূজাবার্ষিকীতে নাম 'ভয়ংকর সুন্দর', এই সিরিজের শেষ কাহিনী 'গোলকধাঁধায় কাকাবাবু'ও প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দমেলা পত্রিকার পূজাবার্ষিকীতে ২০১২ সালে। এই দীর্ঘ ৪১ বছরব্যাপী সময়পর্বে কাকাবাবু সিরিজের মোট ৩৬ টি উপন্যাস এবং ৬ টি গল্প পাঠকদের উপহার দিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

কাকাবাবুর উপন্যাসগুলি ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যেমন- 'উদাসী রাজকুমার', 'অন্ধকারের বন্ধু', 'কালো পর্দার ওদিকে', 'ডুংগা', 'জলদস্যু', 'মা আমার মা' ইত্যাদি।উপন্যাসগুলির অধিকাংশ রহস্য রোমাঞ্চ তথা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী। তবে 'অন্ধকারের বন্ধু' এবং 'মা আমার মা' উপন্যাসদুটির আশ্রয় ঐতিহাসিক পটভূমি। 'অন্ধকারের বন্ধু' উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে বঙ্গে বর্গী আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছে– নবাব আলিবর্দি খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা, বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত প্রমুখ। অন্যদিকে 'মা আমার মা' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং উপন্যাসের শেষে আডির্ভূত হয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত উপন্যাসের হাত ধরে কিশোর পাঠকেরা সহজেই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী হয়ে ওঠে।

'নবীন কিশোর, তোমার জন্য দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ....', ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন সুনীল। যাওয়ার আগে অবশ্য

বলেছিলেন– 'জীবনই জীবন্ত হোক,তুচ্ছ অমরতা।' শারীরিক দিক থেকে তিনি অমরতা কামনা করেননি, বরং অমরত্বকে তাচ্ছিল্যই করেছেন, কিন্তু তাঁকে অমরত্ব এনে দিয়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম। নিজেকে উজার করে দিয়েছেন তিনি সাহিত্যপ্রেমী বাঙালীর রসতৃপ্তির উদ্দেশ্যে। আর কিশোর পাঠকদের 'উত্তরাধিকার' সূত্রে দিয়ে গিয়েছেন মণিমুক্তার মতন সব গল্প-উপন্যাস। তাঁর মোহময় জাদুকরী কলমের ঝরঝরে গদ্য কিশোর পাঠকের কোমল হৃদয়কে অনাবিল আনন্দে উদ্বেল করেছে বহু বছর ধরে এবং আগামীতেও করবে নিশ্চিত। কিশোর পাঠকের উদ্দেশ্যে তিনি যে প্রায় দুশোটি ছোটগল্প এবং পঞ্চাশোর্ধ উপন্যাস লিখেছেন তার সমস্তটা নিয়ে বিশদে আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়, তাই কিছুটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা রইলো এই প্রবন্ধে। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ প্রতীম এই সাহিত্যিকের চরণ ছুঁয়ে যাক এই সামান্য প্রবন্ধ এবং তাঁরই আশীর্বাদে দূর হোক লেখাটির সমস্ত ভুল ত্রুটি, – পরিশেষে এই কামনাই রইলো।

গ্রন্থঋণ :

১. দাস, উজ্জ্বলকুমার, সম্পাদিত(২০১৩); শতমুখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা-৭৩। সাহিত্যম।

২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল(১৯৯৬); ছোটদের বাছাই গল্প। কলকাতা-৬। রূপায়ণী।

৩. ঘাটী, রতনতনু (২০১৩, জানুয়ারী-মার্চ); 'তাঁর কিশোর সাহিত্য বৈচিত্র্যে ভাস্কর'। বইয়ের দেশ। কলকাতা-৭০০০৬০। এবিপি প্রাঃ লিমিটেড।

৪.গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯৫); কিশোর রচনাসংগ্রহ। কলকাতা-৭৩। নির্মল বুক এজেন্সি।

৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৮৯); সেরা বারো। কলকাতা-৬। রূপায়ণী।

৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (২০০৫); কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র। কলকাতা-৯। পত্র ভারতী।

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল(১৯৯৩); কাকাবাবু সমগ্র ১। কলকাতা- ৯। আনন্দ।

৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (২০০১); দশটি কিশোর উপন্যাস। কলকাতা-৯। আনন্দ।

৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯২); কবিতা সমগ্র ১। কলকাতা-৯। আনন্দ।

১০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯২); কবিতা সমগ্র ২। কলকাতা-৯। আনন্দ।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাষাশৈলী: একটি পর্যালোচনা

সুলগ্না ব্যানার্জী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বাংলা কবিদের বিশেষত, তিরিশের দশকের কবিদের কবিসত্তার পাশাপাশি গদ্যকার হিসেবে প্রতিভা অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে এঁদের কবিতার ভাবগত ও প্রকরণগত পার্থক্য খুব সহজে চোখে পড়ায় তাঁরা আধুনিক কবি হিসেবে আখ্যাত। কিন্তু আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা নতুন গদ্যরীতির দাবীদার। এই নতুন গদ্যরীতির আবহ সৃষ্টিতে 'পরিচয়' ছাড়াও 'কবিতা' পত্রিকা রয়েছে। তাঁরা সুশিক্ষিত, সুপঠিত, দেশি-বিদেশি ধারার সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে। কবিতার মতো এঁদের গদ্যেও মাটির মানুষের দাবি ও অধিকারের প্রসঙ্গ এসেছে, আবার আধুনিক-মনা বিদেশি কবিদের প্রতিও আশ্চর্য ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

কবিতা লিখতে লিখতে কবিতার ভাব, বিষয়, গঠনবৈচিত্র্য ইত্যাদি নিয়ে তিরিশ-চল্লিশ দশকের কবিদের মধ্যে নব নব চিন্তা ভাবনার যে প্রতিফলন ঘটেছিল তারই সূত্র ধরে একের পর এক প্রবন্ধ লিখতে এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পরিবেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পদক্ষেপ যখন ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল তখনই এদেশের লেখালেখিতে লেগেছিল পরিবর্তনের ছোঁয়া। সে সময় বাংলা গদ্য সাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। মূলত 'পরিচয়' পত্রিকার সূত্র ধরে কখনো সম্পাদকীয় নিবন্ধ, কখনো গ্রন্থ পর্যালোচনা, কখনো সরাসরি বিশুদ্ধ প্রবন্ধ লেখবার জন্য কলম ধরেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।

মাত্র দুটি প্রবন্ধ সংকলনের ভিত্তিতে সুধীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত – (i)'স্বগত' (১৯৩৮) এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭)। এই প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির প্রাপ্ত প্রবন্ধের ভিত্তিতে তাঁর রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৩৮। বৈচিত্র্যগত ভাবে প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল–

১। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। সম্পাদক ও প্রাবন্ধিক-সত্তার পাশাপাশি তাঁর কবি-সত্তার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। 'স্বগত' থেকেই তাঁর প্রবন্ধের বিষয়-ভাবনা স্পষ্ট–

> ''উনিশ শতকের বাঙ্ময় প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্থায়ী কাব্যে আমি স্বপ্রাধান্যের চিহ্ন দেখি না এবং প্রতিকূল শিশুশিক্ষার পরেও প্রকৃত কবির সংসর্গে আমার আত্মোপলব্ধি জাগে।''[১]

সুধীন্দ্রনাথের কবিসত্তার প্রথম ভাবনার দিক ছিল কবিতার উৎস ও পরম্পরা সম্পর্কে। তাঁর দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থ 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ'-এ এর নিদর্শন পাই। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কাব্যের মুক্তি' তে কবিচিত্তের নানা জিজ্ঞাসা এবং উত্তর মেলে। বিংশ শতাব্দীর কাব্যের মুক্তির প্রশ্নটি আকাশ ছোঁয়া হয়ে উঠেছিল সুধীন্দ্রনাথের কাছে।

২। বিংশ শতাব্দীর কাব্য-মুক্তি প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ নৈর্ব্যক্তিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন ও সংশয় থেকে যায়। একালের অনেকেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা কীটসের চেয়ে কম ব্যক্তিগত কবিতা রচনা করেন নি, তবুও বিশ শতকের অধিকাংশ অ্যাংলো-স্যাকসন্ প্রভাবশালী কবি এবং আমাদের আধুনিক অগ্রনায়কেরা নৈর্ব্যক্তিকত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন। সঙ্গত কারণে বিশ শতকের কবিতা ওদেশের অধিকাংশ উনিশ শতকীয় কবিতা কিংবা প্রাক্-পুনশ্চ রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মতো তপ্ত ও ঘনিষ্ঠ নয়। তাই সুধীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছিলেন–

> ''ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিতায় আর যাই থাকুক ব্যক্তিত্বের যে ছড়াছড়ি ছিল না, এ সত্যের সাক্ষ্য-স্বরূপ বাল্যজীবনের অধ্যাপকীয় অনুশাসনগুলোর স্মরণই যথেষ্ট।''[২]

৩। বিশ শতকের ভারতীয় তথা বিশ্বের পটভূমিতে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বীক্ষাটিকে গড়ে তুলেছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তব বিশৃঙ্খল নানা কারণে। সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু বাস্তবকে ত্যাগ বা অস্বীকার করেন নি। তাঁর সোহংবাদ তাই অহংকে বড় করা

নয়, বরং জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ কল্পনার সূত্রে বৃহত্তর বাস্তব ও ব্যক্তির, কবি ও সমাজের, বিষয় ও রূপের একান্ত অর্জন। পারিপার্শ্বিক নাস্তিককে সংহত বীক্ষায় আনার জন্য যে বিশুদ্ধ চৈতন্য তিনি চান, তা আসলে মানুষ ও তার পরিমণ্ডলের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য। এই লড়াই তিনি অর্জন করেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। আবার, সুধীন্দ্রনাথ কোনো সময়ই শিল্পী ও শিল্পকে বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ম্ভূ ভাবেন নি। সমাজ ও বাস্তবের সঙ্গে সংলগ্ন করেই তাকে দেখতে চান। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস ও নন্দনতত্ত্ব-এই দুইই ব্যক্তির জ্ঞান।

৪। কাব্যের দুরূহতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'ধ্রুপদ-খেয়াল' প্রবন্ধটিতে। পাঠকের কাছে কবি যে কারণে দুরূহ হয়ে ওঠেন, তার পরিচয় তিনি দিয়েছেন -

> ''কাব্য বিবেচনার জন্মদিন থেকে প্রত্যেক সমালোচক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন তা এই, লেখক অধোগতির ধাপে নেমে পাঠকের পাশে দাঁড়াবে, না পাঠক সিঁড়ি বেয়ে লেখকের স্তরে উঠবে।''[৩]

আসলে আমাদের মনের অতলে রয়েছে যে অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে ঘুমন্ত মঞ্জুষা, নতুন অভিজ্ঞতার ধাক্কায় তার মধ্যে মন্থন ঘটে, যা মনে আবেগ ঘনিয়ে তোলে। সেই অভিজ্ঞতায়, আবেগে পাঠক যখন কবিতাটিকে চিনে নেয়, তখন তা আর দুরূহ থাকে না। কেননা সেক্ষেত্রে প্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায়।

৫। সুধীন্দ্রনাথ কবি হয়েও ঔপন্যাসিকদের মৌল প্রতিষ্ঠা, জীবনবোধ নিয়ে স্বচ্ছ বক্তব্য রেখেছেন। তিনি উপন্যাসের তত্ত্বগত দিক ও বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের রচনা নিয়ে ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যে পণ্ডিত হওয়ায় বেশীরভাগ আলোচনা ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের নিয়ে। লরেন্স, ভার্জিনিয়া উলফ্, হেমার্ন ব্রখ, দাউলি, গোর্কি, বার্নার্ড্ শ প্রমুখের এবং একমাত্র বাংলা ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসের আলোচনা পাওয়া যায়।

সুধীন্দ্রনাথ দেখেছেন তাঁর সাহিত্যের দুটি পর্যায়– যুদ্ধ পূর্ববর্তী এবং যুদ্ধ-পরবর্তী। যুদ্ধ-পরবর্তী সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব দেখা যায় এবং এই নৈরাজ্যের যুগে যেখানে নিজের চিন্তা আর বক্তব্যে বিভেদ আছে, সেখানে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়তে বাধ্য। সেজন্য –

> ''যুদ্ধের পর লরেন্সের যে পুস্তকাবলী বেরোয় সেগুলির অধিকাংশ পড়ে স্বতই সন্দেহ জাগে যে, তিনি বুঝি সাহিত্যের প্রাক্তন সংস্কার ভুলে গেছেন এবং তাঁর ইদানীন্তন লেখায় আবেগের অভাব নেই বটে, ভাবুকতার প্রমাণও তাতে প্রচুর। কিন্তু বইগুলির রূপ-পরিকল্পনার কোনও সার্থকতা পাঠকের কাছে ধরা দেয় না বলেই আমার বিশ্বাস।''[৪]

তবুও লরেন্সের চেয়ে পশ্চিমী পাঠক ও সমালোচকদের কাছে ভার্জিনিয়া উল্ফই বেশি জনপ্রিয়। চরিত্র ও পার্শ্ব চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা তিনি বড় কাজ বলে মনে করেন নি, তবে পাত্র-পাত্রীর পরিকল্পনায় একটা স্থিতিস্থাপকতা থাকা আবশ্যক এবং তারাও যে স্বায়ত্তশাসিত একথা মানা দরকার। এবং এজন্যই পাশ্চাত্য উপন্যাস সাহিত্যে তিনি অপ্রতিহত।

৬। গদ্য রচনায় সুধীন্দ্রনাথের মূলকথা যুক্তি। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তিনি লেখেন নি। তাই যেকোনো লেখকের সম্বন্ধে আলোচনায় যে কোনো ধরনের মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন নি। তাই সমস্ত আলোচনার মধ্যেই রয়ে গেছে নিজের যথার্থ মত প্রতিস্থাপনের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সংস্কার মুক্তি তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও তিনি আধুনিক ধ্বংস উন্মাদনার পক্ষপাতী ছিলেন না। পুরাতনের মধ্যে নবীনের প্রাণস্পন্দন সন্ধান করেও তিনি বিপ্লবাত্মক। সুধীন্দ্রনাথ এই ভাবনার দীক্ষা নেন লিটন স্ট্রেচির থেকে।

৭। ছন্দ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের কান ছিল অত্যন্ত প্রখর। কারণ মালার্মে-পন্থী কবি শব্দকে কাব্যের উত্তরাধিকার ভেবেছেন। তিনি ছন্দে যথেচ্ছাচারী ছিলেন না। কিন্তু শব্দ নিয়ে ছন্দকে বৈপ্লবিক করার মনস্ক ছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন অনুভূতিপ্রবণ। সুধীন্দ্রনাথের ছন্দ চিন্তায় নিজস্ব বোধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ চিন্তাকে গ্রহণ করেছিলেন। এবং অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়কে ছন্দ আলোচনার প্রাণপুরুষ বলে চিহ্নিত করেন। তিনি ছন্দ-চিন্তার ধারাকে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরেন, যেমন– অযুগ্ম-চরণ বলতে অযুগ্ম মাত্রা, অক্ষরকে মাত্রারূপে গণ্য করা অবৈজ্ঞানিক, মাইকেলকে শ্রদ্ধা জানিয়েই তাঁর মনোভাব অমিত্রাক্ষর কৃত্রিম হওয়ায় তা সর্বত্র অবাধ নয়, বাংলা ছন্দে দল, কলা, মিশ্র ছাড়াও প্রত্ন-কলাবৃত্তকে প্রাধান্য দিয়েছেন কবি, যার এক নাম ভাঙা জয়দেবী ছন্দ, মুক্ত ছন্দের ভাষা গৃহকর্মের ভাষা নয়– উন্নীত চৈতন্যের ভাষা, ছন্দ দ্রষ্টব্য সামগ্রী নয়-শ্রাব্য বস্তু, ভারতচন্দ্রই আমাদের প্রথম অব্যবহিত বাংলা ছন্দের শৃঙ্খলাকে বুঝিয়েছিলেন, স্বরকম্পনই বাংলা ছন্দের প্রধান উপকরণ।

৮। বিশ শতকের কাব্যচর্চায় T.S. Eliot অনেকটা স্থান জুড়ে রয়েছেন। বিশ ও তিরিশের দশকের বাঙালি কবিরা অনেকাংশেই এলিয়ট দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ তাই তাঁর কবিতা-কেন্দ্রিক আলোচনার নানা প্রবন্ধে এলিয়টের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এলিয়ট সম্পর্কিত যে কথাগুলি বলেছেন তা হল–

কাব্য রচনার জন্য বুদ্ধি, শিক্ষা, বিদ্যা, সাধনা-সংযমের প্রয়োজন। সম্প্রসারণ কবির লক্ষ্য হওয়া উচিত। কাব্যের ব্রত পাঠক চৈতন্যের উদ্বোধন। কাব্যদর্শনের মূল কথা হল, মানব-মস্তিষ্কের সেই চিন্তাশক্তি যার চেষ্টা বিসম্বাদ ঘোচায়, যার অধ্যবসায় বচন-বিরোধের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতি আনে। প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজস্ব প্রণালীর সংযোগ সাধনাই কাব্যরচনার আদর্শ হওয়া উচিত। বিষয় নির্বাচনে কবির স্বাধীনতা যদিও অনন্ত, তবুও বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে কবিতার মৌলিকতা বা সাফল্য জড়িত নয়। কবিতা চিত্রময় হয়ে উঠবে এবং প্রতীকের ব্যবহার বাঞ্ছিত। কবি নিজস্ব কাব্যাদর্শ তুলে ধরবেন কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে।

৯। কবিদের বুদ্ধি-সাধনার দরকার প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিক্ষা, চিন্তা, সাধনা, সংযমের ধারা কাজ করেছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের সঙ্গে সুপরিচিত সুধীন্দ্রনাথ কবিদের শিক্ষা সাধনাকে একান্ত জরুরি মনে করেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—

> ''যিনি মহাকবির মর্যাদা দান তাঁর পক্ষে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির দক্ষ নির্বাচনই যথেষ্ট নয়। সেজন্য প্রাচীন ও অর্বাচীন কাব্যরচনার যথাযথ মূল্য বিচারও অত্যাবশ্যক।''[৫]

১০। সুধীন্দ্রনাথের 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে আছে এদেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনা। এখানে রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার মূল্যায়ণ করেছেন। এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে কবি ও কবিতা বিষয়ক ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যভাবনার প্রবন্ধগুলিতে সুধীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে গদ্যের সংযত পরিমিত প্রয়োগ বিষয়ের সুগভীর চিন্তাকে নিবিড় করেছেন। তাঁর কাছে বিষয়ী অপেক্ষা বিষয় সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে কাব্যবোধ, কাব্যতত্ত্ব, কবিতাশৈলী নিয়ে আলোচনা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এখানে ব্যক্ত। সুধীন্দ্রনাথ তাকে অদ্বিতীয় বলতে চান। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একাধিক মন্তব্য তাঁর নিজস্ব এবং গুরুকে প্রণাম নয়, গুরুর সামনে উপযুক্ত শিষ্যের সাহসের যথার্থ পরীক্ষা। কল্লোল নতুনভাবে কাব্যভাবনায় ধাক্কা দিলেও সুধীন্দ্রনাথ নিজেকে রবীন্দ্রভাবনাতেই নিয়োজিত রেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছর দশেকের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত সাহিত্য ভাবনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূল্যায়নের যে সূত্রগুলি নির্দিষ্ট করেন তার আলোচনায় সেগুলি বাস্তবিক অর্থে একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত এক প্রাবন্ধিকের সাহস, সত্যভাষণের অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মিক উন্মোচনের বিচার ও বিবেকের আলোকিত মঞ্চ—

> ''ভারতবর্ষে জীবিত লেখকদের মধ্যে শুধু একজন ব্যক্তি প্রাচীনদের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি রবীন্দ্রনাথ। এবং তাঁর আসন যেহেতু ব্যাস-বাল্মীকি, হোমর দান্তের সমপর্যায়ে, তাই তাঁর পাশে সাম্প্রতিকেরা তেমনই নিষ্প্রভ যেমন দীপ্তিহীন সূর্যের চতুর্দিকের উপগ্রহেরা। তথাচ তিনিও শেষ পর্যন্ত প্রাগুক্ত বিধানের বশবর্তী। এবং আজ আর তাঁকে কোনও বিশেষ অবদানের গুণে অপ্রতিম লাগে না। তাঁর সমগ্র অভিব্যক্তির বিস্তারেই তিনি এখনও অদ্বিতীয়।''[৬]

১১। সাহিত্য ভাবনার প্রবন্ধগুলিতে সুধীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে গদ্যের সংযত পরিমিত প্রয়োগে বিষয়ের সুগভীর চিন্তাকে নিবিড় করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে বিষয়কে প্রোজ্জ্বল করেছেন। নিজের শিল্প ভাবনাকে চেনাতে 'শিল্প ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে লেখক নিছক শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় এনেছেন প্রাচীন বেদ-বেদান্তের প্রসঙ্গ, বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমের ক্ষেত্রে নিজের শিল্প ভাবনাকে সক্রিয় করে একাধিক মন্তব্য করেছেন। শিল্প ও অচৈতন্যের আদান-প্রদান বিংশ শতাব্দীর অপবিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়। তাই প্রাচীনেরাও বোধহয় তাকে প্রেরণা বলতেন। নিরপেক্ষ শিল্প তথা নিরাসক্ত সাহিত্য আপাতত সোনার পাথরবাটি অথবা আকাশ-কুসুমের মতো নিরপেক্ষ সামগ্রী।

১২। একদিকে জড়বাদী মার্কসবাদ আর অন্যদিকে অধ্যাত্ম বিশ্বাসে চিহ্নিত বেদবেদান্ত - এসবের আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে নানা বিপরীত চিন্তার জট গড়ে উঠেছে। তিনি প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের দিকপালদের আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদের পক্ষে তাঁর মন্তব্য পেশ করেছেন। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত মার্কসবাদে যথার্থ আস্থা কোনদিনই রাখতে পারেন নি। তবু তা বর্তমান সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও সমর্থকদের কাছে প্রনিধানযোগ্য—

> ''আমার বিশ্বাস আধুনিক মনোবিজ্ঞান মার্কসের অনুগামী, এবং নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের ইতিহাসের পরিণামী প্রকষ্টের পদধ্বনি শুনুন বা না শুনুন অন্তত এ বিষয়ে তাদের মতান্তর নেই যে ব্যক্তি সেকালে সমাজ ব্যবস্থার দাস আর সমাজ ব্যবস্থা ভূত-প্রকৃতির মুখাপেক্ষী তখন নিরঞ্জন বিবেক কবিকল্পনার পরাকাষ্ঠা এবং নির্লিপ্ত বিবেচনা আবশ্যিক পক্ষপাতের নিমিত্ত মাত্র।''[৭]

১৩। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয়গত ব্যাপ্তি অসামান্য অসাধারণ দক্ষতায় তিনি বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস্, পাউণ্ড থেকে অগ্রজ, অনুজ ও সমকালীন

কাব্য জগৎ। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার কাব্যে উক্তি ও উপলব্ধির বিষয়ে অনৈক্যের ছায়াপাত দেখা যায়, তাই তিনি কাব্যে মুক্তির তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

যুক্তিধর্মী অনুবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে সমালোচক প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন তাঁর আলোচনায়। যেমন—

রবীন্দ্রনাথ : ''মানুষের মত এত বড় একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিৎ ছিল,...''[৮]

প্রমথ চৌধুরী : ''আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক। শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন।''[৯]

ধূর্জটিপ্রসাদ : ''শীতের পর নির্জলা দেশের দিগন্তব্যাপী মাঠে খড়ের গাদায় আগুন লেগেছে তারই একটি লেলিহান শিখা যেন মূর্তি নিয়েছে সহরের মধ্যে, এইটুকুই অশোভনতা।''[১০]

অন্নদাশঙ্কর : ''খারাপ মেয়ে সুন্দর মেয়ে আমি কি তোমাকে চিনতে পারি নি? সুন্দর মেয়ে খারাপ মেয়ে, তুমি কি আমাকে ভুল বুঝতে দিয়েছিলে?''[১১]

সুধীন্দ্রনাথের মতে অসাধারণ মনীষার অধিকারী বুদ্ধদেব বসু, নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার ব্যক্ত করতে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মূলত রোমান্টিক বলে তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য পূর্বসূরীদের স্বাক্ষর থাকলেও আত্মউপলব্ধিতেও সার্থক আনন্দের প্রসারে তাঁর কবিতাগুলি ভাস্বর।

১৪। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ডি.এইচ.লরেন্স, ভার্জিনিয়া উল্ফ, গোর্কির গল্প-উপন্যাসে, ইবসেনের নাটকে, অদ্বৈত দর্শন থেকে বৌদ্ধ দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের প্রান্তরে এবং তার থেকে ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডে অনায়াস পদচারণা করেছেন মহারানীর রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডে সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ হুইগ টোরির মতানৈক্য তার পরিপ্রেক্ষিতে কবিদের রাজ-অনুগ্রহ পাওয়া ইত্যাদিকে অবলম্বন করে সুধীন্দ্রনাথ যেন তকালীন ইংল্যাণ্ডের একটি সামাজিক দলিল তুলে ধরেছেন 'আঠার শতকের আবহ' এবং 'ভিক্টোরীয় ইংল্যণ্ড' প্রবন্ধের মাধ্যমে।

১৫। সুধীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে মর্ত্য পৃথিবীর মানবতাকে ধ্রুব বলে মনে করেছেন এবং ফ্রয়েড ও ইয়ুং কথিত মনোবিশ্লেষণের সূত্র ত্যাগ করে মার্কসীয় সীমাবদ্ধতার যুক্তি তর্কে পুষ্ট করে চিরন্তন মানবতার পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের বহু পঠনজাত মেধাবী অভিজ্ঞতা তাঁকে তাঁর আন্তর্জাতিক উদার স্বভাব ভাবনার পথে নিয়ে যায়। তাই তিনি সেখানেই মানবতার কথা ভেবেছেন সেখানেই এনেছেন বিশ্বমানবতার প্রসঙ্গ। 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে বিজ্ঞানীদের সীমিত চিন্তাশক্তির কথা বলে দেখিয়েছেন ওরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবিশ্বাসকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আর তাই সুধীন্দ্রনাথের মেরুভাবনা এঁদের থেকে পৃথক। ফ্রয়েড, মার্কস, ইয়ুং, এঙ্গেলস, মেকিয়াভেলি, বার্কলে, ভিসতে প্রমুখ একাধিক বিচিত্র অভিজ্ঞতার লেখক, দার্শনিক সমাজতত্ত্ববিদ ও মনস্তত্ত্ববিদদের প্রসঙ্গ এনে তাঁদের প্রদত্ত সূত্র বিচার করে সুধীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে জগৎ, মানুষ শিল্প ও নন্দনতত্ত্বকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন।

১৬। সার্ত্রের অস্তিবাদ ও সেই ভাবনায় বৈপরীত্যজনিত সংকট, বিজ্ঞানের আদর্শ সন্ধান, মনুষ্য ধর্মের প্রয়োগ ও আলোকময় প্রসারতা, ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের কেন্দ্রস্থ স্বভাব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সুধীন্দ্রনাথের আলোচনা এক বৈজ্ঞানিক সত্তার প্রদর্শন করে। তিনি জেনেছেন ও বুঝেছেন যে, বর্তমান জগৎ কুসংস্কারপ্রবণ এবং বিজ্ঞান মানুষেরই জ্ঞানের ক্ষুদ্র অংশ- একথা মানুষ ভুলেছে বলেই আমরা সর্বাঙ্গীণ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি—

> ''সেজন্য বিজ্ঞান দোষাবহ নয়, বৈজ্ঞানিকেরাই অপরাধী, এবং তারা যে কালের মানুষ তখন সন্তর্পণ শুচিবায়ুর আড়ালেও মানুষী অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ তাদের বর্তাতে বাধ্য।''[১১]

১৭। কাব্যে তথা সাহিত্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার এবং তার সন্ধান সুধীন্দ্রনাথের বিশেষ ধ্যান আকর্ষণ করেছে। তাঁর মতে, আমাদের বিভিন্ন অনুভূতিগুলি ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়। সুতরাং, মানবমনের উচিত সনাতনকে জানার প্রচেষ্টা করা। নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে তবেই বিচার সংবেদনা ভুল না নির্ভুল। কারণ, মানুষ নিজের আত্মচেতনায় সবকিছু উপলব্ধি করতে পারে।

১৮। সৌন্দর্যের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের মতো সুধীনন্দ্রনাথও অনুভব করেছিলেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেক ভাষারই একটি স্বাধিকার রয়েছে। ভাষা যে রূপ গড়ে তোলে সেই বাহ্যিক রূপটি সৎ কবির কাম্য, শব্দকে অস্বীকার করে নয়। তবে যদি সাহিত্যে শুধু রূপ বর্ণনা থাকে, তাতে যদি রূপ সৃষ্টি না হয়, তবে তা কারুশিল্প হলেও ললিতকলার সৃষ্টি করে না। কারণ তাতে নিজস্বতা থাকবে না। এই জিনিসটিকে গদ্যের সনাতন লক্ষ্য বলে মনে করা হয়। কোনো শিল্প সৃষ্টিই যখন কবিতায় মূর্তিলাভ করে, তখনই তা যথার্থ রূপ পরিগ্রহ করে। তাই প্রতিটি জিনিসে ধ্যানের

যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন সত্যের সার্থক সমন্বয়। এই সত্য রূপকারী বিবেকের খেয়াল খুশিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই সৌন্দর্য বিচারে সত্যের উপস্থিতি আবশ্যক।

১৯। সুধীন্দ্রনাথ বারংবার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনের পটভূমিতে ঘোরাফেরা করেছেন। তার ফলে তিনি অনুভব করতে পেরেছেন ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে মার্কস বা স্পেংলার কেউই যথার্থ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, উভয়েই জড়বাদী। সুধীন্দ্রনাথের কৈশোরের হেগেল-ভক্তি বার্ধক্যে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে এসে মিশেছে। তাঁর মতে, পশ্চিমের ভাবধারা যেমন ব্যক্তি ও জাতির অধিকারকে খুঁজেছে, তেমনি পূর্বের ধ্যানধারণা খুঁজেছে অনির্বচনীয়তাকে।

২০। প্রগতি ছাড়া যে সাহিত্য-সংস্কৃতি আস্বাদন করা যায় না, একথা সুধীন্দ্রনাথ অন্তর থেকে উপলব্ধি করেন। তাঁর কাঙ্ক্ষিত সাহিত্যে প্রগতি কখনোই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নি। তাঁর গদ্যে যে কবিতার প্রবণতা দেখি সে সম্পর্কে জীবনানন্দের মন্তব্য যথার্থ–

> ''আধুনিক সাহিত্যে প্রায় বারো আনা তথাকথিত প্রাগ্রসর কবিতার চেয়ে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বেশি প্রবীণ। তাঁর নিজের এষণার কবিতালোকে তিনি আধুনিক, প্রায় সকল কবির চেয়ে বেশি আন্তরিক নন কি!''[১২]

২১। বাংলা সমালোচনায় আধুনিকতার যে হাওয়া 'পরিচয়' পত্রিকার হাত ধরে এসেছিল, তার পুরোধা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমকালীন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এলিয়টের সমালোচনা পদ্ধতিকে পরিচিতি দেন এদেশে সুধীন্দ্রনাথ। এলিয়টের বিচার পদ্ধতিতে তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন– (১) Objective Correlative, (২) Unified Sensebility, (৩) Convensational Speech. কবিতার বিচারে এই মানদণ্ড ব্যবহার করে বাংলা সমালোচনায় নব সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আধুনিক কাব্যকলা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমাদের কাব্যভাবনাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করে। সুধীন্দ্রনাথ মনে করেন এজরা পাউণ্ডে যে কাব্য-চিন্তার সূত্রপাত, এলিয়টে তার পরিণতি। এলিয়ট সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল, ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত যে ভবিষ্যতেও তিনি পূজ্য।

২২। সমালোচক সুধীন্দ্রনাথের বিশেষ বিচার পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্র-কাব্য সমালোচনায়। লিরিক কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে গদ্য পদ্যের নির্বিরোধ চেয়েছিলেন। ছন্দের আলোচনায় নেমে মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত প্রবহমানতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দের আদি উৎসের সন্ধান পান। যথার্থ্য ও প্রবহমানতার যে দুই

গুণে কথোপকথনের ঢঙ ধরা পড়ে, গদ্য পদ্যের নির্বিরোধ ঘটে, তার আংশিক সাফল্য সুধীন্দ্রনাথ 'লিপিকা' র গদ্যে লক্ষ্য করেছেন। আধুনিক কাব্যচর্চায় রবীন্দ্রচর্চা যে অত্যাবশ্যক, বাংলা কবিতায় গদ্য পদ্যের নির্বিরোধ ঘটাতে হলে যে রবীন্দ্র ছন্দচর্চা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের নানা ছন্দ নিরীক্ষা যে বাংলা ছন্দের মুক্তির ভিত্তিভূমি এই চিন্তা চেতনাই মূলকথা। তাঁর মতে–

> ''আজ আর তাঁকে কোন বিশেষ অবদানের গুণে অপ্রতিম লাগে না, তাঁর সমগ্র অভিব্যক্তির বিস্তারেই তিনি অদ্বিতীয়। ... এ কবির কাব্যোপজীবিকা একেবারে সংস্কারে মুক্ত, এমনই সংস্কার মুক্ত যে চিরন্তন প্রসঙ্গেও ইনি কবি-প্রসিদ্ধির ধার ধারেন না, সর্বত্র অন্য সমস্ত ভুলে উক্তি ও উপলব্ধির সহযোগে খোজেন।''[১৩]

এইসব মন্তব্যে লক্ষণীয় যে, সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রকাব্যে অনুভূতির ঐক্যবোধ ও রবীন্দ্রছন্দে কথ্য-ছন্দ খুঁজেছেন। এই দুটি ক্ষেত্রে কাব্যের মুক্তি সম্ভবপর।

এই সমালোচনার ক্ষেত্রে মুক্তির ধারায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমালোচনার ধারা শুরু। তাঁর সমালোচনায় তিনি কথ্যছন্দের প্রতি মনোযোগ, গদ্য পদ্যের নির্বিরোধ সাধন, আবেগের পরিবর্তে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূত্রপাত করলেন।

সুধীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলীর প্রয়োগ দক্ষতা :

যখন কোন কবি গদ্য রচনায় ব্রতী হন, তখন তাঁর গদ্য বিশিষ্ট গদ্য, যার যোগসূত্র খোঁজা যেতে পারে কবির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা অর্থাৎ কবির কবিতাতেই। কবির গদ্য কাব্যিক হবে, এমন নাও হতে পারে। গদ্যের নিজস্ব এক শিল্পিত ছন্দ আছে, যা গদ্য বা কবিতার সাধারণ ছন্দ থেকে আলাদা। ধ্বনি এবং শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের উপর সেই শিল্পিত ছন্দ নির্ভর করে।

তিরিশের যুগে 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ পরিচয়, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে এক ধরনের আধুনিক রীতি এল, যা রবীন্দ্র-রীতির শৈল্পিক দিকটা গ্রহণ করে রবীন্দ্রোত্তীর্ণ। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যে একাধিক স্টাইলের আবির্ভাব ঘটেছে। ভাষাগত জ্ঞানের জন্য ইংরেজি গদ্য সাহিত্যই বাংলা গদ্যের পথ-প্রদর্শক। এই 'পরিচয়' পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য যেমন বিষয়বৈচিত্র্যে ভরপুর, তেমনি তাঁর গদ্যের ভাষাও দুর্বোধ্য হলেও নিজস্ব বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্য যুক্তি সহকারে সুন্দর ছন্দভঙ্গিতে

উপস্থাপিত। কথ্য ভাষার উপর জোর দিয়ে জানিয়েছেন যে, রীতি ও রচয়িতা অভিন্ন হলেও তাঁর কাছে বিষয়ীর বিষয়-নিষ্ঠাই উপজীব্য। ভাব ও ভাষা তাঁর কাছে সমমর্যাদা সম্পন্ন বলে তাতে নিজের বিশ্বাসের অগ্রগতি দেখেছেন।

১। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যভাষা বিজ্ঞান নির্ভর। তাঁর রচনায় ব্যক্তি ভাবনার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে ধারাও পাল্টেছে। এর প্রতিফলন আমরা সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে পাই -

> ''বহির্জগৎ হয়তো জ্ঞাতারই বিবিধ অংশ, এর জ্ঞান সেই অংশ সমূহের সামঞ্জস্য সাধক, কিন্তু সংখ্যাভূয়িষ্ঠতাই যেকালে জ্ঞানের মুখ্য সম্বল তখন স্বয়ং সম্পূর্ণ মন তার উপকারে লাগে না বহুলাঙ্গ দেহেই সে সন্তুষ্ট।''

২। চলতি ভাষার বাংলা গদ্যে স্থাপত্যধর্মিতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা গেছে সুধীন্দ্রনাথের রচনায়। গাঢ়বদ্ধ গুরুধ্বনি সংস্কৃত শব্দের সমাবেশে উদ্ভূত, নিগূঢ় ব্যঞ্জনাময় ভাষা রচনায় সুধীন্দ্রনাথের সিদ্ধি বিস্ময়কর। তাঁর রচনায় জার্মান স্থাপত্যধর্মিতা অনুভব গোচর। সুধীন্দ্রনাথ কথ্যভাষায় বাংলা গদ্যে যে দৃঢ়ভাব গাম্ভীর্য এনেছেন তাতে অবশ্যই চলতি ভাষার ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ। তাঁর গদ্যের ভাব ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রতীতিগম্য, বাচ্যার্থ অতিক্রম করে ব্যঙ্গার্থে ধ্বনি তার পরিস্ফুরণ। তাঁর জটিল চিন্তারাশিকে সুসমরূপ দিতে গেলে জার্মান ছাঁদের গুরুগম্ভীর এবং সংস্কৃত প্রধান চলতি ভাষার আশ্রয় না নিলে উপায় ছিল না –

> ''যাঁরা স্মৃতিকে ভয় পান না, অন্তত গেস্টাল্ট নামক স্নায়বিক রূপকল্পে যাঁদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁরা হয়তো বহির্জগতে না ঢুকেও স্বকীয়া পরকীয়া সংবাদ শোনেন। কিন্তু তাহলে ব্যক্তিকে আর অবিভাজ্য ও কালাতীত ভাবা চলে না। কালপ্রবাহের বুদ্বুদ পরম্পরায় তাঁর উপমা খুঁজতে হয়।''

৩। বাংলা ভাষা যে কত ভার বহনক্ষম তা 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ'-এর ভাষা প্রমাণ করে। গ্রন্থদুটিতে চলতি বাকভঙ্গির সঙ্গে দুরূহ, দুর্বোধ্য তৎসম শব্দের সমাবেশ হয়েছে। তাঁর লেখার এই দুর্বোধ্যতার অভিযোগের জন্য সুধীন্দ্রনাথ দুঃখবোধ করেছেন– ''বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত।'' তিনি মনে করেছেন, হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা বর্ণশঙ্কর ঘটিয়ে তিনি যে অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছেন, তার জন্য তিনি গুরুজনদের নিন্দার পাত্র হয়েছিলেন। আর ঐ অহেতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা তাঁর কাছে সাধ্যের অতীত।

৪। সুধীন্দ্রনাথ উপভোগ্য ভাষায়, ভঙ্গিতে লঘু ভাষার নিদর্শনও রচনা করেছেন –

> ''সেজান যখন গোলবাড়ির চুনকাম করা দেওয়ালে সুন্দরের স্বাক্ষর খুঁজছিলেন তখন বাষ্পাকুল সুইনবার্ন কুঞ্জান্তরে ছুটেছিলেন বনদেবীর

> অভিসারে। অতিমত্ত আর্টের অন্তিম রিক্ততা এখানেই পরিস্ফুট টেনিসন ও সুইনবার্ণের বিরাট কারবারের দরজায় হঠাৎ লালবাতি জ্বালার ফলেই বোধহয় সেদিনকার কবি মহলে হিসাব পরীক্ষার অত ধূম পড়েছিল।''

এর ব্যঙ্গ রস নিঃসন্দেহে উপভোগ্য।

৫। সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার তাঁর রীতির সঙ্গে যেখানে পার্বতী-পরমেশ্বরের সম্পর্কে আবদ্ধ, সেখানে উভয়কে পৃথক করে লেখকের ব্যবহৃত দুরূহ শব্দাবলী সুবোধ ভাষায় রূপান্তরিত করলেও পাঠকের সুবিধা হলেও লেখকের রচনারীতি বিলুপ্তির আশঙ্কা থেকে যায়–

> ''মহাকবিরা নিজেদের ভাষা নিজেরা বানিয়ে যান বটে, কিন্তু সে ভাষা যখন চূড়ান্তে পৌঁছায় তখন তার মধ্যে শোনা যায় নিত্য নৈমিত্তিক উক্তি প্রত্যুক্তির প্রতিধ্বনি।''

বুদ্ধদেব বসু তাঁর রচনায় 'আবিষ্কারের আনন্দ' পেলেও কথ্যছন্দ সচেতনতা ও প্রকরণ সচেতনতার পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়।

৬। শব্দ চয়ন, পরিভাষা ও শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গদ্যে তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব শব্দ স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ শব্দ, বিদেশি শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে বিষয়ভাবনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য দর্শন, কাব্য-কবিতা বিজ্ঞানের জগতে ঘোরাফেরা করেছে, তেমনি তাঁর শব্দ চয়নে বিভিন্ন ধরনের শব্দ আসাটা স্বাভাবিক।

৭। যুক্তিকে দৃঢ় করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষ্যের বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা গদ্যকে দৃঢ়তা দান করে সুন্দর বাক্যবন্ধ সৃষ্টি করেছে। যেমন– ঐশী অতৃপ্তি, কারয়ত্রী জীবনযাত্রা, ভাবয়িত্রী সমালোচনা (স্বগত), অতিচেতন বুদ্ধি (উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য), অতিব্যক্তি আবেগ (ঐতিহ্য ও টি.এস.এলিয়ট), রসালু ভাবালুতা (ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ)।

৮। সুধীন্দ্রনাথ বাক্য সংকোচন করে অনেক কথাকে একটি শব্দে প্রয়োগ করেছেন। যেমন– ঋনিত্র (অনার্য সভ্যতা), দ্বিরানন (অদ্বৈতের অত্যাচার), ক্ষিতিজ (অদ্বৈতের অত্যাচার), বৈনাশিক (লিটন স্ট্রেচি), নৈয়ায়িক, পৌত্তলিকতা (স্বগত)।

৯। বাংলা গদ্যে প্রত্যয়ান্ত শব্দের ব্যবহার বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। সুধীন্দ্রনাথ বেশ কিছু প্রত্যয়ান্ত শব্দেরও ব্যবহার করেছেন।যেমন– বহিরায়তনিক → বহিরায়তন + ইক্, আত্মজৈবনিক → আত্মজীবন + ইক্ (স্বগত), ঐশিক

→ ঈশ + ইক্, ঐন্দ্রজালিক → ইন্দ্রজাল + ইক্ (ধ্রুপদ খেয়াল), মিথুনিক → মিথুন + ইক্ (ঐতিহ্য ও টি.এস.এলিয়ট)

১০। সুধীন্দ্রনাথ নিজের যুক্তিসম্মত গদ্যে নতুন নতুন ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক নতুন শব্দ তৈরী করেছেন। যেমন– প্রাড্ মাইকেলী, কারয়িত্রী, ভাবয়িত্রী, অনেকান্ত (স্বগত), অপসাহিত্য (ম্যাকসিম গর্কি), শৃগালী (লিটন স্ট্রেচি), প্রাগ্ রৈবিক, উত্তর রাবীন্দ্রিক (রবীন্দ্র-প্রতিভা)

১১। দুটি বিপরীত অর্থের শব্দকে পাশাপাশি বসিয়ে অর্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন। যেমন– অনুলোম-প্রতিলোম (কাব্যের মুক্তি), ইতর-অবর (জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স), প্রকার-প্রকারী (ডব্লু. বি. ইয়েটস ও কলাকৈবল্য)।

১২। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই হোক বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য সহজ কথাকে ঘুরিয়ে বলতে প্রাবন্ধিক অনেক প্রচলিত শব্দকে নতুন অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন– অধুনাতনী – আধুনিক অর্থে (উইলিয়াম ফকনর), প্রৌঢ়ি– বৃদ্ধা অর্থে (বার্নার্ড শ), ব্যাসকূট– নিগূঢ় অর্থে, হট্টচারী– গোলোযোগ সৃষ্টি অর্থে (ধ্রুপদ খেয়াল), পশুপতি– মহাকবি অর্থে (জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স), প্রাপ্ত বয়স্ক– শব্দ অর্থে (চোরাবালি)।

১৩। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে কাব্য কবিতা ছাড়াও দর্শন, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি এনেছেন। তাই তিনি বেশ কিছু পরিভাষাও ব্যবহার করেছেন। যেমন– দৃকশাস্ত্র (বিজ্ঞানের আদর্শ), অবচ্ছেদবাদ (উদয়াস্ত), অ্যাপলোগিয়া (ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ড), এন্ট্রোপি (স্বগত), ক্যুনীফর্ম (অনার্য সভ্যতা)।

১৪। ইংরেজি শব্দের ব্যবহার যেহেতু নিছক প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ না রেখে ইংরেজি শব্দের পরিভাষা সৃষ্টি করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।যেমন– অ্যাটাভিজম বা অধিসংক্রান্ত (মনুষ্যধর্ম), জিওলজি বা ভূপঞ্জরবিদ্যা (সূর্যাবর্ত), ব্যারোমিটার বা বায়ুবিদ যন্ত্র (ফরাসির হার্দ্য পরিবর্তন)।

১৫। ইংরেজি শব্দের মধ্যে বাংলা প্রত্যয়ের অনুপ্রবেশ করিয়ে শব্দ তৈরী করেছেন। যেমন– লরেন্সী, বালজাকী (কাব্যের মুক্তি)।

১৬। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে আমরা প্রচুর পরিমাণে চলিত ক্রিয়া, বাগধারা, বিশিষ্ট বাক্যের ব্যবহার পাই। যেমন–বিড়ালতপস্বী, পথ খোয়ানো, জুড়ে বসা, তাকলাগা (ডি.এইচ.লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উল্ফ) জিবেবাঁধা, নামজপা, আশমেটা, কলম চালানো (ডব্লু. বি. ইয়েটস্ ও কলাকৈবল্য)।

১৭। বাক্যসজ্জার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসুরিদের মতোই ইংরেজি বাক্যসজ্জার

দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা অলংকারের প্রয়োগে, পক্ষাপক্ষে দিয়ে, না বোধক শব্দ দিয়ে বাক্যারম্ভ করেছেন। বাক্যসজ্জার তিন ধরনের গঠন দেখি–

ক) SOV ব্যবহার: (i) "পদার্থ বিজ্ঞানীর জড় জগতে উক্ত প্রবৃত্তি সন্ধান পেয়েছেন।" (স্বগত) (ii) "তারপর মানুষের ভাষা ক্রমশ বেড়ে উঠল।" (কাব্যের মুক্তি)

খ) SVO ব্যবহার: (i) "কবি খোঁজে বিশ্বাস্য সম্ভবপরতাকে।" (স্বগত) (ii) "অবশ্য তিনি সে সম্বন্ধে যতটুকু লিখেছেন তা প্রায় নির্ভুল।" (অনার্য সভ্যতা)

গ) OSV বাক্য ব্যবহার : (i) "তাই উক্ত ব্যাধি আমার ক্ষেত্রে মারাত্মক রূপ ধরেনি।" (স্বগত) (ii) "অকপট বিশেষণটিকে আজ আমরা সন্দেহের চোখে দেখি।" (কাব্যের মুক্তি)

১৮। Anti-Climax ব্যবহার : "সেইজন্য কলাকৌশলের অতখানি বহিরাশ্রয়িতা সত্ত্বেও তিনি ধ্রুপদী লেখকদের শেষ বংশধর নন, অত্যাধুনিক খেয়ালী সাহিত্যের অগ্রদূত, সেইজন্য তিনি নিষ্কাম অথচ বৈনাশিক, নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক আখ্যার অযোগ্য, সেইজন্যে তাঁর নিজের সুবুদ্ধি সুবিখ্যাত বটে, তবু তাঁর মন্ত্র শিষ্য মোঁপাসার মৃত্যু উন্মাদ রোগে।" (উইণ্ড্যাম্ ল্যুইস ও এজ্রা পাউণ্ড)

১৯। Climax ব্যবহার : "মনুষ্য সংসারে মানুষই নিত্য, মনুষ্য সমাজে মানুষই সেব্য, মানুষিক মঙ্গল মনুষ্য ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য।" (মানুষ ধর্ম)

২০। অনুপ্রাসের ব্যবহার : (i) "নীল নয়নের নির্বাক অনবধান।" (স্বগত) (ii) "নিরাসক্ত নিসর্গ বিলাসের মতো নিষ্কাম প্রেমও বাঙালীর চরিত্র বিরোধী।" (রবিশস্য)

২১। বক্রোক্তির ব্যবহার : "সুতরাং নিরপেক্ষ শিল্প, তথা নিরাসক্ত সাহিত্য, আপাতত সোনার পাথর বাটির অথবা আকাশ কুসুমের মত নিরুপাখ্য সামগ্রী।" (শিল্পী ও স্বাধীনতা)

২২। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে পূর্ণচ্ছেদ কম না হলেও অর্ধচ্ছেদ ব্যাপক। যেমন– "কাজেই যাঁদের কাছে অনাত্মসাহিত্যই কাম্য ঠেকে তাঁদের পক্ষে শ্রেয়োবোধে অপরিহার্য, তাঁরা একটা লোকোত্তর আদর্শকে প্রাণপণ বলে আকড়ে ধরতে বাধ্য, ... " (উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য)

২৩। 'না' বাচক শব্দ দিয়েও তিনি অনেক বাক্য সৃষ্টি করেছেন, যা গদ্যে নতুন মাত্রা সঞ্চার করেছে। যেমন– "নতুন হপকিন্স কাব্যের ভূমিকায় স্বরচিত সনেট

জুড়ে পরবর্তী কবিতাগুলিকে 'প্রীতির উত্তরাধিকারে' বলার সার্থকতা থাকত না।" (জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স)

২৪। সুধীন্দ্রনাথ উক্তিধর্মী বাক্যও প্রয়োগ করেছেন– "অর্ধসত্য অসত্যের চেয়েও মারাত্মক।" (ম্যাকসিম গর্কি) । "সমালোচনা বন্দনার সপত্নী" (স্বগত)

২৫। খণ্ডবাক্য সজ্জার বিভিন্ন ধরন আমরা সুধীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে পাই। 'যে' দিয়ে 'খণ্ডবাক্য' প্রায় ৫০ টি রয়েছে। যেমন– সুতরাং আরম্ভেই জানিয়ে রাখছি যে স্বগত শব্দটা স্বাগতের মুদ্রাকর প্রমাদ নয়। (স্বগত) অবশ্য তার মানে এ নয় যে সকল কবিই মহাকালের ক্রীতদাস। (কাব্যের মুক্তি)

এ সমস্ত উদাহরণ থেকে প্রথমেই মনে যে ধারণা আসে, তিনি ভাবোদ্দীপক গদ্যের অভূতপূর্ব স্রষ্টা। শুরু থেকেই সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বতন্ত্র। তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'হালবাংলার সিদ্ধিদাতা' রূপে স্বীকার করে নিলেও, শব্দচয়ন, বাক্যসৃষ্টি, একাধিক বাক্যাংশকে সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা বাঁধা সব মিলে সুধীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন এক গথিক শৈলী রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক শৈলীর পাশাপাশি এই শৈলী স্বতন্ত্রতার দাবি অবশ্যই রাখে।

তথ্যসূত্র :

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ, স্বগত, পৃ.৪, প্রকাশ ১৩৯০।
২. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ, কাব্যের মুক্তি, পৃ. ২২, প্রকাশ ১৩৯০।
৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ধ্রুপদ খেয়াল, পৃ. ৩৭, প্রকাশ ১৩৯০।
৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ডি.এইচ.লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উল্ফ, পৃ. ৬৪, প্রকাশ ১৩৯০।
৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ, ঐতিহ্য ও টি.এস. এলিয়ট, পৃ. ১৪১, প্রকাশ ১৩৯০।
৬. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধসংগ্রহ, রবীন্দ্র-প্রতিভার উপক্রমণিকা, পৃ. ২০৯, প্রকাশ ১৩৯০।
৭. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রবন্ধসংগ্রহ, শিল্প ও স্বাধীনতা, পৃ. ৩১৫, প্রকাশ ১৩৯০।
৮. য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পঃবঃ সরকার প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৬, পৌষ, পৃ. ৬৯।
৯. প্রমথ চৌধুরী, বীরবলের হালখাতা, কথার কথা, পৃ. ৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩২৪।
১০. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্তঃশীলা, পৃ. ৫।

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ নাটকে পুরাণ কাহিনির নবরূপায়ন

সুস্মিতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পুরাণ কাহিনির ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে পুরাণ কাহিনি যুগোচিত স্বাতন্ত্রে ফুটে ওঠেনি। মধ্যযুগের পরবর্তী সময় বিশেষ করে নবজাগরণের পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারতের নানান পৌরাণিক কাহিনি সাহিত্যে সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। আধুনিক জীবনের সংকট, অস্থিরতা, মনস্তত্ত্বের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সাহিত্যিকেরা ভারতীয় ঐতিহ্যের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সমালোচক বলেছেন–

> “আমাদের নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল– গ্রিক লাতিনের বদলে সংস্কৃতের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন। তাও হয়েছিল অতীতে ফিরে যাবার রিভাইভালিস্ট তাগিদে নয়, জীবনে নতুন দর্শন, নতুন চর্যা আবিষ্কারের জন্য।”[১]

এই তাগিদ থেকেই সাহিত্যিকেরা বারে বারে তাঁদের লেখনীর উপাদান হিসেবে রামায়ণ, মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনিকে বেছে নিয়েছেন। এই রামায়ণ ও মহাভারতের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে আসছে। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন–

> “এই যুগের বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতিনিধি রূপে দুইখানি বৃহৎ মহাকাব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার একখানি মহাভারত যাহার বিশাল আয়তনের মধ্যে

> ভারতীয় মনের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী রচিত কবিতার অংশ সংগৃহীত হইয়াছে আর একখানি রামায়ণ।”[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যযোগ্য রামায়ণ, মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনিতে নানান অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে, যা আধুনিক মানসিকতার পরিপন্থী। কিন্তু তবুও এই পুরাণ কাহিনির অন্তরালে থাকে মানুষের কতগুলো বাস্তব প্রতীতি। আধুনিক যুগের সাহিত্যিকরা এই প্রতীতিকে তাঁদের সাহিত্যের বাহন করে তুলেছেন। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন–

> “পুরাণের ধর্মই এই যে, তা এক বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহুবিভিন্ন ফুলফোটায় অনেক ভিন্নভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।”[৩]

বাংলা সাহিত্যে পুরাণ কাহিনিকে নব তাৎপর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন সাহিত্যিক। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসু রামায়ণ, মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে বেশ কিছু কাব্যনাটক রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে একটি অন্যতম কাব্যনাটক ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’। রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গের পুরাণ কাহিনিকে এখানে নতুন তাৎপর্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আধুনিক কাব্যনাটকে এলিয়ট যে অন্তর-বাস্তবতা উন্মোচনের কথা বলেছেন ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ কাব্যনাট্যে তার পরিচয় পাওয়া যায় সুস্পষ্টরূপে। একটি সমৃদ্ধ পুরাণ কাহিনিকে নিজের মনোমতো সাজিয়ে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক মানুষের মানসতা, দ্বন্দ্ব, বেদনা সঞ্চার করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকে পুরাণের ঋষ্যশৃঙ্গ, তরঙ্গিণী মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব বেদনায় আধুনিক মানুষের প্রতিরূপক হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধদেব বসুর এই কাব্যনাটকের আধার রামায়ণ, মহাভারতে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনি। রামায়ণের বালখণ্ডে এবং মহাভারতের বনপর্বে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি আছে। মহাভারতের কাহিনিতে আমরা পাই লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরকে ঋষ্যশৃঙ্গের কথা বলেছেন। অঙ্গদেশে বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ বারাঙ্গনাদের সাহায্যে তেজস্বী তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে আনা হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদেশে বৃষ্টি

আরম্ভ হয়। এরপর রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়। সন্তান জন্মের পর রাজকুমারী শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গ দুজনই সংসারের মোহ, মায়া ত্যাগ করে আশ্রমে ফিরে যান। রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি ঠিক এরূপই। বুদ্ধদেব বসু 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাটকে পুরাণের এই চিরাচরিত কাহিনিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের এই প্রাচীন মিথকে নাট্যকার আধুনিক যুগপ্রেক্ষাপটে স্থান দিয়েছেন। নাটকের ভূমিকা অংশেই নাট্যকার জানিয়েছেন–

> "এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটি শিল্পিত অর্থাৎ একটি পুরাণকাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়ে, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য এ ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।"[৪]

বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাটকে চিরাচরিত মিথ-কাহিনির অন্তরালে বর্তমানের যুগ-মানসকে যেমন দেখাতে চেয়েছেন, এর পাশাপাশি তিনি এই কাব্যনাটকে প্রেমের এক নবদিগন্ত আবিস্কার করেছেন।

'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্যনাটকটির কাহিনিতে আমরা পাই– বৃষ্টির কামনায় রত লোমপাদ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে এনে নগরে বৃষ্টি আনবার চেষ্টা করেন। এদিকে তপোবনে বিভান্ডকের পুত্র নারীজ্ঞানহীন ঋষ্যশৃঙ্গ গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে আনবার জন্য লোলাপাঙ্গীর কন্যা বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীকে নির্বাচন করা হয়। লোমপাদের নির্দেশ অনুযায়ী নানা কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরিয়ে আনার জন্য তরঙ্গিণী মনোহর রূপে সুসজ্জিত হয়ে তপোবনে যায়। নারী বিষয়ে অসচেতন ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীর প্রতি আকর্ষিত হয় । ঋষ্যশৃঙ্গকে তার নিজস্ব পৌরুষ সম্পর্কে অবহিত করে তুলেছিল তরঙ্গিণী। বিভাণ্ডক সেই সব শুনে পুত্রকে কামিনীর মোহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং জানায় তার জন্ম বৃত্তান্ত। কিরাত রমণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। বিভাণ্ডক পুত্রকে বলেছেন– "মাতৃত্বের একটি যন্ত্র..সুগঠিত.... তারই নামান্তর হল নারীদেহ ।"[৫] কিন্তু মহাভারতে বিভাণ্ডক সেই সব শুনে বারাঙ্গনাকে

রাক্ষস বলে প্রতিপন্ন করেছিল কিন্তু নাটকে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ পাই না। এছাড়াও নাট্যকার ঋষ্যশৃঙ্গের হরিণের শিঙের বিবরণ নাটকে অনায়াসেই বাদ দিয়েছেন মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনি গড়ার জন্য। নাটকটিতে আমরা লক্ষ করি বিভাণ্ডক প্রভূত চেষ্টা করা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা করতে পারে না। তরঙ্গিণী নিজ প্রতিভা গুণে নিজের উদ্দেশ্যে সফল করে। পরবর্তীতে ঋষ্যশৃঙ্গ নগরে প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি হয়। মহাভারতের এই অলৌকিক বৃষ্টি নামাবার জাদু কাহিনিকে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক ভাবে আবিষ্কার করেছেন সংকেতের মাধ্যমে।

পুরাণ অনুযায়ী লোমপাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই ইন্দ্র তার রাজ্যে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়। নগরজীবন বৃষ্টির অভাবে ব্যাকুল হলে তপস্বীকে রাজ্যে আনবার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনালে শাপমোচন হবে বলে বারাঙ্গনাদের দিয়ে ছলনা করে তাকে নানা কৌশলে তাকে নিয়ে আসা হয়। ফলস্বরূপ সেই নগরে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তারপর রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ হয় তপস্বীর। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভান্ডক ক্রুদ্ধ হলেও তাকে রাজ্যে থাকবার অনুমতি দেন। কিন্তু পুত্র জন্মের পর শান্তার সাথে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গকে ছলনা করতে গিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের পবিত্র দৃষ্টিতে তরঙ্গিণী নবজন্ম লাভ করে এবং ঋষ্যশৃঙ্গ নারী সৌন্দর্য ও সান্নিধ্য উপলব্ধি করে।

> "নারী নারী নারী। নূতন নাম। নূতন রূপ ... নূতন জগত। ... আমি অম্লাত থাকবো তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে।"[৬]

কাব্যনাটকটিতে বুদ্ধদেব বসু ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর দুই বিচিত্র মনোজগতের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে ঋষ্যশৃঙ্গের চরম রোমান্টিক প্রেম ক্রমশ দেহপ্রেমে পর্যবসিত হয়েছে। অন্যদিকে তরঙ্গিণী পবিত্র রোমান্টিক প্রেমে মগ্ন হয়েছে। তরঙ্গিণীর প্রেমের মূল বিষয় যেখানে হৃদয় সেখানে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রেম সম্পূর্ণ রূপে দেহ চেতন। কাব্যনাটকটিতে এই দুই চরিত্রের কথোপকথনে উক্ত মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় –

> "তরঙ্গিণী – এসো প্রেমিক, এসো দেবতা – আমাকে উদ্ধার করো।
> ঋষ্যশৃঙ্গ – এসো দেহিনী, এসো মোহিনী – আমাকে তৃপ্ত করো।"[৭]

ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আসার পর এক বছরের মধ্যে তরঙ্গিণীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি এবং ঘটনাচক্রে রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু শান্তার সঙ্গে তার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। কারণ অবচেতন মনে ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীর অভাববোধ করতে থাকে। এই কাব্যনাটকে তরঙ্গিণীর প্রতি এই অমোঘ আকর্ষণ ঋষ্যশৃঙ্গকে তাড়িত করেছে। নাটকে দ্বিতীয়বার ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গিণীর যখন দেখা হয় তখন ঋষ্যশৃঙ্গ নিজেকে নতুনভাবে আবিস্কার করে। তরঙ্গিণীর হৃদয়ের বাসনার কথা শুনতে শুনতে ঋষ্যশৃঙ্গ দুজনের মধ্যেকার ভাবনার প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি করে। ফলস্বরুপ এক চূড়ান্ত বেদনার উপলব্ধিতে ঋষ্যশৃঙ্গ জীবনের নতুন দিশা খুঁজে নেয়।

আরেকদিকে যখন মন্ত্রী পুত্র অংশুমান সমাগত হয় এবং পিতা বিভান্ডকও পুত্রকে তপোবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী ; তখন শান্তার প্রেমিক অংশুমানের হাতে তাকে তুলে দেয় এবং তাদের সম্পর্কটি পুনরায় প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু অংশুর হাতে তুলে দেবার আগে তাকে কুমারিত্ব দান করে সেই প্রসঙ্গে নাটকে দ্রৌপদীর কুমারিত্ব প্রসঙ্গ এসেছে। পঞ্চপান্ডবের সাথে বিবাহের সময় দ্রৌপদী প্রতিবার নতুন করে কুমারী হয়েছিল। ঋষির বরেই তা সম্ভব হয়েছে। ভারতে পুরাণের সেই তপস্বীদের বরের প্রয়োগ এখানেও বর্তমান। বুদ্ধদেবের কাব্যে 'দ্রৌপদির শাড়ি', 'নল ও দময়ন্তীর প্রেমে' পুরাণের অভিনব প্রয়োগ করে অন্তহীন রহস্যের উন্মোচন করেছেন। নতুন কাহিনি না নিয়ে পুরাতনকে চিরন্তন করার প্রবণতাকে বিশ্বজনীন করতে পেরেছেন। তরঙ্গিণীকে প্রেমের স্বীকৃতি দিলেও শেষে ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা বিভাণ্ডকের সঙ্গে আশ্রমে চলে যায়নি। রামায়ণের কাহিনি অনুযায়ী ঋষ্যশৃঙ্গ বারাঙ্গনার সাথে চলে গেলেও আর কখনো তপোবনে ফিরে আসেননি। এছাড়া ঋষি তার জীবনের প্রথম নারীকে ভুলতে পারেনি। কিন্তু পুরাণে ঋষ্যশৃঙ্গের তপোবনে গমন দেখালেও নাট্যকার কাহিনি মনের মাধুরী দিয়ে সাজিয়েছেন। তাই তপস্বী তপোবনে চলে যাওয়ার সময় তরঙ্গিণীকে বলেছে জন্মান্তরে দেখা হওয়ার কথা।

প্রাচীন ঋষ্যশৃঙ্গ ও বারাঙ্গনার কাহিনির মধ্যে এ যুগের সুস্থ প্রেমের বিকাশ ঘটিয়েছেন। একজন তপস্বী বা মানুষ জীবনের সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিবাহ, সন্তান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে না গেলে উত্তরণ সম্ভব নয়। পুরাণ কাহিনির ঋষ্যশৃঙ্গের

চরিত্রে আধুনিক মানস-ভুবনের দ্বন্দ্ব ও বেদনা সঞ্চারিত করেছেন নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু। তিনি জীবনের সত্যরূপ তুলে ধরতে গিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রাচীন রিচ্যুয়ালস-এর বৃষ্টি বীর্যের প্রার্থনার সংকেত হয়ে দেখা দিয়েছে।

আদিম সমাজে পুরুষ ও নারীর যৌনমিলন প্রসঙ্গে Weston বলেছেন–

> "There is no doubt that ceremonical marriage very frequently formed a part of fertility rituals and was supposed to be specially efficacious in bringing about the effect desired."[৮]

বুদ্ধদেব বসু আদিম রিচ্যুয়ালস সমন্বিত মিথকে আধুনিক জগতের অনুষঙ্গে করে তুলেছেন সার্থক। পুরাণের আকর্ষণ ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর পরিবর্তনগুলি আধুনিক হিসেবে আবশ্যক। কিন্তু পুরাণের শিকড়ে ভর করেই তা হয়ে উঠেছে সামর্থ্য। 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এ বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও বারাঙ্গনার কাহিনিতে অলৌকিক বৃষ্টি নামানোর প্রসঙ্গটিকে চির আধুনিকের পথে নির্দেশ করেছেন। তবে বুদ্ধদেব বসুর এই কাহিনির সাথে পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পতিতা কবিতা পাঠের পরথেকে। তিনি নিজে জানিয়েছেন সেকথা–

> "ঐ নাটকটিকেও কাব্যজাতীয় রচনা বলে ধরে নিচ্ছি- সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম আমি সবেমাত্র উত্তরতিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্ন মহাভারতের আস্বাদ ; সবিস্তার ও অনুপুঙ্খ সমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান পড়ে চমকে উঠেছি – এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পতিতার বাইরে কিছুই জানতাম না।"[৯]

বুদ্ধদেব বসু এই নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর মধ্য দিয়ে প্রকৃত প্রেমের জয়গানকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেহজ কামনা-বাসনাকে অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক প্রেমের পথে অগ্রসর হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর এই প্রেম সম্পর্কিত ভাবনা একেবারে অভিনব সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়াও নাটকটিতে প্রাচীন ঐতিহ্যের কাহিনি যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি এই কাহিনির অন্তরালে বর্তমানের জীবন-জিজ্ঞাসার দিক ব্যঞ্জিত হয়েছে।

আদিম কালে কৃষিকাজ, ফসল ফলানো সংক্রান্ত নানান প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার অঙ্গ হিসেবে কৃষিকাজ করবার সময় পুরুষ নারীর বিবাহ করানো হত। তাঁদের মতে পুরুষের বীর্য এবং সৃষ্টি ছিল সমগোত্রীয়। ফলত পুরুষের সংস্পর্শে নারী যেমন গর্ভধারিণী হয়ে ওঠে তেমনি বৃষ্টির সংস্পর্শে পৃথিবী শস্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই প্রাচীন মিথ নাটকটিতে বর্ণিত হলেও নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক দৃষ্টির উন্মোচন। নাটকটিতে আমরা পাই অঙ্গদেশের অনুর্বর ভূমিতে ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে ধরিত্রী শস্য শ্যামলা হয়ে উঠেছে এবং পরবর্তীতে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী প্রেমের এক নব আলেখ্য রচনা করেছে। বুদ্ধদেব বসু মূলত অঙ্গদেশের বৃষ্টিহীন অনুর্বর ভূমির সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু বন্ধ্যা দিকটির তুলনা করতে চেয়েছেন। আর এই সমস্যা জর্জরিত বর্তমান সভ্যতা প্রকৃত প্রেম, ভালোবাসার আগমনেই তা সুস্থ রূপে ফিরে পেতে পারে। বুদ্ধদেব বসু 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকটিতে এইভাবে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনিকে নবরূপে আধুনিকভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. ত্রিপাঠী অমলেশ, ২০০৯, ইতালীর রেনেসাঁস বাঙালির সংস্কৃতি, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা ৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি, পৃষ্ঠা- ১৯

২. শ্রীঅরবিন্দ, ১৯৯৭, ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি, অনুবাদক: শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, পুনর্মুদ্রণ, পণ্ডিচেরী ৬০৫০০২, মুদ্রক-শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমপ্রেস, পৃষ্ঠা– ৩৪৫

৩. বসু বুদ্ধদেব, ১৩৮১, মহাভারতের কথা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ৭৩, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রালি, পৃষ্ঠা- ৩২

৪. বসু বুদ্ধদেব, ১৪১৮, তপস্বী ও তরঙ্গিণী, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ভূমিকা অংশ

৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৮

৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬

৮. Weston Jessie l., 1993, From ritual to Romance, USA, Priceton University Press, page- 31

৯. বসু বুদ্ধদেব, ১৯৭৪, কবিতার শত্রুমিত্র, কলকাতা, এম সি সরকার, পৃষ্ঠা - ৬৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বসু রাজশেখর, প্রকাশ ১৯৪৯, মহাভারত, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

২. বসু রাজশেখর, প্রকাশ ১৯৪৯, বাল্মীকি রামায়ণ, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৩. চট্টোপাধ্যায় কমলেশ, প্রকাশ ১৯৮০, বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

সুমন ও নচিকেতার গানে ‘জীবনমুখী’ পরিসর : বিস্তৃতি ও বিতর্ক

স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ উচ্চকিত প্রকাশ লক্ষ করা যায় বাংলা গানের ধারায়। বাংলা গানের বিবর্তনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বিশ শতকের নয়ের দশকে বাংলা গান যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার পাঠরূপ বা ‘টেক্সট’-ই এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য। গণসংগীতের বিস্তৃত পর্বের পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানত বিশ শতকের নয়ের দশকের সময়পর্বকে কেন্দ্র করে এমন এক ধারার গান উঠে আসছে, যে গান কার্যত হয়ে উঠতে চায় সমকালের নানা শ্রেণিচরিত্রের আশা-নিরাশা, ভাঙা-গড়ার নির্ভরযোগ্য নথি। রোমান্টিকতার সাথে সমাজবাস্তবতার প্রত্যক্ষ সংঘাত, সমসাময়িক নানা প্রতিচ্ছবি, মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সামাজিক ভাঙন, নগরকেন্দ্রিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হতাশা, যৌনতা ইত্যাদি নানা অভিমুখে পুষ্ট এই কালের গানকে বহু সমালোচক, গণমাধ্যম, আরো নানা প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে ‘জীবনমুখী গান’ বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিশ শতকের নয়ের দশকের প্রেক্ষিতে গীতিকার সুমন এবং নচিকেতার গানের ‘টেক্সট’-এর প্রেক্ষিতে ‘জীবনমুখী গান’-এর তাৎপর্য অনুসন্ধান, বিষয়গত অভিমুখ বিচার, বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই গানগুলিতে ‘জীবনমুখী’ শব্দের অর্থগত অভিপ্রায় অন্বেষণ এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ

সংগীত ; সাহিত্য ; জীবনমুখী ; বঙ্গসংস্কৃতি ; সমাজবাস্তবতা।

মূল প্রবন্ধ

১

‘সংগীত’ সাহিত্য তথা সংস্কৃতির এমন একটি বহুবিস্তৃত মাধ্যম, যা স্থান-কালের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান ঐতিহ্যের মধ্যে জেগে থাকে অবিরত। কবি উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ *Lyrical Ballads*-এর ভূমিকায় যে “Spontaneous Overflow of Powerful Feelings”-এর কথা বলেছিলেন, সংগীতের প্রাণের মর্মকথাটিও যেন তার সাথে মিলে যায়। বঙ্গসংস্কৃতির যাপনের ইতিহাসে গীতিপ্রবণতা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা হিসেবে সদাবিরাজিত। বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ উচ্চকিত প্রকাশ লক্ষ করা যায় এই সংগীতেই। সুর প্রকৃতিসৃষ্ট;মেঘমল্লার, হংসধ্বনির মতো রাগগুলির মধ্যে দিয়েই তা প্রতীত হয়। কিন্তু ভাষা মানুষের আত্মিক সম্পদ। শিল্পীর আপন মানসলোক থেকে স্বতোৎসারিত ভাষা সুরের সঙ্গে সংযোগসাধনের মাধ্যমে জনমানসের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে মিলেমিশে একটি জাতির ‘আত্ম’-এর প্রকাশের নানা অভিমুখকে বয়ে নিয়ে চলে।

২

বাংলা গানের বিবর্তনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বিশ শতকের নয়ের দশকে বাংলা গান যে বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার পাঠরূপ বা ‘টেক্সট’-কে কেন্দ্র করে ‘জীবনমুখী’ গানের পরিসরটির দিকে দৃক্‌পাত করলে তা হয়ে উঠতে পারে সমসময় এবং সমাজের নির্ভরযোগ্য দলিল। গণসংগীতের বিস্তৃত পর্বের পরবর্তী পর্যায়ে প্রধানত বিশ শতকের নয়ের দশকের সময়পর্বকে কেন্দ্র করে এমন এক ধারার গান উঠে আসছে, যে গান আক্ষরিক অর্থেই জীবনের প্রতিস্পর্ধী চরিত্রকে ব্যক্ত করতে চায়। সুমন চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, নচিকেতা চক্রবর্তী, মৌসুমী ভৌমিক, তপন সিংহ, শুভেন্দু মাইতি, পল্লব কীর্তনিয়া প্রমুখ গীতিকারের গীত এই অন্যধারার গানকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমে, নানা প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে প্রাবন্ধিক ও সমালোচকদের আলোচনায় উঠে আসছে একটি বিশেষ পরিভাষা– ‘জীবনমুখী গান’। এই পর্বে তথাকথিত প্রচলিত ‘রোমান্টিকতা’-র সাথে সমাজবাস্তবতার প্রত্যক্ষ সংঘাতের সূত্রে সমকালের নাগরিক নানা প্রতিচ্ছবি, সংবাদ-শিরোনাম থেকে উঠে

আসা ঘটনা সরাসরি স্থান পেয়েছে গানের আখ্যানভাগে। আধুনিক বাংলা গানে প্রেমচেতনা, বিরহবোধ বা নিসর্গচেতনার যে ব্যাপ্তি, তার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ আখ্যানকেন্দ্রিক পরিসরে শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে প্রাতিস্বিক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করাই ছিল এই ধরনের গানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। গানের 'জীবনমুখী' ধারার অন্যতম অগ্রণী সুমন চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা গানের ধারাবিবরণী লিখতে গিয়ে যেমন বলছেন–

> "আধুনিক গানের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে পেটেন্ট হয়ে যেতে লাগলো একটি মাত্র বিষয়: প্রেম।... 'প্রেম' বড়ো সুন্দর বিষয়, বেশ নিরাসক্ত সে রাজনীতির দিক দিয়ে। প্রেমের গানও বেশ নিরপেক্ষ রাজনীতির হিসেবে। পৌনঃপুনিকতার মধ্যে দিয়ে একদিন দেখা গেল 'প্রেমই' হয়ে পড়েছে আধুনিক বাংলা গানের প্রায় একমাত্র বিষয়বস্তু। সেই ট্রাডিশন প্রায় জাঁকিয়ে ব'সে গিয়েছে।"[১]

সচেতন পাঠক নিশ্চয়ই উপরিউক্ত উক্তির মধ্যে থাকা শ্লেষাত্মক পরিহাসটুকু ধরতে পারবেন। সুমন-নচিকেতাদের পূর্ববর্তী সময়ের গানে সুর যতই আধুনিক হোক না কেন, গানের কথায় বা লিরিকে পুনঃ পুনঃ প্রেমের উচ্চারণ ছাড়া তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। এখানেই বাংলা গানের গতানুগতিক চলনে সুমন-নচিকেতাদের গানকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া নতুন বাঁকবদলটি বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দৈনন্দিন যাপনের পরিসরে স্বেদ, ক্লেদ, যন্ত্রণা, সামাজিক ভাঙন, অর্থনীতি, রাজনীতি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, হতাশা, মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন, যৌনতা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে বা শাব্দিক প্রতিরূপের বিচারেও একালের গান এমন বিচিত্র অভিমুখ নির্ধারণ করে দিচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী সময়ের গানের প্রতিপাদ্য বিষয়ের চেয়ে পৃথক। এই সময়ের বাংলা গান একদিকে যেমন ক্রমশ সমকালীনতাকে প্রতিফলিত করবে, ঠিক তেমনি এমন এক সাংস্কৃতিক তথা শৈল্পিক বিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড় করাবে বাংলা গানকে, যার প্রভাবে চমকিত হয়ে পড়বে উদ্দিষ্ট শ্রোতাকুল। বিশ শতকের শেষ দুই-তিন দশক জুড়ে বাংলা গান সংরূপ ও ভাষার দিক থেকে এমন এক অভিনবত্বের অংশীদার হয়েছে, যেখানে স্পষ্টতর অর্থে বাঙালির গানে প্রবেশ করেছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন হল এমন একটি বিমূর্ত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে

বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত আদানপ্রদানের আন্তর্জাতিকতার মাধ্যমে বিশ্বকে একটি একক হিসেবে দেখার চেষ্টা করা হয়। পূর্ববর্তী ও সমসময়ের পাশ্চাত্যের বহু গীতিকার ও সুরকার, যেমন- বব ডিলান, পিট সিগার, জোয়ান বেজ প্রমুখের স্বচ্ছন্দ প্রভাবকে ধারণ করেছে এই কালের বাংলা গান। জোয়ান বেজের 'Farewell Angelina' বা বব ডিলানের 'How many roads must a man walk down before you call him a man' যে শ্রোতারা শুনেছেন, তারা খুব সহজেই সুমনের 'বিদায় পরিচিতা' বা 'কতটা পথ পেরোলে তবে পথিক বলা যায়'-এ পূর্ববর্তী দুইটি গানের প্রভাবকে দেখতে পাবেন। নিয়মতান্ত্রিকতার ঘেরাটোপ থেকে বাংলা গানকে মুক্তি দিয়ে বৃহৎ অর্থে মানবিকতা বা মানবতাবোধের অবক্ষয়ের সূত্র ধরে সুমন স্পষ্টতই বাংলা গানে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য গবেষক স্টিফেন ডরিনকে দেওয়া সুমনের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের অংশ, যেখানে সুমন বাংলা গানে পাশ্চাত্য প্রভাবকে সদর্থকভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন-

> "The great advantage of having modern Bengali Songs was the western influence. So it was a global music. It was better to have that than not to have it. Because, that way, we could have much more variety. Brilliant varieties."[২]

বাংলা গানের সুরে বা কথায় পাশ্চাত্য প্রভাব যদিও নতুন কিছু নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যে সমকালে যেসকল বিষয়-অভিমুখকে কেন্দ্র করে গান বাঁধছেন গীতিকারেরা, সেই অভিমুখকে ধারণ করেছে সুমন-নচিকেতাদের গান। জনসাধারণের জীবনের খুবই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে ভাষার কারুকার্যে যে শিল্পের স্তরে উন্নীত করা সম্ভব, তা নিজস্ব ভঙ্গিতে বাংলা গানে করে দেখিয়েছিলেন সুমন। আর পাশাপাশি নচিকেতার গানে আমরা পাব জীবনের প্রতি এক ক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত। সময়ের ক্ষয়, যন্ত্রণাজনিত রূঢ় বাস্তব, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-বিপ্লবকে এক সম্পূর্ণ নতুন ভাষার আঙ্গিকে পরিবেশন করছেন নচিকেতা। তার গানে যে চালচুলোহীন 'বোহেমিয়ান' দৃষ্টিভঙ্গির চলাচল দেখা যায়, তা এত স্বচ্ছন্দ বলেই বোধহয় তাকে নচিকেতার গানের বৈশিষ্ট্য না বলে বরং তার স্বভাবধর্ম বলতেই বেশি ইচ্ছে করে। প্রতিবাদী গান রচনার আপন নিয়মে নচিকেতার গানে যেমন

আসে র‍্যাপের প্রভাব, তেমনি তীব্র প্রতিরোধের সূত্র ধরে আপাতভাবে 'অশ্লীল' কিছু শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও তার গানে রূঢ় বাস্তবের নির্মোহ বর্ণনাকে সহৃদয় শ্রোতা অস্বীকার করতে পারেন না।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সুমন-নচিকেতা এবং সমকালীন আরো বহু শিল্পীর গানের ভাষায় সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, যৌনতা ইত্যাদি নানা অভিমুখের সাপেক্ষে জীবনের যে পরিসর মূর্ত হয়ে ওঠে, তা কি পূর্বের কোনো গানের সূত্রে পাওয়া যায় না? বাংলা গানের এক বিশেষ প্রতিরূপকে 'জীবনমুখী' তকমা এঁটে দেওয়াকে কেন্দ্র করে তো আজ অবধি কম বিতর্ক হয়নি। যে অর্থে, যে প্রবণতাগুলির মিলিত সূত্রাবলীর নিরিখে বিশ শতকের নয়ের দশকের বিশেষ কিছু গীতিকারের গানকে 'জীবনমুখী গান' বা 'জীবনবাদী গান' বলে চিহ্নিত করা হয়, সেই বিশেষ গীতিকারেরাও প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে এই বিশেষ পরিভাষাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত ছিলেন। এইচএমভি কোম্পানির সূত্র ধরে নচিকেতার গানের ক্যাসেটে 'জীবনমুখী' শব্দটির প্রথম ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যদিও নচিকেতা নিজে তার গানে এই তকমাটি এঁটে দেওয়ার সাথে সহমত ছিলেন না। প্রাবন্ধিক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ সালে অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রতিবেদনের সূত্র ধরে 'জীবনমুখী' শব্দটিকে কেন্দ্র করে হওয়া বিতর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন-

> "'জীবনমুখী' লেবেলটা প্রথম এইচএমভি সেঁটে দেয় নচিকেতার গানে। তারপর থেকে এখনকার সব গানকেই অনেকে 'জীবনমুখী' বলে চিহ্নিত করেন। এই শব্দটায় গায়কদের কিন্তু সকলেরই আপত্তি। নচিকেতারও। নচিকেতা মনে করেন, 'জীবনমুখী বা মরণমুখী নয়। বাংলা গান।' সুমন বলেন, 'আধুনিক বাংলা গান।' শুভেন্দু মাইতি বলেন, 'ভালো গান।' তপন বলেন, 'এই সময়ের গান।' "[৩]

'জীবনমুখী' গানের এই বিশেষ অভিধায় সময়ের সূত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। যে গান শুধুমাত্র যা কিছু সুন্দর, তাকেই ধারণ করে থাকে না, বরং অসুন্দর, কদর্যকেও নির্মোহ সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, জীবনের চলমান পরিসরে যে গান প্রিয়-অপ্রিয়ের

যুগ্ম সহাবস্থানকে স্বীকার করে সমকালীন আঙ্গিকে নিরাভরণ অথচ শিল্পীত মৌলিক এক প্রকাশভঙ্গিকে উপস্থাপন করে, তাকেই বলা হচ্ছে জীবনমুখী গান। ইতিপূর্বে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির অনুষঙ্গে বাংলা গানের চলনকে যে আবিষ্কার করা যায়নি, এমন নয়। যেমন- সুমন-নচিকেতার গানে যে সমাজবাস্তবের পদধ্বনি সূত্রে 'জীবনমুখী' পরিসরের অনুসন্ধান, তার পূর্বসূত্র সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিস্তারিত ভাবে রয়েছে বাংলা গণসংগীতের ধারায়। সুমন-নচিকেতার গানে সমাজবাস্তবতার যে পদধ্বনি শোনা যায়, দৈনন্দিন সংবাদপত্র থেকে উঠে আসা শিরোনামও যেন কোনো সুনিপুণ কৌশলের মাধুর্যে হয়ে ওঠে তাদের গান, তার পূর্বসূত্র নিহিত ছিল গণসংগীতের বিস্তৃত পর্বে। গণসংগীতের অপসৃয়মান ভবিষ্যতের মাঝেও তার অনপনেয় প্রভাব উত্তর-আধুনিক কালের গানের পটভূমিকে নিঃসন্দেহে প্রস্তুত করেছে। এসময় থেকেই ক্রমশ গান 'নির্জন একক'-এর পরিসর থেকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে শ্রেণিচেতনার দৃপ্ত আলোকে।

৩

বিশ শতকের নয়ের দশকে সুমন এবং নচিকেতার গানকে কেন্দ্র করে মূলত 'জীবনমুখী' গানের যে ধারার সূত্রপাত ঘটেছিল, তাই সমসময়ের বহু গীতিকারের গানে প্রভাব ফেলে। নচিকেতার গানে যেমন যন্ত্রণাবিদ্ধ নিরালম্ব এক প্রজন্মের হতাশাবিক্ষুব্ধ, বেদনাতাড়িত জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে গান হয়ে উঠতে চায় সমকালের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিবিম্ব, সে গানে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়ে ঘুণে ধরা ক্লান্তিময় ক্ষণবাদী জীবনের গতানুগতিক চিত্ররূপ, আবার সীমাহীন প্রাণপ্রাচুর্যে ভাস্বর সুমনের গান হয়ে উঠতে চায় আশাবাদের নিষ্কলুষ আশ্রয়। এই পর্যায়ের গানের ভাষারূপ কখনো বা শিল্পীত, আবার কখনো তা উদাসীনতায় ম্লান, পাশাপাশি কখনো তা প্রতিবাদী বেআব্রু বাক্যবাণে পরিব্যাপ্ত। বিশ শতকের নয়ের দশককে কেন্দ্র করে আধুনিক বাঙালির 'প্রাণহীন দেশেতে সাময়িক গানহীনতা'র বেদনাদীর্ণ পথে এই যে নতুন ধরনের গানকে কেন্দ্র করে পথচলা, সেখানে পরিবর্তমান বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে একালের গানগুলির যোগসূত্র নিরূপণের সূত্র ধরে সুমন এবং নচিকেতার গানের পাঠরূপ বা 'টেক্সট'-কে কেন্দ্র করেই মূলত 'জীবনমুখী গানে'র বিষয়গত অভিমুখ অনুসন্ধান করে দেখা আবশ্যক।

জীবনমুখী গান মূলত লিখিত হচ্ছে আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালির সংকটাপন্ন জীবনবোধকে স্মরণ করে। এই কালের গানের শ্রোতাও হলেন এই মধ্যবিত্ত বাঙালিরাই। আবার, এই পর্বে যারা গান লিখছেন, যেমন– সুমন, নচিকেতা। এঁরাও প্রায় সকলেই সেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই একটি বিশেষ প্রজন্মের প্রতিনিধি। ফলে তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মূল্যবোধের গান আসলে কোথাও গিয়ে হয়ে উঠছে সমষ্টির স্বর। সুমন যেমন তার 'তোমাকে চাই' (১৯৯২) অ্যালবামের গানে শোনাচ্ছেন এক নিঃসীম আশাবাদের অনুরণন। তিনি তাঁর গানে মানুষের বানিয়ে তোলা একটা জগতের খোলনলচেকে আমূল বদলে দিয়ে তার গানে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ভিন্ন স্বাদে বাঁচার এক জীবনকৌশল। মধ্যবিত্ত বাঙালির অসুখবিসুখ ভরা হতশ্রী দিনযাপনের ক্লেদপূর্ণ 'কাশির দমক'-কে পরাস্ত করে তার গান হয়ে ওঠে হাল না ছাড়া 'দিনবদলের স্বপ্ন' প্রত্যক্ষ করার এক আশ্চর্য ক্যালেইডোস্কোপ। বাঙালির আপোষপূর্ণ মনোভাব, পণ্যবিলাসী যাপনকে পরাস্ত করে তার গানের কথায় প্রতিধ্বনিত হয় পূবের কোণে আসা লালচে আশ্বাসের দিন। আবার নচিকেতার গানে ধরা পড়ে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্ববিরোধী চারিত্র্যলক্ষণ। সমস্ত সুবিধাবাদ, আশ্রয়-প্রশ্রয়ের অনৃতভাষণকে ভেঙেচুরে ধ্বংসের বেসাতিতে মত্ত সভ্যতায় মধ্যবিত্ত আপোষপন্থী জীবনের কশাঘাতে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে চান জিজীবিষার বোধকে।

যে গান স্পষ্টতই শোনায় দৈনন্দিন জীবনলগ্ন মানুষের কথা, পুনরুচ্চারিত 'রোমান্টিক' ভাষণের মোহান্ধকার থেকে যে গান তৈরি করে সচেতন অথচ অনায়াসরচিত এক দূরত্ব, সে গান কি আদতে আবেগবর্জিত কাঠিন্যে ভরা? এই উত্তর পাওয়া যাবে সুমনেরই একটি গানে–

> "আমি ভালোবাসি সন্ধে
> আমি ভালোবাসি তারা
> আমি ভালোবাসি তাদের ভীষণ ভালোবেসে যায় যারা।
> তুই কাকে ভালোবাসিস
> আমি ভালোবাসি তোকে
> পৃথিবীর সব ভালোবাসা যেন সবার ঘরেই ঢোকে।"

সুমনের গানের এই রোমান্টিক উচ্চারণ তো গতানুগতিকতায় আবদ্ধ নয়। তার গানের কথা এভাবেই বরং তার সমকালীন প্রজন্মের চেতনায় ছড়িয়ে পড়ে তৈরি করে এক 'অন্য গানের ভোর'। তার প্রেমের গানের শিল্পীত বয়ানে পেলব স্নিগ্ধতার স্বাভাবিক ছন্দকে তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু আবার তিনি বানিয়ে তোলেন না কোনো রোমান্টিক 'ইউটোপিয়া'-র জগত। মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানিময় বেদনার সাথে সেতুসম্ভব এক দূরত্বে অবস্থান করে একালের প্রেমের গান, ক্লান্তিপূর্ণ জীবন থেকে যে গানের আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে পাওয়া যায় দু'দণ্ড শান্তি। যদিও সুমনের গানের সাথে ভাষার প্রতিরূপ এবং বিষয়ের প্রেক্ষিতে একটা সচেতন দূরত্ব তৈরি করে নচিকেতার গানের জগত। নচিকেতার গানে একটা পৌনঃপুনিক দুঃখবাদী অনুরণন ধ্বনিত হয়। এই নৈরাশ্য অবশ্য সময়ের গভীর থেকে উঠে আসা; তা নচিকেতার নিজস্ব বানিয়ে তোলা নির্মাণের জগত নয়। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে ভরপুর বেকারত্বময় জীবনে প্রেমের ইশারা তাই ক্ষীণ হয়ে যায় বিষণ্ণতাময় নাগরিক ক্লান্তিময় দিনযাপনে। যে গানে প্রেমের সমান্তরালে উঠে আসে কালো ধোঁয়া, রকের বখাটে ছেলেছোকরা, 'সদ্য শেখা গালাগালি', সে গানের নিরাশাময় আকুতি কোথাও স্পর্শ করে শ্রোতার মননে।

জীবনের সমস্ত রকম নেতিবাচকতার বিরুদ্ধেই কথা বলতে চায় জীবনমুখী গান। সুমনের গানের ভাষায় তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষা আসে খুব স্বচ্ছন্দ গতিতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে নিজেই নিজের শ্রেণিচরিত্রের প্রতি শিল্পীত পরিশীলিত ভঙ্গিতে পরিহাস ছুঁড়ে দেন তিনি, যা ধাক্কা দেয় শান্তিকামী মধ্যবিত্তের আপোষপূর্ণ মানসে। এমনকি পুঁজিবাদী সভ্যতার করাল গ্রাসে চাহিদা ও যোগানের নীতির উপর নির্ভরশীল গানও যে আর পাঁচটা পণ্যের মতোই বিপণন সহায়ক উপকরণ হয়ে ওঠে, তার উপস্থাপনেও 'গানওয়ালা' সুমনের পরিহাসময় আত্মসমালোচনামুখর বিষণ্ণতার বোধ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শত নৈরাশ্যবাদের অভিঘাতের মধ্যে দিয়েও গানকে হাতিয়ার করে তিনি তবু ফিরতে চান অন্য কোনো জগতে। সে জগতের স্পষ্ট রূপ বা দিশা তার গানে ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু আশাবাদী এক অভিগমন সচেতন শ্রোতা বা পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না–

"বেঁচি দিন পালটে দেওয়ার গানের জবান
কোনোদিন হয়ত অন্য আর কোনো গান
'টাকডুম টাকডুমাডুম' নিয়ম ছেড়ে
মানুষের জন্য সুদিন আনবে কেঁড়ে আনবে কেঁড়ে।"

নচিকেতার গানে আবার জীবনের নেতিবোধের ক্লিশে উচ্চারণই হয়ে ওঠে প্রধান। আশা এবং নিরাশার বিরোধপূর্ণ সহাবস্থানে দ্বিধাদ্বন্দ্বময় এক অস্থিরসংকল্প মনোভাব ফুটে ওঠে তার কথায়, যার থেকে নেই কোনো পরিত্রাণের পথ। নচিকেতার গান শেষপর্যন্ত কোনো বিশেষ মতবাদের দাসত্ব করে না। বাস্তব জীবনসংলগ্ন খাপছাড়া এক অসংগতির বোধ হয়ে ওঠে তার গানের প্রধান অবলম্বন। আর শৈল্পিক ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে একেবারে সাদামাটা জনসাধারণের মুখের ভাষাতে কথা সাজিয়ে দেন বলেই কখনো 'স্ল্যাং' এসে তার গানকে পরিশীলিত মধ্যবিত্তের গণ্ডি ছাড়িয়ে নামিয়ে আনে একেবারে মাটিতে-

"হাসপাতালের বেডে টিবি রোগীর সাথে খেলা করে শুয়োরের বাচ্চা
তবুও রেডিওটা টিভিটার সাথে সুর ধরে- সারে জাঁহা সে আচ্ছা।"

অবক্ষয়িত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে, সর্বোপরি ভঙ্গুর সমাজে বসবাসকারী এক নাগরিক হিসেবে বানিয়ে তোলা দেশপ্রেম, ভাঙা সমাজ-সংসার, অর্থনৈতিক অবক্ষয়, দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি নানা বৈনাশিক স্রোতের আবহে ক্রোধের ভাষার যে অসংযম ফুটে ওঠে, সময়ের নিরিখে তাই সঙ্গত বলে বোধ হয়। আর এখানেই পূর্বের এবং সমসময়ের সমস্ত শিল্পীদের সাথে নচিকেতার গানের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট।

জীবনমুখী গান যারা রচনা করছেন, তারা প্রত্যেকেই প্রায় নগরজীবনের শরিক। ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের গানে রচিত হয় দীর্ঘ নাগরিক পরিসরের নানা উদ্ভাস। বিগ্রেডের মিটিংকে কেন্দ্র করে মহানগর কলকাতার চিত্রকে যেমন তুলে ধরছেন সুমন তাঁর গানে, ঠিক তেমনি তাঁরই রচিত গানের সূত্রে ভরপুর জনারণ্য, যানজটের মিছিল, কালো ধোঁয়ায় মুছে যাওয়া আকাশ উঠে আসছে জীবনমুখী গানের ধারায়। নচিকেতার গানের 'ন্যারেটিভ'-ও নাগরিক দীনতাকে মূর্ত করে তোলে। কল্লোলিনী তিলোত্তমার প্রকাশের মাঝেও যে কত স্ববিরোধী ছবি লুক্কায়িত হয়ে আছে, তা তিনি দেখাতে চান।

ক্রিকেট আর ফুটবলের উন্মাদনা ঘেরা শহর বা ভিক্টোরিয়া এবং শহীদ মিনারের সৌন্দর্যের মাঝেও তাই 'অকারণ' মানুষের মৃত্যু বা ফুটপাথে ভিখারিদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না তিনি। কল্লোলিনী তিলোত্তমার বুকে দেহ বিক্রি করে যে মেয়েটা প্রতি রাত্রে 'বারো টাকা' উপার্জন করে, সেই 'রিয়েল' এই গানের শ্রোতাদের বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে। পারিপাট্যহীন এক জীর্ণতার বোধ তাই ঘিরে থাকে তার গানের পরিসর।

দৈনিক *স্টেটসম্যান* পত্রিকার সাংবাদিককে দেওয়া একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে সুমন বলেছিলেন– "Many people ask me why do I record contemporary happenings? I ask why do they happen?"[৪] সমসময়ে ঘটে চলা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানা নেতিবাচক ঘটনার বাস্তবায়নে দুঃখজর্জর কণ্ঠে সকরুণ পরিহাস ফুটে ওঠে জীবনমুখী গানের স্রোতে। শিল্পের প্রতি দায়সূত্রে 'রিয়্যালিটি'র উপস্থাপনে সেখানে থাকে না কোনো কল্পনাবিলাস বা অপরিশীলিত ভাষ্য। সফদর ব্রজলালের খুন, চুনি কোটাল হত্যা, শরণার্থীদের জীবনের ভয়াবহতা, অন্নহীন বেকার শ্রমিকের ক্ষুধাজনিত হাহাকার, ধনহীনতার গ্লানিবোধকে মুছতে চেয়ে বাঁচার লড়াইয়ে সামিল কোনো অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ের দেহপসারিণী হয়ে যাওয়া, অনীতা দেওয়ানের প্রতি ঘাতক ইতিহাসের বিস্মৃতি, ফুটপাথবাসী দরিদ্র জনসাধারণের টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা, পণপ্রথা, নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি নানা ঘটনার নির্মোহ উপস্থাপন সুমনের গানে চোখে পড়বে। 'জীবন আসলে বাঁধা পাকস্থলীতে'– সুন্দর-অসুন্দরের যাবতীয় তর্কের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে যে গান এই রূঢ় আবেগবর্জিত চিরসত্যকে উপস্থাপন করে, সে গানের কাছে বাংলা গানের দীর্ঘতর ইতিহাসের অন্তহীন ঋণ অনস্বীকার্য। পুঁজিবাদী সমাজ, উৎপাদনশীল অর্থনীতিতে জীবনের পণ্য হয়ে যাওয়ার প্রতি নচিকেতার গানেও লক্ষ করা যায় প্রত্যক্ষ আত্মধিক্কার। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি যে সমাজের বুকে ধরিয়ে দিয়েছে আদর্শহীনতার ঘুণ, বিবেকের ক্রন্দন যেখানে ব্রাত্য হয়ে যায়, সেই সময়ের গানের চলনে একটা একঘেয়েমির সুর পাওয়া যায় নচিকেতার গানে–

"শ্রমিকের মুক্তির গান
কৃষকের হাতিয়ার শান
শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন
ঘৃণার প্রতিপালনেতে যত্ন"

খাপছাড়া কতগুলো খন্ড খন্ড ছবির উপস্থাপনে যে গান বুনে চলে প্রতিনিয়ত যাপনের যন্ত্রণাকে, শ্রেণিহীন সমাজ যে সেখানে একটা কাল্পনিক স্বপ্ন হয়েই থেকে যায়, তাকে অর্জন করা যায় না, এরকম কোনো অর্থপূর্ণ অভিঘাত কি দিতে চায় এই গান? উত্তর মেলে না। কিন্তু জীবনের এই ক্রমাগত নেতি, বিচ্ছিন্নতার বোধকে গ্রহণ করেও নচিকেতা যখন সমস্ত জীর্ণ মতবাদকে ইতিহাসের কালগর্ভে নিক্ষেপ করে আলোভরা আকাশ আর শান্ত পৃথিবীর গানে ভবিতব্যকে ভরে দিতে চান, তখন তার গানকে 'দুঃখবাদী' তকমায় না এঁটে বরং 'জীবনমুখী' বলাকেই বেশি সঙ্গত বলে মনে হয়।

৪

বামপন্থী সমাজ আন্দোলনের সূত্র ধরে পর্তুগাল, স্পেন, ল্যাটিন আমেরিকায় গানকে কেন্দ্র করে 'New Song Movement' নামে এক নতুন ধরনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন তৈরি হয় ১৯৭০-১৯৮০'র দশকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল গানের বিষয় ছিল দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, সামাজিক শোষণমুক্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ক্ষমতায়ন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি। এর প্রায় এক দশক পরেই বাংলা গানকে কেন্দ্র করে এমন এক ধরনের গানের জোয়ার আসছে, যার বিষয়-অভিমুখ প্রায় অভিন্ন। অথচ দমকা হাওয়ার মতো বাংলা গানের জগতে সুমন-নচিকেতা বা সমকালের আরো অনেক শিল্পীর আবির্ভাবের পশ্চাতে ছিল না কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের অভিঘাত; বরং তাদের উদ্ভবের পিছনে মূল দায়ভাগ ছিল সমকালের।

জীবনমুখী গানের স্রোত বাংলা গানকে দীর্ঘকাল ধরে যে সমৃদ্ধি দান করেছে, তা নিঃসন্দেহে বাংলা গানের 'নতুন ভোর'। সময়ের অভিঘাতে একসময়ে যে গানের সূত্রপাত ঘটেছিল, তা সময়ের সাথে সাথেই ম্রিয়মান হয়ে এসেছে, এ কথাও স্বীকার্য। যদিও শিল্পী থেকে সমালোচকরা 'জীবনমুখী' পরিভাষাটি নিয়ে নানা সময়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন,

তথাপি জীবনের প্রতিস্পর্ধাকে ব্যক্ত করাই ছিল যে গানের অন্যতম দায়, নির্মম সততার সাথে ঘটমান বাস্তবের উপস্থাপন অনবরত করে চলেছে যে গান, অর্থ-কীর্তি-স্বচ্ছলতার গণিতকে পরাভূত করে মানুষের রক্তে খেলে যাওয়া বিপন্ন বিস্ময়ের বয়ান তৈরি করে যে গান, বিশ শতকের নয়ের দশকের সেই বিশেষ গানের ধারাকে 'জীবনমুখী' গান বা 'জীবনবাদী' গানের আখ্যায় আখ্যায়িত করাকে খুব অসমীচীন বলে মনে হয় না। সুমনের গানকে অনুসরণ করেই বলা চলে, সময়ের এই ভরা আকালেও রূপবৈচিত্র্যে ভরা আধুনিক বাংলা গানের বহমানতাকে কেন্দ্র করে আমরা যদি স্বপ্ন দেখি, কার তাতে কী?

তথ্যসূত্র

১। চট্টোপাধ্যায়, সুমন। (১৯৯৯)। আধুনিক বাংলা গান : আকালের সন্ধানে ? । *ধ্রুবপদ প্রসঙ্গ বাংলা গান*। বার্ষিক সংকলন ১৯৯৯। পৃ. ১৪৪-১৪৫।

২। Dorin, Stephane. (2012). Songs of Life in Calcutta Protest and Social Commentary in Contemporary Bengali Popular Music. *Journal of Creative Communications*. P. 202.

৩। বসু, অরুণকুমার। (২০০১)।*সলিল থেকে সুমন এবং তারপর*। কলকাতা : প্রতিভাস। পৃ. ১৮৭।

৪। তদেব।পৃ. ৭৩।

[*সুমন এবং নচিকেতার গানের পাঠরূপ সিডি, ডিভিডি ক্যাসেট এবং আন্তর্জালিক মিউজিক পোর্টাল থেকে গৃহীত।]

UDDALAK
ISSN: 2320-9275

গান্ধীজির অহিংসা ও সমসাময়িক বিশ্ব : একটি আলোচনা

হৈমন্তী ব্যানার্জী
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় রাজনীতির আকাশে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হলেন সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বস্তুত ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান মুখ। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে তিনি তিনটি বৃহৎ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তবে এগুলি ব্যতীত ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি ক্ষুদ্র স্তরে কিছু আন্দোলন করেন যেগুলি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। গান্ধীজি অসংখ্য আন্দোলন করলেও তিনি কখনও হিংসার সমর্থক ছিলেন না। তিনি ভালোবাসার দ্বারা প্রতিপক্ষের হৃদয় জয়ে পক্ষপাতি ছিলেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর জীবনের মূল বাণীই ছিল সত্য ও অহিংসা। তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যই ঈশ্বর। ঈশ্বরই হল সত্য। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন সত্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র উপায় হল অহিংসা। তবে বর্তমান দিনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি তথা সমাজে এই নীতির প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে এবং তার কারণ কী? তাছাড়া এই অহিংসা নীতিকে বর্তমান দিনের বিভিন্ন হিংসা এবং সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ-এর মোকাবিলা করার জন্য কী উপায়ে ব্যবহার করা হবে, সেটিই হল আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শব্দসূচক

অহিংসা, ভালোবাসা, হিংসা।

মূল আলোচনা

ভূমিকা : মানবজীবনের অনেকাংশই ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়। যিনি যে ধর্মের মানুষ তিনি সেই ধর্মীয় দর্শনের দ্বারা পরিচালিত হন। কিন্তু বিশেষ কোনা ব্যক্তির চিন্তার দ্বারা মানব জীবন পরিচালিত হয়েছে, ইতিহাসে এরূপ নিদর্শন খুব কমই আছে। গান্ধীজি হলেন সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে একজন যার দার্শনিক চিন্তা সমগ্র ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর মনে কম-বেশী প্রভাব ফেলেছে। তাঁর জীবন, দর্শন, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা গান্ধীবাদ নামে পরিচিত। এই গান্ধীবাদ কতকগুলি সূত্র-র উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল সত্য ও অহিংসার সূত্র। গান্ধীজীর কাছে সত্যই হল ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই হল সত্য। অহিংসার পথে চলার মাধ্যমে আমরা এই ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি।

অহিংসা কী ? অহিংসা বলতে সাধারণ অর্থে অন্যের প্রতি হিংসা প্রয়োগ না করাকে বোঝায়। কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে অমাদের চেতনে বা অবচেতনে অনেক সময় আমরা হিংসা প্রয়োগ করে ফেলি। যেমনভাবে আমাদের নিঃশ্বাস বা প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার সময় অনেক অণুজীব বিনষ্ট হয়ে যায়, সেটিও কিন্তু একপ্রকার হিংসা। গান্ধীজি কিন্তু অহিংসাকে বর্ণনা করেছেন অন্যভাবে। তাঁর মতে, হিংসাময় এই পৃথিবীতে আমাদের অবশ্যই একটি অহিংস জীবনযাপন করতে হবে এবং তা তখনই সম্ভব হবে যদি আমরা সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকি। এইভাবে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সত্য অহিংসা নয়, কিন্তু সত্যের মধ্যেই অহিংসা নিহিত আছে।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজির ধারণা প্রকৃতিগত ভাবে একটি সক্রিয় ও সাহসী মতবাদ। কারণ তিনি একজন অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী মানুষকে অন্যায়কারী বা অত্যাচারী মানুষকে ক্ষমা করার কথা বলেন এবং হিংসাকে ক্ষমার দ্বারা জয় করার কথা বলেন। এবিষয়ে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

স্বরূপ দুটি প্রত্যয়কে তুলে ধরেন–

ক) মানুষ স্বভাবগত ভাবে সৎ

খ) অহিংসা ও সত্যাগ্রহ মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আনতে পারে।

তবে তিনি অহিংসার পূজারী হলেও নারীর মর্যাদা, শিশুর প্রাণরক্ষা, এবং অতর্কিতে হামলা করা বন্যপ্রাণী ও শত্রুপক্ষের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য হিংসার আশ্রয় নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

গান্ধীজির অহিংসা চিন্তার উৎস : গান্ধীজির রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হল অহিংসা। কিন্তু অহিংসা তাঁর সহজাত ধর্ম ছিল না। তিনি তাঁর যৌবনকালে বাইবেল-এর 'সারমন অন দ্য মাউন্ট' গ্রন্থের দ্বারা অহিংসা তথা ভালোবাসার মধ্য দিয়ে অন্যায়কে প্রতিরোধ করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। এছাড়া ভারতীয় হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রের উপনিষদ এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতার দ্বারা নিজের অন্তরের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এমনকি ইসলামের পয়গম্বর মহম্মদের জীবন আদর্শ দ্বারাও তিনি অহিংসা নীতি গ্রহণে উৎসাহী হয়েছিলেন। এছাড়াও আমেরিকান দার্শনিক থোরো রচিত 'Essay on Civil Disobedience' এবং টলস্টয় রচিত 'The Kingdom of God is within You' দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

গান্ধীজির অহিংসা ও সত্যাগ্রহের প্রয়োগক্ষেত্র : পেশায় একজন আইনজীবী হিসাবে ১৮৯৩ খ্রী: আফ্রিকায় গান্ধীজি তাঁর কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে তিনি সেখানকার অভিবাসী ভারতীয়দের বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই-এ পুরোধা হয়ে ওঠেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন বাইশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। তবে তাঁর এই সংগ্রামের পথটি ছিল অহিংসার। যেখানে তিনি হিংসা প্রয়োগ না করে ভালোবাসার মাধ্যমে শাসকের মনের প্রতি সত্যের প্রতি আগ্রহ জাগাতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের মনের পরিবর্তনই একমাত্র পারে সকল প্রকার রাগ, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের অবসা ঘটাতে।

তাঁর এই অহিংসা তথা সত্যাগ্রহের পথটি ছিল আবেদন-নিবেদন-এর মাধ্যমে শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তবে আমরা একথা বলতে পারি যে, তিনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেননি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি ভারতীয় কৃষকদের (যারা ইক্ষুক্ষেতে মজুরের কাজ করতো) এবং খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষের শিকার হতে দেখে এইরূপ আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনে তিনি সফলও হয়েছিলেন। এই সফলতাই গান্ধীজিকে উজ্জীবিত করেছিল ভারতে ফিরে এসে আসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করার। তাই আমরা বলতে পারি দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-এর পরীক্ষা মঞ্চ।

১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এসে তিনি নিজেকে ভারতীয় রাজনীতির মূলধারার সাথে নিযুক্ত করেননি। তিনি ফিরে আসার পর ভারতবাসীর তৎকালীন পরিস্থিতি জানার জন্য সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে এসে ১৯১৬ সালে গুজরাটে সবরমতী আশ্রম গড়ে তোলেন। সেখানে তাঁর অনুগামীদের তিনি অহিংসা ও সত্যাগ্রহের ভাবধারায় দীক্ষিত করতে শুরু করেন।

গান্ধীজি আসার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতির মূলধারা থেকে কৃষক, শ্রমিক-এর মত নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন ব্রাত্য ছিল। গান্ধীজি সর্বপ্রথম জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৫-১৯২০ সাল পর্যন্ত কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনটি আন্দোলন করেছিলেন। এই আন্দোলনের প্রত্যেকটিতেই তিনি চূড়ান্ত সফলতা লাভ করেন।

গান্ধীজির অহিংসা ও সমসাময়িক বিশ্ব : গান্ধীজি তাঁর নিজের রাজনৈতিক জীবনে ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন করলেও সেগুলি যে চূড়ান্ত সফল এমনটা বলা যায় না। তবে তাঁর অবদানকে একেবারে অস্বীকারও করা যায় না। বস্তুতপক্ষে তিনিই প্রথম জাতি-ধর্ম-বর্ণ- পেশা নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে গণ আন্দোলনের রূপ দিতে সমর্থ

হয়েছিলেন। গান্ধীজির আন্দোলনগুলির নেতিবাচক দিকটি ছিল ধারণাগত বোঝাপড়ার অভাব। প্রতিটি আন্দোলনই দলের শিক্ষিত ও প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হত। তারা ঘন ঘন আন্দোলনের রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটাতেন। ফলে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মনে বিভ্রান্তি তৈরী হত। গান্ধীজি ভালোবাসার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের হৃদয় পরিবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের কখন শুভবুদ্ধির উদয় ঘটবে, কখন তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটবে এইসব বিষয়গুলি ছিল অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটত। চৌরিচৌরার ঘটনা ছিল এর অন্যতম উদাহরণ। গান্ধীজির চিন্তাভাবনার সাথে কিছু অবাস্তবতা মেশানো ছিল। তিনি সত্যাগ্রহীদের পরজন্মে বিশ্বাসী হওয়ার পরামর্শ দিতেন। তিনি কোনো কিছু প্রাপ্তির কথা না ভেবে কর্ম করে যাওয়ার কথা বলতেন, কিন্তু কোনো ফল লাভ না করে কর্ম করলে মানুষ একদিন হতোদ্যম হয়ে পড়বে গান্ধীজি এই সত্যটায় বিস্মৃত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহ ফলাফলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্তরে কিছু সংখ্যক সংগঠন (ASEAN, SAARC, SAFTA) প্রতিষ্ঠা করে। এটা আশা করা হয়েছিল যে, এই সংগঠনগুলি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে এবং দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু এইসব যে অলীক কল্পনা ছিল, তা খুব সহজেই বোঝা গেল। ঠাণ্ডা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সমগ্র বিশ্ব দুটি মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা শুরু করল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর। এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে জাতিসমূহকে আবদ্ধ করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। সমসাময়িক কালে ভূখণ্ডগত

সাম্রাজ্যবাদ হয়তো নেই কিন্তু তার থেকেও বড় হয়ে যেটি দেখা দিয়েছে সেটি হল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল। দরিদ্র দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) স্থাপন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে উন্নত দেশগুলি দুর্বল দেশগুলিকে ঋণের জালে আবদ্ধ করেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত ও শক্তিশালী দেশ পৃথিবীর উত্তরভাগে অবস্থিত এবং দুর্বল ও গরীব দেশগুলি দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। তাই বলা যেতে পারে দক্ষিণের ওপর উত্তরের আধিপত্য তৈরী হয়েছে। ঔপনিবেশিক দেশগুলি যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন দেশগুলি পরস্পরের সাথে ভূখণ্ডগত, জাতিগত ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সেই ধারা এখনও বজায় আছে। উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণকে এইসব দেশগুলি নিজেদের উন্নতির কাজে ব্যবহার না করে পরস্পরকে ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠে। ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। উদাহরণ হিসাবে পাকিস্তানের কথাই বলা যেতে পারে। ভারতকে ধ্বংস করার চেষ্টায় পাকিস্তান প্রায় দেউলিয়ার পথে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির অবস্থা আরও ভয়াবহ। এখানকার প্রতিটি দেশ উগ্র সন্ত্রাসবাদ ও গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত। অথচ যদি এই ঘটনা পরম্পরাগুলি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে মানুষের দ্বারা। বিশেষ করে মানুষের অশুভ চিন্তার দ্বারা। মানুষের মনের অশুভ উপাদানগুলি বিশেষত লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদিগুলি মানুষকে সৎ কাজ করা থেকে ও অন্যের প্রতি করা সৎ ভাবনা থেকে বিরত রাখে। মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব, সমাজের একক হিসাবে প্রতিটি মানুষ পরস্পরের সাথে আন্তর্জালকের ন্যায় যুক্ত থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এক মানুষের ক্রিয়াকলাপ অন্য মানুষকে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও এই নিয়মের বাইরে নয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের পদক্ষেপ অনান্য রাষ্ট্রগুলিকে প্রভাবিত করে। এই রকম এক পরিস্থিতিতে গান্ধীজির অহিংসা ও সত্যাগ্রহের ধারণা

সমসাময়িক বিশ্বের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহ ও অহিংসার ধারণায় সমগ্র ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় মুক্ত সংগ্রামে নিয়োজিত করলেও তাঁর ধারণাগুলি কখনও কোনো দেশ, কালের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এগুলির আবেদন সর্বজনীন। সকল মানুষের মধ্যেই সত্যাগ্রহীর সত্তা আছে। শুধু সেই সত্তাকে সঠিক সময়ে জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষ যখন নিজের মনকে অশুভ উপাদানগুলি থেকে মুক্ত করে সত্য অন্বেষণে নিয়োজিত করবে তখনই সে প্রকৃত সত্যাগ্রহী হয়ে উঠবে। একমাত্র তখনই তার মধ্যে ভালোবাসা ও অন্যের প্রতি মঙ্গল চিন্তার প্রকাশ ঘটবে যা দিয়ে সে বিশ্বের সকলের মঙ্গল সাধন করতে পারবে। গান্ধীজির অহিংসা ও সত্যাগ্রহের ধারণা ভারতবাসীকে ব্রিটিশদের দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছিল, স্বাধীন করেছিল। সমসাময়িক বিশ্ববাসীর কাছে এই ধারণাগুলি অনুসরণযোগ্য। মানুষের মন যতদিন অশুভ উপাদানের দ্বারা পরিচালিত হবে ততদিন সে অশুভ শক্তির কাছে পরাধীন হয়ে থাকবে। একমাত্র গান্ধীজির আদর্শে পরিচালিত হওয়ার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। গান্ধীজির চিন্তাভাবনা কোন নির্দিষ্ট দেশের সীমা ছাড়িয়ে সকল বিশ্ববাসীর কাছে আজও প্রাসঙ্গিক কারণ প্রতিনিয়িত নিত্যনতুন অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে কোনা ব্যক্তির দ্বারা অথবা দেশের সরকারের দ্বারা। একমাত্র গান্ধীজির আদর্শই পারে সকলের মধ্যে সত্যাগ্রহীর আদর্শ জাগিয়ে তুলতে।

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে গোটা বিশ্ব জুড়ে। পরিবর্তন ঘটেছে হিংসা প্রয়োগের কৌশলেও। ফলে হিংসা প্রয়োগের ফলাফল হয়েছে আরও বেশী মারাত্মক। তাই এখন গান্ধীজির অহিংসা নীতি ও সত্যাগ্রহের নীতিগুলির প্রয়োগক্ষেত্রের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। পৃথিবী ব্যাপী বায়ুদূষণের মাত্রা গভীর সবুজ অরণ্যেও যেমন প্রভাব ফেলে, ঠিক তেমনই গান্ধীজির অহিংসা ও সত্যাগ্রহের নীতিটিও পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়ে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার হিংসার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সমান প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

বর্তমান বিশ্বে প্রধান সমস্যা হল পরিবেশ দূষণ। এখন মনে হতেই পারে, হিংসার সাথে পরিবেশ দূষণের কী সম্পর্ক? পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, একশ্রেণীর মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী মানুষ অত্যধিক মুনাফা লাভের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহার করছে, যাতে পরিবেশর অবনমন ঘটছে। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। তাছাড়া অতিরিক্ত পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার ফলে এবং পরীক্ষা নিরিক্ষা করার ফলে পরিবেশে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশছে তার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমরা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ঘটা পরামাণু বিস্ফোরণের ক্ষতিকারক দিকের কথা স্মরণ করতে পারি।এগুলি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হল মানুষকে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ ও অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী করে তোলা। যাতে করে প্রতিটি মানুষ আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্য হিংসার বশবর্তী হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে।

পৃথিবী হয়তো এখনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পাশাপাশি অবস্থানকারী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষে লিপ্ত আছে। এর ফলে দুটি দেশের প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ ও অর্থের অপচয় ঘটে চলেছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে গান্ধীজির অহিংস নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে পরস্পর দুটি দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা, পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যুদ্ধর আবহ থেকে মুক্ত থাকা যেতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে পুঁজি এবং বিভিন্ন দ্রব্যের অবাধ যাতায়াত সম্ভব হয়েছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে। এর ফলে বিভিন্ন অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শোষণ তীব্রতর হওয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্যগুলির নিজেদের দেশের বাজারেই আজ কোনো চাহিদা নেই। উন্নত দেশগুলির বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানী এসে ঘরোয়া বাজার দখল করে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিদেশী দ্রব্য গুলি বর্জন করে নিজস্ব দ্রব্য

উৎপাদনের উপর জোর দিতে হবে। যার জন্য গান্ধীজির দেখানো পথে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে।

বর্তমানে বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলি নিজেদের পেশীশক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তকে অস্থির করে তুলছে। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরান আক্রমণ। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ে বিগত সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে রাশিয়া বিরোধীতার রঙ্গমঞ্চে পরিণত করেছিল এবং তালিবান সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছিল। যাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বর্তমান বিশ্ব তথা বর্তমান প্রজন্ম ভীত, সন্ত্রস্ত। মানুষের মনের বিকৃত চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর হল হিংসামূলক কার্যকলাপ। যা থেকে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হয়। একমাত্র গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ সর্বপ্রকার হিংসা বর্জন করে আত্মশুদ্ধিকরণ ঘটাতে পারে।

উপসংহার : গান্ধীজির অহিংসার বাণী আজও প্রাসঙ্গিক। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। সেই ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট সমস্যাগুলি আরও জটিল। আর এই প্রতিটি জটিল সমস্যার উৎস-স্থল হচ্ছে মানুষের বিকৃত মন। তাই সর্বাগ্রে উচিত মানুষের এই বিকৃত মনের পরিবর্তন ঘটানো। গান্ধীজির সত্য, অহিংসা ও ত্যাগ-এর মহান নীতিগুলির দ্বারা যখন মানুষ পরিচালিত হবে, তখন পৃথিবী হিংসা মুক্ত হয়ে সকলের বসবাসের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

গ্রন্থপঞ্জি :

1. Chandra Bipan, Mukherjee Mridula, Mukherjee Aditya, Mahajan Sucheta and Panikkar K.N. (2016), India's struggle for Independence, Penguin Random House India.
2. Chandra Bipan (2009), History of Modern India, Orient Blackswan.

3. Malik Rahaman Abdur M, Abbas Zamin Rana, Ashraf Muhammmad, Rehman Abdul Chaudhry, Ahmad Zulfqar, Gandhi's Ahimsa – A Critical Review at the Critical Time of war against Terrorism, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 12; July 2011.
4. Bhuimali A., Saha J, (2017), A Brief History of Ahimsa with Special Reference to Gandhi, International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies, Volume – 3, Issue – 3.